

অনল-আয়তি

সুশীল রায়

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১-সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রকাশক প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি.
১-সি কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা ১২

বৈশাখ ১৩৭১
মে ১৯৬৪

দাম পনেরো টাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শ্যামল সেন
সহায়তায় শুচিব্রত দেব
ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন
সিণ্ডিকেট, কলিকাতা ৬

মুদ্রক : ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৬

নিবেদন

এ বই কিছুকাল আগে লেখা। কবে লেখা, গ্রন্থ-মধ্যে কাহিনীর প্রসঙ্গে তার উল্লেখ আছে। সে সময়েই এটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোনো কারণে বাধা ঘটে। ফলে, বইটি প্রকাশের উৎসাহ আর থাকে না। অবশেষে কয়েকজন বন্ধুর, বিশেষ ক'রে একজন বন্ধুর, উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হল।

সতীদাহ-প্রথা নিয়ে বইটি লিখিত। এজন্যে এ'কে সতীদাহ-উপাখ্যান বলা যায়। ইতিহাসের উপর এ কারণে অনেকটা নির্ভর করতে হয়েছে।

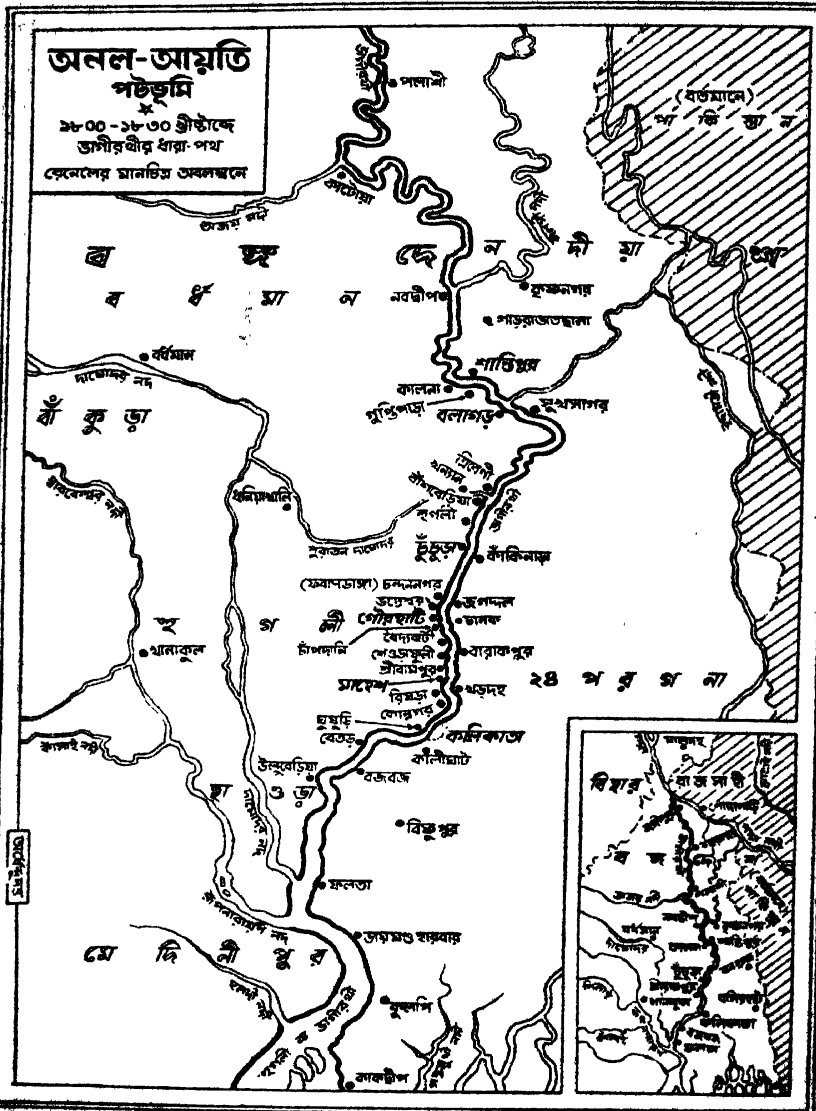
ছড়া গান বা কবিতা-জাতীয় যেসব লেখা এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু সংগৃহীত, বাকিগুলি লেখকের।

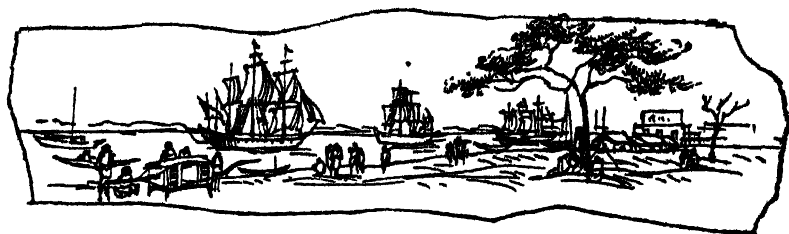
এই গ্রন্থের কাহিনীর ঘটনাস্থল ভাগীরথীর উভয়কূল; গ্রন্থারম্ভে পটভূমিকার একটি মানচিত্রও দেওয়া হল।

১৩/বি কাকুলিয়া রোড। কলিকাতা ১৯
২৫ বৈশাখ ১৩৭১

সুনীল রায়

অনল-আহুতি


অনল-আয়তি
পটভূমি
১৮০০-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে
ভাগীরথীর ধারা-পথ
রেনেলের মানচিত্র অবলম্বনে
পলাশী
কাটোয়া
অজয় নদী
(বর্তমানে)
পা কি স্তা ন
ন দী য়া
ব র্ধ মা ন
নবদ্বীপ
কৃষ্ণনগর
বর্ধমান
দামোদর নদ
শান্তিপুর
কালনা
গুপ্তিপাড়া
বলাগড়
সুখসাগর
বাঁ কু ড়া
ত্রিবেণী
বাঁশবেড়িয়া
হুগলী
ধনিয়াখালি
চুঁচুড়া
নৈহাটি
পুরাতন দামোদর
(ফরাসডাঙ্গা) চন্দননগর
জগদ্দল
গৌরহাটি
বৈদ্যবাটি
চাঁপদানি
শেওড়াফুলী
ব্যারাকপুর
শ্রীরামপুর
মাহেশ
খড়দহ
রিষড়া
কোন্নগর
খানাকুল
হু গ লী
২৪ প র গ না
ঘুষুড়ি
বেতড়
কলিকাতা
কালীঘাট
উলুবেড়িয়া
বজবজ
হা ও ড়া
বিষ্ণুপুর
ফলতা
রূপনারায়ণ নদ
ডায়মণ্ড হারবার
মে দি নী পু র
কুলপি
কাকদ্বীপ
বিহার
রাজসাহী



॥ প্রথম স্ফুলিঙ্গ ॥

প্রবলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে আজ বঙ্গোপসাগর। সুদূরের কোনো নেপথ্যলোক থেকে কোনো গ্রহ আজ তাকে নিশ্চয় নিবিড় আকর্ষণে টেনেছে। ফেনার অজস্র হাত আকাশে তুলে তার নাগাল পাওয়ার জন্যে তাই আজ উন্মত্ত হয়েছে হয়তো বঙ্গোপসাগর। তার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চারিদিকে বেজে উঠেছে কল্লোল, বিপুলাকৃতি ঢেউ সেই কল্লোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাতামাতি আরম্ভ করেছে।

তার এ দাপাদাপি মধ্যসমুদ্রে নয়, এ দাপাদাপি মাটির কিনারের কাছে। কী সে চায়, সে কথা স্পষ্ট করে হয়তো সে নিজেই জানেনা। তা যদি জানত তাহলে তার এ মত্ততার মানে হয়তো কিছু পাওয়া যেতই, তা যদি জানত তাহলে তার একটা নিশানাও থাকত নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু না, সে অনুভব করেছে প্রবল আকর্ষণ মাত্র। এবং সেই জন্যেই এই মত্ততা জেগেছে তার মনে। বঙ্গোপসাগর এই জন্যেই প্রবলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে।

মোহনার কাছে এসে তার প্রমত্ততা যেন চরম রূপে দেখা দিয়েছে। যত দূরে দৃষ্টি যায়, শুধু জল আর শুধু জল, শুধু ঢেউ আর শুধু ফেনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ছে সেই জলের পাহাড়, আক্ষেপের মত ক'রে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে অজস্র জলকণা।

একটা সমুদ্র-শকুন বার বার ছোঁ মারার চেষ্টা ক'রেও কিছুতে ছুঁতে পারছে না সেই জলপাহাড়ের চুড়া। কেবল ঘা খাচ্ছে পাখায়। তার আকাঙ্ক্ষারও বুঝি পুরণ হচ্ছে না কিছুতে। তবুও তার চেষ্টার ত্রুটি নেই, পাখা ঝাপটানোরও শেষ নেই। তার ব্যস্ত পাখায় বেজে চলেছে আর্তনাদ।

অবশেষে ক্ষিপ্ত ঢেউয়ের উপর তার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে পশ্চিম-আকাশের দিকে উধাও হয়ে উড়ে চলে গেল সেই সমুদ্র-শকুন। কিন্তু সমুদ্র তার আশা বুঝি জলাঞ্জলি দিতে পারল না।

স্ফীত হয়ে উঠে পথ খুঁজতে খুঁজতে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ঢুকে পড়ল একটা জলের গলিতে। সে গলি হচ্ছে হুগলী-নদী।

দুই পার উচ্চকিত ক'রে ভয়ংকর মূর্তিতে উজানে এগিয়ে চলল বিশাল জলদৈত্য—সদাগরী নৌকোর সারা শরীরে ত্রাস সঞ্চার করতে করতে, কিনারের ক্ষুদে ক্ষুদে কুটিরে হাহাকার ছড়িয়ে দিতে দিতে।

বান এল হুগলী-নদীতে।

পোর্তুগিজ বণিকেরা এ নদীর নাড়িনক্ষত্রের খোঁজ রাখে অনেক কাল থেকে। তারা বান দেখেছে, তাদের মনে আছে সেই প্রলয়ের কথা— ১৭৩৭ সালের সেই প্রবল ঝড় আর এই নদীর তাণ্ডব। কলকাতায় বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল সেই প্রলয়, কুমারটুলিতে গঙ্গার কিনারে গোবিন্দমিত্তিরের নবরত্ন-মন্দিরের আকাশ-ছোঁয়া চূড়ার কয়েকটা সেই প্রলয়ে খসেও পড়ে। কিন্তু এমন অদ্ভুত বান তাদের এ তল্লাটের সদাগরী-জীবনে এই নাকি প্রথম। আকাশে ঝড় বাদল নেই। কেবল নদীর স্রোত উঠেছে ফেঁপে। সেই স্ফীত জলের অগাধে তলিয়ে যাচ্ছে কিনারের মাটি।

সাগরসংগমতীর্থ ডুবিয়ে দিয়ে, শতমুখী আর চৌমুখীতে প্লাবন সঞ্চার ক'রে রূপনারায়ণের ও দামোদরের মোহনা ডিঙিয়ে সেই জলস্রোত তীব্রবেগে প্রবেশ করল এই নদীতে। ফলতা আর বজবজে প্রলয় সাধন ক'রে কালীঘাট কলকাতা বেতড় পার হয়ে ছুটে চলল উজানে, ঘুষুড়ি কোন্নগর সুখচর মাহেশ পার হয়ে ঘা দিল শ্রীরামপুরের ঘাটে— দিনেমারদের কয়েকটা পণ্যবোঝাই বাণিজ্যতরী দিল ডুবিয়ে।

তবু কমল না সেই বেগ। বৈদ্যবাটী আর কাকিনাড়া ডিঙিয়ে গিয়ে সেই বান ঝাঁপিয়ে পড়ল গৌরহাটির কিনারে। কোনো সদাগরী নৌকো নয়, কোনো বজরা নয়, ডিঙি নয়, পিনীষ নয়, কামানমুখো জাহাজ নয়, কোনো

আশ্রয়-কুটিরও নয়— এখানে এসে এক [illegible] করে বসল [illegible] বান। মহোৎসব-মত্ত এক বিরাট জনতার উল্লাস [illegible] দিল সহসা।

নিভিয়ে দিল একটি চিতা।

এক লহমার মধ্যে এখানে এই অঘটন ঘটিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে গেল সেই বান কালনা আর কাটোয়ার দিকে।

গৌরহাটির সেই নিমজ্জিত চিতার কিছুটা দূরে এবং কিছুটা উঁচুতে নদীর কিনারের একটি চালতে-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে দুটি প্রাণী। অনেকক্ষণ থেকে তারা দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এখান থেকেই তারা দেখছে সার বেঁধে দাঁড়ানো ওই এয়োতির দল, এখান থেকেই শুনছে ঢাক আর ঢোলের প্রবল শব্দ, এখান থেকেই তারা লাল রঙের কাপড় পরা এক পাল লোকের তাণ্ডব-নৃত্যও দেখছে। সেই সঙ্গে তারা দেখতে পাচ্ছে একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে জন-কয়েক লোক চলেছে জলন্ত চিতাটির দিকে। ঢাক-ঢোলের শব্দ আর তুমুল কলরবের মাঝখান থেকেও তাদের কানে আসছিল করুণ আর্তনাদ। নির্মম হাতের নিগড় থেকে মুক্তির জন্যে কাঁদছে মেয়েটি।

হঠাৎ সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিভে গেল চিতা। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। আশাভঙ্গও বুঝি হল তাদের।

চালতে-গাছের নীচে ছোট্ট মেয়েটি যেন ভয় পেয়ে গেল, তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হল বাবা ?

পাথরের মূর্তির মতন অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তার বাবা।

কোনো উত্তর না পেয়ে মেয়েটি আবার বলল, কি হল বাবা ?

একটা নিশ্বাস ফেলে তার বাবা বললেন, কিছু না।

মেয়েটি ছাড়েনা। বাবার হাত ধরে টেনে জিজ্ঞাসা করল, কি হচ্ছিল বাবা। কি হচ্ছিল ওখানে ?

তবুও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বাবা অস্ফুটে বললেন, সতী।

কিছু বুঝতে না পেরে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল মেয়েটি।

সে অনেকদিনের কথা। চার শ বছরেরও বেশি। অনেক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অনেক দূর দেশ থেকে এই দেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিল একদল

বিদেশী বণিক। সোরা আফিম সিল্ক রেশম মসলা আর মসলিনের বাণিজ্যের লোভে এসেছিল তারা— এই পোর্তুগিজেরা। সমুদ্রের তরঙ্গ মন্থন করতে করতে ভারতের উপকূল বরাবর পুবদিকে এগিয়ে এসে বঙ্গোপসাগরের কিনারে আরাকানে ও চট্টগ্রামে স্থাপন করেছিল তাদের উপনিবেশ। তারপর ক্রমে তারা এল বাংলাদেশের নূতন এই উপকূলে। এখানে তারা নরমমাটির স্বাদ পেল এবং সেই সঙ্গে পেল প্রশস্ত একটি নদীমুখ। তারা নোঙর করল তাদের জাহাজ। এ নদীতে জাহাজ অচল ব'লে ছোট ছোট নৌকো চেপে তারা প্রবেশ করল ভিতরে, এবং অনেকটা অন্দরে চলে এসে সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হল তাদের বাণিজ্য। ক্রমশ বাণিজ্য বেড়ে উঠল, তারাও এসে ঘাঁটি নিল হুগলীতে। কেবল ব্যাবসা নয়, সেই সঙ্গে তাদের অনেকে আরম্ভ করল অত্যাচার অনাচার। ত্রাস সঞ্চার করল তারা এই দেশের মানুষের মনে।

এখানকার বাণিজ্য-সম্ভাবনার কথা ধীরে ধীরে বুঝি ছড়িয়ে পড়েছিল আরো বহু বিদেশীর কাছে। আরও অনেক বিদেশী বণিকের তাই নজর পড়ল এই দিকে। ক্রমে ক্রমে একই জলপথ ধরে এদেশে এসে উপস্থিত হল নতুন ভাগ্যান্বেষীর দল— ওলন্দাজ দিনেমার ফরাসি ইংরেজ।

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। এই নদীর দুইপারের কুঠিতে আর আড়তে, প্রাসাদে আর অট্টালিকায়, কলে ও কারখানায়, এমনকি এর জলের কণায় কণায় বুঝি স্পষ্টাক্ষরে তা লেখা আছে। এই জলের নামা-ওঠা আছে, ইতিহাসের এই ঘটনাবলীর মধ্যেও জোয়ার-ভাটা খেলে গিয়েছে অনেক কিন্তু অত সুদূর-কাহিনীতে আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই।

দেখতে দেখতে আড়ং আর কুঠির আশে-পাশে নদীর দুই কূলে দুর্গ গড়ে উঠেছে বিদেশীদের— হুগলীনগরে চন্দননগরে কলকাতায়। নদীর পশ্চিমপার জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে, নীলকুঠিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন জনপদ— বাঁশবেড়িয়া হোসেনাবাদ তালদা বলাগড় মায়াপুর দ্বারবাসিনী গুপ্তান মেলিয়া দুর্গাপুর কালিকাপুর গোপীগঞ্জ। খানাকুলে ধনিয়াখালিতে নতুন উদ্যমে গড়া হয়েছে রেশমের কুঠি, কোথাও বা সোরার আড়ং।

নিয়মিত জোয়ার-ভাটা খেলা করে এই নদীতে। স্ফীত কিংবা স্তিমিত সেই জলের বুকে, কখনো উজানে, কখনো ভাটায়, যাতায়াত করে বাণিজ্যতরী, খেলা ক'রে বেড়ায় শৌখীন বজরা।

কিন্তু সব নিয়মেরই অনিয়ম আছে। সাধারণ জোয়ার এক একদিন অসাধারণ মূর্তিতে দেখা দেয়। জলের সে প্রবল উচ্ছ্বাসকে সেদিন আর জোয়ার বলে না, বলে বান। মাঝনদীতে বিদেশীদের বাণিজ্যতরী সেই হঠাৎ-আক্রমণে নাকাল হয় সেদিন। কিনারে-বাঁধা নৌকোর বহর সেদিন প্রবল ঘা খেয়ে জখম হয়। কখনো চূর্ণবিচূর্ণও হয়ে যায়। ভীষণমূর্তি সে বান উজান-পথে ধাওয়া ক'রে ঘাটে ঘাটে অঘটন ঘটিয়ে উধাও হয়ে চলে যায় অনেক দূরে। যত দূর দৃষ্টি যায়, কিনারের মানুষ সেই মূর্তির দিকে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিদেশী বণিকদেরও সে বাধা দেয়নি, এই প্রবল বানকে বাধা দেওয়ারও তার কোনো শক্তি নেই। সে তাই চেয়ে চেয়ে দেখে এই ভীষণমূর্তির ভয়ংকর আচরণ।

আচরণে যে অস্বাভাবিক তার কাছে পাত্রাপাত্র ভেদ থাকে না। জলের নৌকো স্থলের কুটির সে ভাসিয়ে তো নেয়ই, এক-এক দিন সে নিভিয়ে দেয় শ্মশানের চিতাও।

ধীরে ধীরে কেটে চলেছে এইভাবে বছরের পর বছর। একে একে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে যেন লেখা হয়ে চলেছে ইতিহাস। পলিমাটির সার পড়ছে যেন বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষায় আর সংস্কারে—সেই জমি ভেদ ক'রে যেন দেখা দিচ্ছে প্রত্যহ নূতন নূতন অঙ্কুর। নূতন দিগন্তের আলো দেখার জন্যে আকাশে উঁকি দিচ্ছে বুঝি অজস্র শিশুতরুর দল।

এই কয়েক ছত্রেই আমরা কয়েকটা শতাব্দী পার হয়ে চলে এসেছি। ষোড়শ শতাব্দীর পোর্তুগিজদের অত্যাচারে-অতিষ্ঠ বাংলাদেশের এলাকা থেকে সরাসরি ইংরেজ আমলে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এলাকায়। ওলন্দাজ দিনেমার আর ফরাসিদের কথা আমরা ভুলিনি—আমাদের কাজ নেই তাদের নিয়ে। আমরা এখন এসে পৌঁছেছি উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ায়।

১৮০০ সাল। ১০ জানুয়ারি। শ্রীরামপুর।

আমরা এসে উপস্থিত হলাম এখানে। অতি প্রাচীন জায়গা এই শ্রীরামপুর। বিদেশীর পদার্পণেই এর সুনাম ও সুখ্যাতি নয়। শ্রীরামপুরের ইতিহাস আরো অনেক আগের। অতি পুরাতন সংস্কৃত বই দিগ্বিজয়প্রকাশেও উল্লেখ

আছে এই জনপদের। কিন্তু সে আমলে ভদ্রেশ্বরের খ্যাতি ছিল শ্রীরামপুরের চেয়ে হয়তো বেশি—এজন্তে শ্রীরামপুরের পরিচয় দিতে গিয়ে একে বলা হয়েছিল, ভদ্রেশ্বরস্থ সন্নিধে। বিপ্রদাস তাঁর মনসামঙ্গল-গ্রন্থেও এর উল্লেখ করে গিয়েছেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী এই জনপদের আধুনিক ইতিহাস অবশ্য আরম্ভ হল ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, পলাশীযুদ্ধের বছর, দুই আগে। এই সময় দিনেমাররা বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করলেন এই স্থানটি, এবং সদাগরী তরী নিয়ে এসে নামলেন এর উপকূলে। বাংলার বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁকে মোটা টাকা নজর দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কয়েক বিঘা জমি সংগ্রহ ক'রে তাঁরা পাকাপাকি ভাবে এখানে আস্তানা নিলেন, এবং নদীর কিনারে একটি চালাঘরে আরম্ভ হল তাঁদের কাজ এবং শ্রীরামপুরের জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল সেই সঙ্গে। বিদেশীরা নূতন শ্রীরামপুর গড়তে আরম্ভ করলেন বলা যায়। ক্রমশ কোঠাবাড়ি পত্তন শুরু হল বিদেশী কাঠামোয়। নতুন শ্রীতে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠতে লাগল শ্রীরামপুর।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকর্তারা ইংরেজ মিশনারিদের সন্দেহ করলেন ফরাসি গুপ্তচর ব'লে, সেইজন্যে কলকাতায় থাকার অনুমতি না পেয়ে দিনেমার-অধিকৃত এই জনপদে এসে ইংরেজ মিশনারিরা স্থাপন করলেন তাঁদের ধর্মপ্রচারের ঘাঁটি— ব্যাপটিস্ট মিশন।

বাংলাদেশের আকাশে এসে লাগল নতুন হাওয়া।

দিনেমারদের প্রায় পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় শ্রীরামপুর সুন্দর একটি শহর হয়ে উঠেছে। ভাগীরথীর কিনার বরাবর পরিচ্ছন্ন কোঠাবাড়ির মিছিল। অনেকটা ইউরোপীয় ধাঁচের একটা ছোট শহর।

সেই শহরে সপরিবারে উপস্থিত হলেন উইলিয়ম কেরী। কিছুদিন আগেই ওয়ার্ড আর মার্শম্যান এখানে এসেছেন।

কেরী এসেছেন যেন শুধু মিশন নিয়ে নয়, সেই সঙ্গে কিছু অ্যাম্বিশন নিয়েও। ধর্মপ্রচারক টমাসের মুনশীর কাছে বাংলা ভাষা কিছুটা শিখেছেন তিনি, এখন তাঁর মাথায় সম্ভবত সেই ভাষারই চিন্তা।

অতএব কয়েক মাসের মধ্যেই কিছুটা জমি কিনলেন তিনি। সংকল্প করলেন এখানে একটি ছাপাখানা বসাবেন।

শীতের দিনগুলো একে একে গত হয়ে গিয়েছে, বসন্তের হাওয়া এসে লেগেছে এখন ভাগীরথীর পশ্চিম কিনারের গাছের ডালে ডালে। এমনি

একদিন সকালে কেরী আর ওয়ার্ড পায়চারি করছেন ভাগীরথীর তীরে, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে হেঁটে কথা বলছেন একজন প্রবীণ বাঙালি— অতি সাধারণ সাজে সজ্জিত তিনি, পরনে মোটা ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে বেনিয়ান।

মার্শম্যান গিয়েছেন মিশনের কাজে— মাহেশে আর কোন্নগরে। আজ আর ফিরবেন না সম্ভবত।

কেরী সাহেবের প্রশস্ত কপালে আর টাকে নদীর জল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে সূর্যের আলো। সেই আলোতে তাঁর মাথাটা যেন আরো বড় দেখাচ্ছে।

একটু-একটু পায়চারি করছেন আর ওয়ার্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে থমকে দাঁড়াচ্ছেন উইলিয়ম কেরী। তারপর পাশে চেয়ে কথা বলছেন প্রবীণ ব্যক্তিটির সঙ্গে।

পঞ্চানন কর্মকার।

তাকে ডেকে আনার হেতু বুঝতে পারছে পঞ্চানন কর্মকার। এখানে একটা ছাপাখানা বসাবার মতলব যে সাহেবদের আছে সে কথা সে বুঝতে পেরেছে এদের হাবে-ভাবেই।

উইলকিন্স নামে সাহেব ছিলেন কোম্পানির একজন কর্তাব্যক্তি। কাজ থেকে অবসর নিয়ে দেশে যান, সেখান থেকে ফিরে এসে হুগলীতে যখন ছাপাখানা বসালেন, তখন পঞ্চাননই ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। ছাপার কাজের জন্যে বাংলার অক্ষরই তখন তৈরি হয়নি, তখন পঞ্চানন কাঠ-খোদাই করে অক্ষর বানিয়ে উইলকিন্স সাহেবের কাজের অনেক সুরাহা করে দেয়। সে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার কথা। সেই থেকে ছাপাখানার কাজে লেগে থেকে পঞ্চানন এখন একজন পাকা কারিগর। কেরী সাহেব এখন পর্যন্ত তাকে খুলে কোনো কথা না বলুন, তিনি যে তাকে তলব করেছেন কেন, তবু সে তা বুঝতে পেরেছে।

অবশেষে স্পষ্ট করেই বললেন কেরী সাহেব, পরিষ্কার বাংলাতেই বললেন, এখানে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করছি, একটা প্রিন্টিং প্রেস বসাব। তোমার হেলপ্ চাই, এবং কো-অপারেশন।

পঞ্চানন অত চিন্তার ধার ধারেন না। হাতে কাজ করবেন, তার জন্যে অত চিন্তা আর ভাবনার কি দরকার? তবু একটু বিবেচনা ক'রে দেখতে হয় সবই, কোনো ঝুঁকি নেওয়ার আগে একটু ঝুঁকে দেখা সব সময়ই দরকার।

বললেন, ভেবে বলব। আছি তো এই-সব কাজ নিয়েই। অসুবিধে হবে মনে হয় না। তবু—

—অলরাইট। তাই হবে। আমিও এর মধ্যে তৈরি হতে থাকি, তুমিও—

কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেরী সাহেবের চোখের দৃষ্টি যেন নিক্ষিপ্ত হল একটু দূরে। প্রশস্ত আর মসৃণ কপালের উপর কয়েকটা সরু ভাঁজও জেগে উঠল। নিজের চোখকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না উইলিয়ম কেরী। কপালের ভাঁজের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কিনারেও জেগে উঠল খুশির ও আনন্দের রেখা। এবার চিনেছেন তিনি। প্রায় তিন বছর গা-ঢাকা দিয়ে ছিল যে লোকটা, আজ বিনা ডাকেই হঠাৎ তাঁর সেই মুনশীর এখানে এই শুভাবির্ভাব? চেনা কষ্ট বটে, শরীর অনেক শুকিয়ে গেছে।

পঞ্চাননও ফিরে তাকালেন। পঞ্চাননেরও যে খুব চেনা লোক। পঞ্চানন থাকেন হুগলীতে, আর ইনিও তো চুঁচুড়ার লোক।

কেরী দু-পা এগিয়ে গিয়ে হাতের মধ্যে তার হাত নিয়ে সানন্দে বলে উঠলেন, হ্যালো রামরাম।

রামরাম একটু লজ্জিত আর কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়ালেন।

টমাস সাহেবের মুনশী হয়ে তাঁকে বাংলা শেখালেন, তারপর এই কেরী সাহেবকেও কতদিন ধরে শেখালেন বাংলা, মালদহের রেশম-কুঠিতে কতদিন বাস করলেন একত্রে, তারপর একটা জঘন্য অপবাদের জন্যে কেরী সাহেব ক্ষুণ্ণ হলেন তার উপর, সেইজন্যেই দু জনের হল ছাড়াছাড়ি। সেই কথা ভাবতে লাগলেন রামরাম, দুঃখে ও ক্ষোভে তাই এখন চোখে চোখে তাকাতেও যেন বাধা বোধ হচ্ছে।

—হ্যালো রামরাম। কেমন আছ? রামরামের দু হাত ধ'রে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললেন উইলিয়ম কেরী।

রামরাম বস্তু সংক্ষেপে বললেন, ভালো না।

ভালো যে না, তা তাঁর চেহারা আর পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এবং সেই ভালো না থাকার জন্যে দায়ীও যে অনেকটা কেরী সাহেবরাই। খ্রীষ্টানের এত নিবিড় সম্পর্কে থাকার জন্যে আত্মীয়বন্ধুরা তাঁর উপর বিরূপ, মালদহের এক বিধবার সঙ্গে প্রণয়-সংক্রান্ত একটা জঘন্য অপবাদে পাদ্রী সাহেবরাও হলেন বিরূপ। অতএব রামরামের অবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠল।

তিনটি বছর কেটে গেল বিপাকে। তারপর শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব এসেছেন শুনে আজ তাঁর সঙ্গে এই দেখা করতে আসা।

ওয়ার্ড পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। কেরীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে কোনো কথা ছিল না।

রামরামের সমস্ত সমাচার শুনলেন কেরী সাহেব, তাঁর যেন মনে হল—তিনি প্ল্যান নিয়েই এখানে একটা পাকা বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেছেন, ঠিক সেই সময় তাঁর এই পুরাতন বন্ধুর এই আবির্ভাব একটা বুন—একটা আশীর্বাদ।

রামরাম বসুর হাত ধরে কেরী বললেন, ইউ রিমেন উইথ মি। লেট আস্ বি ফ্রেণ্ডস্ এগেন।

পুরাতন বন্ধু পুরাতন গ্লানির কথা ভুলে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার বন্ধু হয়ে গেলেন। আবার দুজনে গল্প করতে লাগলেন নানারকম। পঞ্চানন চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন এই দৃশ্য।

কিন্তু, এখন রামরামকে যেতে হবে রিষড়ায়, সেখানেই এখন তিনি বাস করছেন। পঞ্চাননও ফিরে যাবেন হুগলী। এখানকার কাজের কথা শোনা থাকল। তাঁরা আসবেন আবার।

দুজনে কেরী সাহেবদের কাছ থেকে সেদিনের মত বিদায় নিয়ে রওনা হলেন।

পঞ্চানন কর্মকারের দিকে চেয়ে রামরাম বসু বললেন, তুমি না-হয় একটা ছাপাখানার টাইপের ভার নেবে। কিন্তু, কিন্তু আমি কি করব হে পঞ্চানন, আমাকে ওরা খ্রীষ্টান বানাবে নাকি!

রামরাম বসুর কথা শুনে হেসে উঠলেন পঞ্চানন কর্মকার। বললেন, এতদিন ধরে ওদের সহবাস করে যদি খ্রীষ্টান ব'নে না গিয়ে থাক তবে আর ভয় নাই রামরামবাবু।

রামরাম বসু একটু ভাবলেন, বললেন, কিন্তু—

—আবার কিন্তু? রাম নামেরই কি ওই দশা? সব কথাতেই কিন্তু?

রামরাম বসু জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালেন পঞ্চাননের মুখের দিকে।

পঞ্চানন বললেন, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রামমোহনের কথা বলছি। ওই 'কিন্তু' নিয়েই তো ওর বাপের সঙ্গে ঝগড়া। এমনি গোঁ লোকটার যে,—লোকটার বলি কেন, ছোকরাই বলা যায়, বয়স তার এখন কতই আর—সাতাশ কি আঠাশ, বাপের সঙ্গে মতের মিল হলনা ব'লে ভিটেমাটি ছেড়ে

একেবারে কাশীবাসী হয়েছে। সেও তো প্রায় ন-দশ বছর আগেই। তখন বয়স বা কতই ছিল।

পঞ্চানন কোন্ রামের কথা বলছেন এবার বুঝতে পেরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন রামরাম বসু, বললেন, মান বাড়িয়ে দিলে পঞ্চানন। ভেবেছিলাম কোন্ রামাশ্যামার সঙ্গে বুঝি তুলনা করছ আমার।

হাসতে লাগলেন পঞ্চানন কর্মকার।

রামরাম বসু বললেন, সে তো অনেক পরে; পনেরো বছর বয়স যখন পুরো হয়নি তখনই ধর্মের ধাক্কায় তিব্বতে চলে গিয়েছিল, আর ফিরবে না মতলবই বুঝি ছিল।

পঞ্চানন বললেন, সেই কথাই তো বলছিলাম। বাপের সঙ্গে মতের মিল হল না, ওই 'কিন্তু' কথা শুনে বাপ তপ্ত হয়ে উঠলেন। ছেলে বলল 'আচ্ছা'।

দুইজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন ভাগীরথীর কিনার ধ'রে, পঞ্চানন একটু থেমে ভাগীরথীর জলের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবলেন, বললেন, হয় মস্ত মানুষ হবে কিংবা একেবারে জাহান্নমে যাবে। এ ধরণের ছেলেরা মাঝামাঝি কিছু হয় না—যা হয় তা চরম। এর ভবিষ্যৎ কি, কে বলতে পারে, বলো।

তাই। রামকান্ত রায় তার এই ছেলের লেখাপড়ার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি, অর্থ ব্যয়েও কোনো রকম কার্পণ্য করেন নি। বিশেষ করে তাঁর এই ছেলেটির দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কারণও অবশ্য ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তীক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ছেলের, স্মৃতিশক্তিও লক্ষ্য ক'রেছেন অসাধারণ—একবার যা পড়ে বা একবার যা শোনে সে কথা কখনো ভুলে যায় না। খানাকুলের পাঠশালাতে বাংলা পাঠ শেষ করিয়ে রামকান্ত তাঁর ছেলেকে সরকারী ভাষা ফারসি শেখার ব্যবস্থা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে এই নতুন ভাষা আয়ত্ত করে ফারসি-বয়েৎ ও সূফী-দর্শনের উপর প্রবল অনুরাগ দেখাতে লাগল এই ছেলে।

এই অনুরাগ আর আকর্ষণ লক্ষ্য করলেন রামকান্ত, কিন্তু এজন্যে আবার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করবেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু উদ্যোগী হলেন তাঁর স্ত্রী তারিণী দেবী। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁদের ছেলেকে আরবি শেখানোর জন্যে পাঠানো হল পাটনায়। এখানে এসে রামমোহন ইউক্লিড আর অ্যারিস্টটলের আরবি অনুবাদ পাঠ তো করলেনই, সেই সঙ্গে কোরানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হল।

রামরাম বসু বললেন, কোরান পাঠ করার পর থেকেই নাকি ওর ধর্ম-বিশ্বাসের রূপ গেছে বদলে। এখন না-হিন্দু না-মুসলমান গোছের একটা মানুষ হয়ে উঠেছে। কাশীতে গিয়ে নাকি এখন আবার পাঠ করছে হিন্দুশাস্ত্র।

—শেষ-বেশ হয়তো দেখা যাবে, কিছুতেই কিছু হল না। অতএব কোনো উপায় না পেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে আবার হিমালয়ে চলে যেতে না হয়। ছেলেবেলা থেকেই সন্ন্যাসী হবার নাকি বেজায় ঝোঁক।

পঞ্চাননের কথা শুনে রামরাম বললেন, সে ফাঁড়া হয়তো কেটেছে। তিব্বত থেকে ফিরে এসেছে। সেখানে গিয়েও ধর্ম নিয়ে নাকি বিস্তর তর্ক করেছে লামাদের সঙ্গে। লামারা রেগে আগুন হয়েছে। সকলকে রাগিয়েই বেড়াচ্ছে শুধু।

—হ্যাঁ। বাপকেও তো রাগিয়ে, বাপের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়েই চলে গেছে কাশীতে। কিন্তু হাজার দোষ থাক্, চরিত্রে একটু গুণও আছে শোনা যায়। বাপের সঙ্গে হাজার রকম তর্ক করেছে, কিন্তু অসম্ভ্রম করেনি নাকি কখনো। তর্কে বসেছে যখন, অনুগত ছেলের মত নিরীহ ভাবেই তখন বসেছে বাপের সামনে। কিন্তু রামকান্ত হচ্ছেন খাঁটি কুলীন ব্রাহ্মণ। অব্রাহ্মণত্ব তিনি সহ্য করবেন কেন। কোরান পড়ে ছেলের মতিগতি হয়েছে অন্য রকম। রামকান্ত ধর্ম সম্বন্ধে ছেলেকে অনেক বোঝাতে বসেন, কোনো প্রতিবাদ করে না ছেলে; কোনো আপত্তিও জানায় না। বাপের বলার কথা শেষ হয়ে গেলে সে মুখ খোলে। কথা শুরু করার প্রথমেই বলে, 'কিন্তু—'। আড়চোখে রামকান্ত তাকান ছেলের মুখের দিকে, তার বক্তব্য কিছুক্ষণ শুনেই আবার নিজের বক্তব্য পেশ করেন রামকান্ত। যথানিয়মে শুনে যায় তাঁর ছেলে। অবশেষে সে কথা আরম্ভ ক'রে বলে, 'কিন্তু—'। এইভাবে অনেকদিন অনেকভাবে আলোচনা চলে। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, এর নানারকমের সংস্কার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য জানায় রামমোহন, সতীদাহ-প্রথার সে যে ঘোর বিরোধী তাও স্পষ্টভাবে জানাতে কসুর করে না। রামকান্ত প্রতিবাদ করেন, তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। বাবার কথা শেষ হবার পর আবার একদিন রামমোহন বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু আপনি সনাতন ধর্মের সারবানতা নিয়ে যা বললেন তার সমর্থনে আপনার এত যুক্তি সত্ত্বেও এসব যুক্তি অকাট্য মনে হচ্ছে না কিন্তু।' এইবার তপ্ত হয়ে উঠলেন রামকান্ত, পিতার মর্যাদায় ও কৌলীন্যের মহিমায় এসব যেন দুরূহ আঘাত। রামকান্ত রূঢ়ভাবে বললেন, 'সব কথাতেই তোমার একটা ক'রে কিন্তু— তোমার

প্রতিবাদ, তোমার আপত্তি, তোমার অশ্রদ্ধা। আমার বিরোধিতা করাই তোমার জীবনের মন্ত্র হয়েছে দেখা যাচ্ছে।' এর পরই তো রামমোহন চলে যায় তিব্বতে; এবং সেখান থেকে ফিরে অল্পদিন পরেই কাশীতে।

রামরাম বসু কান পেতে শুনলেন সব। পঞ্চানন কর্মকার ছাপাখানার কামারশালাতে কাজ করে বটে, কিন্তু দেশের মানুষের খবরাখবর রাখে দেখে ভালোই লাগল রামরামের।

রামরাম এতক্ষণে কি-যেন বলার জন্যে তৈরী হয়ে বললেন, কিন্তু—

শব্দ করে হেসে উঠলেন পঞ্চানন কর্মকার, বললেন, আবার ঐ কিন্তু? ওই কথা নিয়ে অতবড় একটা অনর্থ হয়ে গেল একটা পরিবারে, ঐ কথার সূত্র ধরে এত গল্প বলা হয়ে গেল আমাদের মধ্যে, আবারও ঐ একই কথা?

রামরাম বসু তার ভঙ্গিকে একটু সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন যেন, বললেন, বলতে যাচ্ছিলাম, আমরা এখানে আবার কোনো অনর্থ ক'রে না বসি।

দুইজন এইভাবে নানা কথা বলতে বলতে এসে পৌছলেন ঘাটে। নৌকো চেপে পঞ্চানন রওনা হলেন হুগলীতে, রামরাম পদব্রজে রিষড়ায়।

কয়েকটা মাস ইতিমধ্যে একে একে গত হয়েছে। গ্রীষ্ম কেটে গেল। বর্ষাও ফুরিয়ে গেল। শরৎকাল এসে উপস্থিত হয়েছে তখন শ্রীরামপুরের আকাশে।

কয়েকটি ঋতু কেটে গেছে ধীরে ধীরে। আকাশের রূপের আর রীতিরও পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা। বাইরের জগতের এই রূপবদলের সঙ্গে তাল রেখেই বুঝি চলেছে এই ব্যাপটিস্ট মিশন আর কেরী সাহেবের প্ল্যান। এবং সেই সঙ্গে হয়তো-বা তাঁর অদৃষ্টও।

মিশনের ছাপাখানার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ হয়ে গেছে, নিলামে পেয়ে গেছেন কেরী সাহেব কলকাতায়। এবং, আরো আনন্দের কথা তার আছে— ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দলকে ফরাসি গুপ্তচর ব'লে সন্দেহ করেছিলেন কিছুদিন আগে, তাঁরাই ডেকে পাঠিয়েছেন কেরীকে। কলকাতায় লালদিঘির কাছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ খোলা হচ্ছে, কেরী সাহেবকে নিতে হবে তার ভার।

রামরাম বসুও নিয়মিত যাতায়াত করছেন, যোগাযোগটা রেখেছেন অব্যাহত। পঞ্চানন কর্মকারও মিশনের প্রেসের ভার গ্রহণ করে নিয়েছেন।

কেরী সাহেবের সঙ্গে এই দুইজনের এই ঘনিষ্ঠতা যে শুভব্রাহ্মস্পর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিন অতটা আন্দাজ করা যায় নি।

যোগ্য লোকের সংসর্গে থাকার সুফল যে আছে তার প্রমাণ পেয়ে গেলেন রামরাম বসু। কেরী সাহেব হলেন ফোর্ট উলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ, রামরাম বসু সেখানে পণ্ডিতীর কাজ পেয়ে গেলেন।

—কিন্তু রামরাম। উইলিয়ম কেরী একটু চিন্তা ক'রে বললেন, কলেজে কাজ তো নিলে। পড়াবে কি? বই কোথায়?

সত্যি, বাংলায় যা-কিছু বই বা পুঁথি আছে সবই পদ্যে, গদ্য-বই নেই। গদ্য-বই ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ সিবিলিয়নদের দেশী ভাষা শেখানো যাবে কী করে।

রামরামও এই কথাই ভাবতে লাগলেন।

—লর্ড ওয়েলেসলির বিশেষ ইচ্ছে সিবিলিয়নদের এ-দেশী ভাষা শেখানো হোক। কেরী বললেন, সেইজন্যে কলেজ তো খোলা হল, কিন্তু কেতাব নেই।

অসুবিধেটাও বুঝতে পারছেন রামরামও, বাইবেলের যে-সব অনুবাদ তিনি এর আগে করেছেন সে-সব দিয়ে কাজ হবে কিনা তিনি ভাবছিলেন। কিন্তু কেরীর কাছে কথাটা প্রকাশ করতে সংকোচ হতে লাগল। কলেজের প্রধানপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের কথাও মনে হল রামরামের। তাঁকে বললে তিনি কোনো সুরাহা করে দিতে নিশ্চয় পারবেন। আর আছে পঞ্চানন। পাণ্ডুলিপি পাওয়া মাত্র কাঠ-খোদাই করে পঞ্চাননের পাকা হাত নিশ্চয় চটপট করে ছেপে দিতে পারবে বই।

কেরী সাহেব সেদিন আর কোনো কথা বললেন না। রামরাম তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, এ বিষয়ে তিনি ভাববেন।

পঞ্চাননের সঙ্গে এ বিষয়ে ইতিমধ্যে পরামর্শ করেছেন রামরাম। কিন্তু পঞ্চাননের এক কথা। বলেন, লিখে এনে দাও, তারপর আছে এই কর্মকার। তোমাদের হাতে কলম, আমার হাতে বাটালি। পারা যাবে, হে রামরামবাবু, পারা যাবে।

আরো কয়েকদিন গত হয়েছে। একদিন কেরী সাহেব একসঙ্গে ডেকে পাঠালেন এই দুই বন্ধুকে।

পাঁচ কামরার ছোট একটা বাড়ি— গোলাকার ধরণের। অনেকটা দুর্গের মত দেখতে। চার দিকে চারটি ঘর, মাঝখানে একটা। মাঝের ঘরটা

আয়তনে একটু বড, অনেকটা হল-ঘরের মত। ছোট চারটি ঘরের একটায় বসেছে মিশনের ছাপাখানা, অন্য তিনটেয় কেরী সপরিবারে বাস করেন।

হল-ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল পাতা। টেবিলের গায়ে কয়েকটা কুর্শি, কয়েকটা দেয়াল ঘেঁষে বসানো। চার দেয়ালে চারটি দেয়ালগিরি, সিলিঙ থেকে ঝুলছে ঝাড-লণ্ঠন।

টেবিলের ধারে ছুটো কুর্শি টেনে বসেছেন ত্নজন। কেন তাঁদের ডাকা হয়েছে, স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে পারছেন ত্নজনেই। নিশ্চয় কোনো একটা প্ল্যান এসেছে সাহেবের মাথায়।

রামরাম বললেন, মানুষটা বড নরম, কিন্তু বড তেজী।

পঞ্চানন হাসলেন, বললেন, তোমার কথাটা হয়তো ঠিক। লোকটার কথা মনে হলেই আমার শেগুন কাঠের কথা মনে পড়ে।

হেসে উঠলেন একসঙ্গে ত্নজন।

পঞ্চানন কর্মকার ও রামরাম বসু অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেলা বেড়ে চলেছে ধীরে ধীরে। বেলা কত হল সে হিসাবে কোনো প্রয়োজন যেন নেই। তাডা কিংবা তাগাদা কথার সঙ্গে বুঝি পরিচয়ও নেই কারো।

ঢং ঢং ঢং ক'রে এগারোটা বাজার শব্দ পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পরে, দূর থেকে ভেসে-আসা শব্দ। কলকাতায় বডবাজার এলাকায় বেজে উঠেছে আরমানি গির্জার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি। জলের স্রোত ধরে ঐ শব্দ এসে পৌছেছে শ্রীরামপুরের কিনারে।

কেরী সাহেবরা ফিরছেন। তাদের আগে আগে ছোট একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে। দৌডে এসে সে ঢুকল ঘরে, রামরাম ছেলেটির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম তোমার? ইয়োর নেম?

—জন মার্শম্যান। উত্তর দিল ছেলেটি।

ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন ত্নজন, আর কোনো কথা বললেন না। ওয়ার্ডের বাডির দিকে চলে গেল সে।

কেরী ও ওয়ার্ড এসে এঁদের ত্নজনের সামনে ছুটো চেয়ারে বসলেন।

স্মিত হাসলেন কেরী সাহেব, পরিষ্কার বাংলায় বললেন, অনেক কাজ করতে হবে রামরামবাবু, অনেক ব্যবস্থা করতে হবে পঞ্চাননবাবু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওঁরা তাকালেন কেরী সাহেবের দিকে, কেরী সাহেব বললেন, এখানে ছাপাখানা বসল, এবার এখান থেকে বই ছাপতে হবে বাংলায়।

—আমাদের কি করতে হবে বলুন।

হাসতে লাগলেন কেরী, ওয়ার্ডও যোগ দিলেন সে-হাসিতে।

সোজা হয়ে বসে রামরামের দিকে চেয়ে কেরী বললেন, আপনাকে বাংলায় বই লিখতে হবে। কি বই তাও ভেবে রেখেছি।

রামরাম বসু বুঝি একটু চিন্তিতই হলেন, তাঁর মনে হল তাঁর উপর যেন ভীষণ একটা গুরুভার চাপানো হচ্ছে, তিনি সে-কাজের যোগ্য কিনা এ প্রশ্নও হয়তো জাগল তাঁর মনে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি বই ?

—প্রতাপাদিত্য-চরিত্র।

একটু থেমে কেরী বললেন, বাংলা ভাষার প্রথম গদ্য-বই। আপনি তৈরি হোন।

মাথা নীচু করে বসলেন রামরাম বসু। যেন গ্রহণ করলেন এই দায়িত্ব, এবং তা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টাও করবেন, কিন্তু যোগ্য পাত্রের স্কন্ধে এই গুরুভার চাপানো হল কিনা সে-প্রশ্নের মীমাংসা তিনি যেন করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আচ্ছা।

প্রীত হয়ে উঠলেন উইলিয়ম কেরী, বললেন, আমিও একটা লিখব, কনভারসেশন— কথোপকথন।

ওয়ার্ডের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—পঞ্চাননকেও কিন্তু ছাপাবার ভার নিতে হচ্ছে। বললেন কেরী সাহেব।

এতে রাজী না হবার কিছু নেই। পঞ্চানন কর্মকারও রামরাম বসুর মত একটু চিন্তা ক'রে তাঁর সম্মতি জানালেন।

এমন সময়ে কেরী আর ওয়ার্ডের চেয়ারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সেই ছেলেটা।

কেরী তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, আর এই আছে আমাদের একজন ইয়ং ফ্রেণ্ড। জোশুয়া'স্ সান্। বড় হয়ে এও নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে কাজে নামবে। এই আমাদের মিশন।

উঠে দাঁড়ালেন কেরী সাহেব, বললেন, আজ এই পর্যন্ত কথা। অনেক বেলা করিয়ে দিয়েছি আপনাদের, ওয়ার্ডের সঙ্গে এই-সব কথা নিয়ে আলাপ করতে করতেই দেরি হয়ে গেল।

করজোড় নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমে এলেন রামরাম বসু আর পঞ্চানন কর্মকার। তাঁদের মনে বুঝি ছোঁয়াচ লেগেছে ঐ প্রেরণার।

পঞ্চানন বললেন, খুব দখল করেছে বটে বাংলা ভাষাটা তোমাদের কেরী সাহেব। ভাষায় এতটুকু ভুল নেই; কেবল উচ্চারণের মধ্যে সামান্ত একটু বিদেশী ঢং। ওটাকে ত্রুটি বলছিনে, ওটুকু না থাকলেই অস্বাভাবিক হত।

রামরাম বসু বললেন, উজান আর ভাটা। এটা এই নদীর গুণ। দু-মুখো স্রোত। কেরী সাহেব শিখেছেন বাংলা, আর তোমাদের রামমোহন রায় বাংলা আরবি ফারসি সংস্কৃত শেষ করে ইংরেজি নিয়ে পড়েছিলেন, গত পাচ-ছয় বছরের মধ্যে ইংরেজি ভাষাটাও পাকাপাকি শিখে ফেলেছেন। ইংরাজরা বাংলা শিখছে, বাঙালি শিখছে ইংরেজি।

পঞ্চানন কর্মকার এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না, কিছুক্ষণ হাঁটার পর বললেন, লোকটা একটা জেদী মানুষ। জেদ না হলে কি কাজ হয়?

নদীর ধার ধরে ধরে হেঁটে চলেছেন দুজন, নৌকো ধরে রামরাম যাবেন কলকাতায়, পঞ্চানন যাবেন হুগলী।

ঢালু দিয়ে নামতে নামতে থমকে দাঁড়িয়ে রামরাম বসু জিজ্ঞাসা করলেন, কার কথা বলছ? কেরী সাহেব?

পঞ্চানন নেমে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, কেরীর কথাও ধরতে পার, আমি বললাম অন্যজনের কথা।

রামরাম ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন পঞ্চাননের দিকে, উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কার কথা?

—রামমোহন।

ওপারে আরমানি গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে গুরুগম্ভীর শব্দ বেজে উঠল। বেলা বারোটা।

গির্জার ঘড়ির দূরাগত শব্দ হুগলী নদীর জলের ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। সেই শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই বিপরীত দিক থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের একটা আর্তনাদের ধ্বনি। সে আর্তনাদ চাপা দিয়ে অকস্মাৎ তুমুল শব্দে বেজে উঠল ঢাক ঢোল আর কাঁসীর আওয়াজ, সেইসঙ্গে একপাল জনতার সমস্বর কোলাহল।

নদীর কিনারে বালুর মধ্যে পা ডুবিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন দুজন। কান পেতে শুনতে লাগলেন ওই শব্দ। দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকালেন।

বাঁ দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তত দূরে তাঁরা নিক্ষেপ করলেন তাঁদের দৃষ্টি।

কিছু দেখা গেল না। নদীটা কিছুদূর গিয়েই একটু বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের আড়ালে হয়তো চলেছে একটা মহোৎসব।

তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় দেখলেন, বাঁকের আড়াল থেকে আকাশের দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। যেন অঙ্গভঙ্গি করতে করতে মাথা খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে একটা দৈত্য।

চিন্তার তল থেকে যেন বুদ্বুদ উঠল, এই ভাবে পঞ্চানন বললেন, কে আবার বুঝি সতী হল। শ্যাওড়াফুলির ঘাটে বলেই মনে হচ্ছে যেন।

আরো কয়েক পা নীচের দিকে নামলেন রামরাম, বললেন, ভাগীরথীর দুইপারে ঘাটে-ঘাটে ঘটছে এই ঘটনা, আর ওদিকে অন্তর্দাহ হচ্ছে তোমার বন্ধুবরের। ভীষণ নাকি খাপ্পা সে এইসব প্রথার উপর।

—কার কথা বলছ ?

—রামমোহন।

পঞ্চানন বললেন, শুনেছি। কিন্তু, একটা কথা শোনা হল না রামরাম বাবু।

—কিসের কথা ?

—তোমার সেই প্রণয়ের গল্পটা, মালদহের সেই তরুণী বিধবার কথা।

রামরাম বসুর দুই কান অকস্মাৎ যেন গরম হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের একটা অপযশের কথা এতদূর পযন্ত ছড়িয়ে এসেছে বুঝতে পারেন নি রামরাম। হঠাৎ পঞ্চাননের মুখে কথাটা শুনে তাঁর বুকের মধ্যেও যেন জলে উঠল দাবানল। ওদিকে শ্যাওড়াফুলির ঘাটে এতক্ষণে হয়তো স্বামীর চিতায় দগ্ধ হয়ে গেছে একটি তরুণী বিধবা, অবিকল ঐ রকম আগুন রামরামের বুকের মধ্যে অগণ্য শিখা বিস্তার ক'রে লেলিহান হয়ে উঠেছে। মুখে কোনো কথা ফুটল না রামরামের। দু চোখও জ্বালা করছে। একটা অপযশ বটে, এবং এর জন্যে অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতেও হয়েছে বটে, কিন্তু তবুও এর জন্যে কোনো আফশোস নেই রামরামের। পতির জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণই মেয়েদের একমাত্র ব্রত হবে কেন, প্রণয়ীর কাছে আত্মনিবেদনও তো একটা ধর্ম। শাস্ত্র উদ্ধার ক'রে কোনো যুক্তি দেখাতে চায় না রামরাম, এটা তার জীবনের উপলব্ধি। এবং রামরাম আশা করে তার এ-উপলব্ধিতে কোনো ভুল নেই। রামরামের প্রতি তার টান ছিল, এবং রামরামও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যতদিন জীবিত থাকবে রামরাম, মালদহের মদনাবাটীর

উপকণ্ঠের সেই নিবিড় আম্রকুঞ্জের নেপথ্যনিভৃতে বসানো সেই ক্ষুদ্র দোচালা ঘরটির কথা মনে থাকবে তার।

পঞ্চানন বললেন, আজ কিছু বলার মতলব নেই বুঝি? তবে আজ থাক্, একদিন শুনতে হবে গল্পটা।

এও যদি গল্প, তবে সত্য কি? মনে মনে দুঃখের হাসি হাসতে লাগলেন রামরাম বসু।

হুগলীর নৌকোর মাঝি হাত তুলে ডাকছে, এবার ছাড়বে তার নৌকো, যাত্রী ভর্তি হয়ে গেছে।

পঞ্চানন নামতে নামতে বললেন, চললেম। চাক্ষুষ দেখতে দেখতে যাই শ্যাওড়াফুলির ওই উৎসবটা।

—আচ্ছা।

কলকাতার নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন রামরাম বসু। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাবেন তিনি। চাঁদপাল ঘাটের নৌকোর জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন নদীর কিনারে।

ডিসেম্বরের শীতের হাওয়া বইছে কনকন ক'রে।

ভাগীরথীতে গড়িয়ে চলেছে জল। কত জল গড়িয়ে গেছে তার কোনো হিসাব নেই, পরিমাপও করেনি কেউ। ঠিক এই ভাবেই গড়িয়ে চলেছে সময়। ভাগীরথীর— যার নাম বিদেশী সওদাগরেরা দিয়েছে রিভার হুগলী, তার— দুইধারে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বাণিজ্যের কুঠি। পালতোলা সদাগরী নৌকোর ভিড়ে হুগলী নদী উঠছে ভরে। ঝপঝপ শব্দে দাঁড় পড়ছে এর জলে, স্রোতের মসৃণ ধারা সেই আঘাতে শতচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সোরা রেশম সিল্ক মসলা আর মসলিন চলেছে বন্দর থেকে বন্দরে।

জোয়ারে ফুলে উঠছে জল, সুখচরের আর ত্রিবেণীর বাঁধাঘাট ডুবে যাচ্ছে সেই জলে, শ্মশানের আগুনও হয়তো নিভে যাচ্ছে। ভাটার টানে নেমে যাচ্ছে আবার সেই জল, জেগে উঠছে কাদামাটি আর বাঁধাঘাটের কঙ্কাল।

ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে উঠছে এই নদী। দুপারের ঘাটে বসানো সদাগরী ঘাঁটিতে কর্মচাঞ্চল্যের বুঝি শেষ নেই।

কলকাতার লালদিঘির পাশে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের·

বঙ্গভাষা শিক্ষা দিয়ে চলেছেন বাঙালি পণ্ডিতেরা। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে ছাপা হচ্ছে বঙ্গাক্ষরে বাংলা কেতাব।

এই কর্মব্যস্ততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি আমরাও। কত সময় গত হয়েছে ইতিমধ্যে সে-হিসাব করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু অনেকগুলি বছর আমাদের অজানিতে অন্তর্ধান করেছে এমন কথা বলিনে। বড-জোর দেড় বা দুই বছর মাত্র গত হয়েছে ইতিমধ্যে। তার বেশি না।

পঞ্চানন কর্মকার একখণ্ড কাঠের উপর ছাপ নিয়ে সরু বাটালি দিয়ে খোদাই করে চলেছে এক-একটি অক্ষর। উবু হয়ে বসে বাটালি দিয়ে কুডে কুড়ে অক্ষরের পর অক্ষর দিয়ে গডে তুলছে বঙ্গভাষা।

দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে পঞ্চাননের পিঠের কাছে নীচু হয়ে দাঁডিয়ে রামরাম বললেন, কতদূর এগলো হে?

পঞ্চানন কাঠ কুডতে কুডতেই বললেন, মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন শেষ হয়ে গেল। এখন তোমার সিংহাসন বানাচ্ছি— তোমার লিপিমালা তৈরি হচ্ছে।

রামরাম হাসতে লাগলেন, বললেন, আমাব কোনো সিংহাসন চাইনে। সামান্য পণ্ডিত হয়ে থাকতে পারলেই হল।

অদূরে বসে ইংরেজি বইয়ের কাজ করছিলেন মিশন প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর, হাতে কাজ করতে করতেই তিনি মুখে বললেন, সিংহাসন আর নতুন করে হওয়ার দরকার কি? বাংলাভাষায় প্রথম গল্প-বই লেখার রাজটীকা তো ওঁর কপালে। রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র যেদিন বেরিয়েছে সেইদিন আমাদের রামরাম বসু তো বাজসম্মান পেয়ে গেছেন, এবার ওঁর চরিত্র লেখা হবে— রামরাম-চরিত্র।

সকলে হাসতে লাগলেন একসঙ্গে, রামরাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, তা যদি বল তাহলে আমাদেব এই ভট্টাচার্য মহাশয়ও কম যান না। যা উদ্যোগ আর যা উৎসাহ দেখছি মনে হচ্ছে কালে ইনিও বাংলাদেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠবেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামটাও বাংলার ইতিহাসে না ঢুকে যায়। আমাদের পঞ্চানন তো নিজের জন্যে একটা জায়গা করে নিয়েছেনই।

পঞ্চানন এ কথায় প্রতিবাদ করলেন না, গঙ্গাকিশোরও কোনো কথা না বলে হাত চালিয়ে অক্ষরের পর অক্ষর সাজাতে লাগলেন।

একটু পরে পঞ্চানন বললেন, রামরাম-চরিত্র লিখব কিন্তু আমরা। এত কাছে থেকে দেখছি বলে বুঝতে পারছিনে, কিন্তু একটা কাজের মত কাজ করে ফেলেছে। আমরা যদি নাও লিখি তোমার চরিত্র লেখা হবেই, যেই লিখুক।

চরিত্র? ভাবতে লাগল রামরাম। ঘরের এক কোণে ঘটঘট শব্দ করে ছাপাযন্ত্র তুলট কাগজের উপর কালির ছাপ দিয়ে চলেছে। এ শব্দে রামরামের চিন্তার বিঘ্ন হল না। তার চরিত্র লেখা হবে? দুশ্চরিত্র বলে সে অপদস্থ হয়েছিল মালদহে— সে ঘটনাও তাহলে থাকবে সেই চরিতকথায়? যেন থাকে। তার জীবন থেকে একেবারে বাতিল ক'রে যেন না দেওয়া হয় মালদহের মদনাবাটীর সেই মেয়েটিকে। তার জীবনের অনেকটা অংশই যেন যুক্ত হয় তার জীবনকথার সঙ্গে— এইটুকুই মাত্র আকাঙ্ক্ষা। অবহেলা অবজ্ঞা বা অপমান দিয়ে তার নামোল্লেখ যেন না হয়, এই তার অনুরোধ। কী নাম তার? আসল নাম দিয়ে দরকার কি? ধরা যাক-না তার নাম মেনকা।

গঙ্গাকিশোর আর পঞ্চানন হাত চালিয়ে চলেছেন, রামরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথাই ভাবছিলেন। সে ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়ল। নদীর ধার থেকে ভয়ংকর সোরগোল শোনা গেল। সেই সঙ্গে ভীষণ জলকল্লোলের ধ্বনি। সেই কল্লোলের সঙ্গে কোলাহল মিশে ভীষণ শব্দ উঠেছে।

সকলে একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কেরী আর মার্শম্যান ছুটে চললেন নদীর কিনারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললেন রামরাম গঙ্গাকিশোর আর পঞ্চানন। চারদিক থেকে আরও অনেক লোকজন ছুটল দলে দলে।

কিছু না। বান এসেছে হুগলী নদীতে।

কিন্তু কিছু-না ব'লে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। সাধারণ নয়, প্রবল বান এসেছে আজ অস্বাভাবিক মূর্তি নিয়ে। সদাগরী নৌকায় ভীষণ আলোড়ন তুলে। মাঝিমাল্লাদের সমস্বর আর্ত চীৎকারে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে দুই পার।

আজ প্রবল ভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। সাগরসংগমতীর্থ নিমজ্জিত করে, একে একে শতমুখী চৌমুখী হাথিয়াগড বদরিকাকুণ্ড ছত্রভোগ প্লাবিত ক'রে গড়িয়ে এসেছে সেই জল এই নদীর খাতের মধ্যে, বারুইপুর চুড়াঘাট কালীঘাট ভেসে গিয়েছে, পুবকূলে কলকাতা আর পশ্চিমকূলে বেতড় পার হয়ে সেই সুউচ্চ জলদৈত্য ছুটে চলেছে দুরন্তবেগে, দুই ধারে একে একে ঘুঘুড়ি

আড়িয়াদহ কামারহাটি কোন্নগর কোন্নগর সুখচর রিষড়া শ্রীপাট খড়দহ মাহেশ চানক শ্রীরামপুর পার হয়ে চলেছে এই দৈত্য। বৈদ্যবাটির ঘাঁটি ডুবিয়ে দিয়ে কাঁকিনাড়ায় ত্রাস সঞ্চার ক'রে গৌরহাটির কিনারে এসে সে নিভিয়ে দিয়ে গেল একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড— দুই দিনের একটা বাসী চিতা। সে চিতার পাশে জমে ছিল যে বিরাট জনতা, ছত্রখান ক'রে দিল তাদের, পণ্ড হয়ে গেল এই মহোৎসব।

তারপর পাইকপাড়া ভদ্রেশ্বর গাড়ুলিয়া মুলাজোড় ভাটপাড়া চুঁচুড়া হুগলী সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী গুপ্তিপাড়া ফুলিয়া কালনা কাটোয়া পার হয়ে চলে গেল সেই জলদৈত্য দৃষ্টির অন্তরালে।

জলে টইটুম্বর হয়ে উঠেছে ভাগীরথী। প্রস্থে বিশাল হয়ে উঠেছে এখন। গৌরহাটির কিনারে আর্তরবের সঙ্গে উৎসবের কিংবা মহোৎসবের সঙ্গে হাহাকারের যে প্রতিযোগিতা চলেছিল, সহসা তা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঢাক-ঢোল-কাঁসির শব্দে মুখরিত নদীতট এখন নীরব। শ্মশানে এখন নেমে এসেছে শ্মশানেরই অকৃত্রিম স্তব্ধতা।

কিন্তু এমন তো ছিলনা কিছুক্ষণ আগেও। উল্লাসে আর উৎসাহে আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জনতা। একধারে বাজনদারেরা, একধারে সিঁদুরের কৌটা হাতে নিয়ে সীমন্তিনীর দল, লালরঙে ছোপানো কাপড় পরা একদল লোক অন্যধারে— তাদের চোখ লাল, মাথায় একবোঝা চুল, সেইসঙ্গে জনকয়েক অবধূত সন্ন্যাসী। এয়োরা সতীর মাথার সিঁদুর নিয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবতী করার লোভে এসে জড়ো হয়েছেন গৌরহাটির ঘাটে। অন্যেরা এসেছেন অন্য মতলবে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে টুপিওয়ালা কয়েকটা ফিরিঙ্গি, তারা বুঝি তামাশা দেখছে।

ফরাসগঞ্জের লাগোয়া গ্রাম নোনাদিঘির বৃদ্ধ বিমলাকান্ত মারা গিয়েছেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছিল এই শ্মশানে।

এই প্রমত্ত জনতা সেই শবদাহ-উৎসবে সাড়ম্বরে এসে জড়ো হয়েছে।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল এই প্রবল উল্লাস। নদীর কিনারে জলের বাজনা কেবল বাজতে লাগল ছলছল শব্দে।

অদূরে চালতে-গাছের বড় বড় পাতা বাতাসের আলোড়নে তর্ তর্ করে কাঁপছে। সেই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা— ফরাসগঞ্জের হরিশঙ্কর ও তার মেয়ে।

হরিশঙ্কর এই উৎসব দেখছিল একরকমের চোখ দিয়ে ও এক রকমের মন নিয়ে ; সে-চোখে ছিল সামান্য একটু জল, এবং সে মনে ছিল হয়তো একটু করুণা। সে করুণার সঙ্গে তার নিজের জীবনের নিদারুণ ইতিহাসও বুঝি ছিল লুকানো। অদূরে দাঁড়িয়ে এই উৎসব দেখতে দেখতে তাই হরিশঙ্করের মনে হচ্ছিল নিজের জীবনেরই কথা। সে কথা ভুলেই ছিল সে, সে কথা আবার নতুন করে তার মনে হল। মনে হওয়া মাত্র দুই কান যেন গরম হয়ে উঠল হরিশঙ্করের।

তার বাবার মনের কথা বুঝতে পারছেনা হরিশঙ্করের মেয়ে। সেও দেখছিল এই উৎসব অন্যরকমের চোখ দিয়ে ও অন্যরকমের মন নিয়ে। সে চোখে ছিল শুধু বিস্ময়, এবং সে মনে ছিল কেবলমাত্র কৌতূহল।

আবার জিজ্ঞাসা করল রাধা, কি হচ্ছিল বাবা ওখানে ?

মেয়ের মুখের দিকে তাকাল হরিশঙ্কর। চালতে-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে রাধাব কপালে হলদে রঙের তিলকের মত। ওই বিন্দুটির দিকে চেয়ে হরিশঙ্কর মেয়ের হাত চেপে ধরে বলে উঠল, তোর বিয়ে আমি দেব না রাধা।

বাবার এই অদ্ভুত কথাটা শুনে বড মজা লাগল। খিলখিল করে হেসে উঠল ফুটফুটে মেয়েটি।

ঝুটামতির নোলক তার নাকেব ডগায়, কানে সোনার মাকড়ি, দুই হাতে গালার দুগাছি চুড়ি, পায়ে দুগাছি করে রুপোর মল। পরনে ডুরে-কাটা তাঁতের শাড়ি। বছর-দশেক বয়েস হবে রাধার। বিয়ে কথার মানে সে বোঝেনা এমন নয়, কিন্তু বিয়ের কথাটা এখন হঠাৎ বলার মানে সে বুঝতে পারল না।

ঘোলাজল টলমল করছে সামনে, জলের কিনার থেকে গৌরহাটি-শ্মশানের জমায়েত মেয়ে-পুরুষ উঠে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ ডাঙায়। ওরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু কাঁদছে মাত্র একজন।

—ও কে বাবা ? ওর কী হয়েছে ?

রাস্তার ধুলোর উপর প্রসারিত পাখার ছায়া ফেলে উড়ে গেল কয়েকটা গাঙচিল, নদীর ওপার থেকে কাদের চীৎকার-শব্দ ভেসে এল এপারে। কাছে আর দূরে ঘাটে-ভেড়ানো নৌকো জলের ধাক্কায় দোল খাচ্ছে ক্রমাগত।

দশ বছরের মেয়ের প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিতে বার বার কথা আটকে যেতে লাগল হরিশঙ্করের। হরিশঙ্করের বয়স এখন অনেক— পঁয়ত্রিশও হতে

পারে, চল্লিশও হতে পারে, তার চেহারা দেখে তার বয়েস আন্দাজ করা কঠিন। গোঁফে আর দাড়িতে মুখ ভরা। কিন্তু, তার বয়স ছিল যখন তার মেয়েরই মত, তখনকার দিনের এমনি একটা ঘটনার কথা মনে পড়ায় হরিশঙ্করের সমস্ত কথা আজ আটকে গিয়েছে। কী সে কথা? সে কথা প্রকাশ করতে হরিশঙ্কর এখন রাজি না।

আমরাও নাহয় এখন সে কথা জানতে না চাইলাম।

হরিশঙ্কর মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে অকারণেই বুঝি আদর করতে লাগল, বলল, তোর নাম রাধা না হয়ে প্রতিমা হলে বেশ হত, আমার মাও ছিল ঠিক এমনি, অবিকল এমনি সুন্দর দেখতে—সোনার প্রতিমার মত।

বাবার কাঁধের উপর হাত চেপে নিজের শরীরটা একটু সরিয়ে নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল রাধা, বলল, সে কোথায় বাবা?— তোমার মা?

হঠাৎ ওদিক থেকে ফের ভেসে এল আর্তকান্নার শব্দ। হরিশঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের দুই হাতের নীচ দিয়ে যেন চুরি করে দেখে নিল ঐ দৃশ্য, মেয়ের জিজ্ঞাসার জবাব দিল না।

রাস্তার ওপাশে কয়েকটা বাবলা-গাছ সরু পাতার সবুজ সমারোহ নিয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি অভিনয় দেখছে রাস্তার এপাশের—। শ্মশানঘাটের ধারের, আর চালতে-গাছের আড়ালের।

মাথার উপর দিয়ে নদীর ওপারের দিকে উড়ে গেল দুটো কৌতুহলী পাখি, তাদের গলায় প্রশ্ন বাজতে বাজতে মিলিয়ে গেল জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে— কে ও, কে ও।

সেই শব্দ লক্ষ্য করে তাকাতে লাগল হরিশঙ্কর। আশ্চর্য, তার মনে বুঝি আজ লক্ষ প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে। যে কথা ভুলে থাকার তার ইচ্ছে, সেই কথাই জানার জন্যে চারদিকে যেন ব্যাকুলতার শেষ নেই।

বাবার কোলে উঠে রাধার বুঝি আহ্লাদের শেষ নেই। অনেক উঁচুতে উঠেছে সে, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু আরো দূর পর্যন্ত দেখার ইচ্ছে এতে জাগবেনা কেন।

আবার জিজ্ঞাসা করল সে, তোমার মা কোথায় বাবা?

মেয়েকে কোল থেকে ধুলোর উপর নামিয়ে দিল হরিশঙ্কর, বলল, কি জানি।

—ওখানে বুঝি মেলা বসেছিল? জিজ্ঞাসা করল রাধা।

—মেলা না রে, মেলা না। শ্মশান। নোনাদিঘির ওপারে তাঁতিদের ঘর,

ওই ওপারে ফরাসিদের সেই-যে ভাঙা কুঠি! মনে আছে? তার ধারেই থাকত সেই-যে বুড়ো বামুন বিমলাকান্ত। সে মরেছে। তার চিতায়—

একটু দম নিল হরিশঙ্কর। তারপর সে একটু একটু ক'রে তার মেয়েকে বলতে লাগল ঘটনার কথা। সবটা হয়তো বলল না, কিছু ঢেকে, কিছু হয়তো রেখে।

এই ভরদুপুরে নদীর ঘাটের ধার দিয়ে মাঝে-মাঝে দুই-একটা মানুষ হয়তো চলে যাচ্ছে তাদের পাশ কাটিয়ে। কেউ-কেউ হয়তো চেয়ে দেখছে ওই শ্মশান।

ওপারে চানক। চানকে মেয়ের মামাবাড়ি যাবে বলে হরিশঙ্কর নিয়ে এসেছে মেয়েকে। বান আসার আগে খেয়ানৌকো ঘাট ছেড়ে দুবার চলে গেছে ওপারে, কিন্তু তার আর যাওয়ার গরজ নেই। বান আসায় এখন আর রওনা হবার কথাও ওঠেনা। ফিরেই যাবে ওরা। কিন্তু ফিরতে পারছে না। তারা চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল।

ওরা দাঁড়িয়ে থাক্, ইতিমধ্যে— কিছু রেখেওনা, কিন্তু ঢেকেওনা— যতটা পরিষ্কার ক'রে জানা সম্ভব বিমলাকান্তের কাহিনীটা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি।

ঐ তল্লাটের নাম নোনাদিঘি হল কী ক'রে আর কবে থেকে তার কোনো ইতিহাস কেউ জানেনা। ফরাসগঞ্জ গ্রামের গায়ে ধুধু মাঠ পড়ে আছে, এতে আবাদও হয়না, ফসলও ফলায় না কেউ, এই জমিতে কখনো কেউ হলকর্ষণ করেছে কিনা— এ কথাও কেউ বলতে পারে না। কুমারী মৃত্তিকার এই প্রান্তরটি প্রখর সূর্যের নীচে বসে একাকী যেন রৌদ্রতপস্যা করে চলেছে, মাঝে মাঝে এক-এক ঝাঁক বাবলার বন আছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে— যেন নিজেদের মধ্যে নীরবে জটলা করে চলেছে, যেন এই কুমারী মাটির কৌমার্য-কাহিনী নিয়ে তাদের এই চাপা আলোচনা। সেই শব্দহীন জল্পনাকল্পনার ওপারে সরু ইঁটের পাঁজর বের করে দাঁড়িয়ে আছে ফরাসিদের জীর্ণ কুঠির কঙ্কাল, তার হাড়ে হাড়ে হয়তো তবুও বাজছে লক্ষ লালসার অস্থির ঐকতান। কুমারী মাটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই পঙ্গু কুঠি। জানিনে, কিন্তু হয়তো বৃদ্ধ কুঠির এই উৎকট আহ্লাদ দেখেই লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছে ওই বাবলার শাখাপ্রশাখা।

তাঁতিরা পল্লী গড়েছে এখানে। ফরাসগঞ্জের ধুতি বোনে ঠিক ফরাসডাঙার নকল ক'রে— তফাত ধরা বড় কঠিন ; গামছা বোনে, শাড়ি বোনে— খড়কেডুরে রোশনচৌকী। মাকু চলে খটখট শব্দে, কামাই নেই। গৌরহাটির ঘাটে-বাঁধা নৌকো ক'রে চালান হয় হুগলী নদীর ঘাটে-ঘাটেও, মেদিনীপুরেও, আবার সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের দেশেও। ফলাও ব্যাবসা।

দুধারে তাঁতিদের ঘর পার হয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেই মসজিদ। মসজিদের গায়েই আমবন। এখান থেকেই বামুনপাড়া শুরু।

যেখান থেকেই সাড়া দেওয়া যাক-না সে সাড়া এসে এই বামুনপাড়ায় পৌঁছবেই? সব রকমের বিধি আর সব রকমের বিধান বিলি হয় এখান থেকেই।

বিমলাকান্ত চাটুজ্জে এ-তল্লাটের চাঁই—মাথা। অনেক বুদ্ধির জোগান দিতে হয়েছে তাঁকে। অনেক শাসনে সায়েস্তা রাখতে হয়েছে সমাজকে। তা না হলে কবে সারা গাঁ খ্রীষ্টান হয়ে যেত এতদিনে। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের উপদ্রবে চারিদিক অস্থির। পোর্তুগিজদের দৌরাত্ম্য আর ঠগীদের অত্যাচার তবু সহ্য করা গিয়েছে, এবং এখনো হয়তো কিছু-কিছু বরদাস্ত করতেও হচ্ছে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে টানাটানি সহ্য করা কঠিন।

বিমলাকান্তও খুব কঠিন মানুষ। তাঁর কাছে কারো কোনো খাতির নেই।

এখন তিনি প্রাচীন হয়েছেন। চেহারাও চিমড়ে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠায় তিনি কাবু হন নি। ফরাসিদের জীর্ণ কুঠিটার মত তাঁর শরীর এখন শুধু কঙ্কালেরই একটা কাঠামো হতে পারে, কিন্তু মন বুঝি এখনো বাবলা-বনের মতই সবুজের সমারোহ দিয়ে ভরা, এখনো সে মন ওই ভরানদীর মত রসে টইটুম্বর।

দুই স্ত্রী থাকেন তাঁর সঙ্গে। অন্যেরা অন্যত্র। কালো আঁঠালমাটির শিব গড়ে দুইটি কুমারী কন্যার মত পুজো করে এই দুই মেয়ে। বিমলাকান্ত চাটুজ্জের দুই ষোড়শী স্ত্রী।

বারান্দায় বসে মোটা পুঁথির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিমলাকান্ত দুই চোখে দুটি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এক একবার।—কুয়ো থেকে জল তুলছে বিধুমুখী। গড়নটা বড় নিটোল।

পুবে আমগাছ তার অজস্র ডাল বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ; পশ্চিমে ফুল ধরেছে সজনের ডালে— তার গিঁঠে গিঁঠে অজস্র ক্ষত থেকে ক্ষরিত হয়ে

জমে আঁঠা হয়ে তালের সঙ্গে এঁটে আছে কষ ; দক্ষিণে নারিকেল আর সুপারীর বন ; উত্তরে বট। নানারকমের এই গাছ দিয়ে বিমলাকান্তের বাড়ির চৌহদ্দি তৈরি। তার মাঝখানে দক্ষিণদুয়ারী একটা আর পুবমুখো দুটো আটচালা ঘর। দক্ষিণমুখো ঘরে থাকে বিমলাকান্ত, আর পুবমুখো দুটিতে অবলাকান্ত ও কমলাকান্ত। এ দুভায়ের দুই বউও আছে। তারিণী আর তরুবালা। তারিণী মৃতবৎসা, আর তরুবালা বাঁজা। এ বাড়িতে তাই কোনো শিশুর হাসিও নেই, হামাগুড়িও নেই। তা যদি থাকত তা হলে নিশ্চয় এ বাড়ির চেহারা হত আলাদা। এতটা নির্জীব আর নীরব থাকত না। হয়তো নিষ্ঠুরও হতনা এত।

উঠোনের মাঝখানে কুয়ো, কুয়োর ওধারে নীচু একটা ছাউনি গোছের ঘর— জ্বালানি কাঠ থাকে। তার চালের উপর লতিয়ে পড়ে আছে কুমড়োর লতা, বন্ধ্যা গাছে ফল ফলেনি। কিন্তু পশ্চিমমুখো রান্নাঘরের চালে উঠেছে শশার লতা, লতায় কলি ধরেছে, ফল ধরবে বলে মনে হয়। তুলসীমঞ্চে অবশ্য কটা রঙের গুচ্ছগুচ্ছ ফল ধরেছে। গোরুর বাথান তার পাশেই।

ভরদুপুরে গাছের পাতার আড়ালে বসে গলা ফাটিয়ে ডাকে বউ-কথা-কও পাখি, চিলেরাও চীৎকার করে কখনো কখনো। কুয়োর দড়িতে ব'সে কাক কোয়া-কোয়া করে ডাক পাড়ে।

নতুন-বয়সের যাবতীয় চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে ঘর ও উঠোন, উঠোন আর ঘর ঘুরে বেড়ায় বিমলাকান্তের দুই স্ত্রী— বিধুমুখী আর বিরজা। তাদের কাজের শেষ নেই। ছোট এই সংসারের ভার নিজেদের মাথায় নিয়েই তারা বুঝি বিব্রত। সেই সঙ্গে ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই হয়তো প্রাণান্ত পরিশ্রম তাদের।

দুই হাতে দুটি সাদা শাঁখা, পায়েও কিছু না, গলায়ও কিছু না, গায়েও কিছু না, কেবল পরনে হালকা রঙের দুটি তাঁতের শাড়ি। শরীরে লাবণ্য থাকলে অলংকারের আর দরকার কী? বিধুমুখী আর বিরজা এ-ওর মুখের দিকে তাকায়, আর তাদের দুজনেরই মুখের দিকে তাকায় বিমলাকান্ত।

বিমলাকান্তের বয়েস এখন পঁয়ষট্টি। কুড়ি বছর বয়স থেকে তিনি বিবাহ আরম্ভ করেছেন। কুলীন বামুনের ছেলে, বিবাহ করা তাঁর জন্মগত অধিকারই নয় শুধু, এটা তাঁর সামাজিক কর্তব্যও। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ক্রমে ক্রমে অনেক বিয়ে তাঁকে করতে হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রথম বিয়ে নদীয়ার

কালীগঞ্জে, পলাশীর প্রান্তরের প্রায় পাশেরই গ্রাম সেটা। পলাশীর যুদ্ধটাও থেমেছে, অমনি তিনিও রওনা হয়েছেন বিয়ে করতে। একে একে অনেকগুলো বউও ইতিমধ্যে মরে গেছে বিমলাকান্তের ; যারা এখনো বেঁচে আছে বলে তাঁর ধারণা তারা সকলেই এখনো সত্যি বেঁচে আছে কিনা সে খবর চট করে বলা তাঁর পক্ষে অবশ্য মুশকিল।

রোয়াকে বসে তিনি পুঁথি দেখছিলেন। তাঁর শ্বশুরগৃহের তালিকা লেখা আছে ওতে, এবং শ্বশুরনন্দিনীদের নাম। পুরো তালিকা। এই তালিকার শেষ দুটি নাম হচ্ছে বিধুমুখীর আর বিরজার। বিধুমুখীকে তিনি বিয়ে করেছেন দেড় বছর হল, বিরজাকে গত শীতে। নেহাত অসহায় এই মেয়ে দুটি ; বাপ-মা নেই ; একজন থাকত মামার কাছে, একজন পিশের কাছে। তাই বিমলাকান্ত, কেবল বিয়ে ক'রে নয়, এদের আশ্রয় দিয়েও এদের ধন্যবাদভাজনই বুঝি হয়েছেন। তার উপর, তাঁর বয়সও হয়েছে এখন, একটু একটু বুঝতে পারছেন বিমলাকান্ত। সেইজন্যে তাঁর পরিচর্যার জন্যে এখন কেউ কাছে থাক্— এও তাঁর ইচ্ছে। লম্বা একটা জীবন তো দেশে-দেশে ঘুরে ঘুরে নিত্য-নূতন স্ত্রীর সহবাস ক'রে আর সিধে আদায় করেই কাটল। এখন একটু ক্লান্তি এসেছে। সহবাস নয়, এখন তিনি চান পরিণীতা স্ত্রীদের সঙ্গে বাস করতে।

প্রথম বিয়ের সেই রোমাঞ্চটা মরে গিয়েছে কবে। পলাশীর আমবাগানের বারুদের গন্ধ তখনো বুঝি নাকে এসে লাগে। গোরুর গাড়িতে চেপে ধিকি-ধিকি চলেছে নতুন বর বিমলাকান্ত, সঙ্গে চলেছেন ঘটক—কী যেন নাম তার—ভবানীপ্রসাদ।

—নামের দিক থেকে একেবারে রাজযোটক। ভবানীপ্রসাদ বললেন, মেয়ের নাম বিমলা, তার কান্তকে নিয়ে চলেছি সঙ্গে। বুঝলে হে বিমলাকান্ত ?

বিমলাকান্ত তখন বিশ বছর বয়সের তাজা জোয়ান একটা। ভবানীপ্রসাদের কথা শুনে রক্ত কেমন টগবগ করে উঠেছিল সেদিন, আজও একটু একটু মনে পড়ে বিমলাকান্তের। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বিমলাকান্ত বলেছিল, বয়সও নাকি ইয়ে ?

—ইয়ে মানে ? বয়স পনর, সেদিক থেকেও পেয়ে যাচ্ছ একটা তাজা মেয়ে। আইবুড়ো নাম ঘোচাবার জন্যে কুলীন ছেলের গলায় মালা দিয়েই ধন্য হতে যাচ্ছেনা এই মেয়ে; এ মেয়ে তোমাকে স্বামীরূপে পেতে চাইবে।

এ কথা শুনে শরীরের রক্ত আবার একটু তেতে উঠেছিল বিমলাকান্তের। খানাখন্দের মধ্যে চাকা পড়ে গাড়িটা ঝাঁকি দিচ্ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় ঝাঁকি লাগছিল মনে।

ভবানীপ্রসাদ বললেন, কুলীনের নন্দন তুমি। এ বিয়ে তো শুধু নিয়মভঙ্গ; আমিষ মুখে দেবে এবার। এরপর তুমিও আছ, আমিও আছি, আর ঘরে ঘরে কুলীনের মেয়েরাও আছে; ফুল ছিটিয়ে মালা বদল ক'রে দেদার মচ্ছপ নিয়ে বসবে। আমিষে আমিষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে হে বিমলাকান্ত।

একটা রোমাঞ্চকর ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। ওই যে দূরে দিগন্তটার বুকের উপর নেমে এসেছে নীল আকাশ, নীলে আর সবুজে ওই যে মনোহর মাখামাখি, গাছেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে সেই অপরূপ দৃশ্য, একটা দুটো করে পাখি বাতাসে শরীর ভাসিয়ে দিয়ে সেই নীলের সমুদ্রে নিরিবিলি ভেসে চলেছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে আরম্ভ করল এক খণ্ড সাদা মেঘ— এসব মিলিয়ে যে পরমরমণীয় রূপ ফুটে উঠেছে চোখের সামনে, তার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটা তার চেয়েও যেন রমণীয় বোধ হতে লাগল বিমলাকান্তের।

তারপর কেটে গিয়েছে কত কাল। জীবনে ঘটেছে কত রকমের অভিজ্ঞতা। বিমলাকান্তের এই শেষজীবনে তার প্রথমজীবনের সেই রোমাঞ্চ নিয়ে এসেছে এই দুই মেয়ে— বিধুমুখী আর বিরজা। নোনাদিঘির এই নিভৃত নিরালায় নানারকম গাছের ভিড় দিয়ে ঠাসা এই ছোট গৃহের মধ্যে বসে আজ বিমলাকান্তের চোখে ভেসে উঠেছে সেই পলাশী— সেই কালীগঞ্জ। আর, ও চোখে ভেসে উঠেছে একটা অপরূপ মূর্তি— সে মূর্তি বিমলার। দশ-বারো বছরের মধ্যে বার ছয়েক দেখা হয়েছে বিমলার সঙ্গে, আলাপ তেমন জমে ওঠার আগেই মরে গেছে মেয়েটা। যাক গে।

ভবানীপ্রসাদের উৎসাহে আর উদ্যমে নিত্য নূতন ঠিকানায় ধাওয়া করতে হয়েছে বিমলাকান্তকে। কোথায় ত্রিবেণী, কোথায় ফুলিয়া, কোথায় জয়নগর, কোথায় তমলুক, কোথায় বিষ্ণুপুর— জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে যা ক'রে চলেছে সে, তাকে বিবাহের ব্যাবসায়ই বুঝি বলতে হয়। সকলের মুখ মনে পড়ে না, সকলের নামও বুঝি মনে পড়ে না। সেই অজস্র পরিণীতা কন্যার ভিড়ে হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রথমজীবনের প্রথমস্পর্শের

রোমাঞ্চটা। আজ চোখের সামনে দুটি ষোড়শী মেয়ে তাদের শরীরের প্রতিটি রোমকূপে জীবনের আর যৌবনের সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপন এঁটে ঘুরে বেরিয়ে বিমলাকান্তকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের একটি গোধূলিলগ্নে। হায়, চলে গেছে সে লগ্নটা, আর বিমলাকান্তের জীবনে এসে লেগেছে ধূসর গোধূলিটাই। বিমলাকান্তের মন তো ধেয়ে চলল অতি পুরাতন পশ্চাতে, কিন্তু তার বয়স? এ-বয়সটাকেও যদি মনের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে অতটা পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে হয়তো কোনো আক্ষেপই আজ উঁকি দিত না তার মনে।

এ পর্যন্ত পঁচানব্বইটি বিয়ে করেছেন বিমলাকান্ত। কারো কারো কাছে এ সংখ্যাটা খুব বেশি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তারা যদি কুলীন-কুলের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখত তা হলে হয়তো ধমকই দিত বিমলাকান্তকে, বলত, এত বেকুবকান্ত কেন হে তুমি, এতটা লম্বা জীবনে মাত্র এই কয়টি কেন, এখনো শতপূর্তি করতে পারলে না?

সত্যি, বিমলাকান্তের বাবা রমণীকান্ত মোট এক শো ছত্রিশটি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর পুঁথিটা এখনো ঘরের তাকে জমা আছে, তাতে আছে সেই লম্বা তালিকাটি। দিন-কয়েক আগে বিমলাকান্ত তার বাবার পুঁথি টেনে নিয়ে নতুন করে আবার দেখেছে।

অবলকান্ত আর কমলাকান্তও অবশ্য বেশি না, একজন বাইশটি একজন একত্রিশটি বিয়ে করেছে।

অনেক মজা আছে বটে এই ধরণের বিয়েতে, কিন্তু মাঝে-মাঝে দু-একটা চোট ও আছে।

বিমলাকান্তের বয়স তখন ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ। তখনকার তার চেহারা এমন চিমড়ে ছিল না, এমন অস্থিচর্মসার ছিল না, বেশ নধরকান্তি চেহারাই ছিল তখন বিমলাকান্তের। যশোরের কোটচাঁদপুরে নলিনীমোহন মজুমদারের বাড়িতে এক রাত্রি তার পাওনাগণ্ডা আদায় করে ভোরবেলা রওনা হল বিমলাকান্ত, রাত্রিবেলা মেয়েটি গড হয়ে তাকে প্রণাম করে কত-কী শপথ করিয়ে নিলে, কিন্তু ভোরবেলা সব ভুলে যেতে হল বিমলাকান্তকে। চারদিকেই তো এমন ফাঁদ পাতা, কোনো ফাঁদে ধরা দিতে গেলে তো তার চলে না। তাই ভোরবেলা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে, কপোতাক্ষ-নদীর ওপারে মহেশপুরের মুখুজ্জেবাড়িতে যেতে হবে। কপোতাক্ষের কিনারে এসে

পৌঁছতে বেলা বেজে গেল দুপুর। মনে ছিল না, নদীর ধারে স্নানার্থীর ভিড় দেখে মনে পড়ে গেল আজ বারুণী— বারুণীর স্নান। তাহলে স্নানটা সেরে নিয়েই খেয়া পাড়ি দেওয়া যেতে পারে। থলিটা ফাঁক করে দেখে নিল, মজুমদারের মেয়ে কিছু খাবার দিয়ে দিয়েছে— সরভাজা, নারকেলের ছাঁচ, ছানার গজা। বলে দিয়েছে, পথে যেন কষ্ট না হয় আবার যেন ফিরে আসা হয়।

কোনো কথা দেয়নি বিমলাকান্ত, কথা দিতে নেই। কথা যে রাখা যাবেই তার কী মানে আছে, আবার সত্যি কোনোদিন আসা যে যাবেই তার স্থিরতা কি।

কপোতাক্ষের জলের কিনারে বসে আছে অনেক মেয়ে, অনেক মেয়ে-পুরুষ জলে নেমেছে স্নানে। কত কামনা নিয়ে, কত বাসনা নিয়ে, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে আছে এক বিরাট মেয়ের মেলা।

আইবুড়ো কুলীনের মেয়েও আছে অনেক। কুমারী না বিধবা তাদের চেহারা দেখে বোঝা যাবে না। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কিন্তু পরণের কাপড় দেখে খটকা লাগে। থানকাপড় নয়, ময়লা পেড়ে শাড়ি তাদের পরনে। জীবনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাদের, কিন্তু বর জোটেনি, অনূঢ়া থেকে যদি জীবন শেষ হয়ে যায় তাতে যে ঘোরতর পাপ। এ পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কী করে? স্নানার্থী পুরুষ জলে নামতে যাচ্ছে যখন, তখন কয়েকটি বুড়ি তাদের সেধে সেধে কি যেন বলছে।

স্নান সেরে পাড়ে উঠে কেউ কেউ বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ছে, কেউ সারছে সূর্যপ্রণাম।

সদাচারী মানুষ বিমলাকান্ত, নদীর কিনারে আসার সময় পথের ধারে দেখেছে জবা আর বেলফুলের গাছ। ফিরে গিয়ে কয়েকটা ফুল নিয়ে এল। বরুণ দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে পুণ্যস্নান করবে।

মনকে যথাসাধ্য পবিত্র ক'রে ঢালু ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বিমলাকান্ত। হাত ইশারা ক'রে কে যেন ডাকছে তাকে।

বৃদ্ধাটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল নধরকান্তি বিমলাকান্ত, জিজ্ঞাসা করল, কী?

বিমলাকান্তের হাতের দিকে চেয়ে বৃদ্ধা অনুনয় ক'রে বলল, আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে দাও। দাও বাবা, হাতের একটা ফুল এ-বুড়ির মাথায়।

কথাটা বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল বৃদ্ধা, দম নিয়ে বলল, ওষ্‌ধ্ যা, হল না।

উবু হয়ে বসে বিমলাকান্ত বুঝি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, কী হল? কি হল না?

মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধা বলল, হল না। হল না।

—কেন। কেন। বিমলাকান্ত একটু ঝুঁকে বসল।

বৃদ্ধা বলল, বাবা বলে ডেকে ফেললাম।

বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল বিমলাকান্তের, সোজা হয়ে উঠে সে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়াল না, জলে নেমে স্নান সেরে উঠে গেল একেবারে নদীর বালু ভেঙে উপরে।

বিধুমুখী আর বিরজা এত কী কাজ করে বেড়াচ্ছে উঠোনে আর কুয়োতলায়? একবার কাপড় মেলে দিচ্ছে, একবার কাপড় তুলছে, ঘর নিকোনোর নাতা ধুচ্ছে, জল ঢালছে কলসীতে। স্বাস্থ্য আছে শক্তিও আছে ওদের, কিন্তু হায় বিমলাকান্তের ও-দুটির কোনোটাই নেই, সে এখন দেউলিয়া।

বৃদ্ধ বিমলাকান্তের মনের মধ্যে হাজার রকমের চিন্তার আর ভাবনার বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওই দুটো জীব। কিছুই পেলনা ওরা জীবনে, শুধুমাত্র একটা আশ্রয় পেয়েই এত খুশি? ওদের মাথায় কেবল ফুল ছিটিয়ে দিয়েই তো ওদের আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়েছে বিমলাকান্ত, সেই আনন্দেই বুঝি ওদের এত উৎসাহ। বাপ নেই, মা নেই— অসহায় মেয়ে-দুটিকে বউ ক'রে তাই বিমলাকান্ত নিয়ে এল তার ঘরে।

কপালে বুঝি মাছি বসেছিল, বিমলাকান্ত নিজের কপালে একটা চাপড় দিল।

ঝর-ঝর ক'রে পুঁথির পাতা পিছন দিকে উল্টে নামটা একবার দেখে নিল বিমলাকান্ত। সরস্বতী। বর্ধমানের তপসী গ্রামের হীরু গাঙ্গুলির মেয়ে। হীরুর অন্নই জোটে না, মেয়ের জন্যে কুলীন পাত্র জোটাবে এমন সাধ্য কি।

জামুরিয়ার বৃন্দাবন বাঁড়ুজ্জের মেয়ে কুসুমকুমারীকে বিয়ে ক'রে বিমলাকান্ত ফিরছে। মাঝপথে করজোড় নমস্কার ক'রে তার পথ আগলে দাঁড়াল এক বৃদ্ধ।

—কী চাই?

বৃদ্ধ সংক্ষেপে বলল, কৃপা। ভিক্ষা চাই বাবা। তুমি মহৎ কুলীন একটু মমতা চাই।

হাতের ঝুলি থেকে একমুঠো তণ্ডুল দেওয়ার জন্যেই বুঝি তৈরি হচ্ছিল বিমলাকান্ত।

বৃদ্ধটি বিমলাকান্তের হাত চেপে ধরে বলল, না না, মুষ্টিভিক্ষা নয়। পাণিভিক্ষা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল বিমলাকান্ত; বৃদ্ধ বলল, আমার নাম হীরু গাঙ্গুলি। অতি দীন আমি, অতি দরিদ্র। কিছু নেই আমার। কিন্তু ঘরে আইবুড়ো মেয়ে। বয়স হয়ে যাচ্ছে, তিরিশ পেরিয়ে গেছে। তাকে গ্রহণ করো, তাকে গ্রহণ করো। এই ভিক্ষা।

এত সহজে এমন পাত্র যে জোটে না, জোটা সম্ভব নয়, সবই জানে হীরু গাঙ্গুলি। কিন্তু মানুষের কৃপা পেলে সবই লাভ করা যায় বলে হীরু গাঙ্গুলির নাকি বিশ্বাস।

বিমলাকান্ত রাজি হল, এবং সেই রাত্রেই কেবল শাঁখা আর সিঁদুর নিয়ে বিয়ে করল সরস্বতীকে।

বড় সরল মেয়েটা। বাসরঘরে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দিতে লাগল, তারপর বিমলাকান্তের হাত চেপে ধরে কৃতজ্ঞতায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, অবশেষে বলল, এ দেনা শোধ হবে না। তুমি আমাকে বিয়ে করলে, আমার বাবার কাজ করলে।

কথাটা শুনেই চমকে সরে শুলো বিমলাকান্ত, বলল, কি রকম?

সরস্বতী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বাবার সাধ্য কি আমাকে বিয়ে দেয়, তাঁর কি সেই অবস্থা? তুমি আমার বিয়ে দিলে। আমাকে বউ করে নিলে।

এ কথার কোনো উত্তর দেয়নি বিমলাকান্ত। নবপরিণীতা বধূর সঙ্গে সেই রাত্রিটা কাটিয়ে যথারীতি পরদিন গৌরহাটির দিকে যাত্রা করার জন্যে দামোদরের নৌকোয় চেপেছে।

পাঁচানব্বইটি বিবাহে এক শো রকমের হাঙ্গামা সহ্য করতে হয়েছে বিমলাকান্তকে। কিন্তু তার মধ্যে ঐ দুটি ঘটনার কথা আজ বড় বিশ্রী ভাবে তার মনে পড়ছে।

আজ সব কথা মনে পড়াচ্ছে এই দুটি জীব। ওদের সতেজ শরীর দুটোর আকর্ষণ এতই বেশি যে, ওই টানে বুঝি বিমলাকান্তের অতীতের দিনগুলোও আজ এসে এই উঠোনে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। বহুদূর

অতীত থেকে ভেসে আসছে বিমলার গলা, সরস্বতীর চাপাকান্নার শব্দ, আর কপোতাক্ষের কিনারের সেই অসহায়ার আকুল রোদন।

বিরজা গিয়ে ঢুকছে গোয়ালে, গোবর কেচে কেচে জড়ো করছে একধারে, মশার উৎপাতে গোরুটা কাহিল, ডান হাতে গোবর মাখা, বাঁ হাত দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে দিল গোরুর গলায় আর গায়ে।

স্নান সেরে বিধুমুখী জ্বালানি কাঠ নিয়ে এসে আঁচ দিয়েছে উনুনে। লঙ্কা আদা আর হলুদ জলে ধুয়ে নিয়ে বাটনা বাটতে বসেছে। তাড়াহুড়ো বলে তো কিছু নেই এ সংসারে, রেঁধে খেতে বেলা বাড়ুক-না।

খকখক ক'রে কাশছিল বিমলাকান্ত, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বাটনা বাটতে বাটতে বিধুমুখী পিছন ফিরে একবার তাকাল, বুড়োর আবার শরীর খারাপ হল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, আদা দিয়ে একটু গরম জল দেব নাকি?

—না বউ। এ-কাশি এমনি। সর্দির না। ব'লে বিমলাকান্ত নিজে হাতেই নিজের বুকটা নাডতে লাগল।

গোয়ালঘর থেকে দুহাতে গোবরের ঝাঁড়ি নিয়ে বের হল বিরজা, থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ও বিধু, পোড়ারমুখী, দে-না গিয়ে বুকটায় হাত বুলিয়ে।

কথাটা বলেই কেন যেন ফিক করে হেসে ফেলল সে, বলল, রাখ-না এখন বাটনা বাটা।

বাটির জলে হাত ডুবিয়ে দুহাত ধুয়ে বিধু বিরজার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল, বলল, মরণ আর-কি।

বুড়োর কাশি থামে। কিন্তু বিধু তবুও ওই শীর্ণ বুকে তার দুখানি কচি হাত বুলাতে থাকে।

বিমলাকান্ত বলল, থাক্। আর দরকার নেই।

দরকার তো নেই, কিন্তু ঐ হাতের ছোঁয়া তো মন্দ লাগে না এ বুড়ো বুকেও।

অবলাকান্ত আর কমলাকান্ত এখানে নেই। অবলা গিয়েছে অণ্ডালে শ্বশুরবাড়িতে, আর কমলা হুগলীতে ধানজমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তিতে। জমি-জমা সবই অবশ্য বিমলাকান্তের— পঁচানব্বইটি ঘরের সম্পদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছোট-খাট একটা সম্পত্তি তৈরি করে নিয়েছে বিমলাকান্ত। অন্য দুটি ভাই তেমন করিৎকর্মা নয়, তাই তেমন-কিছু গুছিয়ে উঠতে পারেনি।

কিছিৎকর্মা যে না তার প্রমাণ তারিণী, তার প্রমাণ তরুবালা। কুলীনের ছেলে যদি ঘরে বউ এনে গেরস্থ হয়ে সংসার পেতে বসে তাহলে তার বংশ-কৌলীন্য খাটো হয় না হয়তো, কিন্তু কাঞ্চনকৌলীন্য লাভ করতে বিঘ্ন ঘটেই। তার উপর তারিণী আর তরুবালা যেমন-তেমন মেয়ে না, তারা তাদের স্বামীদের বশ তো করেছেই, এমন-কি অন্য কোনো শ্বশুরঘরে যেতে দিতেও নারাজ। বলা যায় না, আরো কোনো তারিণী কিংবা তরুবালা বশীকরণের জাদু নিয়ে বসে আছে কিনা। তবু যে অবলাকান্তকে যেতে হয়েছে তার কারণ অন্য। নাচারে পড়েই গিয়েছে সে, তারিণীর অনুমতি নিয়েই— যাওয়া আসা আর থাকা নিয়ে সাত দিনের ছুটি মিলেছে অবলাকান্তের। সেই অণ্ডাল ; সে কি এখানে ? নৌকো চেপে যেতে হবে, তার পর পায়ে-হাঁটা রাস্তা।

তারিণীর বড় আক্ষেপ, তিন-তিন বার জ্যান্ত বাচ্চা হল, হয়েই তৎক্ষণাৎ মরে গেল। তরুবালার বুঝি কোনো ক্ষোভ নেই, সে নির্বিকার সে নির্লিপ্ত— কতকটা তৃপ্তও বটে , স্বামীকে হাত করতে পেরেছে এই-না কত— বেশি আশা সে রাখে না।

তারিণী আর তরুবালা এতক্ষণ নেপথ্যে ছিল। এবার এল তারা প্রকাশ্যে। পুবমুখো দুই ঘরে তারা পুবমুখে বসে পুজো করছিল। পুজোর টাট হাতে নিয়ে একে একে দুজন বেরল।

—একি ? উনুন ধরল নাকি এতক্ষণে ? আকাশের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে তরুবালা বলল, সূর্য উঠে এসেছে মাথার উপর, বেলা কি বসে আছে।

চাপা গলায়, বিমলাকান্ত শুনতে না পায়, এমনিভাবে তারিণী বলল, ধিঙ্গি ধিঙ্গি দুই মেয়ে এসেছে ধিতিং নাচন করে ঘুরে বেড়াতে। সংসারে কি মন আছে, মন ওদের উড়ুউড়ু।

হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে তরুবালা সায় দিয়ে বলল, তা বয়সের ধর্ম ভাই, বয়সের ধর্ম।

এই হচ্ছে নিত্যকার নিয়ম। প্রত্যহের কটূক্তি। এসব কথা বিমলাকান্তের কান পর্যন্ত পৌঁছয় না, ওরাও কান করে না।

দিন কাটে একে একে। গ্রীষ্ম যায় বর্ষা আসে, বর্ষা গিয়ে আসে শীত, আবার ফিরে আসে গ্রীষ্ম। আকাশের রঙ বদল হয়— নীল থেকে মেঘলা, মেঘলা থেকে আবার নীল, আবার ধূসর। কিন্তু এ-বাড়িতে রঙবদল নেই।

এই শীতটা যখন টিকে গেল বিমলাকান্ত, তখন আরো কিছুদিন টিকে থাকবে। ঠাণ্ডার দিনে হিম লেগেই বুঝি বুড়ো যায়-যায় হয়েছিল।

কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে বিরজা বলল, বুড়ো না বাঁচলে আমাদের কি দশা হত ভাই ?

—সকলের যা হয়, তাই হত। উঁকি দিয়ে কুয়োর জলে নিজের মুখের ছায়া দেখতে দেখতে নির্লিপ্ত উত্তর দিল বিধুমুখী।

—হাতের লোহা খুলে ফেলতাম ? সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতাম ? বলতে গিয়েই ভিজে দড়ি হাত থেকে পিছলে গেল বিরজার, ভরা ঠিলিটা আবার গপ্ করে পড়ল গিয়ে জলে।

বিধুমুখীর মুখের ছায়াটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল ওই গভীর গহ্বরের মধ্যে।

বিধুমুখী বলল, না। অন্য পথ আছে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বিরজা বলল, বুঝেছি। কিন্তু ভাই, বড ভয় করে।

এ-কথার আর-কোনো উত্তর দিল না বিধু। গুমট হয়ে দাঁড়াল। সে তাব ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছক তৈরি করে ফেলেছে, কিন্তু বিরজাটা বড়ই ছেলেমানুষ, এখনো কিছু বুঝতে শেখেনি— এইজন্যে বড মায়া হয় মেয়েটার উপর।

ও পাশের সজনে-গাছের পাতাব আড়াল থেকে একটা পাখি ডেকে উঠল আচম্‌কা— খোকা হোক, পোকা হোক, খোকা হোক।

তারিণী বেরিয়েছে ঘর থেকে, বেবিয়েই বলল, আ মরণ। এই অবেলায় এসব ডাক ডাকা কেন। ও-ঘরে বুড়োটা পড়ে আছে আধমরা হয়ে, এই-যায় কি সেই-যায়। এখন মানুষের খোকা হবাব বুঝি সময় ? দূর হ্।

—কাকে ধমকাচ্ছ মেজবউ ? ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল তরুবালা, বলল, যাঁদের খোকা হবে তাঁরা তো কুয়োতলায় জলকেলি করছেন। ঘরে রুগ্‌ণ স্বামী যাদের, এই সময় তাদের কি কুয়োর দড়ি ধরে ঝুলে রাসলীলা করা সাজে ? আজকালকার মেয়েগুলোই যেন কেমনধারা হয়েছে মেজবউ— প্রাণ নেই।

অবলাকান্ত ঘরে বসে তামাক টানছে, কমলাকান্ত মামলার নথীপত্র নিয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে। তাদের কানে তাদের বউদের কথা যাচ্ছে বটে,

কিন্তু ও-কথায় ওরা যোগ দিতে চায় না, বাধা দিতেও না। মেয়েদের কথার মধ্যে মাথা গলিয়ে লাভ নেই।

নথীপত্র হাতে নিয়ে কমলাকান্ত তার মেজদাদার পাশে এসে বসল, বলল, এসব তুমি রাখ দাদা। কী করতে হবে বুঝে-সুঝে কোরো। বড়দার অবস্থা তো ঘনিয়ে আসছে। তার বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশের একটা ব্যবস্থা—

হুঁকো নামিয়ে খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে অবলাকান্ত বলল, হবে হবে। ব্যবস্থা একটা হতেই হবে।

কিন্তু কী-যে ব্যবস্থা হবে তার কোনো আভাসই দিল না অবলাকান্ত। বলল, তুই ঘরে যা। আমি ভেবে দেখছি।

ঘরে চলে গেল কমলা, তার ঘরে যাওয়া দেখে তরুবালা ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকল ঘরে, বলল, কী হল? কি পরামর্শ পেলে? কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, পরের বুদ্ধির উপর সবটুকু নির্ভর করতে গেলে কিন্তু ঠকতে হবে। নিজের বুদ্ধিও একটু খাটিয়ো।

কমলাকান্ত কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু একটু বিরক্তিই যেন বোধ করল সে। কিন্তু তা প্রকাশ ক'রে কোনো লাভ নেই, অযথা একটা অশান্তি বাধবে মাত্র। ভাশুর শ্বশুর মানা নাই, গলা হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়ে দেয়।

তারিণী তর্‌তর্‌ ক'রে উঠোনটা পার হয়ে এসে চাপা ধমক দিল অবলাকান্তকে, বলল, যাও, যাও, ঘরে যাও। সম্পর্কে তোমার গুরুজন, অমন হাঁ করে বসে বসে তামাশা দেখতে হবে না।

—সে কি কথা? অবলাকান্ত মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল, সে কি কথা?

—কিছু না। পুরুষখেকো মেয়ে ওরা। কখন কী করে ঠিক নেই। দেখছ না, ওরা ঘরে এল আর ভাশুরঠাকুর বিছানা নিলেন। চলে এস, দেখছ-না স্নানে নেমেছে? ওদেরও বলিহারি, এতবড় একটা দেওর বসে এখানে, একটু লাজলজ্জা নেই?

অবলাকান্তের হাত ধরে প্রায় টেনেই তাকে ঘরে নিয়ে গেল তারিণী।

যেন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে এমনি অপরাধীর মতই আচরণ করতে লাগল অবলাকান্ত। স্ত্রীর মুখের দিকে চাইতে পারল না।

তারিণী বলল, বড় হ্যাংলা তোমরা— পুরুষরা। তোমার মেয়েরা বেঁচে থাকলে অত-বড়টিই যে হত, সে খেয়াল আছে?

বাতার বেড়ার দিকে চেয়ে বসল অবলাকান্ত। চোখের পাতা দ্রুত ওঠা-নামা করতে লাগল। সে বুঝি হিসেব করছে। হ্যাঁ, হিসেবই করল সে ; বলল, না মেজবউ, ওদের চেয়েও বড় হত এখন তারা— একজন বিশ হয়ে যেত, একজন আঠারো।

তাদের তৃতীয় সন্তানটি হয়েছিল ছেলে, এখন তার বয়সের হিসাব আর করল না অবলাকান্ত। কিন্তু, সে-ছেলেটি বেঁচে থাকলে এখন আট-নয় বছরের হতই।

তারিণী স্তম্ভিত হয়ে বসল মাটির মেজের উপর, যেন আকাশ-পাতাল কত-কী ভাবল। নিজের কথাও হয়তো ভাবল, নিজের সন্তানদের কথাও, নিজের স্বামীর কথাও, এবং স্বামীর ভবিষ্যতের কথাও। এক কানাকড়ি আয় নেই, ভাশুরঠাকুরের উপর পড়ে আছে। ভাশুরঠাকুর সারাটা জীবন ফলে-ফুলে মধু লুটেই ঘুরে বেড়ালেন, চাক বাঁধলেন না, সংসার করলেন না— ভাইয়েরা তাই ঘরবাড়ি আর বিষয়-সম্পত্তি সামলাবার জন্যেই ব্যস্ত রয়ে গেল। শেষবয়সে কী ভিমরতি হল তাঁর— দুটো কচি মেয়ের গলায় মালা দিয়ে একে একে ঘরে এনে তুললেন।

নিজের মেয়ের কথা ভেবে তারিণীর বুঝি মায়াই হতে লাগল ওই মেয়ে দুটোর উপর— ঐ বিধুমুখী আর ঐ বিরজা।

তারিণী বলল, শোনো। ভাশুরঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তির লোভ ছাড়। নীলকুঠিতে কাজ নাও। তালদায় বলাগড়ে গোপীগঞ্জে বাঁশবেড়িয়ায় কত তো নীলের কুঠি বসেছে। চেষ্টা করলে একটা জুটে যাবে। দুটো মানুষের তো পেট— ওর জন্যে কারো শাপমন্যি কুড়িয়ে লাভ নেই।

অবলাকান্ত মন দিয়েই শুনল স্ত্রীর পরামর্শ। নিজের মনের ইচ্ছেটার কথা কিছু খুলে বলল না সে। চুপ ক'রে বসে রইল।

তারিণী একটু নড়ে বসে বলল, মেয়ে-দুটি সতী হোক। নইলে অনেক দুর্গতি আছে ওদের জীবনে।

এতক্ষণে কথা বলল অবলাকান্ত, বলল, আমাদের দেশের আইন তো জান। যে স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান হয় না, স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে তার তিলমাত্র অধিকার নেই। দাদাও ওদের জন্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও তো করল না।

—তাই তো ভাবছি ওই মেয়ে-দুটোর গতি কি হবে। ভাশুরঠাকুর তো আর টিঁকবেন মনে হচ্ছে না।

অবলাকান্ত একটু ভাবল, বলল, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।

অকারণেই বুঝি শিউরে উঠল তারিণী দেবী। চোখ বন্ধ করে বসে রইল, মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না। অনেকক্ষণ এইভাবে বসে রইল সে। এমন সময় বাইরে বটগাছের ডালে বসেই বুঝি ডাকল সেই পাখি— খোকা হোক, খোকা হোক, খোকা হোক।

নিশ্বাস ফেলে তারিণী বলল, আর হয়েছে। শুধু গলার ডাকে কি মুখের কথায় তো খোকা হয় না— এ কথা কে বোঝায় ঐ পাখিকে। রোজ এসে ঐ এক রব।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারিণী আবার বলল, তা ভালো। সতী হওয়া। গরিটির নিরুপমার দশা হবে নইলে। ফিরিঙ্গিকে নিয়ে ঘর করতে হবে। মরণ দশা।

অবলাকান্ত এ কথার কোনো জবাব দিল না। জবাব দিল না বটে, কিন্তু ঐ কথাই সে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল, প্রথাটা মন্দ না কিন্তু। নইলে, নিজের চিতায় বউকে পাশে শুইয়ে না পুড়িয়ে জীবন্ত ফেলে রেখে গেলে শেষ-বেশ কার-যে ভোগে লেগে যায় ঠিক নেই। যাঁরা এ প্রথা চালু করেছেন তাঁরা ভেবে-চিন্তেই যে করেছেন এতে অবলাকান্তের কোনো সন্দেহ নেই।

অবলাকান্ত বলল, যাই। স্নানাহ্নিক সেরে নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বের হই। তোমার কথাই ঠিক। একটা কাজ খুঁজে নিতে হয়। কমলাকান্ত বড কডা। দাদার বিষয়-সম্পত্তিতে লোভ করলেও তার হাত থেকে কানাকডি বের করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। নথীপত্র সব ওর কব্জায়।

বিমলাকান্ত আর রোয়াকে বসে পুঁথির পাতা উলটিয়ে তাঁর নিজের জীবনের অতীত সন্ধান করেন না, সে শক্তি আর নেই। এখন তিনি বিছানায় শুয়েই বুঝি তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত।

দুই বউ মাথার কাছে বসা। বুকে-পিঠে তেল-মালিশ, আর মাথায় হাত বুলানো— দুজনের একমাত্র এই কাজ। দুজন কেবল দুজনের মুখের দিকে তাকায়। চিকিৎসারও কোনো বন্দোবস্ত নেই। কে করে? আর এ তো কোনো অসুখ নয়— এ যে জরা। এর চিকিৎসাও নাকি নেই।

রাত্রি গভীর। ও দিকে কাঠের পিলসুজের উপর মোটা পলতের প্রদীপ জ্বলছে। সমস্ত ঘরে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধা, কেবল প্রদীপের কিনারটা

ছাড়া। রাত্রি বেড়ে চলেছে ধীরে ধীরে। রাত্রি যতই গভীরতর হচ্ছে বিমলাকান্তের বুকের মধ্যে শ্লেষার শব্দও সেই অনুপাতে গভীর হয়ে চলেছে। চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ শব্দে বেজে চলেছে ঝিঁঝিদের ডাক। দুটি কুমারী কন্যার মত দুটি বিবাহিত বধূ তাদের স্বামীর শিয়রে বসে তাকে জীবন্ত রাখার সাধনায় ব্যস্ত।

দরজায় খটখট শব্দ শুনে চমকে উঠল দুজন একসঙ্গে। বলল, কে ?

—আমি।

আমি কে। বিধুমুখী আর বিরজা দুজনেই ভীত চোখে তাকাল দরজার দিকে। কেউই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে ভরসা করল না।

আবার শিকল নাড়ার শব্দ হল, বাইরে থেকে সাড়া এল, আমি কমলাকান্ত। দরজা খোলো। দাদা কেমন আছেন ?

গায়ে কাপড জড়িয়ে নিয়ে বিরজা দরজা খুলতেই কমলাকান্ত ঘরে ঢুকে পড়ল, থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঘুমিয়ে আছেন বুঝি ?

—মাঝে-মাঝে জাগছেন। বিরজা বলল, কিন্তু এখন বোধ হয় ঘুমিয়েই।

ওদিকের কোণ থেকে জলচৌকিটা টেনে নিয়ে বিধুমুখী বলল, বসুন।

—না, বসব না। একটা কাজ ছিল। আদালতের যত কাণ্ড, একটা সই নিতে হবে। যাক, সকালের দিকেই দেখা যাবে।

দরজার কাছে কার ছায়া দেখে আঁৎকে উঠল বিরজা, বলল, কে ?

—আমি গো আমি। ভয় নেই। ব'লে তরুবালা ঘরের ভিতরে ঢুকল, বলল, এত রাতে আর বিরক্ত ক'রে কাজ নেই। সকালেই দেখো। বোসো তোমরা। এসো তুমি।

কমলাকান্তকে নিয়ে তরুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওরা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার বসল তাদের স্বামীর শিয়রে।

নিজেদের ঘরে ঢুকে তরুবালা বলল, ভাশুরঠাকুর ঘাটের মরা হলে হবে কি, কি রকম রস প্রাণে বোঝো। কেমন দুটি বউ ধরে এনেছে, আমি মেয়ে, তবু আমারই গা শিরশির করে। পুরুষদের জিভ দিয়ে জল তো পড়বেই। ওদিকে মসজিদে নমাজে এসে জমায়েত হয় কত টাটকা জোয়ান, আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় ফিরিঙ্গিরা। কারা যে লুফে নেবে বলা যায় কি।

—লুফে নেওয়াচ্ছি। ব'লে চৌকির উপর চেপে বসল কমলাকান্ত, মচমচ শব্দ করে উঠল তার কাঠের পাঁজরা।

—কয়াসিঁদের আর পোর্তুগিজদের আড্ডা এদিকে। শ্রীরামপুরে ঘাঁটি নিয়েছে ইংরেজ, কারা যেন এসেছে ওখানে?

কমলাকান্ত অনেক খোঁজ রাখে, বলল, কেরী নামে এক সায়েব, সঙ্গে জুটেছে এক হিন্দুর বাচ্চা মুনশি হয়ে, তার নাম মনে হলেই সারা অঙ্গ রামো রামো করে ওঠে।

—কেন। সেও বুঝি খিষ্টানি বিলিয়ে বেড়াচ্ছে? স্বামীর পাশে সতী-সোহাগিনীর মত ঘন হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল তরুবালা।

বয়সে তরুবালা তারিণীর মত না, বিরজাদের মত কাঁচাও না। সেইজন্যে একটু মারাত্মকই বটে। তরুবালা এখন ডাঁশা।

কমলাকান্ত বলল, লোকটার নামও ওর বাপ-মা বাছাই করেই রেখেছে—রামরাম, রামরাম বসু।

ওসব কথায় তরুবালার কোনো আগ্রহ নেই। সে কথা বলতে চায় ওদের নিয়ে, বলল, কী-যে হবে বুঝতে পারছিনে। বামুনের ঘরে আবার একটা কেলেঙ্কারি না ঘটে যায়।

বলতে বলতে শরীরে মোড়ামুড়ি দিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল তরুবালা। ওদিকের প্রদীপের আলোয় স্বামীর মুখ দেখতে লাগল, বলল, সকাল পর্যন্ত টিঁকবেন তো ভাশুরঠাকুর।

কমলাকান্ত বালিশে কনুয়ের ভর দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিসের কেলেঙ্কারির কথা বলছিলে?

—তোমাদের গরিটির নিরুপমার কথা। বিধবা হয়ে স্বামীর চিতায় উঠলিনে, ফিরিঙ্গিকে বুকে তুলে নিলি? এ বাড়ির ঐ বউ-দুটো আবার অমনি কাণ্ড না বাধায়। আনটুনি ফিরিঙ্গির মত অনেক টনটনে ফিরিঙ্গি আছে আশে-পাশেই— নীলকুঠিতে রেশমকুঠিতে।

গৌরহাটির পোর্তুগিজ সায়েব কেলীর ভ্রাতা অ্যান্টনির কথা বলছে তরুবালা।

শব্দ করে একটা নিশ্বাস ফেলল কমলাকান্ত। সে নিশ্বাসের কি মানে তা বোঝা কষ্ট। প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে, তেল বুঝি কমে এসেছে।

কমলাকান্ত কিছুক্ষণ কি ভেবে অবশেষে বলল, নিরুপমার ক্ষমতা আছে। চোস্ত বাংলা শিখিয়েছে। কোন্ সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে এসেছে ঐ পোর্তুগিজ সায়েব। কেবল কথা বলে না, সে কবি গায়। কবিয়াল ঠাকুর

সিংয়ের সঙ্গে লড়াই করে। চুঁচুড়ার মিত্তিরদের বাড়িতে তাদের খোকার অন্নপ্রাশনে লড়াই হল। ঠাকুর সিংকে গাল দিয়ে ওই ফিরিঙ্গি কি বলল জান? বলল—

হোয়ে ঠাক্‌রে সিংয়ের বাপের জামাই
কুর্তি-টুপি ছেড়েছি।

কবির আসরে নামে বাঙালি সাজে, বাঙালি বউ পেয়ে বড়ই খুশি বুঝি সায়েব। কোট-পাৎলুন ছেড়ে ধুতি-চাদর প'রে আসরে দাঁড়ায়। তাই তো বলি, নিরুপমা যেমন-তেমন মেয়ে না। সায়েবকে কাবু করেছে।

এবার তরুবালা নিশ্বাস ফেলল শব্দ ক'রে, অভিমানে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, অবশেষে বলল, বউ পেয়ে খুশি হয় সকলেই, তোমরা ছাড়া। কাবুও সব পুরুষেই হয়, কেবল তোমাদেরই কাবু করা গেলনা। তোমাদের একটা কথা শোনাতে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়। নিরুপমার মত মেয়ে যদি হতে পারতাম তবে কবেই সইটা করিয়ে আনতে পারতাম। ব'লে ব'লে মুখ ব্যথা হয়ে গেছে। এখন, সকাল পর্যন্ত টিকলে হয়।

বুকটা জলে উঠেছে বুঝি প্রদীপটার, তরুবালা লাফ দিয়ে উঠে হাত-ঝাপটা দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতি। ফিরে এসে ঠাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চৌকির পাঁজরা বুঝি চুরমার হয়ে গেল, মডমড শব্দ উঠল বেজে।

ফিসফিস করে কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করল, কী হল?

—কিছু না।

তরুবালা পাশ ফিবে শুলো।

সকালে ওরা ঘুম থেকে উঠে দেখল বিমলাকান্ত জীবিত আছেন। কিন্তু মেয়ে-দুটো হয়েছে আধমরা। হাসি আর ফূর্তি কোনোদিন তারা করেছে বলে বোধ হল না। কেবল একটা রাত্রি জাগরণেই কারো শরীর এতটা কাহিল হয়ে যায় না। সেই সঙ্গে অন্য কারণও নিশ্চয় আছে। কারণের কি অভাব? যতই কচি হোক তারা, যতই কাঁচা হোক, সারারাত প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় শয্যাশায়ী মুমূর্ষুর মুখের দিকে চেয়ে নিজেদের জীবনের কথাও তারা ভেবে ফেলেছে। সেদিনের সেই কুয়োতলার আলাপের সূত্র ধরে রাত্রিবেলা দুজনের মধ্যে কোনো কথা হয়নি কে বলল? হাতের লোহার কথা সিঁথির সিঁদুরের কথা, আর আর আর—

কিন্তু থাক্ সে কথা।

ত্বপুরের দিকে বিমলাকান্তের জ্ঞান ফিরেছিল পুরোপুরি। জেগে উঠে নিজে বেঁচে আছে দেখে নিজের কাছেই তার বিস্ময় বোধ হতে লাগল। এদিক ওদিক চাইতে লাগল বিমলাকান্ত।

তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বিধুমুখী বলল, কাকে খুঁজছেন?

বিরজা বলল, এই-যে আমরা।

তু পাশ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে কান পর্যন্ত নেমে এল বিমলাকান্তের, বলল, তোমাদের রেখে যেতে পারবনা।

—চুপ করুন। ভাববেন না। শান্ত হয়ে ঘুমোন।

তুজনে উপুড় হয়ে পড়ল তাদের স্বামীর মুখের উপর। বিমলাকান্ত তার তুর্বল হাত দিয়ে তুজনের হাত চেপে ধরল, মুমূর্ষুর হাতের মুঠি এতটা কঠিন হতে পারে, কে বিশ্বাস করবে। গতরাত্রেই যার নিশ্বাস শেষ হয়ে যাবে বলে সকলে ভয় করেছিল, তার হাতে আজ এই বজ্রমুষ্টির শক্তি এল কোথা থেকে?

বিমলাকান্ত জড়িত গলায় বলল, তোমরা আমার স্ত্রী। আমি গত হলে কার জিম্মায় তোমরা থাকবে? চারদিকে হয়তো ওৎ পেতে বসে আছে কতজন জিম্মাদার। কত ফিরিঙ্গি, কত মোছলমান, কত চণ্ডাল, কত বেইমান।

বিরজারা তুজন তুজনের মুখের দিকে চাইতে লাগল, কী ভাবে লোকটাকে ঠাণ্ডা করা যায় হয়তো তাই ভাবতে লাগল তুজন, কিন্তু কোনো কথা খুঁজে পেলনা, শুধু বলল, ভাববেন না, ভাববেন না।

কমলাকান্ত এসে হাজির। চট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। বিমলাকান্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনেক কথা বলল, অনেক বোঝাল, তারপর পিঠের নীচে হাত দিয়ে বিমলাকান্তকে একটু সোজা করে বসাল।

কাজ সিদ্ধ হল কমলাকান্তের। সই নিয়ে নিতে যে পেরেছে, এই রক্ষে। এত সহজে কাজ হবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

কমলাকান্ত বুঝল না, কোন্ কঠিন মুহূর্তে এসে সে হাজির হয়েছে। তুশ্চিন্তায় হিংসায় ঈর্ষায় আতঙ্কে আর লালসায় বিমলাকান্তের অন্তরাত্মা যখন জলে-পুড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই অসহ্য মুহূর্তে সে এসে হাজির হয়েছিল। এদের যদি রেখে যায় বিমলাকান্ত তাহলে কাদের ভোগে লেগে যাবে এই তুটি নবীন নৈবেদ্যের পসরা এই ছিল বিমলাকান্তের শেষমুহূর্তের যন্ত্রণা; মৃত্যুযন্ত্রণা তার কাছে বুঝি কিছু না। রেখে যেতে তাই নারাজ, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য তাই এই ব্যগ্রতা। এ-সময়ে বিষয়-সম্পত্তি যে তুচ্ছ।

কমলাকান্ত কৃতজ্ঞতায় যেন মত্ত হয়ে গেল।' অবলাকান্তকেও কোনো ভাগ দেওয়ার দায় থেকে যে রক্ষা পেয়েছে, এও তার উপরি আনন্দ।

বিমলাকান্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে কমলাকান্ত চাপা গলায় বলল, মেজদার ইচ্ছে ছিল তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবে। আমি রাজি হলাম না। ওতে তুমি সজ্ঞানে বড কষ্ট পাবে। শাস্ত্রের বিধান একটু লঙ্ঘন করা হল বটে, কিন্তু তোমার শরীরটা বাঁচল। কি বল?

কৃতজ্ঞতার চোখে বিমলাকান্ত তার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

কথাটা বলেই বিধুমখী আর বিরজার দিকে চাইল কমলাকান্ত। স্বাভাবিক গলায় এবার বলল, শাস্ত্রের বিধান যে না মানে সে পাপী। পৃথিবীর সুখের চেয়ে স্বর্গের শাস্তি যে অনেক বড জিনিস— এ বিশ্বাস আমাদের সকলের রাখা উচিত। কি বল, দাদা?

কথাটা বলেই বিমলাকান্তের মুখে দিকে তাকাল, তার এ উক্তির সমর্থনের প্রত্যাশাই বুঝি ছিল সেই চাহনিতে। কিন্তু কোনো সাডা এলনা, গঙ্গাযাত্রার নির্মম পীডন থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে বিমলাকান্ত তার ভ্রাতার কথায় অকুণ্ঠ অনুমোদন জানাতে পারল না, কিন্তু বটেই তো, শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করা যে সত্যিই পাপ, এ পাপে পাপী হতে দিতে সে রাজি না তার ঐ সুকুমারী দুটি বিবাহিতা বধুকে।

খুব কঠিন মানুষ এই বিমলাকান্ত। তার কাছে কারো কোনো খাতির নেই। এমন কি মৃত্যুরও বুঝি না। তা না হলে, গতরাত্রে যার গলার ঘড-ঘড শব্দে বাইরের ঝিঁঝিঁ পোকাব ডাক চাপা পডে গিয়েছিল, সেই মানুষ আজ শিয়রে দণ্ডায়মান মৃত্যুকে ধমক দিয়ে সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসে একটা দলিল সই করে দিল কি করে।

কমলাকান্ত ঘর থেকে চলে গেল। কত বড একটা আসাধ্যসাধন সে করে এল, এখনি গিয়ে সে তা বুঝি দেখাতে চায় তরুবালাকে। এ জয় সাধারণ জয় নয়, এক অসামান্য ব্যাপার। অবলাকান্তকে আর এই বাডিঘর-জোতজমির উপর কোনোঅধিকার ফলাতে হবে না— তারিণী দেবীর তেজও এবার খাটো হবে।

কিন্তু তারিণীর যেন কোনো পরোয়া নেই। তার স্বামী অবলা-কান্ত হতে পারে, কিন্তু তারিণী নিজেকে বুঝি অবলা বলে মনে করেনা। অবলাকান্ত আইন-আদালত নিয়ে মাথা ঘামায় না বটে, কিন্তু সেরেস্তাদারীর কাজ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারবে বলে স্বামীর উপর আস্থা আছে তারিণীর।

বিধুমুখী ও বিরজা সকাল থেকে যথারীতি সংসারের কাজে লেগে যায়। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, জল তোলা, গোয়াল মুক্ত করা। মুখে রা নেই দুজনের। কিনারে-বাঁধা ডিঙি নৌকোর মত যেন ঢেউয়ের দোলায় তারা উঠোন আর বারান্দা, বারান্দা আর উঠোন ওঠানামা করে। কিন্তু এ ঢেউ কিসের ঢেউ?

রোয়াকে বসে দেখে তারিণী, দরজার ফাঁক দিয়ে তাকায় তরুবালা। এ যেন সত্যিই একটা তামাশার মতন। কার সংসার আগলে বেড়াচ্ছে এরা। আর ক'দিনেরই-বা এই সংসার। কিন্তু করুণা করে লাভ কি, কুলীনের ঘরের মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছে তখন দুর্ভোগের হাত থেকে পুরো রেহাই পাবে কী করে?

দিন-দুই কেটে গেল এই ভাবে। রাত্রে বাড়াবাড়ি, দিনে সতেজ। সকলে ধারণা করল, এ যাত্রা টিকে যাবে বিমলাকান্ত। সকলের এই ধারণার আঁচ এসে লাগল বালিকা-বধূ দুটিরও মনে। ক'দিন থেকে মনমরা হয়ে ছিল তারা, তারাও যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল। কুয়োর দড়ি ধ'রে— দুই সতীনে যেন নয় —দুই সখীতে গল্প করতে লাগল আবার।

সকালবেলা অবলাকান্ত দক্ষিণদুয়ারী ঘরে ঢুকে দাদার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করে নিজের দাওয়ায় বসে হুঁকো টানতে লাগল। অবলাকান্তের চোখে-মুখেও আজ দুশ্চিন্তার কোনো ছাপ নেই।

তারিণী পাশে এসে বসল, জিজ্ঞাসা করল, কেমন দেখলে?

—অনেকটা ভালো। মনে হচ্ছে টিকে যাবে এ-যাত্রা।

নিশ্বাস ফেলে তারিণী বলল, তাহলেই মঙ্গল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারতে অনেক বেলা হয়ে গেল। বিধুমুখী আর বিরজা বাড়ির মধ্যে সবার ছোট বলে দায় সবার চেয়ে বড়। তাদের দেওরদের খেতে দিল, তারপর জা-দের। তাদের খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে উনুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে নেভা আঁচে আগুন তুলে গরম করল দুধ। বিমলাকান্তকে খাওয়াতে হবে এবার।

বিরজা তাদের দুজনের ভাত বাড়তে বসল। দুধের বাটি নিয়ে বিধুমুখী উঠোন পার হয়ে ও-ঘরে গেল। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই সে বেরিয়ে এল বিদ্যুৎগতিতে, হাতের বাটি পড়ে গেল মাটির মেঝেয়, চিৎকার ক'রে উঠল বিধুমুখী, ডাকতে লাগল, বিরজা রে, আয়। ছুটে আয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ঘটি কাত করে এঁটো হাত কোনো রকমে ধুয়ে ছুটে গেল বিরজা, বাড়া-ভাতের থালায় পায়ের ধাক্কা লেগে ছড়িয়ে গেল সে-ভাত ঘর-ময়। ছুটে গিয়ে

সে ঢুকল ঐ ঘরে। চৌকির কাছে গেল দৌড়ে। বিমলাকান্তকে ডাকতে লাগল, শুনুন, শুনুন, শোনো, শোনো, কথা বল, কথা বল।

কিন্তু এই আবেদনে কোনো সাড়া দিলনা বিমলাকান্ত।

এদের চিৎকারে তারিণী আর অবলাকান্ত ছুটে এল, তরুবালাও এল, কমলাকান্ত এখন ঘরে নেই।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে অবলাকান্ত তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, নেভবার আগে প্রদীপ বুঝি এমনি করেই জ্বলে ওঠে!

কথাটা শুনে তরুবালার মনে পড়ল সেদিন রাত্রের কথা— তার ঘরের প্রদীপটার বুক জ্বলে উঠবার কথা। আজ তার নিজের বুকটাও জ্বলে উঠল ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে।

তারিণীর গায়ের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বিরজা। তরুবালাকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে উঠল বিধুমুখী। আকুল কান্নার শব্দে চারদিক উচ্চকিত হয়ে উঠল।

এই আর্তনাদের কোনো মানে বুঝতে না পেরে রান্নাঘরের চালে বসে কোয়া-কোয়া করতে লাগল কয়েকটা কাক।

নোনাদিঘি ভেসে যেতে লাগল দুটি মেয়ের চোখের নোনা জলের বন্যায়।

পথ থেকেই খবর পেয়েছে কমলাকান্ত। তাই খোঁড়া মনোহরকে সঙ্গে নিয়ে সে তৈরি হয়েই এসেছে। এসে দেখে, বাড়ি লোকে লোকারণ্য। তাঁতিপাড়া ভেঙে পড়েছে, বাগদি-বৌরা ঝেঁটিয়ে এসেছে, আর ছুটে এসেছে গৌহাটি কালীমন্দিরের চত্বর থেকে রাঙাবাস-পরা একপাল ভক্ত, মাথায় তাদের রুক্ষ-চুলের বোঝা, তাদের চোখ তাদের পরিহিত বস্ত্রের মতই রক্তিম।

ধরাধরি করে বিমলাকান্তের দেহ এনে তুলসীতলায় রাখা হল। অমনি চারিদিকে মা-কালীর জয়ধ্বনি ক'রে উঠল বামাচারী ভক্তের দল।

নরম মাটির দুটি পুতুলের মত দুটি স্ত্রী বিমলাকান্তের পায়ের কাছে জোড়াসন হয়ে বসে আছে। যেন ধ্যানস্থ তারা। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তারা। অসাড় হয়ে গিয়েছে তাদের শরীর।

পুরোহিত মনোহরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল কমলাকান্ত। তারপর পুরোহিত দুটি আম্রপল্লব এনে দুটি সদ্যবিধবার হাতে দিতেই তারা চোখ খুলে ডুকরে কেঁদে উঠল। অসহায় দুটি মেয়ে বুঝি ওই পুরোহিতের কাছে পেয়ে গেছে সান্ত্বনার মন্ত্র, বলে উঠল তারা, কি হল আমাদের? কি হবে, ঠাকুর?

তাদের এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না, কেবল বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে লাগলেন পুরোহিত, তারপর বললেন, বল, আমরা স্বামী-সহযাত্রী হব। জীবনে ও মরণে আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকব ব'লে বিবাহকালে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছি, সে মন্ত্রের নির্দেশ পালনে আমরা প্রস্তুত।

বিরজা একবার বিধুমুখীর দিকে তাকাল। তারপর দুজনে একসঙ্গে উচ্চারণ করল ঐ শপথ। এক বার, দুই বার, তিন বার।

খোঁড়া মনোহর ব্যস্ত ভাবে তুলসীমঞ্চের চারদিকে লেংচে লেংচে পাক খেয়ে বলতে লাগলেন, আম্রপল্লব হাতে নিয়ে যে প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করলাম, সে প্রতিজ্ঞা পালনে সামান্য ত্রুটি হলে কতবড পাপ হয় তা আমরা জানি। আমরা তাই সমস্ত-কিছু বিবেচনা করে এই প্রতিজ্ঞা করলাম। স্বামীর সহযাত্রী হব আমরা। পতি ছাডা সতীর গতি নাই— এ নশ্বর জীবন আমবা তুচ্ছ জ্ঞান করি। পতিসহ গতি হোক আমাদের।

দুইটি বধূ বিডবিড করে ঠোঁট নাডতে লাগল।

মন্ত্র বলে যেতে লাগল মনোহর, বলে যেতে লাগল— চট্টোপাধ্যায়-বংশের গৃহবধূ আমরা। আমরা আমাদের এই পতিগৃহের মর্যাদাবৃদ্ধিতে বদ্ধপরিকর। জীবনে আমরা কোনো কর্তব্য-পালনে যদি অসমর্থ হয়ে থাকি, মরণে তার ক্ষতিপূরণ করব। আমবা সংসারের সামান্য সুখের চেয়ে স্বর্গের অসামান্য শান্তি বড় বলে জানি। আমরা স্বর্গের পথে অগ্রসর হব বলে শপথ করলাম। আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্রে— ঋগ্বেদের এই নির্দেশ পালনে আমরা দৃঢ়সংকল্প। আমরা স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সতী পুণ্যবতী হব।

নরম মাটিব দুইটি পুতুল ক্রমশ যেন দুটি পাথরের মূর্তির মত হয়ে উঠল। সংকল্পেই বুঝি কঠিন হয়ে বসল তারা। মন্ত্র উচ্চারণ করার মত ক'রে চোখ বুজে নিঃশব্দে ঠোঁট নাডতে লাগল দুজন, যেন দু জোড়া ফুলের পাপডি বাতাসের দোলায় থরথর করে কাঁপছে।

কমলাকান্ত তার ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল, তার পিছনে তরুবালা। মনোহর তার কাছে গিয়ে বলল, খরচ কিন্তু একটু বেশি পডবে। নগদ দু শো লাগবে।

—এত কেন মনোহরদা?

খোঁড়া মনোহর দাওয়ার উপর শক্ত হয়ে বসে বলল, কাজটাও ছাখো, দুটো মেয়েকে কাবু করা, একি যেমন-তেমন কথা। শ্লোক দিয়ে স্তোক দিয়ে কত রকমে ওদের মন ভিজিয়ে দিতে হচ্ছে, বোঝো। এতে মেহনত কি কম?

কমলাকান্ত একটু কি ভাবল, স্ত্রীর দিকে তাকাল। তরুবালা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে কি যেন বোঝাল। কমলাকান্ত পুরোহিতকে বলল, আচ্ছা, হবে হবে।

হাসল মনোহর, বলল, কি বলব বল। এই তো আমাদের কাজ। এই দিয়েই তো ব্রত। আর এই পুণ্য কাজের জন্তে জীবন যে সমর্পণ করে দিয়েছি, তা জানোই তো ভায়া।

মনোহর তার ট্যাঁক থেকে একটা জড়ানো কাগজ বের করে বলল, ধরো। এগুলো তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিতে হবে।

—কি কি লাগবে দেখি। কমলাকান্ত হিসাবের তালিকায় চোখ বুলাতে লাগল, তালিকাটা তো কম বড় না। তরুবালার দিকে ফের তাকাল সে।

পুরোহিত বলল, কয়েকটা মাত্র জিনিস। গাঁজাটা ধরা আছে ওদের জন্তে, গৌরহাটি থেকে ছুটে এসেছে ওরা, শ্মশানে একটু হৈ-হল্লা করবে দরকার-মত, ওটুকু বকশিশ চাইবেই। বেশি ধরিনি। কিন্তু আরো লোক জুটে গেলে তাদেরও তো খালিমুখে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এ তো আর ভিক্ষে নয়, এ যে হল সিধে। এসব কাজে ওদেরও কিছু পাওনা থাকেই, জানোই তো।

কমলাকান্তের হাত থেকে তালিকাটা নিয়ে পড়তে লাগল তরুবালা—

গব্যঘৃত তিন সের	৩৲
ধুতি একখানি	১৷৹
শাড়ি একজোড়া	৫৲
কাঠ	৫৲
আদালতের পণ্ডিত	৩৲
চাল	১৲
গুপারি	৵৹
সিঁদুর	।৹
ফুল	৵৹
গাঁজা	১৲
হলদি	⁄৹
চন্দন ধূপ ডাব	১।৹
বাহক	৷৵৹
বাজনদার—ঢাকী ঢুলী	২৲ মোট ২৩৸⁄৹

পড়া শেষ করে সে বলল, রাজি না হয়ে উপায় কি, এসব লাগেই। আগুন দেখে ভয়ে পেয়ে কান্নাকাটি চ্যাচামেচি শুরু করলে সামাল দিতে হৈ-হল্লাও লাগবে, ঢাক-ঢোলও লাগবে।

বিধুমুখী আর বিরজা একবার চোখ মেলে তাকাল চার ধারে। বড় আশ্চর্য লাগছে তাদের, বড় অদ্ভুত ঠেকছে। এত লোকও বুঝি ছিল এ দেশে। একেবারে নিরিবিলি নির্জন আর নীরব হয়ে পড়ে ছিল যে বাড়ি সেই বাড়িতে আজ লোক ধরে না। এত লোকের মেলা কেন আজ এখানে? কিজন্যে এসেছে এরা? আনন্দ করতে তো এমন দিনে কেউ আসে না, কিন্তু শোক করতে এসেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। ওদের চোখে-মুখে, কই, তেমন দুঃখের ছাপ আছে বলে তো বোধ হচ্ছে না। তবে কেন এসেছে ওরা? ওরা চলে যাক, ওরা চলে যাক। বিধুমুখীরা একটু নির্জনে বসে প্রাণ ভরে একটু শোক জানাতে চায় এখন।

অবলাকান্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কমলাকান্ত, বলল, খবরটা তো দিতে হয় মেজদাদা। যাঁরা কাছে-ভিতে আছেন তাঁদের অন্তত জানানো দরকার, আনানো দরকার। বেশির ভাগই তো যশোর মেদিনীপুর বাঁকুড়া— অতদূরে কী করে এখন খবর পাঠাই। কাছের মধ্যে কলকাতার নেবুতলায় আছেন একজন, আর-একজন বাঁশবেড়িয়ায়।

অবলাকান্ত নির্বিকার, কমলাকান্তের মুখের দিকে সোজাসুজি কিছুক্ষণ চেয়ে অবশেষে বলল, যা ভালো বোঝো। খবর একটা জানানো তো দরকারই। স্বামীর চিতার পাশে এসে দাঁড়াতে তাঁদেরও ইচ্ছে হতে পারে। জীবনে যাকে পেল না, মরণে তাকে তো চাইতে পারে।

অবলাকান্ত ব্যঙ্গ করল কিনা বোঝা গেল না। তার গলার থেকে কথাগুলো যেন মুখস্থ করা বুলির মত বেরিয়ে এল।

তারিণী ঘরের মধ্যে গিয়ে শয্যা নিয়েছে। এ দৃশ্য সে দেখতে চায় না, এ দৃশ্য দেখতে সে পারবে না।

শ্মশানে শব নিয়ে যাত্রা করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। চার জন জোয়ান মানুষের কাঁধে চেপে বিরাট সমারোহের সঙ্গে যাত্রা করল বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। কত সধবার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিল সে নিজের একটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে— তারা সকলে জানেও না, এ-খবর তাদের জানতে কত দিন যে গত হয়ে যাবে সে হিসেব করার সময়ও এখন না।

আগে আগে চলেছেন পুরোহিত, তার পিছনে শব, তার পিছনে সদ্য-বিধবা এই দুটি মেয়ে— কপালে আর সিঁথিতে অজস্র সিঁদুর মেখে, গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে— ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে স্বামীর সহযাত্রী হয়ে। তরুবালা ওদের দুজনকে ধরে ধরে চলেছে। পিছনে রাঙাবাস-পরা কালীসাধকেরা দলবেঁধে আসছে, তাদের হাতে-হাতে মশাল, চোখে-চোখে তাদের মশালেরই আগুন। নীরবে আসছে তারা, এখনো ঢাক-ঢোলের চামড়ায় কাঠির বাড়ি পড়েনি।

লম্বা একটি মিছিল চলেছে গৌরহাটির গঙ্গাকিনারে। মাঝে-মাঝে হরিধ্বনিতে চারি দিক সচকিত হয়ে উঠছে। মশালের আলোয় দুপাশের গাছগাছড়া শিউরে উঠছে, অন্ধকার যেন সরে সরে দাঁড়াচ্ছে। হরিধ্বনি যেই থামছে অমনি হেঁকে উঠছে মশালচীরা— জয় কালী, জয় কালী, জয় জয় জয়—

অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হল কমলাকান্তকে। এত বড় একটা অনুষ্ঠানের যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে হয়েছে তাকে একা। এর মধ্যে আবার তাড়াহুড়ো ক'রে খবরও পাঠাতে হয়েছে বাঁশবেড়িয়ায় আর নেবুতলায়।

কমলাকান্তকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে গেল মনোহর। তার মনে আশঙ্কা জেগেছে। এই জন্যেই তার এই ব্যস্ততা। এত বড় একটা অনুষ্ঠান যদি সামান্য একটু গাফিলির দরুণ পণ্ড হয়ে যায় তাহলে সে বড় অমঙ্গল। বিমলাকান্ত স্বর্গে গিয়েও তাহলে শান্তি পাবেন না।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুজন। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকার জিনিসটাই বড় জটিল, তার উপর এ অন্ধকার শ্মশানের অন্ধকার, এর জটিলতা বুঝি আরো ভয়ংকর। মনোহর আর বিমলাকান্ত নিবিড় অন্ধকারে দাঁড়িয়েই আলোচনা করছে, তবুও তাদের দুজনের ভৌতিক ছায়া গিয়ে পড়ছে ও-পাশের ঘন পাতায় ছাওয়া পাকুড় গাছে, লম্বা লম্বা দুটো ফিকে ছায়া পাকুড় গাছের গায়ের উপর দোল খাচ্ছে।

গাজনের সন্ন্যাসীদের হাতে দাউ-দাউ করে জ্বলছে মশাল। তার আলোতেই এদের ছায়াবাজি চলছে গাছের পাতার উপর।

মনোহর বলল, বলা যায় না। হঠাৎ আগুন দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারে। বয়স বড় কাঁচা।

—বুঝেছি। কিছু করতে চাও?

মনোহর বলল, হ্যাঁ। বেহুঁশ করে না নিলে চিতায় উঠতে চাইবে বলে মনে হয় না। বয়স যে বড় কাঁচা।

কাঁচা বয়সই বড় খোঁচা দিচ্ছে মনোহরকে, বার বার তাই বুঝি সে সেইজন্য দোহাই দিচ্ছে ওই বয়সেরই।

কমলাকান্ত বলল, কি করতে চাও করো তাহলে। আর, এখানে এখন পাবেই-বা কী।

মনোহর হাসল, বলল, আমাকেও কাঁচা পেয়েছ নাকি? সঙ্গে আছে সবই। সিদ্ধি আছে, ধুতরোও আছে, আর—

ভুরু দুটো নেচে উঠল মনোহরের। নিজের বুদ্ধির তারিফ নিজেকেই করতে হল, এতে কোনো আক্ষেপ তার নেই। খুশিতে তাই তার শরীরেও রোমাঞ্চ হল হয়তো। সে-যে একজন ঝানু লোক, এ কথা জানান্ দিতে পেরে তার ফুর্তি বুঝি ধরে না।

কমলাকান্তের সম্মতি পেয়ে মনোহর রওনা হচ্ছিল, ফিরে এসে একটু হেসে বলল, মস্ত সম্পত্তির মালিক হচ্ছ, মনে থাকে যেন এই মনোহরদাকে।

—থাকবে থাকবে।

দশ-বারোটা মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জলের ধারের একখণ্ড এলাকা। সেই আলোর কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল মনোহর আর কমলাকান্ত।

সহসা রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ ক'রে দূর থেকে তাদের কানে ভেসে এল ঝুমঝুম-ঝুমঝুম শব্দ। কান খাড়া করে তাকাল দুজন দূরে। দুটো মশাল হাতে নিয়ে কারা আসছে যেন গঙ্গাকিনারের রাস্তা ধরে সোজা?

কমলাকান্ত শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কারা ওরা? কে আসছে মনোহরদা?

মনোহর বলতে পারলনা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সামান্য জিনিসকে এমনি অসামান্যই বুঝি মনে হয় দুষ্কৃতিকারীর। যে পথ ধরে প্রত্যহ সহজে ও সচ্ছন্দে চলাফেরা করা যায়, মনের মধ্যে হঠাৎ কোনো কুইচ্ছা জেগে ওঠা মাত্র সে পথ দুর্গম বলেই ঠেকে। প্রতি পদক্ষেপে মনে হয়, কে বুঝি অনুসরণ করে চলেছে। আকাশে যখন জ্যোৎস্না উঠেছে পরিপূর্ণ গৌরবে, তখন উন্মুক্ত মাঠের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ না পায় কে? ঐ পুর্ণিমার আলোর মত মন যদি প্রফুল্ল থাকে তাহলে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু, যদি তখনই মনে জমে ওঠে কোনো কামনা, যদি মনে হয়, বটকৃষ্ণ বটব্যাল মহাশয়ের চপলা স্ত্রীটি খিড়কি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, যাই, তার সঙ্গে একটু ফিস্‌ফিস্‌

করে আসি, তখনই পূর্ণিমার চাঁদকেও বিশ্বাস করতে পারা যায় না ; মনে ভয় হয়— ঐ আলো ছিটিয়ে সে বুঝি ফাঁস করে দিতে চায় এই অভিসারটি। রাত্রের আলোকে যেমন, আবার রাত্রের অন্ধকারকেও তেমনি সন্দেহ হয়, সেও সেই কালো আব্রুর নীচে লুকিয়ে রাখে হয়তো সন্ধানী চোখ।

অবিশ্বাসীর কাছে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা দুইই অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। নিজে অবিশ্বাসের কাজ করলে পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করা বড দায়। মনে ভ্রম জমলে দডিকেও সাপ বলে মনে হয়।

দশ-বারোটা মশালের আলো যাদের দখলে, এত লোকজন যাদের সহায়, তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সামান্য দুটি মাত্র আলোর শিখা দেখে, একপাল ঢাকী যাদের জিম্মায় তারাই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওই ঝুমঝুম আওয়াজে!

মারাত্মক কিছু নয়, চাঁপদানি-বেশমকুঠির টাকা আসছে কলকাতা থেকে। তেলেগু সেপাইরা মোহরের থলিয়া নিয়ে চলেছে দল বেঁধে। চোর-ডাকাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তলোয়ারে সডকিতে আর মশালে সজ্জিত হয়ে ওদের সঙ্গেসঙ্গে চলেছে পেয়াদা আর বরকন্দাজ।

তাও ভালো। মনোহরদের ভয় হয়েছিল। বলা যায় না, ফোর্ট উইলিয়মের শেরিফ সায়েব এই উৎসবটা বন্ধ করে দেবার জন্যেই পেয়াদা পাঠিয়েছেন ভেবেছিল মনোহর। হেনরি স্টোন সায়েব আবার একটু কডা ধাঁচের মানুষ। একটু কডা শেবিফ। এ-সব কাজে বাধা দেওয়া তাঁর এক্তিয়ার নয়, তাহলে হবে কি, দুম করে পেয়াদা পাঠিয়ে একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে দিলেই হল। মনোহববা তাই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

এখানে এই আলোর মেলা দেখে সেপাইরা একটু দাঁডাল। লম্বা বর্শার গলায় ঘুঙুর বাঁধা। কাঁধেব উপব সেই বর্শা ফেলে মিশকালো রঙের সেপাইরা থমকে দাঁডাল একটু।

ওদিকে দাউ-দাউ করে জ্বলছে মশাল। বালির উপর ঢাক রেখে ঢাকীরা বসে আছে উবু হয়ে। ঝাঁকডা-ঝাঁকডা রুক্ষ চুলের বোঝা মাথায় নিয়ে এক-পাশে চাক বেঁধে বসেছে কালীর সাধকেরা, তারা ধূমপানে ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার ফাঁকেই ঘাড ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে নিল কুঠিয়ালের সেপাই-বরকন্দাজদের। মশালের ধোঁয়ার সঙ্গে গাঁজার ধোঁয়া মিশে একটা উৎকট ঘ্রাণ ভেসে বেড়াতে লাগল বাতাসে।

ঝুমঝুম আওয়াজ বাজিয়ে সেপাইরা রওনা হল আবার চাঁপদানির দিকে।

তারা থমকে থেমেছিল কোনো অঘটন ঘটেছে ভেবে, কিন্তু, বহুৎ তুচ্ছ কোনো ঘটনা নয়, একটা মামুলি ঘটনামাত্র— সতী। তারা তাই কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে আবার যাত্রা করল।

মনোহর তার খোঁড়া পায়ের উপরেই একটু নেচে উঠল যেন, শরীরটা ঢুলিয়ে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। ভাবলাম কোনো হারামজাদা শুভকাজ পণ্ড করতে এল বুঝি।

কমলাকান্ত একটু এগিয়ে বলল, শুভস্য শীঘ্রম্। তোমাদের শাস্ত্রেই তো এ কথা বলে। তবে আর দেরি কেন, যা করবে কর। রাত তো ক্রমেই বাড়ছে।

মনোহর তার শক্ত পা-টার উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একবার তাকাল ঐ দিকে। অনড় হয়ে বসে আছে মেয়ে-দুটি, আর তার একটু তফাতে সাদা কাপড়ে ঢাকা-দেওয়া শবটা টান হয়ে শুয়ে।

মনোহর কি-যেন ভাবল একটু, কোনো কথা বলল না, নাকের মধ্যে দিয়ে শব্দ করল— হুঁ। তারপর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পাড়ের ঢালু দিকে হাঁটতে লাগল।

গাঁজা পুড়ছে সরু সরু কলকেয়, মশাল জ্বলছে লম্বা লম্বা বাঁশের মাথায়। মনোহর ধুতরো আর ভাঙ নিয়ে গিয়ে উবু হয়ে বসল ওই মেয়ে-দুটির সামনে। সে যেন কোথা থেকে নিয়ে এসেছে মহাপ্রসাদ, এই প্রসাদ ভক্ষণ করে নিলে মরণে কোনো যন্ত্রণা হয় না, কোনো জ্বালা নাই, মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হয়ে ওঠে পরমমনোহর।

নিজের নামটি উচ্চারণ করে ফেলে মনোহর নিজের মনেই ফিক করে একটু হেসে নিয়ে বলল, গ্রহণ করো এই প্রসাদ। ভক্তির সঙ্গে ভক্ষণ করো। সহমরণ হবে মহামরণ। মহাপ্রসাদের এই মাহাত্ম্য।

ওদিকে মনোহর ওদের ওইভাবে বোঝাচ্ছে। দূর থেকে চেয়ে দেখছে কমলাকান্ত। আর এদিকে বসে আলোচনা করছে সাধকেরা। নেশায় তারা বুঁদ। তবু তত্ত্বকথার বিরাম নেই। এই রাত-বেরাতে এমন মোহর-চালাচালি— একি ভালো কথা? কুঠিয়ালদের কাণ্ডজ্ঞান নেই? কখন কী হয়ে যায় হঠাৎ, তার কি ঠিক আছে কোনো? সারাটা দিন আছে কি করতে? পেয়াদা আছে, সেপাই আছে, বরকন্দাজ আছে, লেঠেল আছে— এই বুঝি ভরসা ঐ কুঠিয়াল-সায়েবদের। কিন্তু বাবারও বাবা থাকে রে, বাবারও বাবা থাকে।

এ কথায় আপত্তি জানিয়ে উঠল একজন। ঝিমচ্ছিল সে, হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে বসে বলল, তার নাম তো ঠাকুরদা, তাকে আবার বাবার বাবা বলে নাকি? নেশা করলেই মেঘনাদের বুদ্ধিটা কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। বরাবর আমি লক্ষ্য করে আসছি।

মেঘনাদ তার ঘাট স্বীকার করে নিল, বলল, বেশ বাবা বেশ। তুই আমার ঠাকুরদা। আমাকে মাপ করো।

ওদিকে মনোহর মন্ত্র পড়ে চলেছে, আর এদিকে মন্ত্রপাঠ চলেছে এদের। কমলাকান্ত একা দাঁড়িয়ে ছিল একটু তফাতে। গাছের ডালে সর্‌সর্‌ শব্দ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে; ফিরে তাকিয়ে দেখল— প্রায় তালগাছের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে পাকুড় বকুল বট গাছের ওপার দিয়ে কি-যেন ছুটে গেল। হিম হয়ে গেল কমলাকান্তের গা, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দৌড়ে আসতে আসতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সোজা হয়ে উঠে বলল, কি ও! কি যেন যাচ্ছে!

মেঘনাদ ধরে ফেলল তাকে, বলল, কি? কি হল দাঠাকুর?

—ওই ছাখ।

সকলে একসঙ্গে তাকাল অন্ধকারের দিকে। কিছু দেখতে পেল না তারা। কমলাকান্ত কিছু বুঝিয়েও বলতে পারছে না, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার জিভে।

আবার সর্‌সর্‌ শব্দ বেজে উঠতেই সকলে দেখতে পেল, এক ঝাঁক গাছের ওপার দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে তীরবেগে ছুটে গেল কয়েকটা প্রাণী, আকাশে ছায়া ফেলে ফেলে।

মেঘনাদ হেসে উঠল, বলল, ন্যাংটোর নেই বাটপাড়ের ভয়। তোমার-আমার ভয় কি? চাঁপদানির কুঠিয়ালের সব মোহর আজ লোপাট হবে। এই কথাই ভাবছিলাম একটু আগে।

মনোহর তার কর্তব্য সমাপন ক'রে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সেও এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

মেঘনাদ উত্তর দিল, বলল, ডাকাতের দল, চাঁপদানির দিকে ছুটে গেল রণপা চেপে।

ছেলেবেলায় ক্ষুদে ক্ষুদে রণপা চেপে মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করেছে কমলাকান্ত, এইভাবে অনেক খেলা খেলেছে সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে। কিন্তু

এত উঁচু বাঁশের খুঁটির গিঁটের উপর পা রেখে এমন তীরবেগে ছুটে চলা— এ যে বিশ্বাস করাই কঠিন। ডাকাতের অনেক গল্প শুনেছে সে, কিন্তু আজ নিজের চোখে এই কাণ্ড দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে কমলাকান্ত। জিজ্ঞাসা করল, কার দল ওটা ?

মেঘনাদ কোনো উত্তর দিল না, মনোহর বলল, কি করে বলি ? পাঁচু সরদারেরও হতে পারে, বিশ্বনাথবাবুরও হতে পারে।

ওরা বুঝতে পারল না, কিন্তু ও-দল বিশু বাগদীরই। মেঘনাদ এখন নিরীহ সেজে বসে আছে, কিন্তু সে এই দলেই ছিল অনেকদিন। ডাকাতগিরির সঙ্গে সাধুগিরির মেশাল ভালো লাগেনি তার। বিশ্বনাথের দলে থেকে মস্ত বড় বড় ডাকাতি সে করেছে, সে একজন বড়-দরের খেলুড়ে, অনেক ঘাঁটি তাকে আগলাতে হয়েছে অনেক বার। বিশ্বনাথের দলের সে ছিল কালীর পাইক। মেঘনাদ কিন্তু দল দিল ছেড়ে, অত দয়া মায়া মমতা নিয়ে কি ডাকাতি করা চলে ? ডাকাত হবে ডাকাত। যেমন পাঁচকড়ি সরদার। মারো, ধরো, খুন করো, লুঠ করো— লুঠের মাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে উধাও হও। কিন্তু বিশ্বনাথ আর-সব করতে রাজি, কিন্তু লুঠের মাল চায় হরির লুঠ দিতে। গরিব আর কাঙালকে বিলিয়ে দিতে। যত-সব বুজরুকি। ওসবের মধ্যে নেই মেঘনাদ। কেন, মেঘনাদরা কি গরিব-কাঙাল নয় ? তাই সে দল ছেড়ে দিয়ে এখন আছে পাঁচকড়ি সরদারের সঙ্গে। গাজন এসে গেল, এই পার্বণের জন্যে ক'দিন আলগা হয়ে আছে। কিন্তু তার সে পরিচয় তো জাহির করা চলে না। এখন সে একজন কালী-সাধক মাত্র। সতীতীর্থে এখন সে এসেছে পুণ্য-অর্জনে।

উৎসবের সমস্ত আয়োজন এখন প্রস্তুত। কড়া নেশার ঝোঁকে বুঁদ হয়ে বসে আছে মেয়ে-দুটি। তাদের শরীরেও কোনো সাড়া নেই, মনেও বুঝি নেই কোনো চেতনা।

ওদিকে আমকাঠের মোটা মোটা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হচ্ছে সুউচ্চ চিতাশয্যা। উঠে দাঁড়িয়েছে ঢাকীরা। মশাল হাতে নিয়ে সান্ত্রীর মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছে কালীর সাধকেরা। সিঁদুর-কৌটো হাতে নিয়ে পাঁচ-সাতজন সাধ্বী নারী অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল ধৈর্য ধরে, এবার তারা এগিয়ে এল একে-একে। বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুই সতী স্ত্রীর সিঁথি ভরে দিল সিঁদুরে, কৌটোর ঢাকনি দিয়ে পুনরায় চেঁছে চেঁছে কৌটোতে তুলে নিল সেই পবিত্র সিঁদুর।

হঠাৎ বীভৎস উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠল গৌরহাটির এই গঙ্গাতীর। মশাল হাতে নিয়ে নৃত্য করতে করতে চিতাশয্যা প্রদক্ষিণ করতে লাগল সাধকেরা।

বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল।—হরিধ্বনি দিয়ে উঠল সকলে সমবেতকণ্ঠে।

মেয়ে-দুটিকে ধরাধরি করে মেঘনাদরা চিতার দিকে নিয়ে গেল। অমনি সধবারা দিয়ে উঠল উলু।

হরিধ্বনি আর হুলুধ্বনি মিশে গেল। মশালের ধোঁয়ার সঙ্গে গাঁজার ধোঁয়া মিশে যেমন উৎকট ঘ্রাণ সৃষ্টি করেছিল, এই দুই ধ্বনি মিশে যে আওয়াজ সৃষ্টি করল তাও বুঝি কম উৎকট নয়।

সুউচ্চ কাষ্ঠশয্যায় বিমলাকান্তের শবের দুই পাশে টান ক'রে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁর দুই স্ত্রীকে। বিমলাকান্তের জীবনে আর কোনো দুঃখ নেই, কোনো বেদনাও বুঝি নেই। যাদের তিনি ফেলে রেখে যেতে পারবেন না বলে সকরুণ আর্তনাদ করেছিলেন, তারা এখন তাঁর পাশে। হায়, বিমলাকান্ত এক মুহূর্তের জন্যেও যদি চোখ খুলে দেখতে পেতেন এই দৃশ্য।

তিনটি শরীরের উপর ক্রমে ক্রমে চাপানো হল কাঠের স্তূপ। খড় দিয়ে আচ্ছাদন ক'রে দেওয়া হল চিতাটি।

নৃত্য করতে কবতে কালীমাতার জয়ধ্বনি করতে করতে মশালচীরা পাক খেতে লাগল চিতার চার ধারে।

মনোহর চীৎকার করতে লাগল, বলতে লাগল, বল হরি, হরিবোল! লাগাও লাগাও। আগুন জ্বাল। উলু দাও সকলে, উলু দাও।

চিতার নীচে দুটি মশাল গুঁজে ধরে দাঁড়াল দুই জোয়ান সাধক। দেখতে দেখতে আকাশ ভরে গেল ধোঁয়ায়। হুলুধ্বনি উঠল বেজে। ঢাকের পিঠে পড়ল কাঠিব বাড়ি। পালক আন্দোলন করে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে করতে তারা বাজিয়ে চলল ঢাক। গঙ্গাকিনার উতরোল হয়ে উঠল উৎসব-নিনাদে।

জ্বলে উঠেছে, জ্বলে উঠেছে, জ্বলে উঠেছে। হু হু করে জ্বলে উঠেছে চিতা। আগুনের তাপে সাধকদের নেশা বুঝি গেছে ছুটে, চিতাব উপর মেয়ে-দুটিরও নেশা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর্তচীৎকার করে উঠল তারা— আঃ আঃ আঃ! লাফিয়ে উঠবার জন্যে বুকের উপর থেকে কাঠের ভার সরিয়ে দেবার চেষ্টায় ছটফট করে উঠল।

মনোহর চ্যাঁচাতে লাগল, চেপে ধর। চেপে ধর। বাজাও ঢাক, বাজাও ঢোল— আরো জোরে, আরো জোরে।

চিতার কাঠের ফাঁক দিয়ে আঃ আঃ আঃ ব্যাকুল হাহাকার বেরিয়ে আসার পথ বন্ধ করার জন্যেই বুঝি বালির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মশাল নিভিয়ে নিয়ে সেই বাঁশ দিয়ে চেপে ধরল চিতার ঐ জীয়ন্ত জীব-দুটিকে। আর প্রাণপণ শক্তিতে ঢাকীরা পিটতে লাগল কাঠি। মশালচীরা হৈ হৈ শব্দে হল্লা আরম্ভ করল। সধবারা দিতে লাগল উলু।

জলে উঠেছে এবার চিতা। সর্বগ্রাসী শিখা বিস্তার করে চার দিকে আস্ফালন করতে লাগল আগুন। সেই আগুনের অতলে তলিয়ে গেল দুটি প্রাণীর আর্তরব।

ঢাক তবু বেজেই চলেছে। মাঝেমাঝে উলু বেজে উঠছে চম্‌কে চম্‌কে। জলে উঠেছে, জলে উঠেছে, জলে উঠেছে।

হু হু করে আকাশের দিকে আন্দোলিত হয়ে উঠল লেলিহান শিখা। আগুনের আস্ফালন দেখে খুশিতে উন্মাদ হয়ে উঠল বিপুল জনতা।

অদূরে দণ্ডায়মান এয়োনারীরা আঁচল দিয়ে নাক ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। তাদের এ উচ্ছ্বাস আনন্দের না বেদনার এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তা বোঝা গেল না।

হঠাৎ নড়ে উঠল চিতার কাঠ। সেই বিরাট স্তূপের ছিদ্র দিয়ে ব্যাকুল শব্দ শোনা গেল— আঃ আঃ আঃ!

ঐ শিখার স্পর্শে নেশা বুঝি একেবারে টুটে গেছে মেয়ে-দুটির। চিৎকার করতে লাগল তারা, কী যে বলতে লাগল কিছু বোঝা গেল না দারুণ হট্টগোলের মধ্যে। শরীরের উপর থেকে এই বিপুল বোঝা সরিয়ে মুক্তিলাভের জন্যে তারা মরিয়া শক্তিতে উঠে বসবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

হট্টগোল চিৎকার উল্লাস ও ঢাকের শব্দ ভেদ ক'রে কানে এল মাত্র তিনটি ধ্বনি— আঃ আঃ আঃ!

মনোহর চ্যাঁচাতে লাগল, চেপে ধর। চেপে ধর। বাজাও ঢাক; বাজাও ঢোল— জোরে জোরে, আরো জোরে।

আরও জন-কয়েক সাধক ছুটে এসে বালুর মধ্যে মশাল ডুবিয়ে তার আগুন দিল নিভিয়ে। তারপর সেই দীর্ঘ বাঁশ দিয়ে সকলে একসঙ্গে চেপে ধরল চিতার কাঠ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই করুণ কাতরানি গেল থেমে। স্তব্ধ হয়ে গেল কাঠের বোঝা।

দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে এবার চিতা। সেই আগুনের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল বিমলাকান্তের যুগল বধূ।

ঢাক তবু বেজেই চলেছে। এবার বিসর্জনের বাজনা বুঝি বাজাচ্ছে তারা। মাঝে-মাঝে উলু বেজে উঠছে চম্‌কে চম্‌কে।

বিদায়, বিদায়। বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা। তির-তির করে জ্বলতে লাগল আগুন।

এ ঘটনার সাক্ষী রইল না কেউ। একমাত্র গোবিন্দমিত্তিরের নবরত্ন-মন্দির ছাড়া। অনেক দূর থেকে অন্ধকারের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে আকাশ পর্যন্ত মাথা তুলে সে দেখতে লাগল এই সমারোহ। ওপারের কুমারটুলির ঘাট থেকে গৌরহাটির ঘাট পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওই মন্দিরটা। বহুদিন আগের এক ঝড়ের ঝাপটে তার নয়টি চূড়ার কয়েকটা গেছে ভেঙে, কিন্তু আজকের এই ঝাপটায় তার একটি চূড়াও খসে পড়ল না।

ক্লান্ত হয়ে মনোহর এসে বসল কমলাকান্তের পাশে। ভীষণ একটা সংগ্রামে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে সে যেন ফিরে এসেছে নিজের শিবিরে। কপালে সে বুঝি জয়তিলক চায়।

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে কমলাকান্ত। সে কোনো কথা বলতে পারল না এখন।

সারারাত ধরে জ্বলল ঐ আগুন। শ্মশানযাত্রীরা জেগে বসে রইল সারারাত। আঁচল দিয়ে মুখের আধখানা ঢেকে বসে রইল এয়োরা।

ভোর হবার একটু আগে আগুনের কুণ্ডটা নিস্তেজ হয়ে এল। সব ভস্ম হয়ে গিয়েছে। সব বুঝি শেষ।

কিন্তু শেষ কোথায়? ফর্সা হওয়ার একটু পরেই একটি পালকি এসে নামল। বাঁশবেড়িয়ার বধূটি এসে উপস্থিত হয়েছেন। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে তাঁর। কৃতসংকল্প হয়ে এসেছেন তিনি— কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ সুযোগ তিনি হারাতে রাজি না। এসেই বললেন, তুষানল থেকে চিতানল অনেক ভালো।

—কি বললেন? কি বললেন? ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে দাঁড়াল কমলাকান্ত। জিজ্ঞাসা করল, কি বললেন?

—কাঠ দাও ঐ আগুনে। আমি সতী হব।

কমলাকান্তের ব্যাকুল প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন না। এ আর ব্যাখ্যার কি আছে? একি জানে না কেউ? বোঝে না কেউ? ভাইয়ের সংসারে তাদের গলগ্রহ হয়ে দিন কাটালে কত সুখে দিন কাটে, প্রতি গ্রাসে গ্রাসে কত গঞ্জনা গিলতে হয়, সে কথা কি খুলে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? উঃ, চোখ বুজে বালুর উপর বসে পড়ল বিন্দুবাসিনী। তার জীবনের এই দীর্ঘ বছরগুলো কী ভাবে তার কেটেছে, একমাত্র জানে সে-ই। তকলীতে সুতো কেটেছে সারাটা দিন, রাত্রি জেগে-জেগেও। পৈতে তৈরি করেছে, বেচেছে। পয়সা জমিয়েছে। পয়সা জমে জমে হয়েছে টাকা। কিন্তু যার জন্যে এই পরিশ্রম আর এই সাধনা, যার শুভাগমনের পথ চেয়ে কেটেছে দিনের পর দিন, যাকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্যে তার এত সঞ্চয়— তার পদার্পণ ঘটল না একদিনও। এখান থেকে বাঁশবেড়িয়া আর কত দূর, যেতে কি পারতনা ইচ্ছে করলে? কিন্তু গেল কই?

বালুর উপর চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে ছিল, চেয়ে দেখে সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে এয়োর দল আশেপাশের গাঁ ঝেঁটিয়ে, তাদের সকলের হাতে সিঁদুর-কৌটো।

তাদের দিকে তাকাল বিন্দুবাসিনী, ওদের দেখে তার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

অমনি এয়োরা এগিয়ে এল কাছে, প্রত্যেকে তাদের কৌটো থেকে সিঁদুর পরাতে লাগল বিন্দুবাসিনীকে। বিন্দুর সিঁথি আর কপাল ভরে গেল সিঁদুরে।

বিন্দু অস্ফুট গলায় বলল, বিধবার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কী লাভ? স্বামী যার গত হয়েছেন, তাকে এ সাজে সাজিয়ে লাভ কী?

কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না। পুণ্য লাভ করার জন্যে তারা এসে জমায়েত হয়েছে এখানে। স্বামীর চিতার আগুন না নেভা পর্যন্ত কি কেউ বিধবা হয়? ওই যে, ওই যে—

সকলকে তাকাল ঐ দিকে, বিন্দুবাসিনীও তাকাল ঐ দিকে। নতুন উদ্যমে জ্বলে উঠেছে আগুন, নতুন ইন্ধন ঢালা হয়েছে অপর্যাপ্ত।

সকলকে করজোড়ে নমস্কার ক'রে তুষানলে-দগ্ধ বিন্দুবাসিনী সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অমনি বেজে উঠল ঢাক, ঢোলের চামড়ায় পড়ল কাঠির বাড়ি।

চৈত্রের এখন মাঝামাঝি। চড়ক এল বলে। তত্রেশ্বরের মন্দিরে জড়ো হয়েছিল গাজনের সন্ন্যাসীরা; তাদের কানে ইতিমধ্যে খবর পৌছে গেছে। হৈ হৈ করতে করতে তারাও রাস্তার ধুলো উড়াতে উডাতে এসে জুটে গেল। গৌরহাটির তীরে আজ এক মহোৎসব। বাজনদারেরা ঢাকের পালক আন্দোলন ক'রে নেচে নেচে বাজাচ্ছে বুঝি বিজয়াদশমীর বাদ্য, আজ বুঝি প্রতিমা-ভাসানের পালা। সন্ন্যাসীর দল সেই তালে তালে শুরু করে দিল সেই নৃত্য— শেষ আরতির ধুনুচি-নাচ।

অদূরে দাঁড়িয়ে এই মজা দেখছে টুপিওয়ালা কয়েকটা ফিরিঙ্গি। নিজেদের মধ্যে কি-যেন বলাবলি করছে তারা।

দুপুর বেজেছে। উৎসবও শেষ হবে বলে মনে হচ্ছিল সকলের। কিন্তু না। এইমাত্র নৌকা ভিড়ল ঘাটে। কে এল? হাত দিয়ে কপালের উপর রোদ আড়াল ক'রে দেখল সবাই। কমলাকান্ত চিনল, নেবুতলার মালতী এসেছে।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে মেয়েটার। সমস্ত শরীর দিয়ে স্বাস্থ্য যেন উপছে পডছে। নৌকো থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে পাডে পডল, কাদার মধ্যে গেঁথে গেল একটা পা। নিজেকে টেনে তুলে 'নয়ে এসে সে দাঁড়াল ডাঙায়। তার সঙ্গে দুজন পুরুষ— একজন বৃদ্ধ, একজন জোয়ান।

উলু দিয়ে উঠল এয়োরা। সিঁদুর-কৌটো-হাতে সকলে এগিয়ে এল তার কাছে।

মালতী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের দিকে চেয়ে বলল, সিঁদুর আছে এ সিঁথিতে, আর চাইনে আমি।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল এয়োর দল। বলে কি এই মেয়ে? সতী হতে চলেছে, তার সিঁথির একটু ছোঁয়া পেয়ে এরা যদি পুণ্যবতী হতে পারে, স্বামীব মনোহরণে যদি আরও একটু শক্তিলাভ করতে পারে, তাতে আপত্তি কী এর?

—আপত্তি কিছুই নেই। মালতী বলল, এ সিঁথির সিঁদুরে কোনো পুণ্য হবে না। এই কথাই শুধু বলছি।

মালতীর বিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল এয়োরা। স্বামীবিয়োগে মেয়েটি যে মর্মে মর্মে বেদনায় জর্জরিত— এ কথা বুঝতে কারো দেরি হল না। যে মেয়ের অদৃষ্টে স্বামী টিকল না, সে তার সেই কলুষিত সিঁদুরের ছোঁয়াচ দিয়ে কারো অকল্যাণ করতে চায় না, এ কথাও বুঝল সকলে। কিন্তু বুঝলে কী হবে?

সংস্কার বলে তো একটা কথা আছে ; যতই অকাট্য হোক, যুক্তি দিয়ে সেই সংস্কারের হাত থেকে চট্ করে মুক্ত করে নেওয়া কি সম্ভব ?

এয়োরা তবু একটু অনুনয় জানাল, বলল, এই পুণ্যদিনে যখন তুমি একটা পুণ্যব্রত পালনে উদ্যোগী হয়েছ, তখন এমন বাধা দিতে নেই। একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও। একটু ছুঁইয়ে নিই সিঁদুর।

বাজনদারেরা ঢাক-ঢোল নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসীর দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, কয়েকজন গাঁজা নিয়ে বসেছে এক পাশে গোল হয়ে। একটি আমের কাঁচা ডাল ভেঙে এনে শপথ পাঠ করাবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খোঁড়া মনোহর। বাসী চিতা আবার সদ্য চিতা হয়ে জ্বলে উঠবে এই আশায় হয়তো বিন্দুবাসিনীর অস্থি ঘিরে ধিক্ ধিক করে জ্বলছে আগুন।

আর, কিছু দূরে, রাস্তার ধারে, চালতে-গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো মূর্তি। তারা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে এই উৎসব। তাদের চোখে বিস্ময়। ওপারে যাবে তারা, তারা যাবে চানকে— এই তাদের ইচ্ছে ; এবং সেইজন্যেই তারা সকালবেলা এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। কিন্তু তাদের সব ইচ্ছে গিয়েছে বানচাল হয়ে। এই প্রমত্ত উৎসব দেখতে দেখতে সময় কেটে গিয়েছে এতটা। এব মধ্যে খেয়ানৌকা দুবার চলে গিয়েছে, কিন্তু তাদের যাওয়ার কোনো গরজ যেন আর নেই। দাঁড়িয়ে আছে দুটো মূর্তি অবাক দৃষ্টিতে এই দিকে চেয়ে।

এয়োরা আবার বলল, একটু দাঁড়াও সোজা হয়ে।

কিন্তু মালতী এ অনুরোধে কান দিতে পারল না। তার কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দে চৈত্রের এই দুপুর বুঝি অশান্ত সংগীত আরম্ভ করে দিয়েছে।

সোজা হয়ে তো নয়ই, মালতী একটু বাঁকা হয়েই দাঁড়াল, এবং একটু বাঁকা ভঙ্গিতেই বলল, মিথ্যে আশা আপনাদের। এতে পুণ্য হয় না, এতে পুণ্য হবে না।

বড় বেয়াড়া তো এই মেয়ে। এয়োরা নিজেদের মধ্যেই ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতে লাগল। কিসে কি হয় না-হয়, তাকি তাদের চেয়ে বেশি বুঝবে ঐ মেয়ে ? তারা ঘর করছে, সংসার করছে, স্বামী-পরিচর্যা করছে, স্বামী-সহবাস করছে ; বয়সও তাদের হয়েছে, অভিজ্ঞতাও তাদের কম না। তবুও কিসে কি হয় না-হয়, তা আজ জানতে হবে ঐ মেয়ের কাছে ?

মালতী বলল, ইনি আমার দাদা। এঁর গরজেই আমার আসা। এঁর ইচ্ছে আমি আজ পুড়ে ছাই হই। কিন্তু আমার ইচ্ছে অন্য।

সকলে উৎসুক হয়ে অশেষ কৌতূহলের চোখে তাকাল তার দিকে, যেন জিজ্ঞাসা করল, কী সে ইচ্ছে?

কোনো উত্তর দিল না মালতী। চোখ ঘুরিয়ে সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করল, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সকলেই তাকাল সেই দিকে। মালতীর সঙ্গের দ্বিতীয় সঙ্গীটি মাথা নীচু ক'রে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ছে।

মালতী বলল, আমি সতী হব না।

কথাটা শুনেই চমকে উঠল সকলে।

—তবে তবে তবে? এগিয়ে এল তার দাদা, বলল, এ কী অসম্ভব কথা? এ-যে কলঙ্কের কথা, কেলেঙ্কারির কথা।

ম্লান হাসল মালতী, বলল, জানি।

—তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব কী ক'রে?

—নিয়ে যেয়োনা। আমিও যেতে চাইব না।

—যাবে কোথায় শুনি? বলেই রুষ্ট চোখে তাকালেন তিনি ঐদিকে, তখনো পায়ের আঙুল দিয়ে বালি খুঁড়ছে সেই ব্যক্তিটি। বললেন, বুঝেছি। ওইজন্যেই বুঝি ওর আসা?

দাপাদাপি করতে লাগলেন দাদা। ইন্ধন গিয়ে পড়তে লাগল নিভন্ত আগুনে। জ্বলে উঠল অগ্নিকুণ্ড। বেজে উঠল ঢাক-ঢোল। মত্ত হয়ে উঠল সন্ন্যাসীর দল।

ছাড়া হবে না। এ অসম্ভব কথা। জোর ক'রে হোক, জবরদস্ত ক'রে হোক, এ কাজ শেষ করতেই হবে। সমাজ বলে তো একটা জিনিস আছে? কেবল মর্জি দিয়েই তো সংসার চলে না। তা ছাড়া, এমন-একটা উৎসব পণ্ড হতে তো দেওয়া যায় না।

মালতীর তীব্র আর্তনাদ চাপা দেবার জন্যে তীক্ষ্ণশব্দে বাজতে লাগল উন্মত্ত বাজনা, কোলাহল আরম্ভ করল জনতা, হুলুধ্বনি দিতে লাগল পুরস্ত্রীরা। মালতীকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আকুল রোদন করে সে যেন কার নাম ধরে ডাকছে, কিন্তু এই কলরবে সে নাম শোনা যাচ্ছে না।

একটা আঙুল দিয়ে বালু খুঁড়ছে না, পাঁচটা আঙুল দিয়ে এখন বুঝি বালু আঁচড়াচ্ছে সেই নীরব মানুষটি। কিন্তু কিছু করারও বুঝি নেই তার। এই

জনতার কবল থেকে সে কাউকে রক্ষা করবে এমন কি সাধ্য তার। অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই মত্ততা। তারপর একটু দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল। এক-পা দু-পা ক'রে এগতে লাগল সে।

ওদিকে আকাশের দিকে শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠছে অগ্নিকুণ্ড। এর হাত থেকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই বুঝি নেই।

বঙ্গোপসাগর কখন স্ফীত হয়ে উঠেছিল কেউ জানেনা। কেউ জানেনা, এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস কী বিপুল বেগে ঘাটে ঘাটে বিপর্যয় বাঁধিয়ে দিতে দিতে ছুটে আসছিল এই দিকে। পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাকে উপেক্ষা ক'রে সেই জনতা একটি বিশেষ আগ্রহে আকুল হয়ে উঠেছে, এমন সময় বৈদ্যবাটী আর কাকিনাড়া ডিঙিয়ে আকুল বান এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গৌরহাটির কিনারে।

নিভে গেল চিতা। উৎসব-মত্ত জনতার উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল সহসা। উলুধ্বনি জড়িয়ে গেল পুরবালাদের জিভে জিভে। যেন থতমত খেয়ে গিয়েছে সকলে একসঙ্গে।

কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেলে চলে না। একটা প্রাণ নিয়ে যারা এতক্ষণ একটা খুশির খেলা খেলার জন্যে মত্ত হয়ে উঠেছিল, এই প্রবল জলপ্লাবনের হাত থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর-একটু দেরি হলেই বুঝি ভেসে যেত সকলে। ছুটে গিয়ে সকলে হুড়োহুড়ি ক'রে উঠে পড়ল পাড়ে; একেবারে রাস্তার উপরে।

ইতিমধ্যে থৈ থৈ করতে আরম্ভ করেছে এ কিনার থেকে ও কিনার পর্যন্ত। সম্মুখে ওটা বুঝি আর সামান্য নদী না, একটা মহাসমুদ্র। তীরে এসে লেগেছিল যে-নৌকোটা, তার কোনো হদিশ মিলছেনা; ডুবেই গেল, না, ভেসে চলে গেল সে খোঁজ করার সুযোগ হয়নি কারো। কত নৌকোই তো আজ এই জলের তোড়ে হাবুডুবু খেয়েছে, কত প্রাণ হয়তো আজ এই জলে সমাধিস্থ হয়েছে, কত খেয়াডিঙি এই নদী ডিঙাবার আগেই মাঝ-দরিয়ায় অথৈ জলে থৈ না পেয়ে অতলে তলিয়ে গেছে। পোর্তুগিজদের দিনেমারদের ফরাসির ইংরেজের সোরা আর মসলিন বোঝাই কত বাণিজ্যতরী রূপনারায়ণের মুখ থেকে জলঙ্গীর মুখ অবধি এই দীর্ঘ নদীপথে কতভাবে বিপন্ন হয়েছে কে তার খোঁজ করছে এখন? গৌরহাটির শ্মশানে জমায়েত এই জনতার পক্ষে সে খোঁজ রাখা সম্ভব নয় এখন। আমরাও সে খোঁজ না রাখলাম।

কিন্তু একটা খোঁজ আমরা রেখেছি।— একটি অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছে ওই জলের আঘাতে। একজন প্রাণ পেয়ে গিয়েছে ওই জলের অতর্কিত আবির্ভাবে। এবং এ খোঁজও আমরা রেখেছি যে, সেই অগ্নিকুণ্ডটা গ্রাস করেছে তিনটি জীবন্ত প্রাণ— সেই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটিকে আমরা প্রাণ ভরে যতই দেখেছি তাদের নোনাদিঘির বসতবাটীতে ততই আমাদের মনে কেমন-একটা মায়ার টান যেন দেখা দিয়েছে। কিন্তু তারা বড় নির্মম, পৃথিবীতে তারা যেদিন প্রথম পদার্পণ করে সেদিন তারা আর্তনাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল এই পৃথিবীকে, কিন্তু পৃথিবী থেকে শেষ-বিদায় নেবার সময় তারা তেমন কোনো সাড়া দিয়ে গেল না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তারা, তারপর নীরবে তারা চলে গেল— একটু মাত্র ক্ষীণ আর্তরব করেই পৃথিবীকে তারা শেষ নমস্কার জানাল। অকারণেই বেজে উঠল ব্যর্থ বাদ্যের শব্দ।

পায়ের পাঁচটা আঙুল দিয়ে যে তার পায়ের নীচের বালু আঁচড়াছিল, তার পায়ের নীচ থেকে সেই ক্ষতবিক্ষত বালুকার চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, ডুবে গিয়েছে সেই ক্ষতচিহ্ন ওই নদীর জলে। তাই সে এখন এসে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ ডাঙায়। তার চোখের সামনে জলের প্রলয় টলমল করলে কি হবে, তার বুকের মধ্যের প্রলয় বুঝি এখন অনেক শান্ত।

একটা প্রলয়ই বুঝি হয়ে গেল— একটা কল্পান্ত। এমন ঘটনা কখনো কোথাও ঘটেছে বলে কেউ শোনেনি। ভদ্রেশ্বরের সন্ন্যাসীদের চোখেও বিস্ময়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

কৌতূহলী সেই ফিরিঙ্গিদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ঐ লোকটা।

সেখানে দাঁড়িয়েই মালতীর মুখের দিকে সে চেয়ে আছে। মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় ভাগীরথীর প্রতি তার কৃতজ্ঞতার বুঝি কোনো অন্ত নেই।

দাদার দিকে একবার তাকাল মালতী, একবার তাকাল ঐ এয়োদের দিকে, এক-পা দু-পা করে এগিয়ে এসে অস্ফুটে বলল, কী অভিলাষ?

দুই চোখ সজল হয়ে উঠল অভিলাষের, তার সাধ্য ছিল না সে ওকে রক্ষা করে, তার পৌরুষের পক্ষে এটা কম কলঙ্ক নয়, কিন্তু এভাবে রক্ষা যে পেয়ে যাওয়া যাবেই তাও তো জানা ছিল না। অথচ এটা একটা সাময়িক পরিত্রাণ কি না, ভাটার টানে এ জল নেমে গেলে আবার ঐ জনতা নতুন করে উৎসবে মত্ত হবে কি না— তার কোনো স্থিরতা নেই।

অভিলাষ চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বলল, চলো। তোমার দাদার বড় ভয়, ফিরে গিয়ে—

দুঃখেও হাসি পায়, মালতী একটু হাসলই, বলল, না। তাঁর গলগ্রহ হয়ে থাকতে আর চাইনে। তাঁর আশ্রয়ে আর ভরসাও নেই। অন্য পথ দেখতে হবে।

অভিলাষ একটু চিন্তা ক'রে আবার বলল, চলো।

—কোথায় ?

—অন্য পথে।

খোঁড়া মনোহর অনেকক্ষণ ধরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। একটা পা ভাঙা—এতেই এত, দুটো পা আস্ত থাকলে বুঝি রক্ষে ছিল না— সারা পৃথিবীটাই সে দৌড়ে বেড়াত হয়তো। একবার যাচ্ছে কমলাকান্তের কাছে, একবার মালতীর দাদার কাছে। হাতে এখনো সেই আমের শাখাটি ধরা, যেন ব্রহ্মাস্ত্র হাতে নিয়ে ঘুরে বেডাচ্ছে সে, তার চোখেমুখে এমনি সংহারকের চিহ্ন।

হরিশঙ্করের ইচ্ছে ছিল শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার, এবং শেষ পর্যন্ত কি হয় তা জানার কৌতূহলও তার ছিল। কিন্তু রাধা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছে। বাবার হাত ধরে টানতে লাগল সে, বাবার হাত চেপে ধরতে লাগল। বলল, চলো।

নীচু হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে হরিশঙ্কর বলল, ভয় কি রে। দূর বোকা। ওরা খেলা করছে।

—তা হোক। বাড়ি চলো। ছলছল দুটো চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রাধা বলল, বাড়ি যাব। মার কাছে যাব।

আদর করতে লাগল হরিশঙ্কর তার মেয়েকে। চালতে-গাছের পাতায় দোল লেগেছে চৈতালি হাওয়ার, পাতা পিছলে পিছলে রোদ এসে পড়ছে রাধার চোখে-মুখে, হরিশঙ্করের শরীর শিউরে উঠতে লাগল। তার মেয়ের মুখে আগুনের শিখা এসে পড়েছে বলে কেন-যেন মনে হতে লাগল তার। হরিশঙ্করের চোখও সজল হল বুঝি অকারণেই।

এ কি সত্যি অকারণেই ? কিন্তু সে কথা এখনও না।

হরিশঙ্কর রাধার হাত ধরে বলল, চানকে যাবে না ? মামার বাড়ি যাবে না ?

—না, না। রাধা সজোরে মাথা নাড়ল, বলল, মার কাছে যাব।

চানকে যাওয়ার কথা আর ওঠে না। নদীর চেহারাই এখন আলাদা। এ জল কখন নামবে তার ঠিক নেই, ভাটা আসবে কখন তারও স্থিরতা নেই কোনো।

ওদিকে অভিলাষ আর মালতীর দিকে একবার চেয়ে হরিশঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়াল, তাদের মুখের দিকেই বুঝি তাকাল, তাদের জীবনের ভবিষ্যতের দিকে নয়। তারপর বলল, তাই। আজ আর চানকে না। চলো, তোমার মায়ের কাছেই যাই।

এখান থেকে ফরাসগঞ্জ মাইল-তিনেক রাস্তা। গৌরহাটির ঘাট পিছনে ফেলে সোজা চলতে লাগল তারা উত্তর দিকে। আকাশে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ডান দিকের নদীর জল যেন ফুটছে টগবগ করে, বাঁয়ে অশ্বত্থে আর বটে চৈত্রের হাওয়া লেগেছে। এই প্রখর রোদে সেই গাছের নীচে প্রসন্ন শান্তির মত প্রশান্ত ভাবে শুয়ে আছে ছায়ার আলপনা।

কিন্তু শান্তি নেই হরিশঙ্করের মনে। তার মেয়ে যেমন তার মায়ের জন্তে ব্যাকুল হয়েছে, হরিশঙ্করের মনের মধ্যেও তার মায়ের জন্তে অশান্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠেছে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগের হরিশঙ্কর নিজেকে যেন দেখছে তার মেয়ের মধ্যে।



॥ দ্বিতীয় স্ফুলিঙ্গ ॥

ভাগীরথীর অনেক জল এবং সৌভাগ্যের অনেক সময় গড়িয়ে গিয়েছে এই জনপদের পাদদেশ ধৌত করে। অনেক কীর্তির সম্মানে যেমন এর মৃত্তিকা সুপ্রসন্ন, অনেক কীর্তির শ্মশানেও তেমনি এর মাটি অপ্রসন্ন হয়ে আছে।

গড়া আর ভাঙা, ভাঙা আর গড়া— সময়ের প্রবাহের সঙ্গে জীবনের এই জোয়ার-ভাটার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ক্ষুদ্র জনপদ— এই গৌরহাটি, এই গরিটি।

কত শতাব্দী আগে থেকে ভাগ্যান্বেষী বিদেশীর দল ভাগীরথীর জলধারা বেয়ে বেয়ে এগিয়ে এসে নোঙর করেছে তাদের নৌকো এর কিনারে, কে তার খোঁজ করতে গিয়েছে। কোনো প্রতিবাদও নয়, কোনো সম্মতিও নয়— নরম মাটির দেশের এই ক্ষুদ্র নদীতট নীরবে চেয়ে দেখেছে সেই বণিকদের গতিবিধি। আশ্রয় চেয়েছে তারা, আশ্রয় পেয়েছে।

ওলন্দাজ ফরাসি পোর্তুগিজ দিনেমার ইংরেজ— সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে তারা ভাগীরথীর কিনারে ঘাঁটি বেঁধেছে, ঘাটে-ঘাটে বেঁধেছে তাদের পালতোলা নৌকার বহর। লবঙ্গ জায়ফল জৈত্রি মরিচ লঙ্কা আদা কর্পূর চন্দনকাঠ নিয়ে তারা তাদের ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াখেলা আরম্ভ করেছে। কেউ জিতেছে কেউ হেরেছে। রত্নের বেচাকেনাও হয়েছে সেই সঙ্গে, নীলের চাষও চলেছে— কুঠি উঠেছে নদীর ধারে ধারে।

ওদিকে চুঁচুড়া থেকে, এদিকে কলকাতা থেকে কত শৌখিন বিদেশী নারী-পুরুষ এসে জমায়েত হয়েছে এখানে, তার কোনো হিসাব নেই। দিন কেটে গিয়েছে একে একে। তারপর বিদেশী বণিকের মানদণ্ড ক্রমশ নতুন মূর্তিতে নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে বদল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে— বিদেশীর ছোঁয়ায়-ছোঁয়ায় নবীন মানুষেরা নূতন রূপ নিয়েছে। গৌরহাটির সম্মুখের ঐ নদী ভরে গিয়েছে নৌকোয় নৌকোয়— উৎসবে চলেছে নবীন বাবুরা ফ্যান্সি নৌকোয় ফ্যাশনের পাল তুলে মাহেশের স্নানযাত্রায়— কত নাচগানে মত্ত হয়ে, বারাঙ্গনার সঙ্গে কতরকমের কৌতুক করতে করতে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে আসছে আর-পাঁচ জনের সঙ্গে এই গৌরহাটিও।

আধ শতাব্দী আগের কথাই হল। অনেক রকমের গৌরবের জন্যে গর্ব করতে পারে বটে গৌরহাটি, কিন্তু একটি ঘটনার জন্যে সে আজও মর্মাহত। অর্ধশত বৎসর অতীত হয়ে গেলেও সে লজ্জা আজও মুছে যায়নি তার মন থেকে।

পলাশি-যুদ্ধের প্রহসনের কথা মনে হলে আজও এর কিনারের ভাগীরথীর জল কেঁপে কেঁপে ওঠে। মুরশিদাবাদ-অভিমুখে সৈন্য পাঠানোর আগে মিরজাফরের সঙ্গে গোপনে সন্ধি করার জন্যে ক্লাইভ অপেক্ষা করেছিলেন এখানে। এবং সেই ঘৃণ্য সন্ধির ফলেই বণিক-ইংরেজ শাসক-ইংরেজ -রূপে এই দেশ শোষণের পরোয়ানা পেয়ে গেল। এবং তার পর ইংরেজ সেনাদের বসবাসের জন্যে বিরাট একটি দুর্গ রচনা করল এর মাটির উপরেই।

সে দুর্গের চিহ্ন আজ নেই। কিন্তু তার স্মৃতিটা পড়ে আছে। এই ১৮০৬ সালেও।

আরো অনেক স্মৃতি পড়ে আছে এখানে, অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। তবু বুঝি এ মাটির স্বাদ আলাদা। তাই ক্ষুদ্র এই জনপদটির উপর অধিকার ছাড়তে কেউ রাজি না। এর একাংশ তাই ফরাসির কবলে, একাংশ ইংরেজের। দুই বিদেশীয় জাতীয়-পতাকায় গৌরহাটির আকাশ রঙিন দেখায়।

আজ এ এলাকা অনেক শান্ত। কিন্তু এত শান্ত এ ছিল না। ফরাসিরা চন্দননগরে তাদের আস্তানা নিয়েছে, কিন্তু সেখানকার ফরাসি শাসক দুপ্লে আমোদ-প্রমোদের জন্যে একটি বিরাট বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন এখানে, ইতিহাসে যাঁদের নাম লেখা হয়ে গেছে তাঁরা এসে জমায়েত হতেন আর ফুর্তি করতেন এই সুরম্য উদ্যানে— আসতেন উইলিয়ম জোন্স, ফিলিপ ফ্রান্সিস, রবার্ট ক্লাইভ ; শ্রীরামপুর থেকে চুঁচুড়া থেকে বিদেশী অতিথি-অভ্যাগত নৌকোয় চেপে এর ঘাটে এসে নামতেন। নানা জাতের বিদেশীদের মস্ত আড্ডা জমত

এখানকার সেই বাগানবাড়িতে। কিন্তু প্রাসাদোপম সে উদ্যানবাটিকা আজ ফাটল-ধরা জীর্ণ প্রাচীরের মিছিল মাত্র।

কিন্তু অতি জীর্ণ হয়ে গেলেও ফরাসিদের নাট্যশালাটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে, সারিবদ্ধ অজস্র গাছ যেন পাহারা দিচ্ছে সেই নাচঘরটি। এখনো সুন্দরী ফরাসি-ললনাদের নৃত্যছন্দ ও কলকণ্ঠের কাকলি হয়তো বেজে চলেছে সেই প্রাচীরের জীর্ণ শরীরে। সান্ত্রীর মত দাঁড়িয়ে নর্তকীদের পায়ের মঞ্জীর-ধ্বনি শুনছে হয়তো এই গাছেরা। জীর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু অন্য-সব ভগ্নস্তূপের মত এ নাট্যশালাটি পরিত্যক্ত হয় নি এখনো। কালে-ভদ্রে হলেও এখনো এক-একদিন এর মঞ্চ কোমল পদের স্পর্শ পেয়ে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

এ এলাকার নাম তাই ফ্রেঞ্চ গার্ডেন, দেশী লোক নাম দিয়েছে ফরাসগঞ্জ।

জীর্ণ নাট্যশালা ডান দিকে রেখে ঘন গাছের জটলার মাঝখান দিয়ে আমরা যদি সোজা এগিয়ে যাই তাহলে সামনেই পাব ছোট একটি গির্জা। পোর্তুগিজেরা গড়েছিল এটি, উপাসনাও হত কোনো কালে, কিন্তু এখন এখানে বাদুড়ের আড্ডা জমেছে। গির্জার বাঁ দিকে মেহেদি-গাছের বেড়া-দেওয়া রাস্তা সোজা চলে গেছে।

এই রাস্তার পাশে একটি এক মহলা কোঠাবাড়ি। এখানে থাকে হরিশঙ্কর। সপরিবারে।

গৌরহাটি-শ্মশানে সেই মৃত্যুর মিছিলের পর আরও কত মৃত্যুর মহোৎসব ঘটে গিয়েছে, এবং ঘটছেও— গৌরহাটিতে এবং আশেপাশেও— কিন্তু, সেদিনের সে ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত হরিশঙ্করের মন থেকে মুছে গেল না। বছর কয়েক তো কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

রাধা এখন বড় হয়ে উঠেছে। তার জীবনে বসন্ত আসি-আসি করছে, কচি কিশলয়ে ঢাকা তার শরীরের শাখায় বসে কোকিলও বুঝি ডেকে উঠছে, কিন্তু সে কুহুস্বরে তার বুঝি কান নেই। তার মুখও বড় ম্লান।

গৌরহাটি-শ্মশানের স্মৃতি আজও তার সমস্ত চেতনাকে বুঝি আচ্ছন্ন করে আছে।

হয়তো এমন আচ্ছন্ন করে রাখত না, সে যদি তার বাবার কাছ থেকে পরিষ্কার করে জানতে পারত সেদিনের সেই ঘটনাটির কথা, তার প্রতিটি কেনর উত্তর; তাহলে মনও বুঝি পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠত। কিন্তু, হরিশঙ্কর সব কথা খুলে বলতে পারল না। সেই ঘটনার সঙ্গে, ঠিক সেই ঘটনার সঙ্গে অবশ্য নয়, অনুরূপ একটি ঘটনার সঙ্গে জটিলভাবে তার জীবন জড়িয়ে আছে।

কিন্তু, কী সেই ঘটনা ?

হরিশঙ্কর বুঝি নিজেকেই এ প্রশ্ন করে। এবং নিজের কৌতূহল চাপা দিয়ে নিজেকেই বলে, সে কথা এখন নয়।

কিন্তু কবে হবে সেই কথা ? যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে, এবং যে ঘটনার জন্যে হরিশঙ্কর বিন্দুমাত্র দায়ী নয়, সে ঘটনা এ ভাবে চাপা দিয়ে রাখার হেতুও অবশ্য বোঝে না হরিশঙ্কর নিজেও।

কেবল মনে হয় মায়ের কথা। মা কি এখনো বেঁচে আছেন ?

গৌরহাটির মাটির উপর দাঁড়িয়ে মিরজাফরের চক্রান্তের জন্যে গৌরহাটির সংকোচ যেমন অর্থহীন, হরিশঙ্করের এই সংকোচও তেমনি নিরর্থক। এর জন্যে দায়ী কে ?

খোঁড়া মনোহরের কথা মনে পড়ে কেবলই। সেই ঘটনার সময় মনোহর ভট্টাচার্য হয়তো সামান্য বালক মাত্র, তবুও তাকেই দায়ী বলে মনে হয় হরিশঙ্করের। মনে মনে বলে, ওই দোষী, ওরাই দায়ী। শ্মশানের ওই পেশাদার পুরোহিতেরাই।

জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার মত টানা-টানা দুটো চোখে রাধা তাকায় তার বাবার মুখের দিকে।

হরিশঙ্কর ঈষৎ থামে, বলে, তুই হয়েছিস অবিকল তোর ঠাকুরমার মতন দেখতে।

—কার মতন বললে বাবা ?

—আমার মায়ের মত, রে। আমার মা।

ব'লেই হরিশঙ্কর বারান্দা থেকে নেমে উঠোন পার হয়ে ওপাশের দালানে গিয়ে ওঠে, বলে, গেলে কোথায় রাধুর মা ?

লক্ষ্মীর পট সামনে নিয়ে হেমাঙ্গিনী পুজোয় বসেছিল, চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র পড়ছিল, ইশারায় বলল, এই যে।

হরিশঙ্কর বলল, রাধার বিয়ে দেব না। এ মেয়ে ঘরে থাক্। এ আমার জগদ্ধাত্রী।

স্বামীর কথার মানে বুঝতে না পেরে মন্ত্রই বুঝি ভুল হয়ে গেল, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পেল না হেমাঙ্গিনী।

ছোট বাড়ি। এ পাশে এক ছাতের নীচে সার-সার চারটি ঘর, ও পাশেও তাই। মাঝখানে লম্বা উঠোন। উঠোনের প্রায় মধ্যখানেই এক বিরাট

আমগাছ ডাল আর পাতা বিস্তার করে কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছেই পাটে-বাঁধা কুয়ো। কুয়ো থেকে জল তুলছে রাধা। শুকনো দড়ি বেঁকে এসে পড়েছে তার গায়ে। হরিশঙ্কর এ দৃশ্য দেখতে দেখতে একটু বুঝি শিউরেই উঠল।

সেদিন ভোলা ময়রা এসেছিল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কাছে, তার মুখে শোনা হরু ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। কলকাতার হাতিবাগানে রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি— সেখানকার ঘটনা।

রাজার বাড়ি রাজপ্রাসাদেরই তুল্য। সারি সারি স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথার উপর সুদৃশ্য ছাদ। ছাদ থেকে ঝুলছে ঝালরদার বাতিদান।

মস্ত ফরাসের উপর নামী পণ্ডিতবর্গকে নিয়ে মখমলে-ঢাকা তাকেয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে আছেন রাজা নবকৃষ্ণ। সঙ্গে তাঁর এয়ারেরা। হুঁকো-বরদার ফরশীর নল ধরে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে।

রাজার খেয়াল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল একটা কথা, কথাটা সামান্যই— 'বড়শি গিলেছে যেন চাঁদে'। এইটি শেষ ছত্ররূপে বসিয়ে একটু কাব্যকলা করা হোক, রাজা এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

সংস্কৃতের অনেক অনুস্বর-বিসর্গ দিয়ে অনেক ব্যাখ্যা করলেন পণ্ডিতেরা, কিন্তু, উঁহুঁ, রাজার পছন্দ হচ্ছে না সে ব্যাখ্যা।

কবিয়ালকে ডাকতে হবে হুকুম হল। কবিয়াল মানে আর কেউ না, হরু ঠাকুর— হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী।

গঙ্গাস্নান সেরে কাঁধে গামছা ফেলে হরেকৃষ্ণ তখন ফিরছেন। মাঝরাস্তায় তাঁকে ধরল পেয়াদা।

রাজসিক বৈঠকে এসে সিক্তবসনে দাঁড়াল হরু ঠাকুর, মনোযোগ দিয়ে শুনল রাজ-ইচ্ছা। ইচ্ছাপূরণে আর আপত্তি কি, ডান কাঁধ থেকে গামছা বাঁ কাঁধে ফেলে সুর ধরলেন তিনি—

এক দিন শ্রীহরি
মৃত্তিকা ভোজন করি
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে,
রানী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে
মৃত্তিকা বাহির করে—
বড়শি গিলেছে যেন চাঁদে।

তাকিয়া সরিয়ে ফরাস থেকে নেমে এলেন নবকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলেন। হাজার টাকা পারিতোষিক পেয়ে গেল হরু ঠাকুর।

হরিশঙ্কর চাক্ষুষ দেখেনি এ ঘটনা, স্বকর্ণে শোনেও নি; ঘটনাটা পুরনো না, মাত্র দিন-কতক আগের; কিন্তু এরই মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে চার ধারে।

রাধার জলতোলার দৃশ্য দেখে ঐ কথাটা মনে হল হরিশঙ্করের। মনে হল, আহা হা। বড়শি বিঁধেছে যেন চাঁদে। লম্বা শুকনো দড়িটা বেঁকে এসে পড়েছে রাধার গায়ের উপর, সত্যি, সেটা যেন মস্ত একটা বড়শির মতই।

নিজের মেয়েকে দেখে নিজেই বুঝি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে হরিশঙ্কর। কিন্তু তার মনের এ ভাব এবং চোখের এই দৃষ্টি বুঝি একটু ধারালো হয়েছে কিছুদিন হল—কয়েক বছর হল। এ মেয়েকে সে তো দেখছে মাত্র কিছুকাল থেকে নয়, এর জন্মকাল থেকে। নিজের সন্তানের উপর যতটা মমতা পিতার থাকার কথা, তা বরাবরই তার আছে। কিন্তু মনের মধ্যে চাপা আবেগ যেন বেড়েই চলেছে দিন-দিন। এর হেতু সে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে না। এর হেতু তার জানা। এর পিছনে একটা আতঙ্ক আছে, এবং একটা ভয়। এই জন্যে মেয়ের মুখের দিকে তাকানো মাত্র তার চোখের সামনে হঠাৎ জ্বলে ওঠে এক বীভৎস আগুন, সে আগুন সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়, সে আগুনের তাপ বুকের মধ্যেও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে তোলে।

এখন তার মনে হচ্ছে একটা বাঁকা বিষাক্ত বড়শি বুঝি এসে বিঁধেছে তার বুকের মধ্যে। মেয়ে বড হয়ে উঠছে দিন-দিন। হরিশঙ্করের মনের আতঙ্কও বৃহৎ হয়ে উঠেছে সেই অনুপাতে।

হরু ঠাকুরের কবিত্বের কথা ভেবে খুশিতে যার মন ভরে উঠেছিল একটু আগে, এখন তার মন একেবারে বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

স্বামীর মতিগতি লক্ষ্য করছে হেমাঙ্গিনী কিছুদিন থেকেই। এর মধ্যে কারণও জিজ্ঞাসা করেছে অনেকবার। কিন্তু খোলসা করে কি সব কথা বলা যায়, না বলতে আছে? এ-যে মারাত্মক কথা। হরিশঙ্কর যদি একবার চোখ বোজে, তাহলে এই হেমাঙ্গিনীকেও পডতে হবে ঐ একই বিপাকে। ঐ মনোহরেরা এসেই শোকার্ত হেমকে শোকের উচ্ছ্বাসের মুখে শপথ করিয়ে নিয়ে—

শিউরে উঠেছিল হরিশঙ্কর। অপরাধীর মত চোখে ও-বারান্দায়-বসা হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়েছিল।

বাপের টান মেয়ের উপরই একটু বেশি হয়ে থাকে ব'লে একটা কথার চলন আছে। কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু সে টানের মাত্রা যেন এখন বাড়াবাড়ি রকমেরই ঠেকছে। তাই ব'লে হরিশঙ্কর মানতে রাজি না যে, তার ছেলেদের উপর টান তার কম। কম নয় বটে, কিন্তু তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা তার নেই— তারা পুরুষ। তাদের জীবন তাদের নিজের হাতে বাঁধা।

কিন্তু রাধার কথা যে আলাদা। সে ঘাটেরও না, সে ঘরেরও না। সে যে সামান্য একটি মেয়ে।

হরিশঙ্কর যেন মহা ভাবনায় পড়েছে।

শিবশঙ্করের একমাত্র বংশধর সে। ভটচাজ বামুনও না, কুলীন বামুনও না— গুরুগিরিও চলে না, পুরুতগিরিও না, করতে হয়েছে তাই মুহুরিগিরি। কলমবাজিতে হাত পাকিয়ে তার পর কাজ নিয়েছিলেন ইংরেজদের হাসীল দপ্তরখানায়। এখানে শুল্ক আদায় হয়েছে অনেক। সেই সঙ্গে নিজের জন্যে শুল্কও কম কামাই হয় নি। এর দৌলতে জোত-জমি যা তিনি রেখে গেছেন তার পরিমাণ সামান্য না। হরিশঙ্করের দুইজন বংশধরের পক্ষে তা যথেষ্ট। রাধাকে বংশধর ধরা হচ্ছে না, সে এই বংশের মেয়ে হলেও এ বংশে তার কোনো দাবি নেই। মেয়ের বিয়ে দেব না বললেই তো হল না, সে একটা কথার কথা, সেটাকে বলা চলে মনের একটা অলস ইচ্ছে মাত্র। নতুন যে-বংশে তাকে যেতে হবে সেই বংশেও তার কোনো দাবি আছে কি না, সেও একটা প্রশ্ন বটে, তার গর্ভে যদি কোনো ব্যাটাছেলে জন্মে তবে তার দৌলতে স্বামীর বিষয়-আশয় ভোগ হতে পারে, নতুবা— নতুবা আর কী? সব সংসারে যা ঘটছে তাই ঘটবে।

যতই এসব হরিশঙ্কর ভাবে ততই তার ইচ্ছে হয় সোনার প্রতিমার মত তার এই মেয়েকে জলাঞ্জলি সে দেবে না। কিন্তু এই ইচ্ছেকে কাজে লাগানো যাবে কি না, সে কথা ভেবে অশান্তি বাড়াতে ইচ্ছে হয় না। সে প্রশ্ন নিয়ে নিজেকে বিব্রত করতে ইচ্ছে নেই তার।

টুংটুং-ঝুমঝুম ঝুমঝুম-টুংটুং— ঐ বেজে চলেছে আওয়াজ। ঐ চলেছে মনোহর ভট্টাচার্য। গৌরহাটির ঘাটে গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করে সূর্যবন্দনা করে কোশাকুশি ও ঘণ্টা হাতে নিয়ে শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করতে করতে চলেছে মনোহর। এ কাজ তার প্রত্যহের। গরিটি আর ফরাসগঞ্জ থেকে নোনাদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত তার এলাকা। উপার্জনও ভালোই।

ওই আওয়াজ শুনেই হরিশঙ্কর একটু বিচলিত হয়ে উঠল ব'লে মনে হল, একটু বিব্রতও বোধ করল হয়তো-বা।

ঝুমঝুম-টুংটুং টুংটুং-ঝুমঝুম শব্দটা তার দরজার সামনে এসে আচমকা থেমে যাবে বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এখনি বিস্তর শাস্ত্রবাক্য শুনতে হবে এই ভট্টাচার্যের কাছে— কে সবচেয়ে বড় দাতা, গত দুর্গোৎসবে কত টাকা ব্যয় ক'রে কে কতটা পুণ্যসঞ্চয় করেছেন, ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দক্ষিণা দিতে কার্পণ্য ক'রে কোন্ কঞ্জুস কত বড় পাপের ভাগী হয়েছেন, তার দীর্ঘ তালিকা বুঝি দাখিল করবে এখনি। কিন্তু না, হরিশঙ্করকে একটু বিস্মিত ক'রে দিয়েই ওই শব্দটা ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল।

পুজার ফুল বিলি করতে করতে কোশাকুশিতে আর ঘণ্টায় নানা রকমের শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে গেল মনোহর।

পুজা শেষ হতে অনেকটা সময় লাগে হেমাঙ্গিনীর। স্বামীর উপরে যত, ঠাকুর-দেবতার উপরে তার ভক্তিও ততই। কোথায় কখন কোন্ ত্রুটি ঘটে যায় সেজন্য হেমাঙ্গিনী সর্বদাই সন্ত্রস্ত।

পুজা সাঙ্গ করে ধীরে ধীরে উঠে এসে হরিশঙ্করের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিলে। মেয়ের বিয়ের কথা কি-যেন বললে।

কোমর থেকে কাপড়ের গিঁট খুলে গায়ের উপর কাপড় বিছাতে বিছাতে হরিশঙ্কর বলল, শোনো। একটা কথা রাখতে হবে।

—কি কথা? সোজাসুজি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়াল হেমাঙ্গিনী। কঠিন হয়ে কঠোর হয়ে নির্মম হয়ে যেন পাথরের মূর্তির মত শক্ত হয়ে দাঁড়াল হরিশঙ্কর, বলল, কথা দেবে বলো।

আবার জিজ্ঞাসা করল হেমাঙ্গিনী, কি কথা?

কথাটা মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না, তবুও হরিশঙ্কর এই প্রকাশ্য দিনের আলোতে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, কথা দাও, তুমি সতী হবে না।

ছেলেরা বুঝি ঘরে নেই, মেয়ে বুঝি জল তুলে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে। চারদিকে তাকাল হেমাঙ্গিনী। এমন সংঘাতিক কথার কি উত্তর দেওয়া যায় বুঝে উঠতে পারল না সে। হঠাৎ এমন কথা বলেই-বা কেন তার স্বামী! এতদিন কেটে গেল, তিনটি ছেলে-মেয়ে হয়ে গেল, তারা বড় হয়ে উঠল, মেয়ের বিয়ের বয়েস এসে গেল, এত দিন বাদে হঠাৎ তার স্বামীর মুখ থেকে এমন অসম্ভব কথা বেরিয়ে পড়ল কি করে ভেবে আকুল হয়ে যেতে লাগল হেম।

স্বামীর মনে কোনো বিষ ঢুকে গেল নাকি? কোনো পাপ? দুই চোখ সজল হয়ে উঠল তার, বলল, এ কী কথা বলে বসলে?

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল হরিশঙ্কর।

হরিশঙ্করের মা যা করেছেন হেমাঙ্গিনীও তেমনি কিছু করে বসবে এ-আতঙ্ক তার নেই আদপেই, কিন্তু সে কথা সে বুঝিয়ে বলতে পারল না, কেবল বলল, সতী হোয়ো না!

ফুঁপিয়ে উঠল হেমাঙ্গিনী, তবে কি হব, বলো।

—বেঁচে থাকবে।

—সে কথা উঠল কিসে? এ অলুক্ষুনে কথা কেন?

কেন? এ কেনর কোনো উত্তর নেই।

অনেকক্ষণ নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকার পর বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে হরিশঙ্কর উঠোনে আমগাছের ছায়ায় পায়চারি করতে লাগল।

নিরিবিলি নিশ্চিন্ত আর নির্ঝঞ্ঝাট বাড়িটায় হঠাৎ অশান্তি যেন নেমে এসেছে গুমট হয়ে।

হেমাঙ্গিনী কুয়োতলায় নেমে এল। সেখান থেকেই বলল, কি হয়েছে শিগগির বলো।

কিন্তু এসব কথা এত শিগগির বলা যায় কি ক'রে? কথাটা বলতে অনেক ভাবতে হবে, অনেক সময় নিতে হবে, অনেক বিবেচনা করতে হবে— তবে তো বলা যাবে পরিষ্কার করে।

দু পা এগিয়ে এল হরিশঙ্কর, বলল, আমি ব্যাটাছেলে। তবু বলি— ব্যাটা-ছেলেরা লুচ্চো, তারা লম্পট।

—ছি ছি ছি, নিজেদের অমন ক'রে গাল দিয়ো না।

স্বামীর হাত চেপে ধরল হেমাঙ্গিনী।

কিছুক্ষণ আগে যে রাস্তা দিয়ে মনোহর ভট্টাচার্য ঘণ্টার টুংটুং আওয়াজ বাজিয়ে চলে গেছে, সেই রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। এ রকম শব্দ হামেশাই শোনা যায়। এ রাস্তা অনেকটা সদররাস্তার মতনই। এই রাস্তা দিয়ে ফরাসি ইংরেজ কিংবা পোর্তুগিজ ফিরিঙ্গিরা হরদমই যাতায়াত করে থাকে। কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো পালকি চেপে।

কিন্তু আজকের শব্দটা একটু বুঝি অস্বাভাবিক ভাবেই বাজল। হেমাঙ্গিনী রাস্তার দরজার দিকে তাকাতেই দেখল কে যেন ছুটে ঢুকে পড়ল উঠোনে।

ব্যস্ত হয়ে, হাত থেকে কুয়োর দড়ি ফেলে, হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, কি রে কদম ?

গাঙ্গুলিদের মেয়ে কাদম্বিনী। খিলখিল করে হেসে উঠল সে, বলল, পিছু নিয়েছিল ঐ ঘোড়সওয়ার।

—কে ও ?

—কে জানে ! একটা ফিরিঙ্গি। সব বানরের মুখই তো এক রকমের। ফরাসি না ইংরেজ, না কে, কে জানে।

হেমাঙ্গিনী বলল, আশ্চর্য সাহস তোমার কদম্ব !

হরিশঙ্কর এগিয়ে এল। সদর-দরজার দিকে তাকাল, খোলা দরজা দিয়ে ঘোড়াটার লম্বা মুখটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

হরিশঙ্কর এগিয়ে যাচ্ছিল, হেমাঙ্গিনী বাধা দেবার জন্তে দু পা যেতেই দেখল রওনা হয়ে গেছে ফিরিঙ্গিটা। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ বেজে উঠল।

রাধা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, জিজ্ঞাসা করল, কখন এলে কদম-মাসি ?

—এই তো রে, এই।

—একা বুঝি ?

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কাদম্বিনী, বলল, একা কেন। তোমার মেসো এসেছিল সঙ্গে। এগিয়ে দিয়ে গেল।

বারান্দা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রাধা, কদম্বের কাছে এসে বলল, মেসো এসেছেন বুঝি ? তাই বুঝি তোমার এত সাজের ঘটা ? কবে এসেছেন ? কাল ?

মুচকি হেসে হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকাল কদম। একটু চুপ করে থেকে বলল, তাদের কত কাজ। আসা কি অতই সোজা ?

পাৎলা ফিনফিনে গঙ্গাজলী শাড়ি প'রে, কপালের মাঝখানে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা ক'রে মনোমোহিনীর রূপে এসেছে কদম্ব। আজ বুঝি সে শুধু কদম্ব নয়— রসকদম্ব। দেশী মানুষের কথা আলাদা, বিদেশীরাও ওই মোহিনী মূর্তি দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। তাই বুঝি ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছিল ওই দরজার সামনে।

পাৎলা কাপড় ভেদ করে শরীরের আভা বেরিয়ে পড়ছে, সে আভা কালো হলে হবে কি, তবু তো সে আভা আভাই। ঐ একটি বস্ত্রই শরীরের একমাত্র আবরণ, কোমর থেকে একটি প্রান্ত পাক খেয়ে উঠে জড়িয়ে ধরেছে সারা

অঙ্গটি। কালো মেয়ের শরীরে গঙ্গাজলী অঙ্গবাসটি অপরূপ সুবাস সৃষ্টি করছে যেন। এ সৌরভে ভ্রমরেরা বিচলিত হবে— এ আর নতুন কি।

হেমাঙ্গিনী বলল, বড সাহস তোমার কদম্ব। এই ভরদুপুর, একা-একা এতটা পথ না আসাই ভালো। চারদিকে ফিরিঙ্গিদের আড্ডা।

আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কাদম্বিনী, বিদ্যুতের চমকের মত সে হাসি, আমগাছের ঝুলন্ত একটা শাখা ধরে সামান্য একটু দোল খাওয়ার মত করে বলল, আমাকেও বুঝি ভেবেছ ও-পাড়ার নিরুদির মত। তাই না?

হরিশঙ্কর উঠোন থেকে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেছে। রাধা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

রাধা আবার জিজ্ঞাসা করল, অত সেজেছ কেন কদম-মাসি? সত্যি বুঝি মেসো এসেছে? অ্যাঁ, মা, তাই নাকি?

কৃত্রিম ধমক দিলেন হেমাঙ্গিনী তাঁর মেয়েকে, বললেন, চুপ পোড়ারমুখী! কোথায় তোর মেসো? তাঁর খবরই নেই। তিনি-চার বছর আগে সেই একবার এসেছিলেন একটা রাত্তিরের জন্যে। চার বছর তো হলই, তাই না কদম?

গাছের ডালটা ছেড়ে দিয়ে কুয়োতলার দিকে এগিয়ে এল কাদম্বিনী, বলল, কত কাজ তাঁদের, ঘোড়ায় চড়ে আসেন ঘোড়ায় চড়ে চলে যান। ক'বছর হল তার হিসেব করার সময় কই আমাদের। আমাদের বুঝি কাজ নেই কোনো?

কাদম্বিনীর একটা হাত ধরে রাধা আব্দার করার ভঙ্গিতে বলল, তবে এত সেজেছ কেন আজ? বলোই-না।

কাদম্বিনী একটু ঝুঁকে রাধাকে বুঝি সোহাগ করল, বলল, আজ আমার বিয়ের দিন।

একটু হেসে বলল, সাত বছর আগে এই দিনে আমার বিয়ে হয়েছিল।

কাদম্বিনী আর দাঁড়াল না। যেমন ভাবে ছুটে এসেছিল, আবার ঠিক সেই ভাবেই ছুটে চলে গেল।

তাকে বাধা দেবার জন্যে বা নিষেধ করার জন্যে এতটুকু সময় পেলেন না হেমাঙ্গিনী। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আশ্চর্য সাহস! এতটুকু ভয়-ভীত নেই।

নবীন আর মুরলী ফিরল পাঠশালা থেকে। হেমাঙ্গিনী এগিয়ে গিয়ে

তাদের হাত থেকে পুঁথি নিয়ে বললেন, দৌড়ে যা তো রে একবার তোদের গাঙ্গুলিদাদুর বাড়ি। কদম-মাসি পৌঁছল কিনা দেখে আয়।

দুই ছেলে দৌড় দিল।

আহা বেচারী! সাত বছর হল বিয়ে হয়েছে, বিয়ের রাত্রে একবার দেখা, তার পর মাত্র একবার এসেছিল। মেয়েটা তবু যে এমন হাসতে পারে, সেই ঢের।

নিজের স্বামীর কথা মনে হল হেমাঙ্গিনীর। যে কথা চাপা পড়ে গেল, সেই কথাটা ভালো করে জেনে নিতে হবে নিশ্চয়ই।

হেমাঙ্গিনী রাধার হাত ধরে ঘরের মধ্যে গেল।

অনেক দূর থেকে একটা আর্ত শব্দ যেন এসে বাজছে কানে। কদম্ব কোনো বিপদে পড়ে চিৎকার করছে না তো? হেমাঙ্গিনী বাধার হাত ছেড়ে দিয়ে কান পেতে একটু দাঁড়াল। না, ওটা পাখির ডাক। তৃষ্ণার্ত চাতক গলা ফাটিয়ে ডাকছে— ফটিক জল।

না, এ মেয়ের কোনো বিপদ ঘটবে না। এত যাব সাহস তার কোনো ভয় নেই। নিজের বিপদ স্বেচ্ছায় যদি নিজে তৈরি ক'রে না নেয় তাহলে বিপদে ফেলা শক্ত।

দিন কেটে যায় একে-একে। সকাল নেই দুপুর নেই সন্ধ্যা নেই— যখন-তখন এসে উপস্থিত হয় কাদম্বিনী। নিজের জীবনেব কোনো কথা সে বলে না, কোনো আক্ষেপের কথাও না, কোনো আশঙ্কার কথাও না। শুধু বলে তার বাবার কথা। বলে, বাবা চোখ বুজলেই মহাবিপদ। তখন কি গতি হবে তাই ভাবি। শুধু আমার একার না, আমার আর পিসিমার।

ভাববারই কথা। ননদের চালচলন এতটুকু সহ্য কবতে পারছে না তার ভ্রাতৃবধূরা। চাল্‌চলনের মধ্যে বিসদৃশ আর আছে কি, একটু ছিমছাম থাকা এবং একটু হাসিখুশি ভাব ছাড়া?

হরিশঙ্করের কোনো কাজ নেই। দিন কি করে কাটবে সে চিন্তাও নেই। কিন্তু দিন বুঝি কাটতে চায় না।

কাঁধের উপর চাদর ফেলে হুঁকো হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। জমিদার বলতে যা বোঝায় তা সে নয়, কিন্তু জমি আছে অনেকই— আবাদী জমি ধানের জমি। মোট দুই-তিন শ বিঘা। তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমিতে

নীলের চাষ আরম্ভ হয়েছে কয়েক বছর হল। বরাত ভালো বলতে হবে, তার বাড়িঘর পড়েছে এই ফরাসি এলাকায়, কিন্তু জমিজমা সবই কোম্পানির এলাকায়। সুতরাং কর্নোয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা তার জমির উপর খাটছে। এতে সুবিধে হয়েছে একটু বেশি। আগে যে-জমির খাজনা আদায় করে তার একটা অংশ দিয়ে দিতে হত কোম্পানিকে, এখন সেই জমির পুরো মালিকানাস্বত্ব লাভ হয়েছে, আর পাকাপাকি ভাবে খাজনার একটা অঙ্কও সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এখন জমিতে ফসল বেশি ফলাতে পারলে বেশি লাভ। কোম্পানি তার বাঁধা বখরার বেশি আর দাবি করবে না।

ফরাসগঞ্জের সীমানা পার হতে বেশি সময় নেয় না। কতটাই-বা রাস্তা। কয়েক কদম মাত্র। হরিশঙ্কর হাঁটতে হাঁটতে আর হুঁকোয় মাঝে-মাঝে টান দিতে দিতে এসে পৌঁছে গেল গরিটিতে।

কেলী সাহেবের কুঠি তখন লোকজনে সরগরম। লবণের ব্যবসা ও তেজারতি কারবার নিয়ে পোর্তুগিজ সায়েব খুব ব্যস্ত। কুঠির সামনে তিনটে পালকি রাখা আছে। কারা বুঝি এসেছে কাজকারবার নিয়ে। ওড়িয়া বেহারারা আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছে, কেউ-কেউ বসে পড়েছে। ফরাসডাঙা থেকে ওরা উঠে এসেছে এখানে, কেলীর বাপ ছিল মস্ত কারবারী লোক। বাপের কারবার চালু রেখেছে এই কেলী।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে কেলীকে। এক পাল কালো কালো মুখের মাঝখানে একটা সাদা মুখ, নীল আকাশের চাঁদের মত, না, নীলজলে শ্বেতপদ্মের মত— ঠিক কিসের মত মনে হচ্ছে অত হিসেব করতে পারল না হরিশঙ্কর। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে হুঁকোয় টান দিতে লাগল। কিন্তু ধোঁয়া আর বের হয় না, আগুন তবে নিবে গেছে।

কিন্তু মাথার উপরে আগুন তখন বেশ গরম। সূর্য তখন ঠিক মাঝ-আকাশে।

দশশালা বন্দোবস্তটা করে দিয়ে কর্নোয়ালিশ সায়েব সুখ্যাতি পাচ্ছে অনেকের— তার মধ্যে হরিশঙ্করেরও। তার জ্যাঠার ছেলে ভবানীশঙ্কর শান্তিপুরে তাঁতের ব্যবসা ক'রে বেজায় ধনী হয়ে উঠেছে, নবাবী আমল চলে গেছে সেই কবে— আধ শতাব্দী তো হল— এখন নাকি তার নবাবী বেড়েছে। হরিশঙ্কর তার পৈতৃক জমির মালিক হতে পেরে একটু বুঝি খুশিই। এবার সে যদি নিজের অবস্থাটা একটু মজবুত করে নিতে পারে তবে ভবানীশঙ্করের সমান হতে পারবে— এতেই একটু বাড়তি আনন্দবোধ করছে সে।

বেলা এখন কত? সায়েব-লোকরা ঘড়ি নিয়ে চলা-ফেরা করছে, একটা ঘড়ি কিনতে পারলে মন্দ হয় না।

কেলী সায়েবের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ক'টা যেন বাজল। বারোটাই হবে। বেশ আছে এই সায়েব। কোন্ তেরো নদীর পার থেকে এসে দিব্যি ব্যবসা আরম্ভ করেছে। বাপের যোগ্য পুত্রই বটে।

একটি পুত্র তো এই, কিন্তু আর-একটি ছেলে— সে হয়েছে আবার অন্য রকম। হাতের সব আঙুল কি আর সমান হয়? কেলী হল কুঠিয়াল, আর তার ভ্রাতা হল কবিয়াল।

ছোট রাস্তা। দু পাশে অগুন্তি গাছের ভিড়। রাস্তার ওপাশে নীচু প্রাচীরে-ঘেরা পুরনো একটা বাগানবাড়ি। তার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কুর্তি আর টুপি পরা এক ফিরিঙ্গি।

হরিশঙ্করের বন্ধু লোক। হাতের হুঁকোটা অনেকটা লাঠির মত ক'রে ঝুলিয়ে ধরে হরিশঙ্কর তার কাছে গিয়ে হেসে বলল, কি সায়েব, কুর্তি-টুপি নাকি ছেড়েছ?

হেসে উঠল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি, বলল, রোজ ঐ এক কথা কেন। সেদিনও ভোলার সামনে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করছিলে।

হরিশঙ্কর বটগাছের গুঁড়িটার উপর বসল, বলল, ঠাকুর সিংকে গাল দিয়েছিলে। কথাটা মনে পড়লেই তাই ঐ কথাটা জিজ্ঞেস করতে সাধ হয়।

অ্যাণ্টনি বলল, এখানে কেন? এস, ভিতরে এস, অন্দরে এস। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করণে ইচ্ছা নাই?

পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে এই পোতুর্গিজ ফিরিঙ্গি। বাংলাটা পরিষ্কার, কিন্তু উচ্চারণের মধ্যে একটু যেন গলদ আছে, কিন্তু বলার ভঙ্গি দেখলে সেটা গলদ বলে মনে হয় না। গলদ তো মনে হয়ই না, বরঞ্চ কথা শুনতে মজাই লাগে।

হরিশঙ্কর বলল, দেখা করার সাধ নাই সায়েব। কিন্তু তাঁর দুয়ারে গিয়ে একটু দাঁড়াতে হবেই। একটু আগুন চাই।

হাসতে লাগল অ্যাণ্টনি, বলল, আমার ব্রাহ্মণীর আগুনে বড় ভয়। আগুন দেখলেই পালিয়ে আসে।

হাসতে লাগল দু জন একসঙ্গে। অ্যাণ্টনির এ কথাটার অর্থ আছে। তার ব্রাহ্মণী তার ব্রাহ্মণের মরণের পর তার চিতার আগুন দেখে পালিয়ে এসেছে।

অ্যাণ্টনি সেই জানা কথাটাই এখন একটু রঙ্গ ক'রে জানাল। হরিশঙ্করও বুঝল সায়েবের এ তামাশা। তাই সে হাসতেই লাগল।

হরিশঙ্কর একটু থেমে বলল, কিন্তু সায়েব, তোমার নিশ্চয় আগুনে কোনো ভয় নেই।

মাথার টুপিটা নামিয়ে হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিল অ্যাণ্টনি সায়েব, বলল, একটুও নেই— আমি পতঙ্গ আগুন দেখে ঝম্প দিয়েছি।

উঠে দাঁড়াল হরিশঙ্কর, বলল, বেশ আছ সায়েব।

—বেশ আছি। ভালোই আছি—

এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালির বেশে
আনন্দে আছি।
আমি পতঙ্গ আগুন দেখে
ঝম্প দিয়েছি।

সুর ক'রে হাসতে হাসতে বলতে লাগল অ্যাণ্টনি।

—কিসের আগুন হে সায়েব, কিসের আগুন? অ্যাণ্টনির কাছে সরে এসে যেন জানে না ব'লে জানার আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল হরিশঙ্কর।

যেন কানে কানে ফিসফিস ক'রে একটা গোপন কথা জানাল অ্যাণ্টনি, বলল, দেখ নি দেখ নি?

কিন্তু সেও জানে, সকলেই জানে, নিরুপমার রূপে বিদেশী বণিকের এই বংশধরটি আত্মহারা হয়েই ছিল আগে থেকে। তার পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যুকে উপলক্ষ ক'রে তাঁর মাগু এসে বিদেশীর কাছে আত্মসমর্পণ করল।

অথচ অ্যাণ্টনি সে কথা মানতে রাজি না, মাথা নাড়তে থাকে, বলে, বলো কি হরিবাবু? একটা মিথ্যা কথা রটনা হয়েছে তবে। আত্মসমর্পণের কথা যদি বল, তাহলে আত্মসমর্পণ করেছি আমিই।

ও কথা নিয়ে কোন্দল করে লাভ নেই। এ কথার মীমাংসা হবে না কখনো। হরিশঙ্কর তার হাতের হুঁকোটা তুলে ধরে কলকেয় ফুঁ দিল, অমনি ছাই উড়ে গেল চার ধারে।

অ্যাণ্টনি বলল, আগুন চাই? এস, অন্দরে এস।

পোড়ো বাগানবাড়িতে আস্তানা নিয়েছে ফরাসডাঙার মেয়ে নিরুপমা এবং তার নতুন স্বামী। গাঁয়ের মেয়ের এই কেলেঙ্কারি সহ্য করতে পারে নি সেখানকার মানুষরা, সেখানকার মানুষদেরও সইতে পারে নি এই নতুন

দম্পতি। তাই, তাদের নতুন জীবন নোঙর করার জন্যে তারা এসেছে এই নতুন বন্দরে— এই গরিটিতে।

এখানে তারা নিরাপদে আছে, নিরিবিলিতেও। কাছে-ভিতে কোনো বসতি নেই, চার দিক বন দিয়ে ঘেরা। আর, কাছেই, রাস্তার ওপাশেই তার প্রতিপত্তিশালী ভ্রাতার আস্তানা। কোনো লোক এসে টিপ্পনী কেটে, গঞ্জনা দিয়ে, বিদ্রূপ করে, কোনো উৎপাত করতে পারবে না এখানে। এটা তাদের একটি নিভৃত নিকেতন, এটা তাদের একটা দুর্গ।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বলল, ময়রা ভোলার চিন্তামণি এ আমার নয়, এ আমার আসল চিন্তামণি।

—সে আবার কি কথা হে সায়েব।

—কথার মত কথা। খাঁটি কথা। ফিরিঙ্গির মুখে শুনলে একটু জবরজঙ্গিই শোনায় বটে, কিন্তু এ আমার মেয়েমানুষ নয়।

থমকে দাঁড়িয়ে হরিশঙ্কর বলল, তবে কি এ?

—এ আমার মনের মানুষ।

অনেক ভাষা শিখে গিয়েছে তো সায়েবটা, আশ্চর্যই লাগে হরিশঙ্করের। নিজের দেশের ভাষা এমন ক'রে গুছিয়ে বুঝি বলতে পারবে না হরিশঙ্করও। তার মনের মধ্যেও তো কত সময় কত কথা তোলপাড় করে, কিন্তু সেই কথা সে অনেক সময় পরিষ্কার করে ব'লে বোঝাতে পারে না। তার মেয়ে রাধাকে নিয়ে তার মনের মধ্যে কত আশঙ্কা আর উদ্বেগ জমা হয়েছে, সেই কথাগুলো আজ পর্যন্ত সে ভালো ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারেনি হেমাঙ্গিনীর কাছেও। অ্যান্টনির সঙ্গে কথা ব'লে সে খুশি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনের উদ্বেগও যে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে— এ কথাটিও খুলে বলার ভাষা তার নেই, সাধ্য তার নেই।

নিরুপমার অদৃষ্টকে সে ধিক্কার দিচ্ছে না। ধিক্কার দেওয়া দূরের কথা, তার জীবনে যে এ রকমের— স্বামী নাহয় না বলল— একটি সহায় ও সঙ্গী জুটেছে, এ জন্যে নিরূপমাকে ভাগ্যবতী বলেই মনে করছে সে। কিন্তু তার মেয়ে রাধাও অনুরূপ অবস্থায় পড়ে এই ধরণের ভাগ্য যদি লাভ করে তাহলে রাধাকে ভাগ্যবতী বলে মনে করা দুরূহ। আর আর আর— গৌরহাটি-শ্মশানের সেই মালতী আর সেই অভিলাষ? তাদের কথাও মনে পড়ে গেল হরিশঙ্করের।

কিন্তু থাক্ সে কথা। অন্য কথা ব'লে মনকে অন্যপথে চালিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করল হরিশঙ্কর, বলল, সায়েব, আমাদের দেশের ভাষা তো বেশ শিখে নিয়েছ। তোমাদের ভাষা আমাকে শেখাতে পার?

—পারতাম। যদি দেখা হত আরো দু শো বছর আগে। তখন দলে ভারি ছিলাম আমরা, কিন্তু এখন আমাদের জাত তো এখান থেকে প্রায় সরে গেছে। এখন এসেছে অন্যেরা। তারা তাদের ভাষা শেখাবে।

—কাদের কথা বলছ সায়েব?

—ইংরাজ। শ্রীরামপুরে ঘাঁটি নিয়েছে মিশনারিরা। ইস্কুল বসাবে, ইংরাজি শেখাবে। ভিন্‌দেশী ভাষা শিখে নেবে। আমি পোর্তুগিজ হয়েছি বাঙালি, তোমরা বাঙালিরা হবে ইংরাজ।

হেসে উঠল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। হেসে উঠল হরিশঙ্কর।

অ্যান্টনি বলল, হাসি না, তামাশা না। পলাশির লড়াইয়ের কথা তো জান সব। ওরা যেমন-তেমন জাত না। ওরা এখানে শুধু ব্যবসা করতে আসেনি, তার প্রমাণ তো দিয়েছে।

—হ্যাঁ। তা দিয়েছে।

ওরা ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে চলে এল। ভিতরটা মস্ত ফাঁকা। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই বাগানবাড়িতে অনেক সমারোহ হয়েছে এককালে, আজ সে সমারোহ অবসান। কিন্তু নতুন আগ্রহ নিয়ে এখন এখানে বাস করতে এসেছে দুটি প্রাণী। এই বিরাট এলাকাটি তাদের আগ্রহের স্থান সংকুলান যেন পরিপূর্ণভাবে করতে পারছে না।

আগে যে জায়গায় ছিল বাগান; এখন সেখানে বন। গাছের চেয়ে আগাছাই বেশি। প্রাচীরের গায়ে বসানো দরজার গোড়া থেকে দু-পাশের লম্বা ঘাস আর আগাছাকে দু ভাগে ভাগ ক'রে একটা পায়ে-হাঁটা পথ গিয়ে মিশেছে দূরের ঐ সিঁড়ির গায়ে।

বাগানবাড়ির মস্ত চৌহদ্দির মাঝখানে এক-মহলা একটি বড় কোঠা। এর এক অংশ ভগ্নদশা নিয়ে দাঁড়িয়ে, অন্য অংশটা একটু মজবুত। এই অংশেই অ্যান্টনির আস্তানা। এই অংশের বারান্দায় একটি ছোট তাঁত বসানো, দরজার লম্বা চিক ঝুলছে, জানলাগুলিতেও চিক। ঘরের মধ্যে পালঙ্ক আছে, আগে এর ওয়ারিশ কে ছিল বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন এর স্বত্ব ভোগ করছে অ্যান্টনি-দম্পতি।

ঝিরিঙ্গির ব্রাহ্মণী নিরুপমা তাঁতে বসে টুকুটুক করে মাকু চালাচ্ছে। পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে দুটি প্রাণীকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল নিরুপমা। একটিকে তো ঘাসের আর গাছগাছড়ার ফাঁক দিয়ে হলেও চেনা যাচ্ছে, কিন্তু আর-একজন কে?

ওঃ, হরিদাদা। ঝিরিঙ্গির সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে এই হরিদাদা। প্রায়ই আসছে। গত সপ্তাহে ময়রা ভোলা এসে গঙ্গার ওপারের কলকাতা-শহরের হালচালের গল্পের ঝুড়ি খুলে বসেছিল, এই হরিদাদা তখনো এসে বসেছিল সেই আসরে।

হরিশঙ্কর সিঁড়ির গায়ে এসে পৌঁছেই বলল, আবার এলাম বেড়াতে। একা-একা ভালো লাগে না।

নিরুপমা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বসতে বলল। বলল, ফরাসগঞ্জের খবর শুনি। কি খবর-সব ওদিকে?

কথা পেয়ে গেল বুঝি হরিশঙ্কর, বলল, খবর ভারি বিশ্রী। ফিরিঙ্গিরা বড় জ্বালাচ্ছে।

কথাটা বলেই অ্যাণ্টনির দিকে তাকাল হরিশঙ্কর। অ্যাণ্টনি হাসল, কোনো কথা বলল না।

কিন্তু কথা বলল নিরুপমা, বলল, ফিরিঙ্গিদের ঐ চরিত্র। জ্বালানোটাই তাদের কাজ। আমার ফিরিঙ্গিই কি আমাকে জ্বালাচ্ছে কম? কি, কথা বলছ না কেন সায়েব?

মাথা থেকে টুপি মেঝের উপর নামিয়ে রেখে অ্যাণ্টনি একটি জলচৌকির উপর বসল, বলল, আগুন আনো।

—সে কি কথা? যেন চমকে উঠল নিরুপমা, চোখ বড় বড় ক'রে বলল, অগ্নিসাক্ষী ক'রে কোনো শপথ করবে নাকি?

—উহুঁ। এই বাবু তামাকু খাবেন।

নিরুপমা হরিশঙ্করের হাতের হুঁকোর দিকে তাকাল।

একটু বাদেই মৌতাত বুঝি জমে উঠল। অ্যাণ্টনি গান গাইছে গুনগুন ক'রে আর মাঝে-মাঝে হরিশঙ্করের কথার জবাব দিচ্ছে।

এর মধ্যে আর কোনো লড়াই আছে কিনা; ভোলা ময়রার সঙ্গে লড়াই করতে তার ভালো লাগে, না, হরু ঠাকুরের সঙ্গে, না, রাম বসুর সঙ্গে, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করছে হরিশঙ্কর। দু-একটা কথার জবাবও দিচ্ছে অ্যাণ্টনি।

হরু ঠাকুরের সঙ্গে লড়তে নাকি তার ইচ্ছে হয় না, লোকটা গুণী বটে, কিন্তু বড় বুড়ো। বুড়োকে গাল দিয়ে কোনো চোখা কথা বলতে জিভ সরে না। কিন্তু ভোলার সঙ্গে কিংবা যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে লড়তে আরাম আছে। সেয়ানে সেয়ানে না হলে কি লড়াই জমে। —আছে, আছে। এইবার রাসের সময় যেতে হবে কাশিমবাজারে, রাজবাড়ি থেকে বায়না এসেছে। কার সঙ্গে লড়াই হবে এখনো তা জানে না অ্যাণ্টনি। কে আর হবে? হয় ভোলা, নয় রাম বসু।

তাঁতের গায়ে দাঁড়িয়ে নিরুপমা মাকুর মুখ থেকে সুতোর জট খুলছিল। সব গুছিয়ে রেখে এদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, বলল, ফিরিঙ্গিরা কি রকম জ্বালাচ্ছে বললে না তো হরিদাদা।

হাতের হুঁকো নামিয়ে রাখল হরিশঙ্কর, বলল, সব অ্যাণ্টনিই ফিরিঙ্গি, কিন্তু সব ফিরিঙ্গিই অ্যাণ্টনি নয়। বদ মানুষও আছে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বারো-চোদ্দ জন সেপাই এসেছে গরিটিতে। তারা দৌরাত্ম্য করার চেষ্টা করছে।

—কেমন? গালে হাত দিয়ে মেঝের উপর উবু হয়ে বসল নিরুপমা।

হরিশঙ্কর বলল, মেয়েদের পিছু নিচ্ছে। নিজেদের এলাকা পার হয়ে আমাদের ফরাসি এলাকাতে পর্যন্ত। গাঙ্গুলিদের মেয়ে কদম্ব—

হরিশঙ্করের মুখের কথা যেন কেড়ে নিল নিরুপমা, বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। কি হয়েছে তার?

—তার পিছনে এক ঘোড়সওয়ার ধাওয়া করেছিল। মেয়েটা পালিয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকে বাঁচে।

নিরুপমা উঠে দাঁড়াল। বলল, কিছু করতে পারবেনা ওকে গোরারা। কাদম্বিনী শক্ত আছে।

একটু থেমে হেসে বলল, বিদেশীর উপর টান হয় কি সকলের? সকলেই কি ফরাসডাঙার নিরুপমা? দেশী মানুষ তাদের অনেক আছে।

হরিশঙ্কর বলল, এ কথার অর্থ বুঝলাম না।

—অর্থ পরিষ্কার। প্রাণে সাধ আছে, বুকে সাহস নেই। তাই চুপিচুপি ওদের চলাফেরা। জেনেছি সব।

ঝিমঝিম করতে লাগল হরিশঙ্করের মাথা। ঝিমঝিমানির অন্য কারণও হয়তো আছে। নিরুপমার দিকে পুরোপুরি তাকালে মাথা একটু ঘুরেই যায়।

সায়েবের ঘরণী হয়েছে, কিন্তু তবু দেশী চাল ছাড়েনি একটুও, বরঞ্চ ফিরিঙ্গিকেই করে তুলেছে একটা জবরজঙ্গি— ঘরে তার কোর্তাটুপি, আসরে তার ধুতিচাদর। অ্যাণ্টনির আদব-কায়দা বদল করে দিয়েছে, কিন্তু নিজের রীতি নিজের কাছে অটুট রেখে দিয়েছে। গায়ে জামা দেওয়া তাকে ধরাতে পারেনি অ্যাণ্টনি। দেশের অন্য-পাঁচটা মেয়ের মতই একবস্ত্র তার অঙ্গ-আবরণ। অন্য মেয়েদের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে ওঠে না— অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই পরিবেশটা যে আলাদা। এখানে একটু আলাদা রকমের পোশাক-আশাক আশা করে সকলেই।

মিহি শাড়িতে নিরুপমার মসৃণ শরীরটা আবৃত। কিন্তু সে আবরণ উপেক্ষা করে তার অঙ্গের গৌরব উদ্ধত হয়ে উঠেছে। নগ্ন গলার উপর সাত লহরী মুক্তোর মালা, নীচ-হাতে রুপোর বাউটি, উপর-হাতে বাজু, কোমরে রুপোর চন্দ্রহার, পায়ে হাঁশুলি।

হরিশঙ্কর বলল, অনেক বেলা হল। এবার যাই।

বেলা এখন ক'টা সে হিসাব কারো নেই। কেলী সায়েবের ঘরের দেয়ালে অবশ্য ঘড়ি টাঙানো আছে একটা।

—একটা ঘড়ি দরকার। বলল অ্যাণ্টনি সায়েব, ঘড়ি এনে একটা উৎপাত বাড়বে বটে, কিন্তু হলে মন্দ হয় না।

হরিশঙ্কর উঠে দাঁড়াল, তার মনের আকাঙ্ক্ষাটাও জেগে উঠল বুঝি, বলল, কলকাতায় নতুন এক ঘড়িওয়ালা সায়েব এসেছে।

—হ্যাঁ। ডেভিড হেয়ার না, কি-যেন নাম। শুধু ঘড়ি বিক্রি করে না, নষ্ট ঘড়ি মেরামতও করে। নিরুপমা অ্যাণ্টনিকে বলল, কাশিমবাজার থেকে ফেরার সময় কিনে এনো একটা।

অ্যাণ্টনিও উঠে দাঁড়াল, ভঙ্গি ক'রে বলল—

কেলী করে তেজারতি
আমি করি এ-আরতি—
ভাই তোমার কথা-মতন গতি
ছাড়া বান্দা পথ দেখে না।
কেলীর কেলি সিক্কা টাকায়
আমার কেলি কেবল কথায়
রেস্ত দেখে শঙ্কা জাগায়—
হবে ঘড়ির বদল ঘণ্টা কেনা।

হেসে উঠল সকলে এক সঙ্গে। হাসি থামিয়ে নিরুপমা বলল, থাক্ থাক্। হবে না তোমাকে কিনতে। সময় মাপার যন্ত্র আমার জন্যে সময় নষ্ট করে দরকার কি। কাশিমবাজারের লড়াইয়ের কথা মনে রেখে তার জন্যে তৈরি হও।

বিদায় নিয়ে চলে গেল হরিশঙ্কর।

তৈরি হওয়ার মানে হচ্ছে নিরুপমার কাছে পড়ুয়ার মতন নম্র হয়ে বসা। মহাভারতের যাবতীয় গল্প আর রামসীতার কাহিনী ধীরে ধীরে শোনায় সে অ্যাণ্টনিকে। কোন্ দূর দেশের এই মানুষটিকে সে একেবারে নিজের মতন করে গড়ে তুলেছে ও তুলছে ধীরে ধীরে। মনসামঙ্গলের উপকথা, চাঁদবেনের গল্প, দেশের রীতিনীতি, সমাজের আদবকায়দা— সব জানা না থাকলে কারো সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে তর্ক করা কি চলে?

মেটে তেলের আলো জ্বলে দেয়ালগিরিতে। বেওয়ারিশ পালঙ্কে এই বেওয়ারিশ সহধর্মিণীকে পাশে শুইয়ে ভূমধ্যসাগবেব ওপারের দেশের মানুষ বঙ্গোপসাগরের উপকূলের এই বঙ্গললনার কাছে বঙ্গদেশের গল্প শোনে। তার মন থেকে নিজের দেশের উপকথা-রূপকথা মুছে যায় কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু তার মনের উপবে এই বঙ্গবালা যেভাবে গভীর দাগ এঁকে দিয়েছে অবিকল ততটা গভীরতা নিয়ে তার মনের উপর স্পষ্ট রেখা এঁকে ওঠে এ দেশের পল্লীগাথার ও পুবাণকথার। কৃষ্ণ-রাধিকার প্রণয়লীলার কাহিনী শুনতে শুনতে অ্যাণ্টনি বুঝি উদাস হয়ে ওঠে, তার বুঝি মনে হয় তাব মনের প্রতিটি রন্ধ্রে বেজে উঠেছে সেই মুরলীধ্বনি।

মনে-মনে সে মহড়া দেয় লড়াইয়ের। নিজেকে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে কতকগুলো ছত্র আওড়ায়, আবার অমনি তাব প্রত্যুত্তব রচনা করতে আরম্ভ করে।

দেয়ালগিরির তেল বুঝি কমে এসেছে। আলো নিভ-নিভ হয়ে আসে। অ্যাণ্টনি বলে, বলো সেই গল্পটা।

—কোন্‌টা?

—সেই রাই-রাজার গল্প।

রাইরাজার গল্পটা শোনার বড়ই আগ্রহ অ্যাণ্টনির। এ গল্প তার বুঝি বড়ই ভালো লেগেছে। এ কাহিনী গল্প করে আগেও বলেছে নিরুপমা। কিন্তু আজ তার ইচ্ছে হল একটু ছড়া কেটে বলবে। তাই একটু ভেবে নিল।

তারপর পাশ ফিরে শুয়ে অ্যান্টনির কানের মধ্যে মন্ত্র-উচ্চারণ করার মতন ক'রে মিহি সুরে গুঞ্জন করতে আরম্ভ করল নিরুপমা—

রাজা হল শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ ভাবে মনে।
এমন রাজার দেশে থাকিব কেমনে॥
হাতে রাজদণ্ড নাই, নাই সিংহাসন।
কেবল শাসন আছে, এ রাজা কেমন॥
নারী যদি রাজা হল রানী তবে কে।
এ দেশে এমন রাজা কারা এনেছে॥
প্রজার পীড়নে দক্ষ শাসনেতে দড়।
কোথা হতে পেল মেয়ে দম্ভ এত বড়॥
কৃষ্ণ বলে, মন-প্রাণ এখানে বিছাই।
সাম্রাজ্য বিস্তার করো এইখানে রাই॥
তুমি রাই রাজা যদি আমি রাই প্রজা।
খাজনা মিটাব, কাজ নয় জানি সোজা॥
তবুও তোমার রাজ্যে প্রজা হয়ে থাকি।
কিছুতেই বাকি নয় খাজনায় বাকি॥
তুমি রাই রাজা, পাবে যখন যা চাহ।
তোমার সাম্রাজ্যে হবে প্রত্যহ পুণ্যাহ॥

গুঞ্জনটা বাজতে লাগল অ্যান্টনির কানে বড়ই মধুর সুরে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন সে ভাবতে লাগল।

এ রাজত্ব ক্ষণিকের নয়। কত রাজ্য ভাঙে-গড়ে, কিন্তু এ রাজ্যের কোনো বিনাশ নেই, বিকৃতি নেই। যুগযুগ ধরে একই ভাবে চলছে এই রাজ্যের শাসন। কোনো বিনাশ-বিকৃতি নেই বটে, কিন্তু আছে পালা-বদল। এমনি এক বদলের দিনে করুণ আক্ষেপের সুর ওঠে বেজে, তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র—

ভালো মথুরায় গিয়ে রাজা হয়েছ।
রাই-প্রেমের চাকরি ছেড়ে
মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধেছ।
মথুরায় গিয়ে রাজা হয়েছ।

কানে কানে কাদের গল্প বলে চলেছে নিরুপমা, অ্যান্টনি সহসা যেন সে

কথা ভুলে গেল। কোথায় সেই মথুরা, কোথায় সেই বৃন্দাবন— সমস্ত ভূগোল সে যেন গেল ভুলে। ভূমধ্যসাগরও নয়, বঙ্গোপসাগরও নয়, অ্যাণ্টনির মন যেন পাক খেতে লাগল গরিটির পোড়ো বাগানবাড়িটির এই নিভৃত কক্ষের এই পালঙ্কের চারি ধারে, কিছুক্ষণ আগে দেওয়ালের ওই আলোটার চার ধারে একটা পোকা যে ভাবে পাক খাচ্ছিল, ঠিক সেই ভাবে। তার মনে পড়ল তার নিজেরই বানানো ছত্রটা— আমি পতঙ্গ আগুন দেখে ঝম্প দিয়েছি।

অ্যাণ্টনি বলি-বলি করেও কথাটা বলতে পারছিল না, কিন্তু এখন আলোটা নিভে গিয়েছে একেবারে, এবার নিরাপদে জিজ্ঞাসা করা যায়। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল অ্যাণ্টনি, তোমার মনে পড়ে না তার কথা ?

—কার কথা ?

—তোমার স্বামীর কথা ?

প্রশ্নটা বুঝল নিরুপমা, তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল, চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, উঁহুঁ। স্বামী বলে যে কেউ একজন ছিল সেটা জানতে পারলাম তো ঐ একদিন।

—কবে ?

—যেদিন চলে এলাম তোমার কাছে।

অ্যাণ্টনি বলল, তা না। আমি আমার কথা বলছিনে, বলছি তাঁর কথা। যিনি মারা গেছেন।

নিরুপমা একটু তফাতে সরে শুয়ে বলল, আমিও তাঁর কথাই বলছি। তিনি মরে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, তিনি এতদিন বেঁচে ছিলেন। তার আগে এ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। তাঁকে দেখলামই-বা কবে। কিন্তু ওসব কথা থাক্।

অ্যাণ্টনিও ওসব কথা তুলতে চায় না। আজ সহসা একটা অসতর্ক মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।

ভোর হয় গরিটির বাগানবাড়িতে। পাখি ডেকে ওঠে। বসন্তবহুরী, শ্যামা, ফিঙে। গাছে আর আগাছায় বাতাসের দোলা লাগে। সেই দোল দেখে তাদের মনের খুশিও হয়ে ওঠে আন্দোলিত। খৃষ্টে আর কৃষ্টে ভেদ ভুলে গিয়ে ফিরিঙ্গি অ্যাণ্টনি তার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আনন্দে দিন যাপন করতে আরম্ভ করে।

কেলীর কুঠির সামনে দিয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তায় এঁকে বেঁকে এগিয়ে

গেলে গঙ্গার কিনারায়। এই দিকটায় ইংরেজদের চলাফেরা ক্রমে বাড়ছে। মনে হচ্ছে, ফরাসগঞ্জ থেকে ফরাসিরা বুঝি শিগগিরই উঠে গিয়ে চন্দননগরেই জমায়েত হবে। ওয়েলেসলির শাসন চলেছে এখন। কোম্পানি একটা ভালো শাসকই পেয়েছে।

এ দেশের মানুষকে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে তাঁর যেমন ঝোঁক, এই দেশের মাটির উপরও টান তাঁর তেমনি। মিশর থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করে নীলনদের দুই কূলে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্যে যদিও ওয়েলেসলি ভারতভূমি থেকে অনেক ভারতীয় সেপাই পাঠিয়েছেন, কিন্তু এখানে —এই হুগলী-নদীর দুই কূলে— ফরাসিদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু এ দেশের উন্নতি করায় যদি কোনো আগ্রহ তাদের না থেকে থাকে, তাহলে আগ্রহ যাদের আছে তাদের হাতে ছেড়ে দিলেই ভালো হয়। সুতরাং ফরাসগঞ্জটার ভার ইংরেজরাই নিতে চায় বলে মনে হচ্ছে।

গরিটির নদীর কিনারে সেনাদের ছাউনি পড়েছে। হুগলী নদীতে বড় বড় পাল-তোলা ইংরেজদের বাণিজ্যতরী চলা-ফেরা করছে। ঘাটে এসে নোঙর করেছে নৌকা। মাল বোঝাই হচ্ছে, মাল খালাস হচ্ছে। আর-একটু উজানে চন্দননগর থেকেই ফরাসি জাতীয়-পতাকা উড়িয়ে এসে ঘাটে লাগছে নৌকো। ওটা ফরাসগঞ্জের ঘাট। আসলে, এই দুই ঘাট মিলেই হচ্ছে গৌরহাটি।

ইংরেজ আর ফরাসিতে কোনো আলাপ-আলোচনা একান্তই চলেছে কিনা, সে খবর কেউ রাখার দরকার মনে করে না এখানে। ইংরেজই হোক, আর ফরাসিই হোক, কিংবা কেউ না-ই হোক— তাতে কারো বুঝি কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আসলে, সকলে সুখে দিন কাটাতে চায়। পথে-ঘাটে বের হলে কোনো ঘোড়সওয়ার পিছনে ধাওয়া না করলেই হল।

বড বড় বজরা থেকে লবণের বস্তা ও কাপড়ের গাঁট নামে ঘাটে, আবার সোরার বস্তা ওঠে নৌকোয়। নদীর কিনারে সওদাগরদের ভিড জমে ওঠে। ছলছল করতে থাকে নদীর জল।

এই সওদাগরের ভিড়ের মাঝখানে নতুন ধরণের মুখও এসে দাঁড়ায়। এঁরা মিশনারি। শ্রীরামপুর থেকে আসছেন পদব্রজে।

কেরী সাহেব শ্রীরামপুরের প্রেস নিয়ে আর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নিয়েই বিব্রত। মিশনের মেঠো কাজের মধ্যে হাত দিতে তিনি সময় পান না। এ কাজ করে চলেছেন ওয়ার্ড আর মার্শম্যান।

এঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন গরিটির ঘাটে। মানুষে খ্রীষ্টান হল কি না-হল— এ ব্যাপার নিয়ে এঁরা এত ব্যস্ত হন কেন বোঝা কষ্ট। মহিমা যার আছে তার মহিমা চেপে রাখা যায় না, প্রকাশ হয়ে তা পড়বেই, তবুও এঁরা কেন-যে যিশুর মহিমা প্রচারের জন্যে এতটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন তা সকলে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না।

নিরুপমার চেয়ে বড় খ্রীষ্টান যেমন নেই, অ্যান্টনির চেয়ে বড় হিন্দুও তেমনি পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এদের জন্যে যেমন কোনো মার্শম্যানেরও দরকার হয়নি, কোনো মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের দরকারও তেমনি হয় নি।

গরিটির ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে দুইজনে— ফিরিঙ্গি অ্যান্টনি ও তার ব্রাহ্মণী নিরুপমা।

জোশুয়া মার্শম্যান একটু দূরে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলেন এদের দুইজনকে। কারা এরা— চিনতেও পারলেন না, বুঝতেও পারলেন না। বুকের রুপালি ক্রসে সূর্যের আলোর অপর্যাপ্ত দ্যুতি বিচ্ছুরিত করতে করতে তিনি এগিয়ে এলেন। কাছে এসে অ্যান্টনিকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

ভালো ইংরেজি জানে না অ্যান্টনি, তবু ইংরেজিতেই সে বলল, মি এ ক্রীশ্চিয়ান, শি মাই হিন্দু ওয়াইফ।

—এ ফ্রেঞ্চ ?

—নো। এ পোর্তুগিজ।

কেরী সাহেবকে গিয়ে খবরটা দিতে হবে। এদের দিয়ে ব্যাপটিস্ট মিশনের কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে কেরীর সঙ্গে।

মিশনারি সায়েবেরা ফরাসগঞ্জের রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হাটতে লাগল। নিরুপমা তাদের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর জিজ্ঞাসা করল অ্যান্টনিকে, ওরা বলে কী ?

—জিজ্ঞাসা করল তুমি আমার কে, আমি তোমার কে ?

অ্যান্টনি হেসে বলল, গোপন করলাম না, ব'লে দিলাম।

—কি বললে ?

—হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করল, ওটা আবার কী ভাষা ? ও কথার মানে কি ? ঠাট্টা না। কি ওর অর্থ ?

অ্যাণ্টনি মাথার টুপিটা কপালের দিকে একটু নামিয়ে রোদ আড়াল ক'রে নিরুপমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, বলে দিলাম— এ আমার স্ত্রী, আমার ভার্যা। আর, আমি ওর পতি, স্বামী।

নিরুপমা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। একটু চুপ ক'রে থেকে পরে বলল, একটু দাঁড়াও। স্নানটা সেরে নিই।

সেই চালতে-গাছ। অ্যাণ্টনি তার পাতার ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে রইল একা, নিরুপমা নেমে গেল জলে।

কাঁকালে পিতলের গাগরি নিয়ে ঢালুপথে ধীরে ধীরে নেমে গেল নিরুপমা।

জল বুঝি ঐ অঙ্গের ছোঁয়া পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে ; শিরশির করে উঠেছে ঐ স্রোতের গায়ে শিহরন। ওপার থেকে হাওয়া এসে লাগছে জলে, সেই হাওয়ার কিছুটা বাড়তি অংশ উড়ে এসে অ্যাণ্টনির মাথার হালকা টুপির কিনারে ঢেউ তুলছে। হাত দিয়ে টুপি চেপে ধরে চারদিকে তাকাচ্ছে অ্যাণ্টনি। ওদিকে ঐ শ্মশান, তার প্রায় গায়েই সদাগরী নৌকোর ভিড়— থাকে-থাকে উঠে গেছে পালের মিছিল, বড় থেকে ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে গেছে পাল। সাদা মুখের আর কালো মুখের মানুষেরা হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে, যেন দরদস্তুর ঠিক হচ্ছে। কী ভাষায় কথা বলছে ওরা কে জানে।

শ্রীরামপুরের ঐ পাদরির সঙ্গে সে যে-রকম তোফা ইংরেজিতে কথা ব'লে তাদের সব কথা বুঝিয়ে দিল, অমনি চমৎকার ইংরেজিতে কিংবা হয়তো অমনি চমৎকার বাংলাতেই সদাগরদের কথা হচ্ছে ওখানে।

জল থেকে উঠে এল নিরুপমা। গা থেকে গড়িয়ে পড়ছে জল। মনে হচ্ছে মধুভাণ্ড থেকে মধু বুঝি উপচে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

ভিজে কাপড় সেঁটে গিয়েছে গায়ের সঙ্গে। মনে হচ্ছে, চন্দ্রহারটা নিরুপমার অনাবৃত নিতম্বের উপর যেন লেগে আছে আঁট হয়ে। জলভরা গাগরিটা কাঁকালে নিয়ে হাঁটতে লাগল নিরুপমা ঈষৎ বাঁকা হয়ে।

অ্যাণ্টনি ঐ দিকে চেয়ে একটু হাসল, বলল, আমার গায়ের কুর্তিটা দেব নাকি খুলে ?

—কেন ? এ তামাশা কেন সায়েব। গাগরির উপর দিয়ে বাঁকা ভঙ্গিতে ফিরে তাকিয়ে হাসল নিরুপমা।

হেসে উঠল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গিও, চাপা গলায় সুর করে বলল—

পাছে ওরা দেখে ফ্যালে, চক্ষু মেলে।

কাঁচা হলুদ-বর্ণ পাছে যায় গড়িয়ে, হে অবলে।

—হয়েছে। হয়েছে। হয়েছে। শিগগির এস।

তরতর করে হেঁটে চলল নিরুপমা। ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে যেতে লাগল পা। কাঁচা রাস্তার উপর পায়ের ভিজে দাগ আঁকতে আঁকতে এগিয়ে চলতে লাগল নিরুপমা। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে পিছুপিছু চলছিল অ্যাণ্টনি। এবার সে একটু জোরে হেঁটে নিরুপমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে আবার সুর ক'রে বললে—

পাছে ওরা দেখে ফ্যালে, দেখে ফ্যালে ওরা পাছে।

আমার ঘরের ভাণ্ডারেতে কী ঐশ্বর্য জমা আছে।

নিরুপমা হাসল, বলল, বটে। প্রাণে তো পুলক দেখেছি খুব। ঘরেও ঐশ্বর্য তো কত। বাঁয়ে আনতে ডানে কুলোয় না, তার আবার বড়াই।

সে কি কথা? অকুলান তার আছে কি! যার প্রাণ-মন কানায়-কানায় আনন্দ দিয়ে ভরা, যার মন-প্রাণ ঐ গাগরির মতই টইটুম্বর, তার বড়াই না হবে কেন। ভারি অবুঝ তো এই মেয়েটা, এই সামান্য কথাটা সে বোঝে না?

বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল অ্যাণ্টনি, তার মনে আজ হঠাৎ বিপুল ফূর্তি এসে গেছে, নির্জন রাস্তায় নিরাপদে চলতে চলতে নিজের পায়ের শব্দ শুনে তার সঙ্গে তাল রেখে তার মন সুরে সুরে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে যেন। বলতে লাগল—

কাপড়ের বহর ছোট, আমি তায় নই বেয়াকুল।

সোনা দিয়ে গড়া ও পিঠ ঘোমটা দিতে হবেই আদুল॥

এ-কূল ও-কূল দুকূল না চাই, এক কূলেতে নৌকা ভিড়াই।

আমার তরীর কাণ্ডারিণীর কাণ্ড দেখে হই-যে আকুল॥

হেসে উঠল নিরুপমা। দুলে উঠল তার শরীর। গাগরি থেকে ছলকে উঠল জল। ভিজে উঠল পথের ধুলো।

লম্বা পা ফেলে ভেজা রাস্তাটুকু পার হয়ে গিয়ে অ্যাণ্টনি বলল, বলো। হচ্ছে কিনা। পারছি কিনা। কত কবিওয়ালা আসরে সঙ্গে নিয়ে যায় বাঁধনদার। আমার বাঁধনদার আমার ঘরে, আঙিনায় আমি বেঁধেছি তারে।

কোনো উত্তর দিল না নিরুপমা। আনন্দে তার মন যেন ভারি হয়ে

উঠেছে। অ্যান্টনি এত সহজে গান বাঁধতে পারছে মুখে-মুখেই, এতে তার খুশির অন্ত নেই। খুশি লাগছে, কিন্তু মুখে কোনো কথা না বলে কোমর বাঁকা করে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে সে তরতর করে হেঁটে চলেছে।

উত্তর না পেয়ে অ্যান্টনি মনে-মনে হাসল, আবার সুর ধরল, বলল, রেখেছি বেঁধে এ-ঘরে, কিসের নিগড়ে, বলো কিসের নিগড়ে।

মুখের কথা দিয়ে নয়, চোখের দৃষ্টি দিয়ে নিরুপমা উত্তর দিল এ কথার। চলার গতি একটু মন্থর করে আবেশ-অলস চোখে সলজ্জ চোখে তাকাল অ্যান্টনির দিকে।

এসে গেছে তারা, ঐ দেখা যায় বাড়িটা, চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া নয়, নোনা-ধরা প্রাচীরের ঘের। আতা জাম জামরুল আম কাঁঠাল আর নারিকেলের গাছ দিয়ে পরিপূর্ণ।

এবার কথা বলল নিরুপমা, বলল, খুব তো উথলে উঠেছ আজ। কথায় কথায় ছড়ার ছড়াছড়ি দেখছি। কিন্তু কসম কর, কাশিমবাজারে গিয়ে জিতে আসবে লড়াই।

কপাল বুক আর দুই কাঁধে হাত ছুঁইয়ে ক্রস চিহ্নিত ক'রে খ্রীষ্টান অ্যান্টনি বলল, নিশ্চয়। পরশপাথর কপালে যার, তার কপালে ঘটে কি হার। তার উঠোনে আনাগোনা, শুধু সোনা কেবল সোনা।

প্রাচীরের গায়ে বসানো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বুনো ঘাস গাছ আর আগাছার অরণ্যের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দুটি প্রাণী।

এ ঘটনা একদিনের নয়। এই ভাবেই গরিটির বাগানবাড়ি তার প্রায় প্রত্যহের কাজ করে চলেছে। প্রত্যহের পাখি-ডাকায় আর প্রত্যহের সূর্যোদয়ে যেমন কোনো বিঘ্ন নেই, এই পোড়ো বাগানবাড়ির দিনও তেমনি নির্বিঘ্নে বয়ে চলেছে। পাখির কূজনের সঙ্গে সুরের সংগতি রেখে এই গৃহ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে নিত্য নূতন সুরে। নারিকেল গাছ তার পরিপূর্ণ দীর্ঘতায় দাঁড়িয়ে যেন বীজন করে চামর, আম জাম কাঁঠাল আর বট বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা ছায়া বিস্তার করে এই গৃহের প্রাঙ্গণে।

বারান্দার ছোট্ট তাঁতে কেবল বাজতে থাকে ক্ষুদে মাকুর খটখট শব্দ। এপাশ থেকে ওপাশে তার ছোটছোট যাতায়াতে বুনন হয় ছোটছোট চাদর। এ তাঁতে ছোট চাহিদা মেটে, কিন্তু শরীরের ছাঁদ যাদের ছোট না তাদের আবৃত করার পক্ষে এ যথেষ্ট না। এত কম বহরে দুই দিক বজায় রাখা দায়—মুখ ঢাকতে গেলে সর্বাঙ্গ ঢাকা হয় না, পিঠ ঢাকতে গেলে মুখ রক্ষা হয় না।

এখানকার প্রাণী-দুটির চাহিদাও ছোট। তাই অপ্রশস্ত বারান্দায় বসানো এই কুন্দে তাঁতের কাপড়েই তাদের চাহিদা বুঝি মিটে যাচ্ছে। অ্যান্টনি তো বলেই দিয়েছে, এ জন্যে সে বিন্দুমাত্র ব্যাকুল নয়। কিন্তু নিরুপমা ভাবে অন্য কথা। তার মনে কেমন একটা শঙ্কা আছে, সেইজন্যে সে ব্যাকুল হয়। কেলী সাহেবের অবস্থা বহরে এমন ছোট না, তার ভ্রাতার উপর কৃপা ক'রে হঠাৎ সে যদি একদিন দয়া দেখাবার প্রস্তাব করে বসে, তবে সে অপমান বুঝি সইতে পারবে না নিরুপমা।

হুশহুশ-হুমহুম হুশহুশ-হুমহুম শব্দ আসে কানে। পালকি-বেহারাদের নিশ্বাসপাতের শব্দ। বাগানবাড়ির পিছন দিকের রাস্তা দিয়ে পালকি আসছে কেলীর কুঠিতে। সদাগররা আসছে বেসাতির কথা নিয়ে। সেই শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে ক্রমে থেমে যায়। বারান্দায় সোজা হয়ে দাঁড়ালে প্রাচীরের উপর দিয়ে দেখা যায় হুকাবরদার পাঙ্খাবরদার সঙ্গে নিয়ে বড় বড় মহাজনেরা আসছেন।

আবার শোনা যায় ঘোড়ার পায়ের দড়বড়ি। নরম মাটির উপর খুরের শব্দ বাজে। নীলকুঠির কুঠিয়াল-সায়েবরা এসে নামেন। এঁরা আসেন টাকা রেহান করতে। নীলের ফসল তুলতে হবে, টাকার দরকার। ফসল তুলে নীলের পাতা থেকে রস নিঙড়ে বার ক'রে নিলেই টাকাও নিঙড়ে বেরিয়ে আসবে। তখন সুদ-সমেত মূল শোধ করা হবে।

বেলা বাড়তে থাকে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘোড়া দানা খায়, আর, একটু দূরে গাছতলায় গামছা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খায় বেহারারা।

লবণের বস্তা পড়ে আছে স্তূপ হয়ে, মসলার বস্তাও আছে তার পাশে গাদা করা। বাতাসে ভেসে আসছে লবঙ্গের ঝাল গন্ধ।

কাজ শেষ করে নীলকর-সায়েবরা ঘোড়া দাবড়িয়ে চলে যান। হুশহুশ-হুমহুম শব্দ করতে করতে তারপর যাত্রা করে পালকির মিছিল।

নিরুপমা অনেকক্ষণ এই দৃশ্য দেখে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। যতই দেখে তার মনের মধ্যে চাপা আতঙ্কটা তীব্র হয়ে ওঠে বুঝি ততই।

অ্যান্টনি ঘরের মধ্যে ছিল, নিরুপমা বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল, বলল, বাগানবাড়ির মায়া ছেড়ে, চলো, অন্য কোথাও যাই। এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।

আকাশ থেকে পড়ল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হঠাৎ এ বায়না কেন? হঠাৎ আবার হল কি?

কথা বলে না নিরুপমা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কি কথা বলবে, তার মনের আতঙ্কটা জানাবে কী ক'রে কিছুই বুঝি বুঝতে পারছে না সে। তার মনের মধ্যে যে গঞ্জনা জমেছে সে কথাটা প্রকাশ করতেও তার সংকোচ হচ্ছে। আতঙ্কটা একেবারে ভুয়ো হতে পারে, কিন্তু আতঙ্ক আতঙ্কই। যে অপমানের কথা ভেবে সে ভয় পাচ্ছে ; সে ভয়ের কথা প্রকাশ করলেও তো আর-একজনকে সম্মান করা হয় না।

অনেকক্ষণ পরে নিরুপমা বলল, কিছু না। এমনি।

কিন্তু নিরুপমার কোনো-কিছুই এমনি নয়, এর কারণ একটা-কিছু আছেই, এ বিষয়ে ফিরিঙ্গি নিশ্চিত। বলল, শুনি সে কারণ।

নিরুপমা পালঙ্কের এক কোণে বসে ধীরে ধীরে বলতে লাগল তার উদ্বেগের কথা। কথা সাঙ্গ ক'রে বলল, অমন যদি হয় তাহলে সে যে বেজায় ঘেন্না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করল অ্যান্টনি, বলল, চুপ করে থাক। নিশ্চিন্ত হয়ে থাক কোনো ভয় নেই।

অভয় দিয়েই চুপ করে গেল অ্যান্টনি। কিন্তু এই অভয়বাণীর অর্থ বুঝতে পারল না নিরুপমা। জীবনে সে সম্পূর্ণ নিজের অভিরুচির উপর নির্ভর ক'রে চলতে চায়। তার মনে এ বল আছে বলেই নির্ভয়ে সে এই ঘরের ঘরণী করে নিতে পেরেছে নিজেকে। শেষ পযন্ত তার এই অহংকার যেন বজায় থাকে— এই তার আকাঙ্ক্ষা।

হাসিখুশি মানুষ অ্যান্টনি। অকারণে মনের মধ্যে এক ঝাঁক দুশ্চিন্তা এনে নিজের শান্তি নষ্ট করতে সে রাজি না। বলল, কেলী আমার ব্রাদার, আমার ফাদারের সন্। তেমন কিছু ঘটনা ঘটলে আমি বুঝে নেব। ওই পাদরি-সায়েবদের সেদিন যেমন বলেছিলেম, আবার তেমনি বলছি— তুমি আমার ওয়াইফ। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।

কেলী যে ব্যবসা করে সে ব্যবসা তার নিজের গড়া নয়। তাদের বাবার। বাবার মৃত্যুর পর কেলী ব্যবসাটা ধরে রাখে। ওসব দিকে অ্যান্টনির রুচিও ছিল না, ধারও ধারেনি ওসবের। তার রুচি ছিল অন্য। মন ছিল ভিন্ন।

গোন্দলপাড়ায় গিয়ে কখনো কবিওয়ালা রাসুর, কখনো নৃসিংহের আখড়ায় গিয়ে বসে থাকত অ্যান্টনি। তাদের গলার গান শুনত বসে বসে।

তখন সে খুব ছোট। ফরাসডাঙা থেকে এক-দৌড়ে নীলক্ষেতের মাঠ পার হয়ে গঙ্গার কিনার ধরে ধরে চলে যেত ঐ গ্রামে— গোন্দলপাড়ায়। কবিওয়ালারা সখীসংবাদের গান গাইত গলা ছেড়ে। সে গানের কোনো কথার মানে বুঝতে পারত না অ্যান্টনি, ধুলোর উপর বসে গালে হাত দিয়ে একমনে সে শুনত রাসুর গান। তার গান শেষ হলে নৃসিংহ তার নিজের রচা গানে নিজের সুর লাগিয়ে ধরত ভিন্ন একটা রাগিণী।

যত শুনত ততই ভালো লাগত অ্যান্টনির। শুনতে শুনতে ক্রমে সে রাসুর একটা গানের মানে বুঝতে আরম্ভ করল একটু-একটু—

শ্যাম, তোমার চরিত—
পথিক যেমত হয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে,
শ্রান্তি দূর হলে যায় পুন চলে
পুন নাহি চায় ফিরে,
শ্যাম, তোমার চরিত।

শ্যামের এই বিচিত্র চরিত্রের কথা শুনে, অ্যান্টনি শুধুই ভাবত এই শ্যাম-লোকটা কে? এক জায়গায় একটু আশ্রয় নিল নিজের দরকারে, দরকার ফুরিয়ে গেলেই উধাও হয়ে চলে গেল? আশ্রয়টার দিকে ফিরে তাকানোও আর দরকার মনে করল না?

লোকটাকে চিনতে না পারলেও তার এই অদ্ভুত চরিত্রের কথা ভেবে অনেক দিন তার উপর রেগে খাপ্পা হয়ে ছিল অ্যান্টনি।

কিন্তু সেই অচেনা লোকটার উপর খাপ্পা হলে কি হবে, রাসুর উপর টান তার খুব। রাসু রোজই-যে গান গাইত, এমন নয়। যেদিন গিয়ে সে আখড়া খালি দেখত সেদিন শ্যামের উপরের রাগটা গিয়ে পড়ত রাসুর উপর।

কিন্তু আসর বসত প্রায়ই। দোচালা একটা ঘর। বিশ-পঁচিশ জন সমজদার জুটত সে আসরে। তার মধ্যে অ্যান্টনির বয়সেরও কয়েকজন। তাদের সঙ্গে তার বেশ ভাব জমেছিল, কিন্তু তাদের নাম আজ মনে করতে পারছে না অ্যান্টনি। তেলো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে 'উহুঁহুঁ বাঃ বাঃ' করে উঠত এক বুড়ো, তার উপর খুব রাগত অ্যান্টনি। অ্যান্টনির মনে হত, লোকটা বুঝি ব্যঙ্গ করছে রাসুকে। এই লোকটা সেই শ্যাম না তো?

ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল অ্যান্টনি। গির্জায় যেতে আরম্ভ করল। মাঝে-মাঝে তার বাবা তাকে নিয়ে যেতেন ব্যাণ্ডেলে— মস্ত গির্জা এখানে।

উপাসনা করার জন্যে কত সায়েব-লোক আসত তার ঠিক নেই। এই ভিড়ের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠত সে। গোন্দলপাড়ার কথা মনে হত।

আরও বড় হল সে, আরও বড। বারো-তেরো বছর বয়স হয়ে গেল তার। বাপের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগল কেলী, কিন্তু অ্যাণ্টনি চলল গোন্দলপাড়ায়। কবিদের গানের কথার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। সঙ্গীদের মুখের কথার সঙ্গেও এখন সে পরিচিত হয়ে উঠেছে। একটু-একটু বাংলা বলতেও শিখে গেল বালক-অ্যাণ্টনি।

এমনি এক সময়ে ফরাসডাঙার একটি টুকটুকে বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে ভাব হল অ্যাণ্টনির। তার সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করল। তার সঙ্গে অন্য-সব সঙ্গীদের নিয়ে দল-বেঁধে খেলা করতেও আরম্ভ করল।

নাকে নোলক, কোমরে বিছে-গোট, পায়ে মল— মলের ঝুমঝুম শব্দ বাজিয়ে ছোট্ট-একটা ফুটফুটে মেয়ে এসে দাঁড়াত ফরাসডাঙার রাস্তার গায়ে। অ্যাণ্টনির দিকে তাকিয়ে থাকত অবাক হয়ে। কত আর বয়স হবে মেয়েটার। বছর-ছয়।

কটা রঙ কটা চোখ আর কটা চুল, পরনে লাল টুকটুকে লম্বা প্যাণ্ট, গায়ে নীল কোর্তা, মাথায় টুপি — কে এই লোকটা? চার দিকের খালি-গায়ের খালি-পায়ের গেঁয়ো মানুষের ভিড়ের মধ্যে এই জীবটিকে বুঝি বড়ই অদ্ভুত ঠেকত।

গোন্দলপাড়ায় যাবার পথে ভাঙা শিবমন্দির পার হয়ে জটাধারী বটগাছটার শিকড়ের আড়ালে প্রায় রোজই সে দেখতে পেত একে।

একদিন অ্যাণ্টনি এগিয়ে গিয়ে কথা বলল মেয়েটার সঙ্গে। বেশ নির্ভীক মেয়ে তো। অ্যাণ্টনি ভেবেছিল, যার চোখে এমন অবাক চাউনি সে বুঝি পালিয়ে যাবে ভয় পেয়ে। মেয়েটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হাসল।

ভাব হয়ে গেল মেয়েটার সঙ্গে। এই বটের শিকড় ধরে দোল খেয়ে লাফিয়ে পড়ে এইখানে জীবনের প্রথম খেলা শুরু হয়ে গেল অ্যাণ্টনি-ফিরিঙ্গির।

—সেসব কথা মনে পড়ে, নিরুপমা?

নিরুপমা কোনো উত্তর দিল না। দেয়ালের দিকে চোখ দিয়ে বসে বসে শুনতে লাগল অ্যাণ্টনির প্রলাপ। কিন্তু এমন ভান করে রইল যে, সে যেন কারো কোনো কথাই শুনছে না, কারো কোনো কথায় কান দেবার মত ইচ্ছে যেন তার নেই।

এমনি একদিন হঠাৎ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশ থেকে ডাক এল।

হুগলী-নদীতে সেজে উঠল একটা বিরাট বজরা, থরে-থরে থাকে-থাকে বজরার মাস্তুল ঘিরে ফুলে উঠল পাল, মাস্তুলের চূড়ায় উড়তে আরম্ভ করল পোর্তুগিজ-পতাকা। এক পোর্তুগিজ-পরিবার চলেছে স্বদেশে।

অ্যান্টনির মনে আনন্দ ধরে না। এমন একটা দীর্ঘ জলযাত্রার কথা ভেবে পুলকিত হয়ে উঠল তার মন। বজরার মধ্যে বসে সে বুঝি ফরাসডাঙার কথা আর গোন্দলপাড়ার মানুষদের কথা ভুলেই গেল একেবারে।

এক দিন নয়, দুই দিন নয়, পুরো আটটি বছর। আট বছর পরে আবার এসে তারা নামল এই বাংলাদেশের মাটিতে। এ মাটির স্বাদ বুঝি ভুলেই গিয়েছিল একেবারে, এ দেশের ভাষাও বুঝি মনে ছিল না আর। কিন্তু ফিরে এসে নতুন চোখ দিয়ে নতুন ভাবে চেয়ে দেখতে লাগল চার দিক। বুঝতে পারল, কিছুই ভুলে যায় নি। এ দেশের মাটির স্বাদ যেন লেগে আছে তার শিরায় শিরায়। সব ঠিক আছে এখানে। সেই শিবতলা, সেই জটাধারী বটগাছ, সেই গোন্দলপাড়ার আখড়া।

কিন্তু সব কি ঠিক আছে? সব যেন ঠিক নেই। অনেক কিছু বদলে গিয়েছে এর মধ্যে। অনেক চেহারা গিয়েছে অন্যরকম হয়ে। আগে যাদের বয়স ছিল ছয়, এখন তারা চোদ্দ হয়ে গিয়েছে। আগে কাছে এগিয়ে গেলে যারা সরে দাঁড়াত না, এখন তারা একটু যেন আড়ালে দাঁড়ায়।

—সেসব কথা মনে পড়ে, নিরুপমা?

এবারও কোনো উত্তর দিলনা নিরুপমা।

এখন তারা আড়ালে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই আড়ালের মধ্যেই একটু বুঝি ফাঁকি থেকে যায় কোথায়। সেই ফাঁকিটা ধরার জন্যে ফিরিঙ্গিচোখ ফিকির খুঁজে বেড়ায়।

একদিন তার চোখে পড়ল একটা দাগ। কিসের ওটা? সিঁথির উপর লাল রেখা।

এতদিন যে কাটাল এই দেশে, এতদিন যে দেখেছে এই দেশের মানুষদের, এই দেশের মানুষদের সঙ্গে যে মেশামেশি করেছে এত, সে কি অর্থ বোঝে না এর?

নিশ্চয় বোঝে। সেই জন্যেই সে শিবতলার সিঁড়ির উপর আর ব'সে না থেকে চলে গিয়েছিল গোন্দলপাড়ায়।—

শ্যাম, তোমার চরিত—
পথিক যেমত হয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে

শিবতলার সিঁড়ির উপর সেই রকম বিশ্রাম সমাপ্ত করে অ্যান্টনি উঠে রওনা হয়ে যায় সেখান থেকে।

এই শ্যামকে এখন চিনতে পেরেছে অ্যান্টনি। বহুদিন যে লোকটা তার কাছে অচেনা ছিল তার পরিচয় জানা হয়ে গিয়েছে তার। সেই লোকটার মত বেইমান হবার ইচ্ছে নেই তার। এইজন্যেই যাবার সময়ও সে ফিরে ফিরে তাকায় ঐ বটবৃক্ষের শিকড়ের দিকে।

—সেসব কথা মনে পড়ে, নিরুপমা ?

দিন কেটে যায় এই ভাবে। দিনের পর দিন। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, আরো আটটি বছর। জীবনের আকাঙ্ক্ষা জমে উঠেছে ধীরে ধীরে, পর্বতপ্রমাণ সে বাসনাকে ধূলিসাৎ করে দূরে নিক্ষেপ করা অসম্ভব। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাপুরণের কোনো সম্ভাবনা চোখের সম্মুখে দেখা যায় না।

ফিরিঙ্গি অ্যান্টনির সাজগোজের বহর নেই আর। পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক ঢিলে হয়ে গিয়েছে, অনেক এলোমেলো। তার সাজপোশাকের মতই এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ায় সে ফরাসডাঙার রাস্তায়। গোন্দলপাড়ায় গিয়েও লাভ নেই আর। বাসু নেই, নৃসিংহও গত হয়েছে। আখড়াও এখন একটা পোড়ো ভিটে মাত্র।

দিন কেটে যায় একে-একে। কত দিন কাটে কেউ তার হিসেব রাখে না।

হঠাৎ একদিন আকুল কান্না বেজে উঠল বটগাছের শিকড়ের ওপারে। কিসের কান্না ? কেন কান্না ? এক পাল লোক ছুটে চলেছে, তাদের দেখে অ্যান্টনিও চলল ছুটতে ছুটতে।

কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়েছে মেয়েটি। উঠোনে বসে আছে আলুথালু বেশে। অনেক লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে একটি আমের শাখা হাতে নিয়ে থুত্থুড়ো একটা বুড়োলোক মেয়েটাকে সাধছে কি-যেন বলে।

উত্তর দিচ্ছে না মেয়েটা।

ব্যাপারটা জানার জন্যে ব্যাকুল হল অ্যান্টনি। ঝুঁকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞাসা করতে লাগল সকলকে।

মেয়েটার স্বামী নাকি মারা গেছে। বিদেশে। কাশীতে। খবর এসেছে আজ। খবরের সঙ্গে এসেছে স্বামীর উত্তরীয়। ঐ উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে সহমৃতা হতে হবে। এতে মেয়ে যে সম্মত, তার শপথ করাবার জন্যে ঐ আম্রশাখা নিয়ে সাধা হচ্ছে মেয়েটাকে।

বৃত্তান্ত শুনে দু পা পিছিয়ে এল অ্যান্টনি। দাওয়ায় বসে কাঁদছে মেয়ের মা ও বাবা। একবার ফিরে চেয়ে দেখল সেই দৃশ্যটা। আর দাঁড়াল না। চলে এল সেখান থেকে।

বংশের মর্যাদা, সতীর পুণ্য, অক্ষয় স্বর্গবাস, স্বামীর কল্যাণ— কী না হয় এতে? আম্রশাখা হাতে নিতে বাধ্য হল মেয়েটা। মিছিল চলল শ্মশানে। সঙ্গেসঙ্গে চলল ঢাকী-ঢুলীর দল, কাতারে-কাতারে পুণ্যপ্রার্থী সধবারা।

শ্মশানে এসে দাঁড়িয়ে আছে ফিরিঙ্গি। মজাটা তার দেখার ইচ্ছে। মজাটা মন্দও না। কিন্তু এই মজা দেখার জন্যে মজ্জায়-মজ্জায় অশেষ যন্ত্রণা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তার।

বেজে উঠেছে ঢাক-ঢোল। হুলুধ্বনি উঠেছে সধবাদের সম্মিলিত উৎসাহে। সজ্জিত হয়েছে চিতা। কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে নদীব খরস্রোত।

আম্রপল্লব হাতে নিয়ে মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে চার ধারে। যে মেয়ে এত নির্ভীক ছিল একদিন, আজ তার চোখে কেন এই ভীতির চিহ্ন, কেন এই আতঙ্কের ছায়া?

মন্ত্রপাঠ চলেছে কাষ্ঠাসনেব চার ধার ঘিবে। মেয়েটাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। তার বুকের উপর অনেক কাষ্ঠের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া মাত্র আর্তনাদের শব্দে বেজে উঠল বাদ্য।

আগুন লাগাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত। শেষমন্ত্র-পাঠ হয়েছে, এমন সময়ে যাবতীয় কাষ্ঠের বোঝায় আলোড়ন তুলে যেন উঠে এল এক দেবীমূর্তি। সে মূর্তিব চোখে তখন চতুর্গুণ আতঙ্কেব ছায়া, যেন নীরব আর্তনাদ হয়ে বীভৎস ভীতি জমে উঠেছে চোখে-মুখে। পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাকে যেন ডাকছে।

হাহাকার পড়ে গেল করাসডাঙার ঘাটে। এতবড় অঘটন নাকি কখনো ঘটেনি এখানে। এ বিপর্যয়ের হাত থেকে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তারই ব্যস্ততা সকলের মধ্যে। সকলেই আক্ষেপ করছে তাদের ভুলের জন্যে। নেশা করিয়ে নিতে ভুল হয়ে গেছে মেয়েটাকে। কিন্তু—

আর ভয় না। আর শঙ্কা নয়। সমস্ত বাধার বাঁধ ভেঙে, যাবতীয় পবিত্রতা কলুষিত করে দিয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল এক ফিরিঙ্গি।

—সেসব কথা মনে পড়ে, নিরুপমা?

আর নিরুত্তর নয়। বাধার বাঁধ ভেঙে গেল। অ্যান্টনির হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ল নিরুপমা। বলল, চুপ চুপ চুপ।

চুপ করে গেল অ্যাণ্টনি। নিরুপমার অনাবৃত পিঠের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল। একটা মসৃণ স্বাদ যেন আছে ওই পিঠে। কিন্তু তার চেয়েও আরও মোলায়েম স্বাদ সোজা গিয়ে পৌঁছেছে তার মর্মের মধ্যে।

ঠিক যেন ব্যথিত নয়, একটু বিচলিতও যেন হয়েছে সে। বুঝতে পারেনি, এমন অন্তরঙ্গভাবে সে তার জীবনের কথা বলছিল অতীতকে সামান্য-একটু আস্বাদন করার জন্যেই। যে দিনগুলো একে-একে চলে গিয়েছে, সেই দিনগুলোর মুখোমুখি হয়ে ক্ষণকালের জন্যে দাঁড়াবারই বাসনা হয়েছিল তার। বুঝতে পারেনি যে, অতীতের দিনগুলো অনেকটা সাপের শরীরের মতই, কিলবিল করে এঁকে বেঁকে চলে যায়, ধরে রাখা যায় না, হাতের মুঠির মাঝখানে থেকেও তাদের পিছল শরীরগুলো পিছলিয়ে যায়, নিরিবিলিতে এই ভাবে চলে গেলেও হত, কিন্তু ওদের স্বভাবও বড় মারাত্মক, কোন্ অসাবধানতার সুযোগে হঠাৎ রেগে ওঠে, ফুঁসে ওঠে, বিষাক্ত ফণা উত্তোলন করে, হঠাৎ হয়তো-বা বিষদাঁতে একটা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েই নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

অ্যাণ্টনির কোন্ অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তাদের অতীতের দিন এই রকম একটা বিষাক্ত ছোবলই হয়তো দিয়েছে নিরুপমাকে। তাই বুঝি সেই বিষ-যন্ত্রণায় এমন করে ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা।

—নিরুপমা। নিরুপমা।

অ্যাণ্টনির এই সহৃদয় ডাক শুনেও নিরুপমা মাথা তুলল না, তার হাঁটুর উপর পড়ে রইল উপুড় হয়ে।

—আমার ঘাট হয়েছে, আমি ভুল করে ফেলেছি। কেলীর কথা বলতে গিয়ে বলে ফেলেছি কেলেঙ্কারির কথা। ভুল হয়েছে। ওঠো।

অ্যাণ্টনির কথা শুনে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল নিরুপমা। তার সজল দুটি চোখ ভরা যেন প্রতিবাদ। অ্যাণ্টনির মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, কিসের কেলেঙ্কারি? এ'কে কেলেঙ্কারি বোলো না।

কথা জড়িয়ে গেল অ্যাণ্টনির। সব কথা সে শিখেছে, কিন্তু সব কথার সব রকম মানে বুঝি সে ধরতে পারেনি এখনো। ঐ কথাটার মধ্যে এমন কি আপত্তি আছে বুঝতে না পারলেও সে ধরতে পারল যে, এতে নিরুপমা খুশি হয়নি। বলল, আচ্ছা, না বললাম।

এই গুরুতর অবস্থাটা হালকা করে দেবার জন্যে সে শব্দ করে হেসে উঠে সুর ক'রে বলল—

হিতে বিপরীতো হোলো,

হিতে হোলো বিপরীতো।

কুসুমে রয়েছে কীটো

জানিলে কে প্রাণো নিতো।

নিরুপমা স্থির হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলল, আমি ফরাসডাঙার কুমারী কন্যা, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু যার দৌলতে সে শৃঙ্গারভূষণ তাকে দেখিনি চিনিনি জানিনি। এ জীবনে তাই কলঙ্কও নেই, কেলেঙ্কারিও নেই। ফরাসডাঙা থেকে চলে আসতে হল লোকগঞ্জনায়, মুখের চুণকালি ঢাকবার জন্যে নয়।

সব জানে অ্যাণ্টনি। কিন্তু সেই জানার কথা বারবার উল্লেখ করলে কেমন বেমানান শোনায়। তাই চুপ করে রইল। কেবল তাকাতে লাগল নিরুপমার মুখের দিকে। বলতে পারলনা যে, এই জন্যেই কেলীর ছায়ায় এসে তারা আছে। কুঠিয়াল লোক সে, অমায়িক হতে পারে সজ্জনও হতে পারে, কিন্তু হুঁশিয়ারও। ওর পেয়াদা আছে, বরকন্দাজ আছে, লাঠিয়াল আছে। দরকার হলে তাদের দিয়ে কেলী এদের ইজ্জৎ রক্ষা করবেই।

এইজন্যেই মাত্র গৌরহাটিতে আসা, এবং এইজন্যেই ঐ কুঠির কাছে এই বাগানবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া। এর চেয়ে বেশি কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই অ্যাণ্টনির। কিন্তু নিরুপমাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলার ইচ্ছে তার হল না এখন। নিরুপমার মন এখন নরম হয়ে আছে, একটু ছোঁয়াতেই টোল পড়ে যাবে।

বাইরে রোদ উঠেছে চনচনে। বারান্দায় তিনটে শালিখ পাখি এসে কিচমিচ করছে। জাম গাছের মরাডালে কাক ডাকছে— কোয়া কোয়া।

কেলীর কুঠির সামনে এখন জনমানব নেই। সকালের কয়েক ঘণ্টার কথাবার্তাতেই দিনের বাণিজ্য সমাপ্ত করে তারা চলে গিয়েছে।

যার কথা থেকে এদের মধ্যে এত কথা হয়ে গেল, এমন সময় হঠাৎ সেই এসে হাজির। কেলী এসে হাজির হয়েছে। ভারি জুতোর শব্দ করতে করতে উঠে এসেছে বারান্দায়। লম্বা চেহারা, মুখ-ভরা দাড়ি-গোঁফ— এক বিরাট পৌরুষ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট পুরুষ।

পায়ের শব্দ শুনে ওরা দুজন বেরিয়ে এল বাইরে। কেলী হাসল, বাংলা জানেনা সে, দু-একটা দেশি কথা অবশ্য তার জানা আছে, নিরুপমার দিকে চেয়ে বলল, নমস্কার।

জলচৌকির উপর বসে পড়ল কেলী সায়েব, তার ভাইয়ের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কি-সব যেন বলাবলি করল, সে ভাষা বোঝার সাধ্য কি। নিরুপমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল।

তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বাগানটার চারদিক কেলী দেখল চেয়ে চেয়ে। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল— এই বাড়িটা বুঝি তার বেশ পছন্দ। যাবার সময় হাত বাড়িয়ে নিরুপমার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে হেসে কী যে বলল বোঝা গেল না।

চলে গেল কেলী সাহেব। কেলী চলে যাবার পর অ্যাণ্টনি বলল, এইজন্যে। এইজন্যেই আছি এখানে।

—কি, হয়েছে কি ?

—ফরাসডাঙা নাকি আবার নতুন ক'রে রেগে উঠেছে। তাই সাহস দিয়ে গেল।

নিরুপমা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি বলে তারা ?

—কি আর বলবে। বলে, নিরুপমাকে রেস্‌কিউ করতে হবে— উদ্ধার। আমি একটা পোর্তুগিজ, আমি নাকি— ইংরেজদের ভাষায়— একটা রোগ্। তারা পোর্তুগিজদের আদি-ইতিহাস নিয়ে টানছে। তাই সাহস দিয়ে গেল কেলী।

এ কথা শুনে নিরুপমার একটু ভয় পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে নির্ভীক মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রইল। তার এই মূর্তিটার দিকে তাকাতে ভরসা হল না অ্যাণ্টনির। আবার-যে পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আবার-যে সেই পুরনো দিনের ছায়া এসে পড়ছে এই বারান্দার কিনারে। একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে একদিন এই রকম ভয়হীন চেহারায় দেখেছিল অ্যাণ্টনি।

নিরুপমা বলল, পাঁচ বছর কেটে গেল। তবু আজও ফরাসডাঙা ভুলতে পারল না তার মেয়ের শোক। তাদের গিয়ে বলে এস, তাদের ভাবতে হবে না আমরা কথা। বলে এস তাদের, আমি আনন্দে আছি।

অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেন জ্বলে উঠেছে নিরুপমার চোখে, উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। বলল, যারা তাদের মেয়ের আসল দুঃখ বোঝে না, যারা তাদের মেয়েকে আগুনে ছুঁড়ে দিতে পারলে বাঁচে, তাদের আবার—

অ্যাণ্টনির মনে কোনো রাগ-তাপ নেই, স্মিত হেসে সে বলল—

আমি পতঙ্গ আগুন দেখে
ঝম্প দিয়েছি।
এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালির বেশে
সুখেতে আছি।

নিরুপমা বলল, ও কথা থাক্। তোমার দাদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এস।

কেলী সায়েব মাঝে-মাঝেই আসে। এই আগাছা আর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অ্যাণ্টনি বুঝি দেখেও দেখে না। দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে পায়চারি করে তার বারান্দায়। পাখি ডাকে গাছে-গাছে, গাছের পাতা থেকে রোদ পিছলে পড়ে কেলীর মুখে আর গায়ে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে কেলীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল তার ভ্রাতা। দুজনে গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই প্রাক্তন বাগানবাড়ির চত্বরে। এখন একে বাগানবাড়ি বলা অবশ্য চলে না ; এখন এ বাড়িটা একটা জঙ্গলবাড়ি।

কেলীর বুঝি মতলব বাগানটা কিনবে। তার মতলবের আঁচ পেয়ে অ্যাণ্টনি মনে মনে হাসতে লাগল। বেওয়ারিশ বাগানটা কিনবে কেলী কার কাছ থেকে? আর, এ-বাগান যদি সে কেনেই তাহলে অ্যাণ্টনিরা আবার আস্তানা জোটাবে কোথায়? তার-চেয়ে থাক্-না, এটা যেমন আছে তেমনি থাক্, নতুন একটা বাগানবাড়ি গড়ে নিক কেলী তার মনের মত আর-এক জায়গায়। চন্দননগর থেকে ডুপ্লে সায়েবরা আসতেন ফরাসগঞ্জে ফুর্তি করতে, সেখানে মস্ত প্রমোদ-উদ্যান ছিল তাঁদের। কেলীও তেমনি গরিটিতে বাস ক'রে এখানেই বাগানবাড়ি না বানিয়ে ফরাসডাঙার বুকের উপর তৈরি করুক এক মস্ত বাগিচা। দুনিয়ার সেরা সেরা বাইজি এনে হল্লা-হুল্লোড় করুক ওখানে। ওই জমির একটি মেয়েকে নিয়ে এসে অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গির এখানে ঘরকন্না করা যদি তাদের পছন্দ হয়ে না থাকে তাহলে তারা কেলী ফিরিঙ্গির রস-কেলি সহ্য করুক নিজের বুকের উপর।

কেলী প্রায়ই আসছে। তার এখানে আসার মাত্রাটা হঠাৎ এমন বেড়ে গেল দেখে নিরুপমারও একটু উদ্বেগ হয়েছে বলে যেন মনে হয়। তার নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। পালকি বোঝাই লোকজন আসছে তার দরজায়, গঙ্গার কিনারে তার সদাগরী নৌকার বহর বাঁধা, সোরা মসলিন আর মসলা নিয়ে কোনো নৌকা চলেছে তমলুকে, কোনোটা মুর্শিদাবাদে, কোনোটা বেতড়ে। সে মানুষ এখানে এসে রোজ এমন সময় কাটিয়ে যাচ্ছে কেন?

এ কেনর জবাব দিতে পারে না অ্যাণ্টনিও। নিরুপমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। ঐ হাসি দেখে নিরুপমার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। গালের পাতলা চামড়ার নীচে সবুজ শিরার আভাস অদৃশ্য হয়ে যায়। নিরুপমার এই উদ্‌বেগের সঙ্গে অ্যাণ্টনির যেন কোনো সম্পর্ক নেই। কিসের পরোয়া তার।

ইংরেজরা এসেছে এখানে, ফোর্ট উইলিয়মের শেরিফের পেয়াদারা প্রায়ই গরিটিতে আসে নানা রকমের ওজুহাতে, নতুন ইংরেজি শিখেছে সেই দেশী চাকরেরা। কথায় কথায় ইংরেজি বলে। তাদের কাছ থেকে দু-চারটে কথা শিখে ফেলেছে অ্যাণ্টনিও। সেইজন্যে সেই ভাষাতেও সে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে এখন। অ্যাণ্টনি কারো পরোয়া করেনা— এইটেই জানা ছিল, এবার ইংরেজি কথাটা উচ্চারণ করল সে, বলল, কে করে কেয়ার।

প্রাত্যহিক পূজার সংক্ষিপ্ত আয়োজন নিয়ে ঘরের এক কোণে জোড়াসন হয়ে বসে পূজা করছিল নিরুপমা, অ্যাণ্টনি উঁকি দিয়েই সরে আসছিল, নিরুপমা তার দিকে তাকাল।

গলবস্ত্র হয়ে নিরুপমা প্রণাম সমাপ্ত ক'রে সোজা হয়ে বসা মাত্র অ্যাণ্টনি বলে উঠল, ব্রাহ্মণী, সমাচার শুভ।

অ্যাণ্টনির এ রসিকতার সম্বোধনে সে হাসল না, জিজ্ঞাসার চোখ নিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল নিরুপমা, কপালে সিঁদুরের টিপের একটু উপরে শ্বেত চন্দনের একটি ফোঁটা। ফোঁটাটা কপালের রঙয়ের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, কি? কি সমাচার?

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অ্যাণ্টনি বলল, কেলী আমার ব্রাদার। আমার ভাই। আমার রামচন্দ্র।

কিছু বুঝতে না পেরে নিরুপমা বলল, হয়েছে কি? ভালো করে বলো।

কেলী আসত অন্য মতলবে। বাগান কেনার মতলবে না। আজ তা স্পষ্ট জেনে এসেছে অ্যাণ্টনি। ফরাসডাঙার মানুষগুলোর কাজ নেই কোনো। কেবল জুয়া আর জালিয়াতি নিয়ে মেতে আছে, শুধু মদ আর মেয়েমানুষ; নেশার ঝোঁকে নানারকম ইচ্ছে তাদের জাগে। তাদের দেশের একটি মেয়েকে নিয়ে গিয়ে পোর্তুগিজ ফিরিঙ্গি বন্দী করে রাখবে— হতে পারে না, হতে পারে না। মদের নেশায় চুর হয়ে সেদিন নাকি কেঁদেছে হলধর মিত্রের পুত্র জটাধর, আর মল্লিকদের মেজকর্তা শ্রীপতি। তারা এই বাগানবাড়িতে ফূর্তি করতে আসবে বলে তৈরি হচ্ছিল পরদিন থেকে। কেলী এ খবর পেয়েই তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। কেলীকে ভয় না করে কে? ওদের বুঝি ধারণা ছিল, অ্যাণ্টনিকে বরদাস্ত করে না কেলী সায়েব, তার ভায়ের ঘরে হিন্দু বউ সহ্য করতে পারেনা সে। এই ভরসায় তারা দল পাকাচ্ছিল। কেলী তাই রোজ এখানে আসা আরম্ভ করল। সকলে দেখুক, সকলে জানুক, অ্যাণ্টনির সঙ্গে কেলীর

মিলমিশ আছে কিনা। এদের মধ্যে এতটা মিল আছে জানলে কেউ এসে এখানে হানা দিতে সাহস করবেনা। ভিমরুলের চাকে কেউ কি খোঁচা দেয়? কেলীতে আর ভিমরুলে তফাত কি।

—কে বলল তোমাকে? কোথা থেকে শুনে এলে? জিজ্ঞাসা করল নিরুপমা।

অ্যাণ্টনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল যেন কত কথা। অনেক কথা ভাবতে লাগল সে। মিত্তিরদের জটাধর আর মল্লিকদের শ্রীপতি—সকলকেই চেনে সে। তাদের কথা ভাবতে ভাবতে একবার মাত্র কটাক্ষে সে তাকাল নিরুপমার দিকে। কিন্তু নিরুপমার কথার উত্তর দিল না। ওই প্রশ্ন বুঝি শোনেইনি?

নিরুপমা কাছে এসে তার গায়ে ঝাঁকি দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, শুনে এলে কোথা থেকে?

কত বিশ্রী আর কত মারাত্মক কথা বলত এই জটাধর আর ঐ শ্রীপতি, সে কথা মনে পড়ে গেছে অ্যাণ্টনির। ফরাসডাঙার এই ছোকরারা ছিল অ্যাণ্টনির সাঙাত। অনেক মনের কথা তারা বলেছে অনেকদিন। গোন্দলপাড়ায় যাওয়ার পথে পথের ধারের শিবতলায় দাঁড়িয়ে বটগাছের শিকড়ের দিকে চেয়ে জটাধর বলত, কুলীনের ঐ মেয়েটা বড় উপোসী।

শ্রীপতির উৎসাহ ছিল আবার একটু বেশি, বলত, চল্-না দলবেঁধে গিয়ে ভাঙি ওর উপোস। আমরা থাকতে খালি পেটে শুকিয়ে মরবে একটা জোয়ান মেয়ে। আমাদের কি পৌরুষ নেই বে জটাধর?

শ্রীপতিকে আরও উত্তেজিত করার জন্যে জটাধর যেসব কথা বলত, সে কথা উচ্চারণ করতে তো পারবেইনা অ্যাণ্টনি, সে কথা ভাবলেও তার শরীর কন্টকিত হয়ে ওঠে। শ্রীপতির সেই বর্ণনার সঙ্গে নিরুপমার মিল কতটা তা দেখার জন্যেই অ্যাণ্টনি কটাক্ষে তাকাল নিরুপমার দিকে।

তার সেই সাঙাতরা যে এখন এতটা সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে এ কথা বুঝি ভাবতে পারে না এই ফিরিঙ্গি।

জটাধর আর শ্রীপতি অনেকদিন অনেকভাবে এই প্রসঙ্গ তুলেছে, নেহাত অপছন্দ হলেও, এমন-কি এক-এক সময় নিদারুণ অসহ্য হয়ে উঠলেও, কোনো কথা বলতে পারেনি অ্যাণ্টনি। তার খেয়াল ছিল যে, সে একজন পোর্তুগিজ। বাঙালির সঙ্গে যতই বাংলা ভাষায় কথা বলুক, যতই বন্ধুত্ব করুক

ওদের সঙ্গে, তবু তার খেয়াল ছিল— সে একজন পোর্তুগিজ। তার পক্ষে কোনো প্রতিবাদ করা কিম্বা কোনো শুভ যুক্তি দেখানো সাজে না। তার কথার কোনো দাম হবে না, কোনো কথা বললে তা নিশ্চয়ই ব্যঙ্গের মত শোনাবে।

পোর্তুগিজরা কয়েক শতাব্দী ধরে এই দেশে যে অত্যাচার আর ব্যভিচার করেছে, সে খবর জানে অ্যাণ্টনি। বহুদূর দেশ থেকে এসেছিল তারা ব্যাণিজ্য করতে। বণিকেরা এসেছিল এখানে, তাদের উদ্দেশ্য মহৎ না হোক, অসৎ ছিল না। কিন্তু মানুষের মধ্যে সু যেমন আছে তেমনি আছে কু। সেই বণিকের পিছন-পিছন আসে কতকগুলো অসৎ মানুষও। তারাই এখানে ছড়িয়ে পড়ে, আর তারাই এ দেশের মানুষের উপর অত্যাচার করে। মুসলমান বাদশাদের রাজত্ব তখন। তখন না ছিল শাসন, না ছিল অরাজকতা-রোধ করার কোনো বন্দোবস্ত। নবাবেরা রাজ্যশাসনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে ছিলেন প্রজাশাসনে ব্যস্ত, এবং নবাবিতে নিমজ্জিত। তা না হলে বহুদূর দেশ থেকে আগত মুষ্টিমেয় বিদেশী বোম্বেটে এ দেশে ত্রাস সঞ্চার করে চলেছিল কী ভাবে। সেই পোর্তুগিজেরা এ দেশের মানুষ নিয়ে দাসব্যাবসা করেছে, এ দেশের মেয়েদের উপর যেসব অত্যাচার করেছে তার সীমা বা সংজ্ঞা নেই। মানুষকে মানুষ বলে মনে করেনি তারা। এ দেশের ছেলেমেয়েদের হরণ ক'রে তাদের হাতের চেটো ফুটো ক'রে সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বেত চালান করে একত্রে বেঁধেছে তাদের, আর গাদা ক'রে নৌকোর খোলের মধ্যে তাদের ভরতি ক'রে নিয়ে চলেছে দূর বন্দরে— মাঝে-মাঝে কয়েক মুঠো ভাত দিয়েছে ছিটিয়ে, অর্ধাহারে অনাহারে রাস্তার মধ্যে যারা মারা গিয়েছে তাদের ত্যাগ ক'রে জীয়ন্তদের দিয়ে তারা চলে গিয়েছে দাসী-হাটে। তাদের বাধা দিতে পারেনি কেউ।

এ সবই সত্য। পোর্তুগিজরা, শুধু এ দেশের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও তাই বোম্বেটে বলেই পরিচিত হয়েছে।

অ্যাণ্টনিও সেই পোর্তুগিজ। যার জাতি এই রকম কদর্য অপরাধে অপরাধী, সে যদি কোনো কুৎসিত ইঙ্গিতের প্রতিবাদ করে তাহলে সে-আপত্তি মানবে কেন এই জটাধর আর শ্রীপতি? মানবে তো নাইই, উপরন্তু কয়েকটা কটু কথাই নিশ্চয় বলে বসবে তার মুখের উপর। সে কথার আর কোনো প্রতিবাদই করতে পারবে না অ্যাণ্টনি।

তার চেয়ে চুপ করে থাকাই মঙ্গল। চুপচাপ তাই সব কথা শুনেছে এই ফিরিঙ্গি। মনে মনে ভয় পেয়েছে কখনো-কখনো— যদি সত্যিই এরা তাদের মনের কদয ইচ্ছা পুরণের জন্যে একদিন হানা দেয়।

বাদশাই আমল নেই বটে। পলাশির আমবাগানে মুসলমান নবাবের মসনদ চুর্ণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন এসেছে নতুন নবাব। ইংরেজদের নবাবি কায়েম হয়েছে এখন— সে নবাবি ছড়িয়ে গেছে বঙ্গ-বিহারে। কলকাতায় এখন জুয়ার ঢেউ চলেছে— টাকার ছড়াছড়ি। ইংরেজরা চেষ্টা করছে বটে— কিন্তু রাজকতা এখনো কায়েম হয়নি। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বিশপ তাঁর চাপরাশি আর বরকন্দাজ পাঠাচ্ছেন দরকার-মত এখানে আর সেখানে। এখন তাই সেই পুরাতন দিনের পোর্তুগিজ শয়তানদের মত খুশিমত শয়তানি করা হয়তো সহজ নয় অন্য জায়গায়। কিন্তু এই ফরাসডাঙায়?

অ্যাণ্টনি ভেবেছে। ভরসাও পেয়েছে। এ এলাকা ফরাসিদের বটে, কিন্তু অরাজকতা দমন করার জন্যে ফরাসি পদ্ধতিও যে আছে, তা সে জানে। এইটুকুই যা ভরসা। সেই ভরসায় নির্ভর ক'রে থাকে অ্যাণ্টনি।

একটু-একটু ছড়া বানাতে পারে ব'লে বন্ধুমহলে তখন নাম করেছে অ্যাণ্টনি, জটাধর বলল, এই ফিরিঙ্গি-কবি, বাঁধো একটা ছড়া। শুনি আমরা। যৌবতী, তোর যৈবনেতে আছে কিসের মৌ—

বলেই নিজের রসিকতায় অটহাস্য ক'রে উঠল জটাধর।

শ্রীপতি বলল, দাঁড়াও। আমি বলছি, রেখে দাও তোমার ফিরিঙ্গি-কবিকে।

শ্রীপতি ভাবতে লাগল শিবমন্দিরের সিঁড়ির উপর একটা পা তুলে দিয়ে, ভাবনা শেষ করে বলল, ছিরিপতির জটাধরের হও-না ঘরের-বউ।

শ্রীপতিকে জড়িয়ে ধরল জটাধর, হাসতে হাসতে বুঝি খিল ধরে গেল পেটে। হাসি থামিয়ে বলল, ওরা নেই, আমরা আছি। ভয় কি আমাদের। চল, আখড়া খুলি একটা। আমি রাম্ব, তুমি নৃসিংহ। আমরা আজ সখীসংবাদের পালা আরম্ভ করলাম। কি বল? আমাদের সখী ওইখানে—

ব'লে বটগাছের দিকে আঙুল নির্দেশ করল জটাধর।

নবীন-রাম্ব আর নবীন-নৃসিংহ নিজেদের নিয়েই মত্ত হয়ে গেল আনন্দে।

ওদের ছেড়ে অ্যাণ্টনি চলে গিয়েছেন সেদিন। শুধু ভয় ছিল মনে, কোনো অঘটন না ঘটে যান।

ব্যভিচারীরা বড় কাপুরুষ হয়ে থাকে বলে আগে শুনেছে অ্যাণ্টনি। কোনো দিন তার কোনো প্রমাণ পায় নি। কিন্তু সত্যিই অঘটন যেদিন ঘটল, সেদিন সে এর প্রমাণ পেয়ে গেল।

অ্যাণ্টনি ছুটে গিয়েছিল মল্লিকদের বৈঠকখানায়। শ্রীপতি জটাধর ও আরও পাঁচজন ইয়ার তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে খিস্তিখেউড় করছে তখন। অ্যাণ্টনি দারুণ দুঃসংবাদটা জানাল, মেয়েটাকে রক্ষা করার জন্যে কি করা যায় পরামর্শ চাইল ব্যস্ত হয়ে।

অট্টহাস্য করে উঠল ইয়ারের দল একসঙ্গে। শ্রীপতি মুখ থেকে ফরশীর নল নামিয়ে বলল, ঐ সতীদহে যাব, বল কি ?

জটাধর তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল, বলল, ওখানে গেলে প্রাণ নিয়ে কি ফেরা যাবে ? পতিদাহ করে ছাড়বে। আমাদের ধরে তুলে দেবে ওই চিতার আগুনে। প্রাণে বেঁচে থাকলে অনেক মেয়েমানুষ পাওয়া যাবে। ওসবের মধ্যে নেই ভাই। হিন্দুর সংকর্মে কিরিঙ্গির মুরুব্বিয়ানা কেন হে ?

কি জন্যে যে তার এ মুরুব্বিয়ানা, সে কথা বলে বোঝাবার নয়, সে কথা তখন সে লুকিয়ে রেখেছে।

অ্যাণ্টনি তবু একটু বোঝাবার চেষ্টা করল, একটু সাহায্যই চাইল বুঝি, কিন্তু ওরা জমে গেছে মজলিশে, এখন ওদের ওঠা অসম্ভব। তা ছাড়া, জটাধর বলল, আমাদের প্রাণে ভয় নেই নাকি হে ? একি আগুন নিয়ে খেলা ? ওই পুরোহিত আর কালীসাধকেরা যেমন-তেমন লোক না। ওদের বাধা দেবার সাধ্য নেই। বাঁশের বাড়ি দিয়ে মাথার খুলিই দু ফাঁক করে দেবে।

অ্যাণ্টনি আর দাঁড়াল না। বোম্বেটের জাত সে, তার জাত এ দেশের অনেক মেয়েকে হরণ করেছে, অনেক অনাচার করেছে। তার জাতের সেই নিভন্ত গৌরব আবার সে জ্বালিয়ে তুলতে চায়।

দ্রুত পায়ে অ্যাণ্টনি হাঁটা দিয়েছিল সেদিন সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকে। একেবারে অকুস্থল অভিমুখে।

সেদিনের সেই নিরুপমা আজ তার পাশে। আর সেদিনের সেই জটাধরেরা আজ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে, আজ আবার তাদের মনে পড়ে গেছে তাদের ফরাসডাঙার মেয়েটার কথা।

নিরুপমার প্রশ্নের উত্তরে অনেকক্ষণ বাদে অ্যাণ্টনি বলল, কেলীর কাছে শুনে এলাম। ওরা বেশি বাড়াবাড়ি করলে কেলী ওদের ভালো-মত শিক্ষা দেবে

বলে ঠিক করেছে। তার উপর ফোর্ট উইলিয়মের বিশপকেও জানিয়ে রাখবে—যেন চন্দননগরের গবর্নরকে এ কথা জানানো হয়। এ কি নবাবি আমল যে, যার যা খুশি তাই করবে ?

নিরুপমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, এই ঘন গাছ-গাছড়ার নিবিড় নেপথ্যে তার এই অটল-মূর্তি দেখে যেন মনে হল, নিপুণ শিল্পী তাঁর দক্ষ বাটালি দিয়ে এই বাগানবাড়ির শোভা বৃদ্ধি করার জন্যে নিটোল মর্মরমূর্তি তৈরি ক'রে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই বারান্দার উপর।

নিরুপমা এইভাবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তারা কারা ? ওরা কারা ? কাদের কথা বলছ ?

নাম উচ্চারণ করতে হল না অ্যাণ্টনিকে। অ্যাণ্টনির মুখের ভাব দেখেই নিরুপমা বুঝি চিনে নিল সেই দস্যুদের, বলল, বুঝেছি। ফরাসডাঙা ছেড়েছি তাদের উৎপাতে। এই আমি দাঁড়ালাম। তারা আসুক। এই ডাঙা আমি ছাড়ব না, এ কথা তারা যেন জেনে রাখে। এটা মগের মুল্লুক নয়।

কথাটা বলেই অ্যাণ্টনির মুখের দিকে তাকাল নিরুপমা। এ চাহনির মানে বুঝতে পারল অ্যাণ্টনি। তাই এই নিদারুণ মুহূর্তেও তার মুখে চোরা হাসি জেগে উঠল।

দুই হাত পিছন দিকে নিয়ে অ্যাণ্টনি পায়চারি করতে করতে তাঁতের গায়ে এসে দাঁড়াল, সেইখানে থমকে থেমে সে টানা-দেওয়া সুতোর উপর আলগোছে আঙুল বুলাতে লাগল, যেন একটা তারযন্ত্রে সে নিজের মনে একটা অচেনা রাগিণী বাজাচ্ছে।

মগের মুল্লুকই বটে এটা। এ কথাটার চলন হয়েছে যাদের দৌলতে অ্যাণ্টনি যে তাদের জাত। নিরুপমা যে তারই ঘরণী। নির্বাধ অত্যাচারে পোর্তুগিজরা এ দেশে যখন ত্রাসের সঞ্চার করেছে, ভাগীরথীর বুকের উপরে অবাধ দস্যুতার অভিযান চালাবার জন্যে যখন এ নদী দস্যুনদী বলে খ্যাত হয়েছে, তখনই তো এ দেশের মানুষ এই দেশকে বলেছে মগের মুল্লুক। পোর্তুগিজদের সে অত্যাচারের তুলনায় ঠগীদের অনাচার ছিল তুচ্ছ।

অ্যাণ্টনি আবার হাত দুটো পিছনে নিয়ে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে এল নিরুপমার কাছে, হেসে বলল, মগেরই মুল্লুক এটা। আমিও একটা মগ। কিন্তু সব মগ সমান না, এই যা রক্ষে। এ দেশেরও সব

মানুষই কি মিরজাফর? এ দেশে মোহনলালও আছে। মগেদের মধ্যেও তেমনি আছে এই অ্যাণ্টনি। কি বলো?

এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না নিরুপমা। তার বলারও কথা অন্য। সে বলতে চায় ওই জটাধরদের কথা। তাদের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে কারো সাহায্য চায় না, ওইটুকুই তার বলার কথা। এই বাড়িটা ছেড়ে যাবার ইচ্ছে সে একবার জানিয়েছিল বটে, কিন্তু তার কারণ ছিল আলাদা। কিন্তু এখন সে ছাড়তে রাজি না এই বাড়ি। তাকে এখান থেকেও উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র যদি কেউ ক'রে থাকে তাহলে সে তাদের জানিয়ে দিতে চায় যে, পরের ইচ্ছায় সে নিজেকে এক পা চালিত করতে রাজি না।

বলল, সতী আমি হইনি বটে, কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে, আমি সতী নই। জটাধরদের এটা জানা দরকার।

প্রবোধ দেওয়ার মত ক'রে অ্যাণ্টনি বলল, এতে এত উত্তেজিত হওয়ার কোনো মানে নেই। একটু সাবধানে থাকতে হবে, এই মাত্র। কেলীও সেই কথা বলছিল।

—তোমার দাদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এস। তার পরামর্শের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি যেন ব্যস্ত না হন্।

অ্যাণ্টনি যেন একটু ব্যস্ত হল, বলল, বলে আসব। তুমি এখন চুপ ক'রে বোসো। তোমার পুজো বাকি আছে হয়তো। শেষটুকু সেরে নাও। আমি আসছি।

সিঁড়ি দিয়ে এক পা নেমে পড়েছিল অ্যাণ্টনি, নিরুপমা বাধা দিল, বলল, থাক্। কেলী সায়েবকে বলতে হবে না কিছু।

ব'লেই নিরুপমা সিঁড়ির উপর বসে পড়ল, দুই হাতের মধ্যে নিজের মুখটা চেপে ধরে বলল, অপমান। অপমান। আমি কী করেছি ওদের? ওরা কী ভেবেছে আমাকে?

নিরুপমার পাশে উঁচু হয়ে বসল অ্যাণ্টনি, বলল, কী করেছ জান না? ওদের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রেখেছ।

ঘাড় ফিরিয়ে রুষ্ট চোখে অ্যাণ্টনির দিকে তাকাল নিরুপমা, বলল, এ কথার মানে?

সব কথার মানে অত ব্যাখ্যা করে বলার আগ্রহও নেই অ্যাণ্টনির। এ মানে আর খুঁজে লাভও নেই কোনো। অ্যাণ্টনি তাকে বোঝাল। যে

শয়তান সে শয়তানই। যে লোভী সে লোভীই। তাদের চরিত্র-শোধনের দায়িত্ব তো আর নেওয়া যায় না। নিজেদের স্বভাব নিয়ে তারা বিচরণ করে বেড়াক, তাদের আচরণ লক্ষ্য না করলেই হল।

কেলী তবু আসে, মাঝে-মাঝেই আসে। অ্যাণ্টনিও তার ভ্রাতার কুঠির বারান্দায় গিয়ে ব'সে সদাগরদের যাতায়াত দেখে। মসলার ঝাঁঝালো গন্ধের মধ্যে বসে থেকে দূর দ্বীপের দারুচিনি-বনের আর লবঙ্গলতাকুঞ্জের স্বপ্ন দেখে। আর তার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে নানান পদাবলী। কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে যেতে হবে রাসপুর্ণিমায়।

এই পথ দিয়ে চলে যায় একে-একে কত লোক। কেউ পদব্রজে, কেউ পাল্কি-বেহারার স্কন্ধে, কেউ বা অশ্বপৃষ্ঠে। কত কাজ ওদের। কত ব্যস্ততা ওদের। কত মানুষের আনাগোনা। তাদের মুখে আলাদা-আলাদা রকমের ফিকিরের ছাপ। কে যে কী চায়, কে যে কী হতে চায়, কে যে কার কাছে কী চায়— সব বুঝে ওঠা মুশকিল। এত চেয়ে, আর এত পেয়ে লাভ হল কী— তারও তো কোনো হিসেব নেই। সিরাজোদ্দৌল্লা এত নবাবির বহর দেখিয়ে অবশেষে গিয়ে আশ্রয় নিল রাজমহলে। কোথায় গেল তার নবাবি? তার চেয়ে, কিছু না চেয়ে আর কিছু না পেয়ে এইভাবে দিন কাটাতে পারলে নিজের মনকে কি সত্যিই একটা রাজ-মহল বলে মনে হয় না?

সেই রাজ-মহল নিয়ে সুখে দিন কাটিয়ে দিতে চায় সে। বাইরের কোনো ঐশ্বর্যে তাই তার টান নেই।

অমাবস্যার গভীর রাত্রি নেমেছে গর্বিটার বাগানবাড়ির উপর। জমাট অন্ধকারের মতই নিরেট স্তব্ধতা চার দিকে নেমে এসেছে নিবিড় হয়ে। শাখায় শাখায় হাত-ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে ব'লে দিনের বেলা মনে হয় যেসব গাছেদের দিকে চেয়ে, সেসব গাছ অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। সবাই মিলে-মিশে এখন একাকার হয়ে অখণ্ড এক চাপ অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাগানবাড়ির ঘরের বাইরে। হঠাৎ বেজে ওঠে পাখা-ঝাপটানির শব্দ, ঘুমের ঘোরে কোনো অসাবধানী পাখির পা হয়তো পিছলে যায় গাছের ডাল থেকে, পাখার ঝাপট দিয়ে নিজেকে আবার সে ভালো করে বসিয়ে নেয় ডালের উপর। ঝিঁঝির ঐকতান-ধ্বনির মত একটানা ঝমঝম শব্দে যেন অন্ধকারের পথে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আবৃত ক'রে নূপুর বাজিয়ে নৃত্য করে চলেছে কোনো বন-সুন্দরী। বহু দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের ডাক— অনেক দূর

থেকে, কে বলতে পারে এ ডাক কয়াসভাঙার দেশ থেকেই ভেসে আসছে কি না। আর শোনা যায় হুগলী নদীর নাবিকদের গলা— এপারের নৌকো থেকে ওপারের ঘাটে-বাঁধা নৌকোর নাবিককে ডাকছে হয়তো কেউ। থমথম করে গরিটির বাগানবাড়ি। নিশীথ রাত্রের একটি নিদ্রিত পুরীর মত নীরবে এই অন্ধকারের অতলে ডুবে আছে এই উদ্যান। রাস্তার ওপারে কেলীর কুঠিতে মাত্র আলো জলে একটা টিমটিম ক'রে।

আকাশ তারায় তারাময়। আকাশের আঙিনায় মুক্তোর হরিলুঠ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে বুঝি কেউ। কেবল এই বাগানবাড়িটা নয়, সারা গরিটির উপর ঝুঁকে পড়ে আছে ওই মুক্তাখচিত আকাশ— যেন আড়াল ক'রে ধরে আছে বাইরের পৃথিবী থেকে এ'কে আলাদা ক'রে।

এই রাত্রির গভীরে যদি কোনো দুর্বৃত্ত হানা দেয় এখানে, তাহলে তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। কেউ এসে তাদের পথ রুখে দাঁড়াবে, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই বুঝি দায়। ঐ যে ডাকছে শৃগালের দল, কারও পদশব্দ পেয়েই কি ওরা সচকিত হয়ে ঐ রব তুলছে?

ঘুম আসে না। দরজা আঁট করে বন্ধ করা। দেয়ালের গায়ে বসানো মেটে তেলের বাতি থেকে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে ফিকে আলোর ইঙ্গিত।

অ্যান্টনির মাথায় আস্তে করে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল নিরুপমা, বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে না।

পাশ ফিরে শুয়ে অ্যান্টনি বলল, আমারও না।

আশ্চর্য লাগল নিরুপমার। তার ধারণা ছিল যে, সে বুঝি একাই জেগে আছে। তাই আবার বলল, ঘুম পাচ্ছে না বল নি কেন আগে?

উত্তর দিল না অ্যান্টনি। চুপ ক'রে পড়ে রইল। অ্যান্টনির মুখে কোনো কথা নেই দেখে বড় বিরক্তই ঠেকল বুঝি নিরুপমার।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, আমাকে চেনে না ওরা।

—কাদের কথা বলছ? এতক্ষণে কথা বলল অ্যান্টনি।

—তোমার বন্ধুদের কথা। তোমার জটাধর আর তোমার শ্রীপতি। কয়াসভাঙার শ্মশানঘাট থেকে অতগুলো মানুষের চক্রান্ত এড়িয়ে যে-মেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে, তার কাছে ওই দুটি লম্পটকে সায়েস্তা করা এমন কী কঠিন কাজ? তখন তুমি যেভাবে সাহায্য করেছিল, ঠিক সেইভাবে যদি আবার সাহায্য কর তাহলে আর-কারও সাহায্য

আমি চাই না। তোমার ভাই কেলীরও না, এমনকি কোর্ট উইলিয়মের শেরিফেরও না।

নিরুপমার কথা শুনে অ্যান্টনি হাসল, বলল, সেদিন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল মাথায়—

—কেন, ঝোঁকটা বুঝি এখন আর নেই? কেটে গেছে বুঝি?

উঠে বসল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, দেয়ালের থেকে আলো ঠিকরে এসে পড়ল তার দুই কটা চোখে, মনে হল, গরিটির বাগানবাড়ির গভীর অন্ধকারের মধ্যে বুঝি জ্বলে উঠেছে বাঘের দুটো চোখ।

অ্যান্টনি বলল—

আছে চোখের দৃষ্টি য-দিন,
য-দিন আছে প্রাণ এ-প্রাণে।
মনের সে ঝোঁক কাটবে বলে
সন্দেহ তো হয় না মনে।

—খুব হয়েছে। নিরুপমা বলল, কথায়-কথায় কেবল ছড়া। আর কতদিন বাকি আছে রাসের? খেয়াল আছে তো?

হাসতে লাগল অ্যান্টনি, একটু বুঝি ভেবে নিল সেই হাসির ফাঁকেই। সবুজ দুটো চোখ জ্বলতে লাগল দুটো সহজ সংকেতের মত। হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে দুলে দুলে বলল—

হয়তো আছে দিন-পনর,
সময় যে নেই শীঘ্র কর।
আসছে অমাবস্যা-নিশা,
অন্ধকারে হারায় দিশা।

নিরুপমা খুশি হল না, বলল, অমন ছেলেমানুষী কাব্য করলেই হয়েছে। ওর মধ্যে না আছে স্বাদ, না আছে রস।

বাইরে রাত্রি নিবিড় তপস্যায় মগ্ন, আচম্বিতে সেই তপস্যার ছোঁয়াচ এসে লাগল বুঝি ফিরিঙ্গি-কবির মনে। সে স্তব্ধ হয়ে বসল, অনেকক্ষণ পরে একটু নড়ে উঠল, তার বুঝি মনে এসে গেছে দুটি ছত্র—ময়রা-ভোলাকে উদ্দেশ করে বলার মতন কথা, সুর করে বলল—

আমি হালুইকরের দোকান
খুলিনি তো শ্যামবাজারে,

আমার বুকে খুলেছি হাট
বসায়েছি শ্যাম-বাজারে।

কিছুক্ষণ গুনগুন করে গানটি গেয়ে অ্যাণ্টনি নিরুপমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, ভোলা ময়রাকে এই রকম কথা দিয়ে ঘা দিলে কেমন হবে ?

—তা এক রকম হবে। কিন্তু ঘায়ের উত্তরে পাল্টা ঘা আছে। ভোলাও ছেড়ে কথা বলবে না। তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

অ্যাণ্টনি হাত নেড়ে বলে উঠল—

তা আছি তা আছি তৈরি,
আসরে আসুক বৈরি।
হাতে না থাক্ তীর বা ধনুক, মুখে আছে বাক্যবাণ,
সে অস্ত্রেতে লড়াই করে করব ওদের ছত্রখান।

বাইরে বনসুন্দরীর পায়ে ঝিঁঝির নূপুর বাজছে একটানা। এই নিভৃত নেপথ্যের আধো-আলো আধো-অন্ধকারের জগতে দুটি প্রাণী তাদের মনের পুলক বিতরণ করে চলেছে। কোথায় ভেসে গিয়েছে জটাধর, কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে শ্রীপতি— সে খেয়াল এখন আর তাদের নেই। তাদের এখন একমাত্র চিন্তা আসন্ন আসর, এবং সেই আসরের দ্বন্দ্বে অপরাভূত হয়ে ফিরে আসাই যেন একমাত্র কামনা।

সেই আলোচনাই তারা করে চলেছে। রাত্রির নিদ্রা দিয়ে যেন কোনো প্রয়োজন নেই, নীরবে নির্জীব হয়ে পড়ে থেকে অচেতনতার মধ্য দিয়ে অকারণে আয়ু নিঃশেষ করে দেবার ইচ্ছে তাদের নয়। তারা বুঝি তাদের জীবনকে এই গরিটির আর-পাঁচজন অধিবাসীর মত সাধারণভাবে ব্যয় করতে চায় না, একটি স্বতন্ত্র পথই তাদের পথ। যদি সাধারণ নিয়ম মেনে চলার বাসনাই থাকত, তাহলে সেই নিয়মের অগ্নিস্রোতে সেইদিনই তো ভস্ম হয়ে ভেসে যেত ভাগীরথীর ভাটার টানে।

নিয়মের শুধুমাত্র ব্যতিক্রম নয়, নিয়মকে অতিক্রম করার প্রবল উৎসাহ নিয়েই বুঝি জন্ম হয়েছে এদের। সেইজন্যে একপাল হন্তারকের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করার অপরিমেয় শক্তিও সেদিন পেয়ে গিয়েছিল নিরুপমা। এই যে পোর্তুগিজ লোকটা সেদিন তাকে সাদর সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে, নিরুপমা মুখের কথা দিয়ে সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় না। আর পাঁচজনের মধ্য থেকে একে পৃথক করতেও চায় না, একে সে করতে চায়— পাঁচজনের

আমি চাই না। তোমার ভাই কেলীরও না, এমনকি ফোর্ট উইলিয়মের শেরিফেরও না।

নিরুপমার কথা শুনে অ্যাণ্টনি হাসল, বলল, সেদিন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল মাথায়—

—কেন, ঝোঁকটা বুঝি এখন আর নেই? কেটে গেছে বুঝি?

উঠে বসল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি, দেয়ালের থেকে আলো ঠিকরে এসে পড়ল তার দুই কটা চোখে, মনে হল, গরিটির বাগানবাড়ির গভীর অন্ধকারের মধ্যে বুঝি জ্বলে উঠেছে বাঘের দুটো চোখ।

অ্যাণ্টনি বলল—

আছে চোখের দৃষ্টি য-দিন,
য-দিন আছে প্রাণ এ-প্রাণে।
মনের সে ঝোঁক কাটবে বলে
সন্দেহ তো হয় না মনে।

—খুব হয়েছে। নিরুপমা বলল, কথায়-কথায় কেবল ছড়া। আর কতদিন বাকি আছে রাসের? খেয়াল আছে তো?

হাসতে লাগল অ্যাণ্টনি, একটু বুঝি ভেবে নিল সেই হাসির ফাঁকেই। সবুজ দুটো চোখ জ্বলতে লাগল দুটো সহজ সংকেতের মত। হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে দুলে দুলে বলল—

হয়তো আছে দিন-পনর,
সময় যে নেই শীঘ্র কর।
আসছে অমাবস্যা-নিশা,
অন্ধকারে হারায় দিশা।

নিরুপমা খুশি হল না, বলল, অমন ছেলেমানুষী কাব্য করলেই হয়েছে! ওর মধ্যে না আছে স্বাদ, না আছে রস।

বাইরে রাত্রি নিবিড় তপস্যায় মগ্ন, আচম্বিতে সেই তপস্যার ছোঁয়াচ এসে লাগল বুঝি ফিরিঙ্গি-কবির মনে। সে স্তব্ধ হয়ে বসল, অনেকক্ষণ পরে একটু নড়ে উঠল, তার বুঝি মনে এসে গেছে দুটি ছত্র—ময়রা-ভোলাকে উদ্দেশ করে বলার মতন কথা, সুর করে বলল—

আমি হালুইকরের দোকান
খুলিনি তো শ্যামবাজারে,

আমার বুকে খুলেছি হাট
বসায়েছি শ্যাম-বাজারে।

কিছুক্ষণ গুনগুন করে গানটি গেয়ে অ্যাণ্টনি নিরুপমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, ভোলা ময়রাকে এই রকম কথা দিয়ে ঘা দিলে কেমন হবে ?

—তা এক রকম হবে। কিন্তু ঘায়ের উত্তরে পালটা ঘা আছে। ভোলাও ছেড়ে কথা বলবে না। তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

অ্যাণ্টনি হাত নেড়ে বলে উঠল—

তা আছি তা আছি তৈরি ;
আসরে আসুক বৈরি।
হাতে না থাক্ তীর বা ধনুক, মুখে আছে বাক্যবাণ,
সে অস্ত্রেতে লড়াই করে করব ওদের ছত্রখান।

বাইরে বনসুন্দরীর পায়ে ঝিঁঝির নূপুর বাজছে একটানা। এই নিভৃত নেপথ্যের আধো-আলো আধো-অন্ধকারের জগতে দুটি প্রাণী তাদের মনের পুলক বিতরণ করে চলেছে। কোথায় ভেসে গিয়েছে জটাধর, কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে শ্রীপতি— সে খেয়াল এখন আর তাদের নেই। তাদের এখন একমাত্র চিন্তা আসন্ন আসর, এবং সেই আসরের দ্বন্দ্বে অপরাভূত হয়ে ফিরে আসাই যেন একমাত্র কামনা।

সেই আলোচনাই তারা করে চলেছে। রাত্রির নিদ্রা দিয়ে যেন কোনো প্রয়োজন নেই, নীরবে নির্জীব হয়ে পড়ে থেকে অচেতনতার মধ্য দিয়ে অকারণে আয়ু নিঃশেষ করে দেবার ইচ্ছে তাদের নয়। তারা বুঝি তাদের জীবনকে এই গরিটির আর-পাঁচজন অধিবাসীর মত সাধারণভাবে ব্যয় করতে চায় না, একটি স্বতন্ত্র পথই তাদের পথ। যদি সাধারণ নিয়ম মেনে চলার বাসনাই থাকত, তাহলে সেই নিয়মের অগ্নিস্রোতে সেইদিনই তো ভস্ম হয়ে ভেসে যেত ভাগীরথীর ভাটার টানে।

নিয়মের শুধুমাত্র ব্যতিক্রম নয়, নিয়মকে অতিক্রম করার প্রবল উৎসাহ নিয়েই বুঝি জন্ম হয়েছে এদের। সেইজন্যে একপাল হন্তারকের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করার অপরিমেয় শক্তিও সেদিন পেয়ে গিয়েছিল নিরুপমা। এই যে পোর্তুগিজ লোকটা সেদিন তাকে সাদর সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে, নিরুপমা মুখের কথা দিয়ে সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় না। আর পাঁচজনের মধ্য থেকে একে পৃথক করতেও চায় না, একে সে করতে চায়— পাঁচজনের

একজন নয়— পাঁচজনের মধ্যে পঞ্চমও নয়, পাঁচজনের মধ্যে প্রথম। এইজন্যেই গভীর রাত্রের অন্তরালে নিরুপমা একে একে যেন অজ্ঞানিত মন্ত্রপাঠ ক'রে অ্যান্টনিকে করে তুলতে চায় মন্ত্রপুত।

রাত্রি কেটে যায়। ধীরে ধীরে সরে যায় অন্ধকার। বনসুন্দরীর পায়ের নূপুরধ্বনি থেমে যায় কখন কেউ জানতে পারে না, অন্ধকারের আঁচল সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আলোর আড়ালে চলে যায় সেই বনদেবী।

গাছে গাছে ডেকে ওঠে পাখি। গরিটিতে নেমে আসে নূতন ভোর।

গাগরির অঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে সূর্যের আলো, চারদিকে সেই আলো নিক্ষেপ করতে করতে গঙ্গাস্নানে চলেছে নিরুপমা। দুইধারে গাছের সারি; মাঝখানে রাস্তাটি গেছে এঁকে-বেঁকে। এঁকে-বেঁকে চলেছে নিরুপমা। নিতম্বে রুপালি চন্দ্রহার তার চলনের সঙ্গেসঙ্গে নামা-ওঠা করছে।

অপ্রশস্ত রাস্তাটি বড় রাস্তায় এসে পড়তেই থমকে দাঁড়াল নিরুপমা। কে আসছে ঐ? যেন চেনা-লোক?

পুব দিকে চোখ পড়তেই নতুন সূর্যের আলোয় দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায়, ভুরু কুঁচকে ডান হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে নিরুপমা দেখল। দেখে চিনতে পারল এবার। ফরাসগঞ্জের হরিশঙ্কর।

কাঁধে চাদর, বাঁ হাতে থেলো হুঁকো, ডান হাতে লাঠি— হরিশঙ্কর আসছে। নিরুপমাকে দাঁড়াতে দেখে হরিশঙ্কর একটু পা চালিয়েই আসতে লাগল।

সে কাছে এলে নিরুপমা বলল, কি গো মশায়? এত সকালে কোথায়?

—শান্তিপুরে।

—হঠাৎ শান্তিপুরে কেন?

—খবর দিয়েছে ভবানী। আমার জ্যাঠার ছেলে। নিশ্চয় জরুরি কোনো দরকার আছে।

নিরুপমার হাতের বালার ঘা খেয়ে ঠং করে বেজে উঠল গাগরি। অমনি ঝলক দিয়ে উঠল গাগরির গায়ে সূর্যের আলো।

হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, সায়েবের খবর কি? কেমন গান-টান হচ্ছে?

রাস্তাটা পার হয়ে গঙ্গার কিনারের দিকে আসতে আসতে নিরুপমা বলল, আমার তো কপাল। আমার কপালে জুটেছে এক পাগোল। ওকে সামাল দেওয়াই দায়। আসরে নেমে কি করবে কে জানে, আমার কান তো ঝালাপালা করে দিল।

—কেন, বলে কি ?

—বলে, তার ঘরের ভাণ্ডার নাকি ঐশ্বর্য দিয়ে ভরা।

হেসে উঠল হরিশঙ্কর, হাতের লাঠি দিয়ে রাস্তার ধুলোর উপর কি-একটা ছবি আঁকতে আঁকতে হুঁকোয় দুটো টান দিয়ে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ভুল বলে না হয়তো।

নিরুপমার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই সে। প্রভাত-সূর্যের পরিচ্ছন্ন আলোয় ঐ অঙ্গের সৌন্দর্য দেখে তার মনে পড়ে গেল অন্য কথা। রাধার কথা।

বলল, পাগোল হলে হবে কি। মাথা খারাপ হয়তো আছে, কিন্তু চোখ-দুটি নিশ্চয় পরিষ্কার। দৃষ্টি বড় সাফ।

নিরুপমাকে দেখে হরিশঙ্করের মনে পড়ে গেল নিজের সংকল্পের কথাটাই। মেয়েকে বিয়ে সে দেবে না। বিয়ে দিলেই তো এই অবস্থা। নিরুপমা নাহয় কোনো রকমে রঙ্কে পেয়ে নিজের জন্যে নতুন একটা জীবন খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু সব মেয়ের কি সে শক্তি আছে। আর, সব মেয়েই যে এই রকম নিজের মনের মত মানুষ পেয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা কি।

যে কথা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করে সেই কথাই ভাবতে লাগল হরিশঙ্কর, সেই সর্বজনবিদিত কথাটা— সব দেশের মানুষের মধ্যেই সু আর কু আছে। এই তো গৌরহাটির গঙ্গাতীর। এইখানেই মীরজাফর চক্রান্ত করেছিল ক্লাইভের সঙ্গে, আর এইখানেই ক্লাইভের সৈন্যেরা জমায়েত হয়েছিল মুরশিদাবাদে রওনা হবার আগে। তারপর সুন্দর একটা অভিনয় মাত্র হল পলাশিতে। সেই পলাশিতেই দেখা গেল আবার অন্য মানুষকেও— মোহনলালকে। একই দেশে পাশাপাশি দুটো বিপরীত মানুষ— মিরজাফর আর মোহনলাল। পোর্তুগিজ বোম্বেটের মধ্যেও তেমনি আছে বিপরীত মানুষ। কিন্তু সবার ভাগ্যেই এমন মানুষ জুটে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

হরিশঙ্কর একবার এ-দিক ও-দিক চারদিক চেয়ে দেখল। হয়তো ঠিক সেই জায়গাটা খুঁজল, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিরজাফরের চক্রান্তটা হয়েছিল। কিন্তু কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। একটা পীঠস্থান বলে গৌরহাটির লোকেরা জায়গাটা বাঁধিয়ে রাখলে পারত। ধিক্কার বাজতে লাগল হরিশঙ্করের মনে।

কাঁকালের গাগরি নিয়ে নিরুপমা গঙ্গার জলের দিকে নামতে লাগল।

চন্দনবৃক্ষকে যেমন জড়িয়ে ধরে সাপ, অবিকল সেই ভাবে নিরুপমার নিতম্ব বেষ্টন করে ধরেছে ঐ চন্দ্রহারটা। চন্দ্রের মতই শুভ্র, আর পূর্ণচন্দ্রের মতই নিটোল গোলাকৃতি ঐ হারটা, তাই বুঝি ওর ঐ নাম। কিন্তু এখন ঐ হার একটা রুপালি সাপের মত বেষ্টন করে আছে নিরুপমার নিতম্বদেশ।

প্রৌঢ় হরিশঙ্করের মনের মধ্যে সমবেদনা যেন মৃদু হাহাকার করে উঠল। আহা বেচারা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণীকে পিত্রালয়ে ফেলে রেখে কিসের মোহে দূর দেশে কাটাল সেই বেয়াকুবটা? পাতার বাহারেই জড়িয়ে থাকে যার মন, ফুলের সমারোহ থেকে তাকে বঞ্চিত হতেই হয়, ফলের ফসলও তার ভোগে লাগে না। নোনাদিঘির বিমলাকান্ত তার এক দৃষ্টান্ত, আর-এক দৃষ্টান্ত ঐ ব্রাহ্মণীর ব্রাহ্মণটি। হতভাগারা বিয়ে করে বেড়ায় অন্য-কোনো কারণে নয়, কেবল বুঝি সহমরণের দাবি ছড়িয়ে বেড়াবার জন্যেই।

অ্যাণ্টনি তাহলে ঠিক কথাই বলেছে, তার ঘরের ভাণ্ডার সত্যিই ঐশ্বর্য দিয়ে ভরা। নিরুপমা সে কথা অস্বীকার করলে উপায় কী।

সেই চালতে গাছ। এই পথে আরও অনেকবার হরিশঙ্কর যাতায়াত করেছে ইতিমধ্যে। এখানকার খেয়াঘাট থেকে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বার-কয়েক সে গিয়েছে ওপারে—চানকে। চানক থেকে ফিরে এসে, সদাগরী নৌকোর ভিড় এড়িয়ে নেমেছে এ-পারের ঘাটে। এই চালতে গাছের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমে ক্রমে চলে গিয়েছে ফরাসগঞ্জের দিকে। ইটের পাঁজর বের করা পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িঘর দু-পাশের মাঠ-কোঠায় ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে তার বাড়িতে।

কিন্তু আজ এই চালতে গাছের দিকে নজর পড়ল তার। নজর পড়া মাত্র সে ফিরে তাকাল জলের দিকে। বুক-জলে নেমে দাঁড়িয়েছে নিরুপমা, নদীর প্রবল স্রোত ওই বুকের পাহাড়ে বার বার আছাড় খেয়ে মরছে। ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করছে নিরুপমা। খালি গাগরিটা কিনারে কাদার মধ্যে বসানো। শূন্যকুম্ভটা বুঝি অপেক্ষা করছে ওই পূর্ণকুম্ভের জন্যে।

সামান্য একটু তফাতে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল একটা আধ-বুড়ো লোক। স্নান শেষ ক'রে সে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করছে, আর সূর্যপ্রণামের ছলে তার চোখের দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে অন্য দিকে। হরিশঙ্কর লক্ষ্য করছে এখান থেকে। ইচ্ছে হচ্ছে, ছুটে গিয়ে একবার খবর দিয়ে আসে ওই ফিরিঙ্গিকে। বোম্বেটের জাতটা এসে এই বুড়োটার প্রাণের রস একটু মেরে দিয়ে যাক।

চিনির কলে যেমন ক'রে আখ-মাড়াই হচ্ছে হুগলীতে, নীলকুঠিতে যেমন ক'রে নীলের পাতা নিঙড়ে রস বের করা হচ্ছে, সেইভাবে অ্যাণ্টনি ওই লোকটাকে একটু নিঙড়ে দিক।

নীলকুঠি! হরিশঙ্করের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল। নীলকুঠি কথাটা তার কাছে বড় অসহ্য। উঃ, কত দিনের একটা মৃত ঘটনা, তবু সে ঘটনা তার জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, তার মৃত্যুর পরেও সে ঘটনা তার জীবন থেকে পৃথক হবে না কিছুতে।

কিন্তু সে কথা আর না। সে কথা এখন আর চিন্তা করতে চায় না হরিশঙ্কর। কিন্তু মেয়ের কথা ভাবে সে। ভাবে রাধার কথা। মেয়ে হয়ে জন্মাল কেন তার মেয়েটা, এই যেন হরিশঙ্করের একমাত্র পরিতাপ। মুখের ডৌলে, গায়ের রঙে, আর চলায়-বলায় অবিকল তার ঠাকুরমার মত হয়েছে রাধা।

নিরুপমা এখনো জলে, কিন্তু কিনারে উঠে দাঁড়িয়েছে ঐ বুড়োটা। একটা পা ছোট আর একটু বাঁকা। কাদার উপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে তার পূজার উপকরণ গুছিয়ে নিচ্ছে— কোশাকুশি আর পিতলের ঘণ্টাটা। আঙুলের চাপ দিয়ে গলার পৈতাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার জল নিঙড়ে নিল। হাতে কাজ করছে ব'লে মুখের মন্ত্র থেমে যায় নি, মুখে মন্ত্র-উচ্চারণ চলেছে ব'লে চোখের দৃষ্টিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।

খোঁড়া মনোহর। শ্মশানের পুরোহিত মনোহর। এ'কে চিনতে অসুবিধে নেই কোনো। এ অঞ্চলে এর খ্যাতি অসাধারণ। কিন্তু পুব দিক থেকে সূর্যের আলো এসে জলে পড়ায়, পশ্চিম দিকে দাঁড়ানো হরিশঙ্করের চোখে ওকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল, তাই চিনতে পারে নি এতক্ষণ।

—জবাকুসুমসংকাশং জবাকুসুমসংকাশং।

মন্ত্র পড়তে পড়তে মনোহর চড়াইটুকু উঠে এসে দাঁড়াল সমতলে। একবার মাত্র ফিরে তাকাল পিছনে, ফিরে চেয়েই সূর্যের দিকে প্রণাম নিবেদন করল।

গাগরি কাঁকালে নিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে নিরুপমা চলে যেতে লাগল তার বাড়ির দিকে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে মনোহর ভট্টাচার্য। হরিশঙ্করের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হরিশঙ্কর বলল, কেমন আছেন মনোহরদা?

হাতের বুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে জলপূর্ণ কোশাকুশি ধরে ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে চলেছিল মনোহর, এই ডাক শুনে সে তাকাল

হরিশঙ্করের দিকে। মুখে মন্ত্র, তাই কথা বলতে পারল না, ইশারায় বলল, ঐ দিকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মনোহর, মন্ত্রটা আপাতত বন্ধ রেখে বলল, কে ঐ বউটা? ওটা ঐ ম্লেচ্ছটার রক্ষিতাটা না? গরিটির বাগানবাড়ির সেই ফিরিঙ্গিটার?

হরিশঙ্কর বলল, তা হবে।

—অনাচার আনাচার। সিঁথের সিঁদুরের ঘটা। কুলত্যাগিনীর এই অনাচারটাই লক্ষ্য করছিলাম। কথায় বলে-না, মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং, নিমেষে হরতি কালং সর্পং। অর্থাৎ, যৌবনের গর্ব করে কোনো লাভ নেই, নিমেষের মধ্যে কোন্ কালসাপের দংশনে সে গর্ব খর্ব হয়ে যাবেই।

সংস্কৃতের উপর মনোহরের আশ্চর্য দখল দেখে হরিশঙ্কর বিস্মিত হল বটে, কিন্তু সে বিস্ময় প্রকাশ করল না।

চারদিকে ম্লেচ্ছদের মেলা বসেছে। ওদিকে তীরে ভিড় করে নোঙর করে আছে ফরাসি আর ইংরেজদের বাণিজ্যতরী, মুসলমান দাঁড়িমাঝিরা নৌকোর পাটাতনে বসে উনুনে আগুন দিচ্ছে কেউ, কেউ তামাকু সেবন করছে, কেউ-বা সেলাই করছে পাল। স্রোতের জলে ভেসে ভেসে দোল খাচ্ছে নৌকোগুলি। এখনো কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হয় নি। রোদ একটু উঠলেই মাল-খালাস মাল-বোঝাই আরম্ভ হবে। সাদা রঙের ফিরিঙ্গি বণিকেরা তদারক করে বেড়াচ্ছে।

সেদিকে একবার তাকাল মনোহর। বলল, ঐ ম্লেচ্ছদের ছায়া মাড়াই নে আমরা, ছায়ায় পা লাগলে গঙ্গা নেয়ে শুদ্ধ হই। আর ওই মেয়েটা একটা ফিরিঙ্গিকে বুকে নিয়ে নাচাচ্ছে। স্বামীর চিতা ভালো লাগল না, ভালো লাগল একটা ফিরিঙ্গির চিত। বিপরীত কাণ্ড ঘটল ফরাসডাঙায়। খেদিয়ে দিল তারা, আস্তানা নিল এই গরিটিতে। শাস্ত্রে বলে, আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্নে— অর্থাৎ স্বামীর চিতানলে অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়, পরকালের একমাত্র ইষ্ট তাতেই। কিন্তু ওরা ইষ্ট চায় না, ওরা চায় খ্রীষ্ট। দেশটা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। পাদ্রিরাও ঘুরছে চারধারে, শ্রীরামপুরে ঘাঁটিও গেড়েছে। যাক্ সব যাক্। ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—

সূর্যের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম ক'রে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল খোঁড়া মনোহর।— টুংটুং-ঝুমঝুম শব্দে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আর কোশার সঙ্গে কুশির আঘাত হানতে হানতে।

স্বামীর চিন্তা ভালো লাগল না, ভালো লাগল কিরিঙ্গির চিত্ত— মনোহর ভট্টাচার্যের এই বাঁকা মন্তব্যটা হরিশঙ্করের বুকে বুঝি বঁড়শির মত বেঁকে বসে গেল। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে গেল নাকি ওই খণ্ডটা? এই গালটা শুধু নিরুপমাকেই দিল না মনোহর, গালটা যেন হরিশঙ্করকে উদ্দেশ ক'রেও নিক্ষেপ করা হল। সেইজন্যে একটু বেশি বিষাক্ত বলে বোধ হল মনোহরের উক্তি।

কিন্তু, থাক্। ও কথা ভেবে ভেবে নিজেকে জীর্ণ ক'রে কোনো লাভ নেই আর। ঘটনায় যা ঘটে গিয়েছে বেদনায় তাকে বেঁধে রেখে কোনো হিত হবে না।

ঢালু পথে নেমে পড়ল হরিশঙ্কর।

অভিলাষ আর মালতীর জন্যে মন একটু চঞ্চল হল বটে, কিন্তু এ ঘাটে তারা কি চিরকাল অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে? নতুন কোন্ ঘাটে গিয়ে তারা তাদের তরী ভিড়িয়েছে সে খবর খুঁজে দরকার কি। কোনো দরকারই নেই, তবু তাদের খবর জানার কৌতূহল একটু জাগে। সেইজন্যে শ্মশানের দিকে এক মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে। পর মুহূর্তেই নেমে যায় একেবারে নীচে, জলের ধারে।

বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছই-লাগানো সার-সার নৌকো বড বড় বাণিজ্য-তরীর পাশে মোচার খোলার মত ভাসছে।

—শান্তিপুরে যাবে কে? যাবে নাকি ইয়াসিন? যাবে নাকি দশরথ? ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল হরিশঙ্কর।

শান্তিপুরে যাবে সে, ভালোই লাগছে তার। তবু হরিশঙ্করের মন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায় যে-বানে, সেই বান সে চায়, কিন্তু এ নদীতে সে বান আসে না। এ নদীর বানের ধরণ আলাদা। এতে সাময়িক ভাবে নিভে যায় কোনো অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু বুকের মধ্যে কুণ্ড জ্বলে যে আগুনের, সে অগ্নি নেভাবার মত প্রবল বানের জন্যে প্রাণ বুঝি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এই পুরুষ-হরিশঙ্করের।

মেয়েদের মনের খবর সে রাখে না, সেই মালতী নামে অচেনা মেয়েটির কিংবা নিরুপমা নামে এই চেনা মেয়েটির বুকের মধ্যেও নিশ্চয় জ্বলেছিল সে আগুন, তা নেভাবার জন্যে কোনো ভাগীরথীর ভরসা না পেয়ে তারা নিজেরাই তা উপশমের বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এতে কারো মঙ্গল হল, কিংবা কারো

অকল্যাণ হল কিনা— সে-খবর রাখার প্রয়োজন ঐ মেয়েরাও মনে করে নি, হরিশঙ্করও সে খবর রাখে না।

এখান থেকে শান্তিপুর পুরো একটি দিনের পথ। এই স্রোতে ভেসে ভেসে যেতে হবে তাকে। দুপাশে কত ঘাট কত আঘাটা, কত কুঠি কত কুঠিয়াল, কত শ্মশান কত লোকালয় দেখতে দেখতে যেতে হবে তাকে। গৌরহাটি-শ্মশানের সেই শোভাযাত্রার মত হয়তো এই রাস্তায়ও দেখবে পুণ্যলোভী সধবার মিছিল, আর, কোনো অসহায় বিধবার আকুল কান্নার শব্দ।

এই তার ভয়। ওসব দৃশ্য সে আর সহ্য করতে পারে না।

সে জানে রাধারও ঐ অবস্থা। তার কচি মনের উপর যে ছাপ পড়েছে, বড় হবার সঙ্গেসঙ্গে সেই ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, আর সেই সঙ্গে মেয়ের মুখও উঠছে শুকিয়ে।

নিরুপমার গর্ভে কোনো সন্তান হলে তার জাত হবে কী? সে কি পোতুর্গিজ বলে পরিচিত হবে, না, বাঙালি ব'লে? আর ঐ মালতীর? মালতীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, অভিলাষ তো বিদেশ-বিভুঁয়ের কোনো মানুষ নয়, এই দেশেরই ছেলে। কিন্তু নিরুপমার কথাটাই চিন্তা করার মত। ঐ পোতুর্গিজরা তাদের অনেক বংশধরই অবশ্য ফেলে রেখে গেছে বাংলাদেশের উপকূলে।

পুরাতন কথাই নূতন ক'রে ভাবতে লাগল হরিশঙ্কর। ষোড়শ শতকের শেষদিকে, অর্থাৎ সম্রাট আকবর যখন দিল্লির তক্তে, সেই সময়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে পোতুর্গিজেরা— আরাকানে আর চট্টগ্রামের উপকূলে। নিজেদের বিক্রম ও দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে এরা এ দেশের শাসকদের চমকিত করে তোলে। তাঁদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে এই ফিরিঙ্গিদের উপর। সাহস আর বিক্রম এদের ছিলই, তার উপর ছিল নৌ-পরিচালনার নিপুণ কৌশল— এ কৌশল জানা না থাকলে বিশাল সমুদ্র অতিক্রম ক'রে তারা কী করে এল এ দেশে। এই কৌশল আর সাহস দেখে এ দেশের নৃপতিরা পর্যন্ত প্রয়োজনের সময় এই বিদেশীদের সাহায্যে নিয়েছেন। সে সাহায্যের মূল্য চাই। সে মূল্যও তারা না নিয়ে ছাড়ে নি। এ দেশের কয়েকটি উপকূল-ভাগে আর কয়েকটি দ্বীপে এরা প্রচুর ভূমি লাভ করল। দাঁড়াবার এই স্থান পেয়ে ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল তারা। বেড়ে উঠে হয়ে দাঁড়াল দুরন্ত জলদস্যু। এ দেশের রমণীদের সংসর্গে এসে উপকূলে এরা ছড়িয়ে দিয়েছে

অনেক বংশধর। ইতিমধ্যে দিল্লির সম্রাট্ হয়েছেন জাহাঙ্গীর। এই সময়ে পোর্তুগিজদের দস্যুতায় অস্থির হয়ে আরাকান-রাজ এদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দমন করেন। কিন্তু দুঃসাহসীর কাছে ওসব কিছুই না। পুনরায় তারা মাথা তুলে দাঁড়াল। সন্দীপের মোগল ফৌজদার তখন ফতে খাঁ— নৌ-যুদ্ধে ফতে খাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাকে নিহত করে নদীমুখের সব-কয়টি দ্বীপ এরা দখল করে নিল। তার পর ধীরে ধীরে সন্দীপ অধিকার করল। যে আরাকান-রাজ একবার এদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবার তিনিই এলেন এদের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণে। তিনি কৃতকার্য হলেন না বটে, কিন্তু এই দস্যু মগদের উৎপাত বেড়েই চলল। কোনো উপায়ে এদের দমন করতে না পেরে সুবাদার ইসলাম খাঁ রাজমহল থেকে রাজধানী তুলে এনে ঢাকায় বসালেন, যাতে এদেব কাছাকাছি ঘাঁটি নিয়ে এদের শায়েস্তা করার সুবিধে হয়। অবশেষে ক্রমে তারা এসে প্রবেশ করল হুগলী-নদীর এই পথে।

সেই অপরাভূত জাতের একজন প্রতিভূ এই ফিবিঙ্গি অ্যাণ্টনি। তাই তার এত বিক্রম— একদল হন্তারকেব কবল থেকে মুক্ত করে নিয়েছে তার মনের মানুষকে। সেও তার বংশধর নিশ্চয় রেখে যাবে বাংলাদেশে— ভাবীকালের মানুষেরা তাদের মধ্যের একটা প্রাণীকে নিয়ে হয়তো খুঁজতে থাকবে তার উৎপত্তির আদিকাণ্ড। সেই প্রাণীটি যখন তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানতে পারবে তখন সে পুলকিত হবে কিনা বলা কঠিন।

কেমন শিউরে উঠল যেন হরিশঙ্কর। সব কথা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে ভাবতে লাগল তার মায়ের কথা। অনেকদিনের কথাই হয়ে গেল। তবু মায়ের চেহারা স্পষ্ট ভাসছে তার চোখে। হুগলী-নদীর জলে ডুবে মরে গিয়েছে ব'লে প্রচার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তার মায়ের খবর জানে সকলেই। সমাজের শাসনই বলো, আব আগুনের আঁচই বলো, এ দুয়েব কোনো একটার ভয়েই নিশ্চয় সেই সাধ্বী নারী জ্বলন্ত চিতায ঝাঁপ না দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল গঙ্গায়। জলে ডুবেই যেত, হয়তো ভেসেও চলে যেত কোথাও, কিন্তু একটা আশ্রয় জুটে গেল তার। সেই আশ্রয় থেকে আর ঘরে ফিরে আসা গেল না। নতুন সংসারে সংসারী হল সে, নতুন পুত্রের মাতা হল। তাব পুরাতন আর প্রথম পুত্র হরিশঙ্করেব কথা নিশ্চয় মনে আছে তার। কিন্তু সেসব চিন্তা মনের মধ্যে দমন ক'রে নতুন পরিবেশে নতুন সমাজে নতুন জীবন যাপন ক'রে চলতে বাধ্য হওয়া ছাড়া কোনো উপায় বুঝি নেই তার।

এই পথেই তো পড়বে বলাগড়। ওদের কারও সঙ্গে, বলা যায় না, শান্তিপুরের পথে দেখা হয়েও যেতে পারে। কিন্তু তা যেন না হয়, তা যেন না হয়। তারা এক সমাজের, হরিশঙ্কর ভিন্ন সমাজের। কোনো মিল হবে না তাদের। না চেহারায়, না আচরণে, না ভাষায়, না চালচলনে।

—শান্তিপুরে যাবে কে গো? যাবে নাকি দশরথ? যাবে নাকি এব্রাহিম? ইয়াসিন যাবে নাকি?

নৌকোয় নৌকোয় ডেকে বেড়াতে লাগল হরিশঙ্কর।

সূর্যে তখন তেজ লেগেছে।



॥ তৃতীয় স্ফুলিঙ্গ ॥

বলাগড়। নদীর কিনারে কুঠিবাড়ি। চৌকো আকারের বিরাট দোতলা দালান। গায়ে কারুকাজ নেই, নকশা নেই, ইটের উপর ইট সাজিয়ে চারটি উঁচু দেয়াল গাঁথা হয়েছে, সেই দেয়ালের গায়ে কয়েকটি দরজা আর জানালা বসানো। অতি সাধারণ আর অতি নগণ্য এই চেহারা।

কিন্তু চেহারা বিশেষ গণ্য না হলেও, বলাগড়ের এই কুঠি সাধারণ কুঠি নয়। বেশ বড়দরের কুঠি। হুগলী-নদীর পারে গড়ে উঠেছে যে নীল-বাহিনী, এই কুঠিকে বলা যায় তার অধিনায়ক। হোসেনাবাদ তালদা মায়াপুর বাঁশবেড়িয়া দ্বারবাসিনী গোপীগঞ্জ দুর্গাপুর কালিকাপুর মেলিয়া থন্যান চাঁপদানি— অন্ত নেই কুঠির, শেষ নেই কুঠিয়ালের। তাদের দাপটেরও শেষ নেই, তাদের প্রতাপও অনন্ত। সেই অন্তহীন প্রতাপ মাঝেমাঝে ঘায়েল হয়, কোনো প্রজার বা কোনো নীলচাষীর হাতে না, ঘায়েল হয় ডাকাত পাঁচু সরদারের কিংবা ডাকাত বিশুর হাতে। দোর্দণ্ড যাদের প্রতাপ, তাদের হাতের দণ্ডও খসে পড়ে যায় যখন বার্তা আসে এই ডাকাতদের কাছে থেকে— লুঠের বার্তা। পাইক বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালরা দাঁড়ায় প্রস্তুত হয়ে।

বলাগড়-কুঠির বরাত ওর মধ্যেই একটু ভালো। বিশ্বনাথের দরদ আছে, এই কুঠির উপর না হলেও, এই কুঠিয়ালের উপর। আর-পাঁচটা কুঠিকে

সে সুযোগ মত উচ্চকিত করে থাকে বটে, কিন্তু বলাগড়কে এ পর্যন্ত কোনো পরোয়ানা সে পাঠায় নি। বিশুর মনের কথা বিশুর মনেই থাকে, এখানকার কুঠিয়াল মিস্টার ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিস সে কথা জানেন না। সেইজন্যে তাঁকে সতর্কই থাকতে হয়।

অনেক দিন এখানে কুঠিয়ালি করছেন মিস্টার- কুর্টিস। যখন এই কুঠির ভার নিয়ে তিনি এলেন তখন তাঁর বয়স কত আর? বিশ, কিংবা বড়জোর বাইশ। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ধরে তিনি আছেন এখানে। এই দিককার কুঠি-বাহিনীর মধ্যে বলাগড়ে যে অধিনায়ক হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব এই কুর্টিসেরই। যখন তিনি রাজশাহীর রেশমকুঠি থেকে এখানে এলেন তখন বলাগড়ের কুঠির পত্তন হয়েছে মাত্র, এই দালানও ওঠে নি, আর ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে দিগন্তছোঁয়া মাঠ ভরতি নীলের চারা দল বেঁধে হাওয়া খাচ্ছে—ওসবও ছিল না। তখন এখানে ছিল হোগলা দিয়ে তৈরি একটা মাঝারি আকারের ছাউনি মাত্র। ইয়ং ব্লাড শিরায় শিরায় নিয়ে উদ্যোগী কুর্টিস এসে নামলেন বলাগড়ের ঘাটে। সেদিন কেউ ভাবতেও পারে নি একটা ক্ষুদে গাঁ একদিন ছোটখাট একটা গঞ্জ হয়ে উঠবে।

বলাগড় এখন গঞ্জই। নানা ধরণের নৌকো ভিড় করে আছে ঘাটে—ভাওলিয়া পালোয়ার বজরা পিনিস ডিঙি। নীল-বোঝাই নৌকো থেকে বলাগড়ী কুলীমেয়েরা রুপার হাসুলি-পরা মোটা গোছার পা জলে ডুবিয়ে নৌকো থেকে মাথায় ক'রে নামাচ্ছে গোছা-গোছা নীল। বজরা আর পালোয়ার দোল খাচ্ছে জলে। দূরের ক্ষেত থেকে নীল আসছে বটে এই ঘাটে, কিন্তু ঐ দিগন্তছোঁয়া মাঠে চাষীরা যে নীল কাটছে গো-গাড়ি বোঝাই হয়ে সে নীল এসে নামছে কুঠির চত্বরে।

বয়স হয়েছে কুর্টিস সাহেবের, কিন্তু শরীর আছে জোয়ান। কুঠিয়ালি থেকে এখনো তাই ছুটি নেন নি।

অনেকটা এলাকা নিয়ে এই কুঠির সীমানা। নীল চাষ হচ্ছে যে মাঠে, এর সীমানার মধ্যে সে অংশ ধরা হচ্ছে না। কিন্তু ঐ বিরাট নীলক্ষেত বাদ দিয়েও এর চৌহদ্দি বড় কম নয়। এর মধ্যে কারখানা-বাড়ি বসেছে, সেখানে নীল নিঙড়ে রস বের করার জন্যে বসেছে ভ্যাট, আর কারখানার জল জোগান দেওয়ার জন্যে বসানো হয়েছে চীনা-পাম্প, রস জ্বাল দেবার জন্যে বয়লার। অর্থাৎ নীলের চারা থেকে নীলের দানা অবধি পৌঁছতে যত রকমের আয়োজনের

দরকার, তার সব-কিছুরই বন্দোবস্ত করেছেন কুর্টিস সায়েব এই বলাগড়-কুঠিতে।

কুঠিবাড়িতেই আগে থাকতেন কুর্টিস, দশ-বারো বছর হল এই চৌকো দালানের অদূরে গঙ্গার কিনারে তিনি তৈরি করেছেন একটি বাংলো। সেখানেই এখন সপরিবারে বাস করেন। তিন ছেলের পিতা তিনি, এবং এক কন্যার।

বিকাল নেমে এসেছে বলাগড়ের আকাশে। অর্ধচন্দ্রের আকারে আকাশে বৃত্তাংশ এঁকে ঐ উড়ে চলেছে এক ঝাঁক বক। বটের ডালে বসে কয়েকটা কাক ডেকে উঠছে থেকে থেকে। তাদের পাখায় বুঝি ক্লান্তি এসেছে এখন।

কুর্টিসও ক্লান্ত। বাংলোর বারান্দায় বেত আর বাঁশ দিয়ে বোনা হেলানো-মোড়ায় ব'সে ফরসির নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছেন কুর্টিস। কার্তিকের শীতের আমেজ লেগেছে বাতাসে, তবুও পাঙ্খাপুলার বারান্দার অপর প্রান্তে বসে দড়ি টানছে— মৃদু হাওয়া লাগছে কুর্টিসের গায়ে।

খুব কড়া মানুষ কুর্টিস, কিন্তু স্বভাব তার বিপরীত। দাস-দাসীরা তাঁর কাছে তটস্থ। কিন্তু কখনো তাদের দুর্বাক্য বলেন না তিনি। যত রকমের দাস-দাসী ভিন্ন-ভিন্ন কাজের জন্যে দরকার তার প্রায় সব রকমই তাঁর আছে— রসুইয়ে খিদমতগার ফরাস আবদার ভুরিয়া মালি ঘেসুড়ে পাখাকুলি, সবাই। কিন্তু তবু তিনি অনেকটা যেন আত্মনির্ভর। এখন এখানে বসে তিনি তামাক খাচ্ছেন ব'লে হুঁকাবরদারকে তটস্থ হয়ে অদূরে দাঁড় করিয়ে রাখেন নি।

পাকা সাহেব হয়েও কুর্টিসের মেজাজ যেন পাকা সাহেবী নয়। তিনি নেটিভ হয়ে যান নি, কিন্তু নেটিভদের উপর তাঁর বড় দরদ।

দাড়ি নির্মূল করে কামানো, কিন্তু ঠোঁটের উপরে একজোড়া মোটা গোঁফ, সে গোঁফে পাক ধরেছে।

বুট-পরা পা-জোড়া সামনের উঁচু চৌকির উপর তুলে নিয়ে গা এলিয়ে বসে তামাকু সেবন করছেন কুর্টিস।

ঘরের মধ্যে বসে লেস বুনছিলেন মিসেস কুর্টিস। আলো কমে এসেছে, কুশিকাঁটা আর সুতোর গুলি হাতে নিয়েই তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। পরনে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঢোলা গাউন— পায়ের কাছের ঘেরে লেস, কনুই পর্যন্ত হাতায় চওড়া লেস। যেমন লম্বা চেহারা, তেমনি পরিচ্ছন্ন সাজ।

মাথায় গভীর কালো চুল খোঁপা করে বাঁধা, সেই কালো চুলের অরণ্যে কয়েকটি শ্বেত রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চুলও পেকেছে মিসেসের।

গায়ের রঙ ঐ সাজের মতই পরিষ্কার। কিন্তু এতক্ষণ ঐ রঙ অদ্ভুত গৌর মনে হচ্ছিল, কিন্তু এই গোরার গায়ের কাছে এসে যখন তিনি বসলেন, তখন রঙের জেল্লা অনেকটা যেন কমে এল। কুর্টিসের গায়ের রঙের তুলনায় অনেকখানি শ্যামলা দেখাল শ্রীমতী কুর্টিসকে।

মৃদু হেসে চৌকি থেকে পা নামিয়ে একটু সোজা হয়ে বসে কুর্টিস তাঁর স্ত্রীকে বুঝি সম্ভ্রম জানালেন। বললেন, দি ইয়ওার গ্যাঙ্গেস ইজ এ ওয়াণ্ডার টু মি।

বাংলা বলার লোভ বুঝি সামলাতে পারলেন না, একটু হেসে কুর্টিস আবার বললেন, টুমিও একটা ওয়াণ্ডার।

মিসেস হাসলেন, বললেন, তুমিও যে ওয়াণ্ডার হয়ে উঠছ।

—হাউ? কেন? কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে উঠলেন কুর্টিস।

—ওসব কথা বলছ কেন আমাকে?

মুখ থেকে নল সবিয়ে একটু ঘুরে বসে কুর্টিস বললেন, কেন বলবে না? ইউ আর এজিং বাট নট গ্রোয়িং ওল্ড। ইউ লুক অ্যাজ ইয়ং অ্যাজ অন দ্যাট ডে।

আবার হাসলেন শ্রীমতী কুর্টিস। এবার হাসি একটু যেন ম্লান দেখাল। মেয়েদের বয়স বাড়ছে, কিন্তু তাদের দেখতে অবিকল আগের মতই কচি আছে —এ কথা শুনলে কোন্ মেয়ে না খুশি হয়? মিসেসও মনে-মনে খুশি হলেন কিনা ধরা গেল না। কিন্তু তাঁর মুখ অকস্মাৎ ম্লান হয়ে যে উঠল তার কারণ অবশ্য অন্য।

দ্যাট ডে। কুর্টিসের ঐ দ্যাট ডে— অর্থাৎ সেই দিন— কথাটাই মিসেসের মুখ ম্লান করে দিয়েছে। অনেক দূরে নিক্ষেপ করে আসা হয়েছে যে দিনটিকে, সেই দিনটার কথা হঠাৎ আজ আবার মনে করিয়ে দিলেন মিস্টার। কবর খুঁড়ে কঙ্কাল বের করার দরকাব কি। রক্ত-মাংস-প্রাণ সমেত যে জিনিসটি আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সেই মৃত আত্মার অন্বেষণে কেন এই অকারণ উদ্যোগ।

অতীতের দিনগুলির মত নির্মম প্রাণহীন নির্দয় আর নিষ্ঠুর কিছু নেই ত্রিসংসারে। অতীতের এক-একটি দিন শুধুমাত্র একটি দিনের জন্যে আসে

আমাদের জীবনে। আমাদের জীবন তার কাছে শুধুমাত্র যেন একটি সরাইখানা। সুদূর পথের যাত্রী সে, দরবেশী মেজাজ নিয়ে দেখা দেয়, তার পর দিন-যাপন সমাপ্ত হওয়া মাত্র সরাইখানার ঝাঁপ সরিয়ে শুরু করে তার যাত্রা; যাওয়ার সময় সাধারণ সৌজন্য পর্যন্ত জানিয়ে যায় না, বলেও যায় না 'চলি এখন'। গভীর নিদ্রায় আমরা যখন অচেতন, তখন আমাদের সেই একটি দিনের অন্তরঙ্গ সহচর আমাদের না জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সকালে ঘুম ভেঙে গেলে; উঠে বসে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখি— সে নেই।

কিন্তু এ ধরণের দিনেরা সাধারণ রকমের দিনের মধ্যেরই একটি। এর কোনো বিশেষত্বও নেই, বিশেষ বিশেষণ আরোপ করেও এর পরিচয় দেওয়ার দরকার করে না। কিন্তু যে দিনটির কথা মনে করে মিসেস বিষণ্ণ হয়েছেন, সে দিন একটি সাধারণ দিন না।

এইজন্যেই কুর্টিসের ভ্যাট ডে কথাটা তাঁর কাছে সামান্য নয়। এই দিনটির সঙ্গে তাঁর জীবনের ভাবনা-বেদনা-আশা-নিরাশা-সমাজ-সংসার— সব জড়ানো। তাই তাঁর মনে হল, তাঁর হাতের কুশির কাঁটা গেঁথে গেল বুঝি তাঁর বুকের মধ্যে।

এদের পিছনে দাঁড়িয়ে নতুন কল্‌কিতে আগুন চাপিয়ে মৃদু মৃদু ফুঁ দিচ্ছে হুঁকাবরদার। কল্‌কে বদলে দিল সে। কুর্টিস সাহেব আবার মুখে তুলে নিলেন নল। বললেন, হোয়াট মেক্‌স্ ইউ স্যাড?

স্যাড আবার কিসের। ও কথা কিছু না। খুবই হ্যাপি সে, খুবই লাকি, এবং খুবই ফরচুনেট। কিন্তু অকারণে অন্যমনস্ক হয়ে অমন কথা না বলে ফেললেই হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে যে জীবন ঐ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে এই নতুন জীবন গ্রহণ করা গিয়েছে, অযথা সেই পুরনো অতীতটা টেনে আনার দরকার কি।

—আয়্যাম সরি।

পা এলিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন কুর্টিস।

বাংলোর সম্মুখে পাকুড় গাছের নীচে দুটি হরিণ চুপ করে বসে আছে। বর্শা-হাতে জমাদার হরকিষণ তার একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। শক্ত আর মজবুত ঐ মানুষটাকে অত কাছে দেখেও চকিত হয়ে উঠছে না ঐ হরিণেরা।

আসন্ন সন্ধ্যার আমেজ লেগেছে বলাগড়ে। সে আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে ঐ মাঠে, এই বাগানে, আর ঐ গাছের ডালে-ডালে। চারিদিক নিস্তব্ধ; কেবল

গঙ্গার ধারায় জলকল্লোল অস্পষ্ট আওয়াজ তুলে মনোহর করে তুলেছে এই বাংলোটা। এই পরিবেশে বসে শ্রান্ত হতে নেই, জীবনে যতই দুঃখ কিংবা বেদনা থাক্-না, সেসব বিষণ্ণতা এই শান্ত সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোতে অদৃশ্য হয়ে যাবারই কথা।

চারদিক শান্ত ও সুস্থির, নীরব ও নিস্তব্ধপ্রায়। হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। এখানে বসে ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে ঘাসে-ঢাকা উঁচু-উঁচু ঢিবি, সেই ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের ঐ পার থেকে ভেসে আসছে শব্দ— 'লা এল্লা ইল্ লি উল্লা, মহম্মদ রসুলুল্লা'।

চেনা শব্দ। মাঝে-মাঝেই হঠাৎ দেখা দেয় ঐ পাগোলটা। অন্যান্য দিন আসে দুপুরের দিকে, আজ অসময়ে আবির্ভাব ঘটেছে তার। মাহেশের পাশের গ্রাম বল্লভপুরে ওর বাড়ি। ঘরামির কাজ ক'রে দিন গুজরান করত ও। ফরাসগঞ্জ গরিটি ফরাসডাঙা চন্দননগর সর্বত্রই ঘুরে ঘুরে কাজ করত। বেশ সাদাসিধে ভালোমানুষ জাতের লোকটা। কিন্তু সেই ভালোমানুষ-লোকটা হঠাৎ কি করে এমন একটা বদ-লোক হয়ে গেছে, পাগোল হয়ে গেছে।

ভিক্ষে না হলে, মানুষের দয়া না হলে, বাঁচার কোনো সংগতি তার নেই। কিন্তু ভিক্ষেও ও চায় না, দয়াও না। কেবল ঐ আওয়াজ করতে-করতে সে ধীরে ধীরে চলতে থাকে, মাঝে-মাঝে শুধু বলে ওঠে— 'মাহবুদ, মাহবুদ'।

লোকটা ঐ আওয়াজ করতে-করতে চলে যায়। ওর বলার কথা বুঝি আর কিছু নেই। দুনিয়ার লোককে হুঁশিয়াব করে করে ঘুরে বেড়ানোই তার যেন একমাত্র কাজ। দুনিয়ার মানুষদের, অর্থাৎ দুনিয়ার মরদানাদের।

গোমস্তা হৃদয়নাথবাবু কিছুদিন আগে মিসেস কুর্টিসকে বলেছেন কাহিনীটা। মিসেসের কেন-যেন ঐ লোকটাকে দেখে মায়া হয়েছে, তাই হৃদয়নাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চায় ও হৃদয়বাবু?

—কিছু চায় না। পাগোল তো। পাগলামি করে বেড়ায়।

হৃদয়নাথের কথাটা পাগোলের প্রলাপ বলে মনে হল মিসেস কুর্টিসের। তিনি একটু হাসলেন, বললেন, পাগোল তো পাগলামিই করবে, কিন্তু—

মিসেস কুর্টিসের কাহিনী কারও অজানা নয়, যতদিনের পুরনো আর বাসী ঘটনাই হোক-না কেন, এ-কাহিনী কারও মন থেকে মুছে যায় নি। মানুষ যতই ভালো হোন তিনি, তবু তাঁর উপর পুরো শ্রদ্ধা যেন নেই কারও।

মিরনের কাহিনীটা বলতে একটু দ্বিধা করছিলেন হৃদয়বাবু, কি জানি, শ্রীমতী

কুর্টিস যদি মনে করেন যে, এই গল্প বলে হৃদয়নাথ শ্রীমতীর সম্বন্ধেই একটু বিপরীত মন্তব্য করছে।

বারান্দার চৌকিতে গাউন ছড়িয়ে বসলেন শ্রীমতী কুর্টিস, গোমস্তা হৃদয়নাথ সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ে জোড়াসন হয়ে বসলেন মেঝেয়। মাথা নীচু করে বসলেন হৃদয়নাথ, পুরো মাথাটাই টাক— এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত ঘাড়ের দিকটা একগুচ্ছ চুল দিয়ে যেন বেড়া দেওয়া। হৃদয়নাথ বললেন, ও পাগোল। কিন্তু অমন ও ছিল না। পাগোল করে দিয়েছে ওর বউ।

—কেন? কেমন ক'রে?

হৃদয়নাথ বললেন, বউ অসতী হলে যা হয় মানুষের। লোকটাকে মেরে ফেলারই মতলব ছিল, কিন্তু ধুতরোর মাত্রা হয়তো একটু কম হয়ে যায়। তাই মরল না মিরন। কিন্তু এর থেকে ওর মরাই বুঝি ভালো ছিল।

—তার বউ এখন কোথায়?

—তার মনের মানুষের সঙ্গে হয়তো আছে কোথাও।

গলা শুকিয়ে উঠেছিল বুঝি শ্রীমতী কুর্টিসের। চোখ-দুটো হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, ডাকলেন, আবদার।

ডাক শোনা মাত্র হুজুরে-হাজির হল আবদার। শ্রীমতী বললেন, পানি লাও। জল— ঠাণ্ডা জল।

মাথা নীচু করে বসে ছিলেন হৃদয়নাথ, মাথা একটু তুলে শ্রীমতীর মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, ঐ মুখে হঠাৎ উদ্বেগের ছায়া পড়েছে যেন।

সেইদিন থেকে ঐ আওয়াজ আর ঐ 'মাহবুদ'-ধ্বনি অসহ্য ঠেকে শ্রীমতী কুর্টিসের কাছে। অসতী নারীর অমন একটা নৃশংস কাণ্ড একটা জীবন্ত ইস্তাহার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দেশে। দেশের মানুষকে হুঁশিয়ার করে বেড়াচ্ছে ঐ মানুষটা। খোদাকে ডেকে তাকে সাক্ষী রেখে সে প্রচার করে চলেছে বুঝি অসতী নারীর চক্রান্তের কথা।

আজ এই আসন্ন সন্ধ্যায় স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছেন শ্রীমতী কুর্টিস, এমন সময়ে ঐ হুঁশিয়ারি আওয়াজ তুলে এই সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি চুরমার করে দিতে এল কেন ঐ পাগোলটা?

'লা এল্লা ইল্ লি উল্লা, মহম্মদ রসুলুল্লা— মাহবুদ মাহবুদ'। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ঐ শব্দ। কুশির কাঁটা গেঁথে গেছে যার বুকে, তার সেই বিপন্ন বুকের মধ্যে হঠাৎ এই বর্শার আঘাত কেন?

শান্ত দুটি হরিণের পাশে বর্শা-হাতে দাঁড়িয়ে আছে জমাদার হরকিষণ। এখন যদি হরকিষণ এ ধারালো বর্শাটা বিঁধে দেয় ঐ হরিণের বুকে, হরকিষণের কি সেটা বীরত্ব হবে? কিংবা তার কি কোনো প্রয়োজন তাতে মিটবে? নিরামিষাশী হরকিষণ তো হরিণের মাংস ভক্ষণ ক'রেও বুঝিয়ে দিতে পারবে না যে, এই লোভে ও নিরীহ জীব হত্যা করল।

মিরন ফিরে পাবে না তার বউকে। ফিরে পেলেও সে তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। তার হুঁশিয়ারি শুনে সতর্কও হবে না কোনো মানুষ, খুব বেশি হলে হয়তো নিজের নিজের স্ত্রীকে অকারণে সন্দেহ করতে শিখবে, অকারণে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করবে। মানুষের সংসারে এভাবে অশান্তি ছড়িয়ে দিয়ে কী লাভ হচ্ছে ঐ উন্মাদটার।

কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না, কারও কাছে এর উত্তর চানও না শ্রীমতী কুর্টিস। কেবল একটা প্রশ্নের উত্তর তিনি চান। অতি সরল একটা প্রশ্ন— অসতী কে? সতী হতে যে পারে না, সে-ই কি অসতী? সতীদাহের অগ্নিকুণ্ড দেখে যে ভীত হয়ে ওঠে, সে কি অসতী? মৃত স্বামীর চিতায় শয়ন করে নিজেকে জীবন্ত দগ্ধ করতে যে অক্ষম, সে কি অসতী? অগ্নির লেলিহান শিখা দেখে কেউ যদি পলায়ন করে, সমাজের সংসারের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-তিরস্কার-ভর্ৎসনার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে যদি তাকে নিতে হয় কোনো আশ্রয়— তাহলে সে কি অসতী?

এইসব প্রশ্ন জেগে ওঠে শ্রীমতী কুর্টিসের মনে। এসব প্রশ্নের উত্তরও তিনি নিজেকেই দেন। কিন্তু সে উত্তর হয়তো মনঃপূত হবে না কারও, এইজন্যে সেসব প্রকাশ করতে রাজি না তিনি।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল বারান্দায়। মিস্টার কুর্টিস গুর-গুর শব্দে এখনো ফরসির নলে ধোঁয়া টানছেন। গঙ্গার স্রোতে পাল তুলে ভেসে চলেছে নৌকো— গেরুয়া পালের কিয়দংশ মাত্র দেখা গেল এখান থেকে। পাকুড় গাছের ডালে জ্বলে উঠল জোনাকির আলো। আরও দূর থেকে ভেসে এল ঝিঁঝি-পোকার ঝাঁঝা শব্দ। ঐ শব্দের অন্তরালে বিলীন হয়ে গেল পাগোল মিরনের গলার আওয়াজ।

ফরাস এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল বারন্দায়। দেয়ালগিরিতে মেটে তেলের আলো উঠল জ্বলে। ঘরের মধ্যে ঝাড়লণ্ঠনের আলো জ্বলল।

মিস্টার কুর্টিসের আরাম উপভোগ হয়তো পুরোপুরি হয়েছে, বললেন, এ গ্র্যাণ্ড অক্টোবর ইভ্নিং।

আরও জানালেন যে, উইনটার তো আসছে, হান্টিংএ গেলে হয়। ডাক্ ভিয়ার অর টাইগার। জীবনের মনোটনি কাটাবার জন্যে ওয়ান মাস্ট হ্যাভ এনাফ রিক্রিয়েশন।

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার কুর্টিস। পরিপূর্ণ দীর্ঘতায় দাঁড়ালেন তিনি। একটা পুরুষ বটে। বয়সটা বুড়ো হয়েছে, কিন্তু কুর্টিস নিজে যেন বুড়ো হতে নারাজ। ভারী বুট পরে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি, তাঁর চলন দেখে বোঝা গেল, হ্যাঁ, ইনি মিস্টার ম্যাক্গ্রেগর কুর্টিসই বটে। বলাগড়ের মত কুঠির যোগ্য কুঠিয়াল।

বেশ নিশ্চিন্ত জীবন এই বাংলোর। দুশ্চিন্তা যে একেবারে নেই তা নয়। দুশ্চিন্তা হয় কেবল ডাকাতির। ও জিনিসটা তো প্রায় প্রত্যহের ঘটনা। একটা-না-একটা ঘটনা ঘটছে রোজই। কখনো কোনো কুঠিতে, কখনো-বা কোনো জমিদার-গৃহে। ডাকাতদের হঠিয়ে দেবার জন্যে ম্যাক্গ্রেগর কুর্টিসও প্রস্তুত। তাঁর ঘরেও বন্দুক আছে। তাছাড়া জমাদার হরকিষণের সঙ্গে আছে একদল পাকা লাঠিয়াল; কুঠির কুলীসর্দার কাল্লুও আছে তার কুলী-রেজিমেন্ট নিয়ে।

এত ভরসা আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে ভয়ও। পাঁচু সর্দারের দাপট খুবই, কিন্তু ভয় হচ্ছে আসল মানুষটা— বিশ্বনাথবাবু— বিশু ডাকাত।

কিন্তু বিশুর মনের কথা জানেন না কুর্টিস। বিশুও অবশ্য প্রকাশ করে না। তাই ভয়, কখন্ তার পরোয়ানা এসে পড়বে— 'আজ রাত্রে লুঠ করব তোমার খাজাঞ্চিখানার মোহর। হুঁশিয়ার।'

বেশ নিশ্চিন্ত জীবন এই বাংলোর। তিনটি পুত্র, একটি কন্যা, এবং স্বামী-স্ত্রী। তিন ছেলের মধ্যে দুজন আছে অন্যত্র। বড় জন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে শেরিফের অধীনে কাজ করে, পরের জন মাত্‌লায় নিমক-মহলে। ছোট ছেলে এবং মেয়েটি থাকে এখানে। মেয়েটি সবচেয়ে ছোট— বছর পনর বয়স তার, নাম লিলি।

বাইরেটা পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল যেন বিশ্বচরাচর।

ওদিকে কুঠিবাড়ির খাজাঞ্চিখানায় আর নায়েবমশায়ের ঘরে আলো জলছে, আর অনেক দূরে কিষাণদের কুটিরে জলছে আলো। ঝিঁঝির ডাকে আর জোনাকির আলোয় রাত্রিটা হঠাৎ নিশুতি হয়ে এল যেন নিমেষের মধ্যে।

লিলি আর রবিনসন এখনো ফেরেনি। দুপুরবেলা তারা বজরায় বেরিয়েছে গঙ্গাভ্রমণে।

মিস্টার ও মিসেস কুর্টিস বারান্দা থেকে ঘরে এসে বসেছেন। মাথার উপর ঝাড়-আলো ঝুলছে। সেই পর্যাপ্ত আলোর নীচে বসে এই দম্পতি গল্প করছেন।

দূরে মশালের আলো দেখা গেল। মশালচী বরকন্দাজ চোবদার আগে-পিছে আসছে, মাঝখানে দুই ভাই-বোন— রবিনসন ও লিলি। অনেক দূরে চলে গিয়েছিল আজ তাদের বজরা, প্রায় গুপ্তিপাড়া পর্যন্ত। গঙ্গার অনেক ঢেউ খেয়ে এসেছে তারা এবং অনেক হাওয়া। দেখেছে অনেক নৌকোবাইচ— বাবুদের সে কী আমোদ আর সে কী উল্লাস।

সেই সঙ্গে আর কাউকে তারা দেখেছে কিনা, তারা জানে না। ঐ পথ দিয়েই হরিশঙ্করের নৌকো গিয়েছে শান্তিপুরের দিকে। হয়তো বজরার গা ঘেঁষেই চলে গিয়েছে, কে বলতে পারে।

মশালের আগুনে কিংবা ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় রবিনসন বা লিলিকে আমরা ভালো করে দেখতে পাব না। দিনের আলোয় স্পষ্ট করে দেখব পরে। নীরব নিভৃতে ঐ বাংলোকে রেখে এখন আমরা তাহলে বেরিয়ে আসি বাইরে।

অফুরন্ত হাওয়া। শিমুলে অশ্বত্থে বটে হাওয়ার বাজনা যেন বাজছে, বাবলার বনে ও কুল-গাছের অরণ্যে তারই প্রতিধ্বনিই বুঝি উঠছে মর্মরিত হয়ে। সেইসঙ্গে গঙ্গার স্রোতের কুলুকুল-ধ্বনি মিশে গিয়ে বলাগড়ের ডাকবাংলোর চতুর্দিকে রচনা করে তুলেছে মধুর ঐকতান।

ঐ সুরের মধ্যে নতুন আর-একটি সুরেলা শব্দ যেন ভেসে আসছে কানে? কিসের ঐ শব্দ তা অনুমান করার চেষ্টা আমরা করতে পারি। কিন্তু চেষ্টার কি আবশ্যক। পিয়ানোতে তান ধরেছে মিস লিলি কুর্টিস। রাত্রির এই তানময় বলাগড় বুঝি প্রাণময় করে তোলার জন্যে মিস লিলির এই অঙ্গুলি-সংকেত।

ইচ্ছে করে, বাহিরের ও অন্দরের এই অপরূপ দুটি তানের এই সম্মিলিত শব্দ সারারাত ধরে শুনি কান পেতে। কিন্তু পলকে মিলিয়ে যায় সে ইচ্ছা। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় পিয়ানোর শব্দ।

গঙ্গার কুলুকুল-শব্দ বাজছিল একটানা। সেই শব্দ ভেদ করে নতুন

আর-একটি শব্দ ভেসে আসে দূর থেকে। কিছুক্ষণ কান পেতেই বোঝা গেল ও শব্দ হচ্ছে ডাকাতদের কুলকুলি— হা-রে-রে-রে রব। ঐ রব এল দূর থেকে ভেসে। কোনো গ্রামে ঢুকেছে ডাকাতদল, কিংবা কোনো কুঠিতে। কাছে-ভিতে আছে নাকি আর কোনো কুঠি ?

নিস্তব্ধ বলাগড় সচকিত হয়ে উঠল। কুঠিবাড়ির পেয়াদা বরকন্দাজ লাঠিয়ালরা এল বেরিয়ে— জ্বলে উঠল মশালের মিছিল। বাংলো-বাড়ির আলোগুলি গেল নিভে। হরকিষণ তার মোটা লাঠি বাগিয়ে ধরে এসে দাঁড়াল ফটকের সামনে, তার পিছনে একটি বিরাট ভৃত্যবাহিনী— চোপদার খানসামা আবদার ফরাস ভুরিয়া। সকলের হাতেই এক-একটি লাঠি।

সবার পিছনে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিস। হাতে দোনলা বন্দুক।

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে এল। মিসেস কুর্টিস জড়িয়ে ধরে আছেন মিস কুর্টিসকে।

আর-একটা বন্দুক হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল রবিনসন তার বাপের পাশে।

ঐ বাংলোর ভিতরে এতগুলি মানুষ ছিল, কে জানত আগে! মাত্র চারটি প্রাণীর জন্যে একটি বৃহৎ দাসবাহিনী। এ ছাড়া দাসীও অবশ্য আছে।

নিদ্রিত পুরী এভাবে জেগে ওঠে মাঝে-মাঝে। রাত্রিকে উচ্চকিত ক'রে রণপার দ্রুতগামী শব্দ এবং ঐ কুলকুলি আশপাশের পল্লীর প্রাণে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। যার লুঠ হবার তার হয়। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব স্বয়ং তদন্তে বের হন দু-চার দিন পরে, সদলবলে ফিরে যান নিজের গদিতে। কিনারা বিশেষ কিছু হয় না। বিশু বাগদীর উপর আক্রোশ বাড়ে মাত্র। বিশু তখন হয়তো সুখসাগরের ঘাটে নৌকো বেঁধে তার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বসে গড়গড়ায় তামাক খায়, আর প্রধান সাগরেদ নলদাহা কৃষ্ণসর্দার ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেশের হালচাল নিয়ে আলোচনা করে, কিংবা কোনো গোয়েন্দা তাদের পিছনে লেগেছে কিনা তার খবর নেয়।

ভোরের হাওয়া লাগে বনঝাউয়ের মাথায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলাগড়।

স্বস্তির নিশ্বাস এখানে শুনতে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ঘটনা যা ঘটার তা ঘটে গিয়েছে কালনায়। বৈদ্যপুরের নন্দীরা তাদের কালনার গদিতে দশ হাজার কাঁচা টাকা পাঠিয়েছে খবর পেয়ে চার জন মাত্র সঙ্গী নিয়ে বিশ্বনাথ নৌকা-যোগে কালনার ঘাটে এসে দাঁড়ায়। যার দলে পাঁচ শ-রও বেশি লোক,

এসে এল মাত্র এই কয়জন লোক নিয়ে। কিন্তু এই চার জনের বল ও বিক্রমের উপরেই তার ভরসা নয়। তারা কয়জন এল জলপথে, আর দলের আরো অনেকে রণপা চেপে বলাগড়কে উচ্চকিত করে দিয়ে হা-রে-রে-রে শব্দে কুলকুলির আওয়াজ তুলে ছুটে চলল কালনার দিকে স্থলপথ ধরে।

কালনার গদিতে হানা দেওয়ার আগে বিশ্বনাথ একটু চিন্তা করল। তার মাথা নেবার জন্যে কোম্পানি-বাহাদুর চর গুপ্তচর পেয়াদা বরকন্দাজ লাগিয়েছে চার ধারে, তার মাথার দাম তবে সামান্য না। মাথাটা যদি এতই দামী তাহলে সে মাথা থেকে নতুন বুদ্ধি বের করতে হবে, কোম্পানি-বাহাদুরের কাছে এই মাথাটা পৌছবার আগে তাঁদের মাথা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া মন্দ না। সেইসঙ্গে পাঁচু সর্দারেরও। বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেবার জন্যে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পাঁচু ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে— এ খবরও পেয়ে গেছে বিশ্বনাথ। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সায়েব জেনে রাখুন, বিশ্বনাথ অত সহজে ধরা পড়বে না,— মনে মনে বিশ্বনাথ নিজের উপর আস্থা ঘোষণা করল যেন। স্বয়ং মা-কালী তাঁর ভরসা, এবং কালী-মার কৃপায় তার দলে ঝানু সড়কীওয়ালা আছে অনেক ; তারাও তার কম ভরসা নয়।

সে এই রাত্রে এই কালনার ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে কেন? টাকা? কি হবে ঐ টাকা দিয়ে? টাকা লুঠ করে করে সে একজন মস্ত বাদশা হয়ে উঠতে চায় না। জরুরি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যখন দরকার হয় টাকার তখনই আরম্ভ হয় বিশ্বনাথের অভিযান।

কার্তিকের অমাবস্যা আসন্ন। ঐ তিথিতে ঘটা করে পুজো দিতে হবে কালী-মার। কিন্তু ঘটা হবে কী করে, ঘট যে খালি। রেস্ত নেই এতটুকু। কোন্ কুঠির মোহর কবে এসে পৌছবে, কোন্ গঞ্জের ব্যাপারীর মোটা টাকার লেন-দেন হবে ইতিমধ্যে— বিশ্বনাথের চর খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ভালো খবর কিছু পাওয়া যায় না। কোম্পানি-বাহাদুর খড়্গহস্ত হয়ে আছে তার উপর, তার এই দুঃসময়ে মা-কালীর কৃপা লাভ না করলেই তার নয়, সমারোহের সঙ্গে তাই সে খড়্গহস্তার পুজার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু একটি মাটির প্রতিমা রচনা করে রিক্ত হস্তে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেই পুজা হল না। দেবীকে প্রসন্ন করার জন্যে ষোড়শ উপচার চাই, দেবীর পিপাসা মেটাবার জন্যে চাই বলি। দেবীর স্নেহ-লাভের জন্যে দরকার কাঙালি-ভোজন করানো।

সুখবর দূরের কথা, কোনো দিক থেকেই কোনো খবর আসে না। হঠাৎ গতকাল সন্ন্যাসী এসে খবর জানাল।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা?

এক পা ডাঙায়, এক পা নৌকোর গলুইতে রেখে সন্ন্যাসী ক্লান্ত গলায় বলল, দশ হাজার। বৈদ্যপুরের নন্দীরা পাঠাচ্ছে তাদের কালনার গদিতে।

কথাটা শুনে বিশ্বনাথ একটু দাঁড়াল, পা হঠাৎ টলে গেল তার। না, পা টলে নি, ঢেউ লেগে দুলে উঠেছে নৌকোটা।

এই সুখসাগর। এই ঘাটে নৌকো বেঁধে আজ দেড় দিন হল সংবাদের অপেক্ষায় বসে আছে বিশ্বনাথ। এখানে বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে না। এখানে বসে ঐ ডাঙার দিকে তাকালে জীবনটা কেমন উদাস হয়ে যায়, মন কেমন বাউল হয়ে ওঠে। গঙ্গার স্রোতের ধাক্কায় ধাক্কায় সুখসাগরের সুখ-স্মৃতিতে ভাঙন ধরেছে, ইতিমধ্যেই ধসে গেছে অনেক মাটি, চিড খেয়েছে পাড়। এখানে সুখোদ্যান রচনা করেছিল হেস্টিংস, প্রমোদনিকেতন গড়ে তুলেছিল এখানে; কিন্তু কোথায় সেই উদ্যান আর কোথায়ই-বা সেই নিকেতন। সমস্তই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি বটে, কিন্তু সব চিহ্ন মুছে যেতে আর বাকি কি। এই স্রোত যেভাবে কুড়ে-কুড়ে নিচ্ছে ঐ পাড, তাতে হেস্টিংসের স্মৃতি এখানকার ঐ মাটি থেকে উহ্য হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই।

ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর তিনজন সিবিলিয়ন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে তৈরি করলেন পল্লী-আবাস। জায়গাটি তাঁদের কাছে বড় মনোরম আর মনোহর লেগেছিল নিশ্চয়। এইজন্যে এখানে দেশী ধরণে একটি গোলা-বাডি তৈরির ব্যবস্থা করলেন। কফি চাষ করা হবে এবং কফি-জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদের বীজও বপন করা হবে ব'লে তাঁরা স্থির করলেন। এখানকার জমির উর্বরতা ও উপযোগিতা পরীক্ষা করার জন্যে তারা নানারকম উদ্যোগ ও আয়োজন করেছেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে এই জায়গাটির, বিশ্বনাথ মনে মনে ভাবে। কিন্তু কী লাভ সে গুরুত্ব দিয়ে? নদীর স্রোতের আঘাতই সহ্য করতে পারে না যে ইতিহাস, সে ইতিহাসের লঘু-গুরুর বিচার করে দরকার কি। বাংলাদেশে ইউরোপীয়রা সবপ্রথম এখানেই জমির ব্যক্তিগত মালিকানা পায়। কোম্পানির অনুমোদন লাভ ক'রে হেস্টিংস ও তাঁর তিন সহচর এখানে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হল। এবং এর থেকেই গড়ে উঠল চব্বিশ-পরগনা। কিন্তু, ইতিহাসই যেখানে ধুয়ে যায় জলের ধারায়,

সেখানে সম্পত্তির অস্তিত্ব আর কতদিনের ? কী যেন নাম ?—মনে করার চেষ্টা করতে লাগল বিশ্বনাথ— কলকাতার সেই ধনী পোতুর্গিজ বণিকটার ? হ্যাঁ, জোসেফ ব্যারেটো। হেস্টিংসদের সেই সম্পত্তি এই বণিক কিনে নিল। মস্ত ধনী লোক এই ব্যারেটো, যেমন ধনী তেমনি বিলাসী। সুখসাগরে বিরাট প্রাসাদ রচনা করল ব্যারেটো, এবং নিজের পরিবারের লোকদের উপাসনার জন্যে তৈরি করল রোমান ক্যাথলিক গির্জা ; গির্জার প্রার্থনা পরিচালনার জন্যে ব্যারেটো সায়েব নিয়োগ করল পাদ্রি-পুরোহিত। কিন্তু হায়, বিশ্বনাথ বুঝি একটা নিশ্বাসপাতই করল, কোথায় সেই গির্জার গির্জাত্ব এবং পুরোহিতের পৌরোহিত্য। ব্যারেটোর হাত থেকে সম্পত্তি গিয়ে পড়ল স্পেন-দেশীয় সায়েব লয়ালেটার হাতে। লোকটা মস্ত শিকারী ছিল। সে নাকি ঐ গির্জার উপাসনা বন্ধ রেখে সেখানে তার হাতি-বাহিনীর মাহুতদের থাকবার ব্যবস্থা করল, এবং সেইসঙ্গে লড়ুয়ে মুরগীদের।

সুখসাগরের এই ঘটনা গ'লে নেমে যাচ্ছে হুগলী-নদীর বুকের গভীরে। ধনীর ধনের এই যদি গতি, ইতিহাসের এই যদি পরিণাম, তাহলে কী লাভ অর্থ দিয়ে, কী লাভ সম্পদ আর সম্পত্তি দিয়ে ?

অর্থে তাই আকর্ষণ নেই বিশ্বনাথের, কিন্তু অর্থের প্রয়োজন তার আছে। যার উদ্বৃত্ত আছে তার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে তাই এতটুকু মমতা বোধ করে না সে।

এই সুখসাগরের মত সবই তো ধুয়ে-মুছে যাবে একদিন, যে জমির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল চব্বিশটা পরগনা, সেই পরগনাগুলি হয়তো কিছুদিন টিকে যাবে, কিন্তু ঐ ভিত্তিটা ইতিমধ্যেই গ'লে গেছে অর্ধেকের বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই হয়তো এর চিহ্নও থাকবে না। এর পরে এই দেশের মানুষেরা হুগলী-নদীর স্রোত ধরে ধরে, কিংবা মানচিত্রের রেখা ধরে ধরে, খুঁজে বেড়াবে— কোথায় সেই ভিত্তিটা, ইতিহাসের সেই পৃষ্ঠাটা, উর্বর সেই ভূখণ্ডটা। বৃথাই হয়তো খুঁজবে তারা।

এখানে দাঁড়িয়ে ঐ ডাঙার দিকে তাকালে মন তাই বাউল হয়ে ওঠে, প্রাণ কেমন উদাস হয়ে যায়। কিন্তু প্রাণ-মন উদাস হয়ে গেলে হবে কি, ঐ ডাঙার দিকে তাকালে ধনীর ধন লুণ্ঠন করার জন্যে মন যেন আকুল হয়ে ওঠে চতুর্গুণ। যে ধনের এই পরিণাম, সে ধন লুঠ হওয়াই দরকার। এই নদীর স্রোত যদি লুঠে নিতে পারে, যদি তাকে ডাকাত ব'লে কেউ শাসন না করে, তাহলে বিশুই

বা ডাকাত কেন, বিশু-ডাকাতই বা লুঠে নেবে না কেন? নদীর এক পার ভাঙে, আর-এক পার গড়ে, এই যদি হয় যুক্তি, বিশুরও তবে যুক্তি আছে। বিশুর চরিত্রও ঐ নদীরই মত।

ঢেউ লেগে আবার নড়ে উঠল নৌকো, আবার টলে উঠল পা। বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে ছইয়ের ভিতরে এসে বসল। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে আল-বোলার রুপালি নল দুই ঠোঁটের ফাঁকে রেখে ডাকল, নলদাহা।

এক-মাথা ঝাঁকড়া চুল আর শক্ত শরীর নিয়ে মাথা নীচু করে ছইয়ের ভিতরে ঢুকে নলদাহা বলল, এই-যে আমি।

মাথা তুলে তাকাল না বিশ্বনাথ, এক টুকরো কাগজে তাড়াতাড়ি কি-যেন লিখল, লেখা শেষ হলে বলল, এই চিঠি আজই পৌছনো চাই কালনার গদিতে, কাল রাত্রে আমরা গদি লুঠ করব।

নলদাহা কাগজের টুকরো মাথার ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে গুঁজতে গুঁজতে বলল, ঠিক পৌছে যাবে।

বিশ্বনাথ মুখ থেকে নল নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ পথে যাবে?

একটু হাসল নলদাহা, বলল, সাঁৎরে।

তা পারবে সে। সাঁতার দিতে যেমন পোক্ত সে, জলে ডুবে থাকতেও তেমনি। জলপথে সাঁতার দিয়ে যাবে তাই চিঠিটা রইল তার মাথার চুলে গোঁজা।

বিশ্বনাথ বলে দিল, তার আর ফিরে আসার দরকার নেই, সে যেন কালনার ঘাটেই তাদের জন্যে অপেক্ষা করে।

নলদাহাকে বিদায় দিয়ে কৃষ্ণসর্দারকে ডেকে বলে দিল যথাসময়ে রণপা চেপে দলবল নিয়ে সে যেন হাজির হয় যথাস্থানে।

সন্ন্যাসী রইল তার সঙ্গে।

যথাসময়ে কালনার ঘাটে এসে লাগল বিশ্বনাথের নৌকো। রাত্রি তখন অন্ধকার হয়ে নেমেছে নদীর জলের উপর। আসন্ন অমাবস্যার স্তব্ধতা থরথর করে কাঁপছে ঐ জলের উপর। নদীর ওপারের শান্তিপুর থেকে শঙ্খধ্বনির শব্দ ভেসে আসছে। এপারে শেয়ালের ডাক থেকে-থেকে চমকে-চমকে বেজে উঠছে।

সমস্তই প্রস্তুত। এখান থেকে নেমে গিয়ে গদি আক্রমণ করলেই কাজ সহজে শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বনাথ একটু ইতস্তত করতে লাগল।

তার মাথায় কোনো বুদ্ধি এসেছে। বুদ্ধি, কিংবা কোনো দুর্বুদ্ধি। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে এসে চট করে লুঠের কাজ শেষ করলেই কাজ শেষ হল বটে, কিন্তু কাজের মত কাজ সেটা হয়তো হল না। যে কোম্পানি-বাহাদুর তার মাথা চায়, তারা একবার জেনে নিক বিশ্বনাথের মাথার দাম কত।

বিশ্বনাথ ডাকল, সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল তার সম্মুখে, আদেশ গ্রহণের এবং তা পালনের জন্যে সে তৈরি আছে, তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে দিয়েই তা প্রকাশ করল সে।

গড়গড়ার নল ডান হাতে শক্ত করে ধরা, হাতের কনুই তাকিয়ার মধ্যে ডুবে আছে অনেকটা, মেটে তেলের ক্ষীণ আলোতেও দেখা যাচ্ছে বিশ্বনাথের ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছে যেন, বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, সন্ন্যাসী, সব তৈরি ?

—হ্যাঁ, তৈরি। ডাঙাপথে যাদের আসার কথা তারাও সবাই এসেছে।

—তারা কোথায় ?

বট পাইকড় আর হোড়ঙ্গের বনে নদীর কিনার একেবারে ঠাসা। বিশ্বনাথের দলের অন্যান্যরা রণপা চেপে সড়কি তরোয়াল সানা আর শূলপিতে সশস্ত্র হয়ে ঐ বনের মধ্যে অপেক্ষা করে আছে। সন্ন্যাসী সে খবর বিশ্বনাথকে জানাল।

—নলদাহা ? সে কোথায় ?

তাই তো বটে। এখানে এসে তার খোঁজ করা হয়নি বটে, কিন্তু যে কাজের ভার দিয়ে তাকে রওনা করে দেওয়া হয়েছে সে কাজ সে-যে সমাধা করতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এরই মধ্যে ভিখিরির বেশ ধরে সন্ন্যাসী একটা পাক দিয়ে এসেছে ঐ দিক থেকে, গদি তো বেশি দূর না, নদীর কিনারেই।

বিশ্বনাথ বলল, নলদাহাকে দেখ। কাছে-ভিতে কোথাও আছেই।

এরা কথা বলছে, এমন সময় তাদের নৌকার গা ঘেঁষে জলে থলবল শব্দ হতেই ছই থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসী দেখল জলের ভিতর থেকে শুশুকের মত ভেসে উঠল গোলাকার এক পিণ্ড অন্ধকার।

—কে রে ?

—আমি।

হাত ধরে নলদাহাকে টেনে তুলল সন্ন্যাসী। বলল, কি রে, এমন ডুব দিয়ে ছিলি কেন?

অদ্ভুত চুল নলদাহার, এ চুল ভেজে না। সে উঠে দাঁড়াল, সর্বাঙ্গ জলে ভেজা, কিন্তু মাথার ঝাঁকড়া চুল থেকে সব জল ঝরে নেমে গেল। নলদাহা বলল, মনে হল মাছি লেগেছে, তাই গা-ঢাকা দিলাম।

নলদাহার গা-ঢাকা দেওয়ার ধরণই আলাদা। সে জলের জীব, না, ডাঙার প্রাণী— বোঝাই দায়। এক নাগারে অনেকক্ষণ সে জলের অতলে ডুবে থাকতে পারে, হাঁফ ধরে না, দম বন্ধ হয় না। তার এই বিপরীত চরিত্রের জন্যেই তার নাম হয়েছে নলদাহা।

—মাছি লেগেছে? বলিস কি? জিজ্ঞাসা করল সন্ন্যাসী।

নলদাহার তাই মনে হয়েছে। গদিতে চুপ করে চিঠিটা বিলি করে দিয়েই সে কালনার বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতে লাগল, তার হাতে একগাছা দড়ি। হাঁকতে লাগল, কুয়ো-ঝালাই হবে নাকি মা-ঠাকরুন।

দু-তিন বাড়ির কুয়োতে তাকে নামতেও হয়েছে, ঘটি-বাটি-থালা তুলে দিয়েছে কুয়োর ঠাণ্ডা জলের তল থেকে। তার জন্যে মজুরিও পেয়েছে। কালনায় দিনটা সে কাটিয়েছে এই ভাবে। এবং সেইসঙ্গে নজর রেখেছে চারদিকে। কোম্পানির গোয়েন্দারা ঘুরছে কিনা। হাটের কাছে দাঁড়িয়ে যখন নবরত্ন-মন্দিরের চুড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে সে বেলা পরখ করছিল, তখন, তার যেন মনে হল কোম্পানির চর ঘুরঘুর করছে, তাদের পিছনে সত্যি মাছি লেগেছে। হুলিয়া জারি করেছে কোম্পানি, বিশু-ডাকাতের মাথা চাই। কেন যে চাই কে বলবে, বলো। কোম্পানির কোন্ ক্ষতিটা করেছে বিশ্বনাথবাবু? কিন্তু বেণের জাত ঐ ইংরেজ। টাকার উপর বড় মমতা; তা, সে-টাকা যারই হোক-না কেন। যারা লাখ-লাখ টাকা ক'রে গরিবের উপর পীড়ন করে, বিশ্বনাথবাবুর রাগ তাদের উপর। লাখপতির টাকা লুঠ করে সে নিজে লাখপতি হতে চেয়েছে নাকি? যার অনেক আছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে, যার কিছু নেই তাকেই তো দিয়ে থাকে বিশ্বনাথবাবু। এটাও বুঝি দোষ?

কিন্তু নলদাহার যুক্তির সঙ্গে কোম্পানির যুক্তির তফাত নিশ্চয় আছে। সেইজন্যেই কোম্পানি বিশ্বনাথের উপর এত রুষ্ট, এবং সেইজন্যেই তাকে ধরার জন্যে কোম্পানি চর ছড়িয়ে দিয়েছে চারধারে। কলকাতার শেরিফ সায়েবটা আচ্ছা পাজি।

ভিতর থেকে ডাক দিল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের ডাক শুনে নলদাহা ও সন্ন্যাসী ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বিশ্বনাথের সামনে উবু হয়ে বসল। জানতে চাইল, কি আদেশ আছে, তারা পালন করতে প্রস্তুত।

ভুরু দুটো আবো কুঁচকে উঠল বিশ্বনাথের, দৃঢ় হয়ে উঠল মুখের ভাব, বলল, তোমরা আছ। কালনার দারোগাকে ধরে নিয়ে আসতে হবে। পান্সীতে রইলাম আমি। আমার কাছে তাকে হাজির করো।

সন্ন্যাসী ও নলদাহা দু-জন দু-জনের মুখের দিকে তাকাল। হঠাৎ এই আদেশ শুনে তারা যেন চমকে গেল। তারা ভেবেছিল, এইমাত্র গদিতে গিয়ে হানা দেবার জন্যে হুকুম হবে তাদের উপর। হুকুম পাওয়া মাত্র তারা ভীষণ একটা কুলকুলি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে গিয়ে নন্দীর গদিতে। কৃষ্ণসর্দারের সঙ্গে একপাল সড়কীওয়ালা বণপা চেপে চলে এসেছে এখানে, ঐ হোড়ঙ্গের বনে বসে তারা অপেক্ষা করছে।

ঐ বনের দিকে তাকাল সন্ন্যাসী। বট পাকুড় বাবলা আর বকুলের গাছ দিয়ে ছাওয়া ঐ ধারটা, হোড়ঙ্গের বনে পূর্ণ। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এক চাপ কঠিন অন্ধকার হয়ে বসে আছে ঐ বন। সারা বনে যেন আলোর ফুল ফুটেছে, দপদপ করছে জোনাকিরা। ওরা কি সত্যিই জোনাকি, না, ওরা বিশ্বনাথের দলের মানুষদের জলজল চোখের দৃষ্টি? সন্ন্যাসীর মনে হল, জোনাকির চেহারা নিয়ে তাদের দলের মানুষেরা যেন দল বেঁধে চেয়ে আছে তাদের এই পান্সীটার দিকে। এই পান্সীতে বসে আছেন তাদের দলপতি। এখান থেকেই জারি হবে হুকুম।

নলদাহা ও সন্ন্যাসী তৈরি হয়ে নেবার জন্যে জোড়াসন হয়ে বসল। সারা মুখে কালী মেখে নিল, সেই কালীর উপর গালে আর কপালে টেনে নিল ঘন সিঁদুরের রেখা। সনাক্ত করে কে, কে চিনতে পারে তাদের, এইবার তার পরীক্ষা হোক, তাদের মনের কথা যেন এই।

রওনা হয়ে গেল তারা। পান্সী থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে ঐ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল দুইটি বীভৎস চেহারা।

নন্দীদের গদিতে তখন যেন ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। লোহার সিন্দুকে মোটা তালা ঝুলছে, চাবির তোড়া হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বৃন্দাবন নন্দী। ফরাসের অপর প্রান্তে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে মেজভাই জনার্দন। তার মুখেও উদ্বেগের ভাব।

জনার্দনের চিন্তার তল থেকে যেন বুদ্বুদ উঠল, বলল, ঝঞ্ঝাট না করে হাতে-হাতে টাকাটা তুলে দেওয়াই ভালো। নইলে—

—নইলে কি হবে কি? প্রায় রুখে উঠল যেন বৃন্দাবন।

জনার্দন হেসে বলল, দাদা, প্রাণ বড় না ধন বড়? দশ হাজার টাকা আজ গেলে আবার নতুন করে তা পাবে, কিন্তু প্রাণটা গেলে?

প্রাণটা গেলে প্রাণ যে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, এ সহজ হিসেব জানা আছে বৃন্দাবনের। লাখ-লাখ টাকার হিসেব যে রাখতে পারে, সে কি একটা প্রাণের হিসেব জানেনা বলে মনে করেছে জনার্দন? কিন্তু দশটা হাজার কাঁচা টাকা, কোন্ প্রাণে সেই টাকাটা একজনের হাতে তুলে দেওয়া যায়?

জনার্দন বলল, ঠিক। যায় না। তবে, দিয়ো না। তুমি তবে অপেক্ষা করো গদিতে, আমি চললাম। বিশু-বাগদির পরোয়ানা এটা, শুধু এইটুকু মনে রেখো। ও না নিয়ে ছাড়বে না। কোম্পানি যার ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, শেরিফ সায়েবের হাজার হাজার পেয়াদা-বরকন্দাজ যার পিছনে মাছির মত লেগে থেকেও ধরতে পারছে না, তার হাত থেকে দশ হাজার টাকা বাঁচাবার চেষ্টা কোরো না, বড়দা।

জনার্দনের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল চাবির তোড়া। চমকে উঠল জনার্দন। বিশ্বনাথের দল এসে গেল নাকি? না, বিশ্বনাথের দল নয়, বৃন্দাবনের হাত ঠকঠক করে কেঁপে উঠেছে, তাই তার হাতের চাবির তোড়ায় বেজে উঠেছে ঐ ঝনঝনা।

বৃন্দাবন তবু অটল থাকতে চায়, বলে উঠল, এত তেজ তার কিসের, এত শক্তি সে পেল কোথায়?

তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসে জনার্দন বলল, শক্তির কথা বলছ, দাদা? শক্তি ওর আছে। বললে মনে করবে বড় কথা বলছি। কিন্তু ওর শক্তি জোগাচ্ছি আমরাই। আমরা যতই ধনী হচ্ছি, ততই ওর ধনের লালসা বেড়ে চলেছে। ততই লোভ বাড়ছে ওর। ততই শক্তি বাড়ছে।

বাধা দিয়ে উঠল বৃন্দাবন, বলল, বুঝেছি। তুমি সংসারে থাকার যোগ্য নও, সন্ন্যাসী হয়ে যাও জনার্দন।

জনার্দন উত্তেজিত হল না, ঠাণ্ডা গলাতেই একটু হেসে বলল, সন্ন্যাসী না ভাবছি, আরও শক্তিমান হওয়া যায় কি করে।

জনার্দনের কথা শুনে চাবির গোছা-সমেত বৃন্দাবনের হাত আবার কেঁপে উঠল, বলল, কি বললে? ডাকাত হবে?

—ডাকাত না। কিন্তু ডাকাতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার মত শক্তি যাতে হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। এমন ভয়ে-ভয়ে তা না হলে জীবন কাটাব কত দিন?

জনার্দনটা বরাবরই একটু ভীতু প্রকৃতির। সোরা গন্ধক লবণ ইত্যাদি চালানির কারবার তাদের। কারবারেও তার মন কম। বরাবরই লক্ষ্য করা গিয়েছে সেটা। কিন্তু সেই ভীতু মনের ভিতরে এই ভাবে এতটা-যে ভয় ঢুকেছে, এতদিন তা টের পেতে তো দেয়নি জনার্দন।

বিশু-ডাকাতের পরোয়ানা আসার পর থেকেই সে কেমন যেন এলোমেলো কথা বলে চলেছে। সেসব কথা তবু সওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এখন যে কথা সে বলল, তা যে সহ্যের বাইরে। এতে মনের বল আরও যেন দমে যায়।

গোমস্তা-মশায় ও খাজাঞ্চি দু-জনে চুপচাপ বসে আছে। দুই ভাইয়ের কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো মন্তব্য করা এখন তাদের সাজে না।

এখানে বসে আছে এরা। মাত্র চারটি প্রাণী। কিন্তু এই গদি ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে এক পাল লাঠিয়াল। থানা থেকে চৌকিদারও পাঠিয়ে দিয়েছেন দারোগাবাবু। কলকাতাতেও খবর পাঠানো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, বৃন্দাবন নন্দী জানেন না, তাঁর প্রেরিত সেই বার্তাবহ মাঝরাস্তায় বিশু ডাকাতের চরের হাতে বন্দী হয়ে বলাগড়ের ঘাটে এখন আটক পড়ে আছে।

জনার্দন অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে বলল, লুঠপাট করে ও বড় ত্যক্ত করে রেখেছে আমাদের, তাই ওকে চিনতে পারছি নে এখন। কিন্তু মানুষটা যখন মরবে তখন ওর শক্তির কদর বুঝব আমরা।

বিরক্ত হয়ে উঠলেন বৃন্দাবন নন্দী, চিৎকার ক'রে বললেন, তুমি বোঝো গিয়ে। আমার বুঝে দরকার নেই।

একটা পেচক চিৎকার করতে করতে গদির মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, বহু দূরে হুক্কা-হুয়া শব্দে ডেকে উঠেছে এক পাল শৃগাল। সারা শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল বৃন্দাবনের। অল্পক্ষণের মধ্যে সে শব্দ ভেদ করে একসঙ্গে ডেকে উঠল কতকগুলো কুকুর। সমস্ত কালনাটা কি তবে শ্মশান হয়ে উঠল, দেশের সব মানুষ কি একসঙ্গে মরে গেছে? কেউ নেই তার সহায়, কেউ নেই তার সম্বল?

নিরুদ্বিগ্ন আর নির্বিকার হয়ে বসে আছে জনার্দন। এখনই যে এখানে এসে উপস্থিত হবে ডাকাতের দল, সে খবর সে যেন জানেই না। তার বসার ভঙ্গি দেখে এই রকম মনে হচ্ছে। তার দাদার মুখের দিকে চেয়ে সে দেখছে ঐ মুখের ভাব, ঐ মুখের উদ্বেগ।

জনার্দনের মুখের দিকে চেয়ে বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করল, কুকুর ডাকে কেন? এসে গেল নাকি?

নির্লিপ্তভাবে জনার্দন উত্তর দিল, বোধ হয়।

বোধ হয় সে বলল বটে, কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর দল এসে গেল বলে তার বোধ হচ্ছে না। এসে গেলে এতক্ষণ হা রে-রে-রে শব্দে বেজে উঠত কুলকুলি।

কিন্তু না, এসেই গেছে বুঝি। বাইরে হঠাৎ একটা গণ্ডগোলের শব্দ পাওয়া গেল, সামান্য একটু কোলাহলের পরেই অবশ্য সব চুপচাপ হয়ে গেল। উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়াল জনার্দন। কি হল, কিছুই বুঝতে পারল না সেও। কাতারে কাতারে মশাল জ্বেলে হুঙ্কার দিতে দিতে এসে পড়ার কথা যাদের, এরা কি তারাই? ক্ষুদ্র একটি মাত্র মশাল নিয়ে হেঁটে আসছে কয়েকটা প্রাণী।

ঐ আলোতে কা'কে যেন দেখে সেলাম জানিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে চৌকিদারেরা, এবং তাদের দেখাদেখি গদির ভাড়া-করা লেঠেলরাও।

ব্যাপারটা কি হল জানার জন্যে জনার্দন এগিয়ে গেল। একটু এগিয়ে গিয়েই সে চিনতে পারল। দারোগাবাবু। দারোগাবাবুর সঙ্গে কে এই মানুষটা? শক্ত চেহারা, পরনে লম্বা ধুতি, গায়ে পরিচ্ছন্ন জামা?

দারোগাবাবু পরিচয় করে দিলেন, বললেন, বিশ্বনাথবাবু। এঁর আসবার কথা ছিল। এসেছেন।

পিছন পিছন আর যারা আসছিল তারা থমকে থেমে গেল। মুখে কালি আর সিঁদুর মাখা ছিল ব'লে সন্ন্যাসী আর নলদাহা আর আসে নি। কৃষ্ণসর্দার এসেছে।

জনার্দন বলল, আসুন।

ওদের নিয়ে গিয়ে ফরাসের উপর বৃন্দাবনের সামনে বসাল।

বৃন্দাবন আশ্চর্য হয়ে গেছে, দারোগাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, হুজুর, আপনি?

ম্লান হেসে দারোগাবাবু বললেন, যা আছে দিয়ে দাও।

কম্পিত হাতে চাবির তোড়াটা এগিয়ে দিল বৃন্দাবন।

সামান্ত একটু সময়ের মধ্যে অতি সহজেই লুঠ হয়ে গেল গদি।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বৃন্দাবন। বিস্মিত চোখে জনার্দন খুব কাছে থেকে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চেয়ে দেখল। মানুষটার নাম শুনছে এতদিন থেকে, আজ তাকে চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল, এটা যেন তার একটা মস্ত লাভ।

কিসে কার লাভ আর কিসে কার লোকসান, এ হিসাব রাখবে কে? দশটি হাজার কাঁচা টাকার থলি নিয়ে চলে গেল বিশ্বনাথের দল, সেই লোকসানের ঘা খেয়ে বৃন্দাবন আহত হয়ে বসে আছে ভারি সিন্দুকের গায়ে; আর একটা মস্ত লাভের উল্লাস নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে এই গদিরই একজন অংশীদার।

ঘাটে এসে পাল্কীতে উঠতে উঠতে বিশ্বনাথ দারোগাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিল, বলল, আপনার মেহেরবানি মনে থাকবে। কোম্পানি-বাহাদুরকে জানাবেন, বিশু-ডাকাত আপনাকে জোর করে একরারনামায় দস্তখৎ করিয়ে নিয়েছে। আপনার ক্ষতি হোক আমি চাই নে। কারো রুজি মারা আমার পেশা নয়, দারোগাবাবু।

গরিবের সবনাশ করা না, বলবানের ও ধনবানের মনে ত্রাস সঞ্চার করাই বিশ্বনাথের পেশা। এইজন্তেই তার পাল্কীতে দারোগাবাবুকে ধরে আনার জন্তে সে তার অনুচরদের পাঠায়। কোম্পানি-বাহাদুর তার বিরাট দারোগাবাহিনী চৌকিদার ফৌজ ও গোয়েন্দাদল লাগিয়েছে যার পিছনে, সেই মানুষটা সেই কোম্পানির মাইনে-করা দারোগাকে কাবু করে কি ভাবে কাজ হাঁসিল করতে পারে, বিশ্বনাথ তারই একটা ছোট নমুনা রেখে যেতে চাইল। এইজন্যই সে তলব করে পাঠাল দারোগাকে।

রাত্রির আহার শেষ করে দারোগাবাবু তখন বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় দুইটি যমদূতের মত তাঁর দরজায় এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথের দুই অনুচর। অনুচরদের চেহারা দেখে ও তাদের মুখে সিঁদুর আর কালির প্রলেপ দেখেই দারোগাবাবু উচ্চকিত হয়ে উঠলেন। হাতে ওগুলো কি ওদের?—শূলপি তরোয়াল সানা। অন্ধকারে আরো অনেকে বুঝি দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসী বলল, বিশ্বনাথবাবু আপনার জন্তে পাল্কীতে অপেক্ষা করছেন, আপনাকে এখনি যেতে হবে।

চমকে উঠলেন তিনি, বললেন, বিশ্বনাথবাবু কে?

এক-পা এগিয়ে এসে নলদাহা বলল, বিশু-ডাকাত। এবার চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়?

নলদাহার রঙ-করা মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, ওঃ, তিনি ? কিন্তু আমাকে কেন ? আমাকে দিয়ে কি কাজ ?

—গেলেই জানতে পারবেন ।

আর কোনো কথা বলে লাভ নেই । বন্দুকটা সঙ্গে নেবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু কী যেন চিন্তা করে সেটা আর নিলেন না । বললেন, চলো ।

বিশ্বনাথবাবু তৈরি হয়েই বসে ছিলেন । নলদাহারা দারোগাবাবুকে নিয়ে পাল্কীতে উঠে ছইয়ের মধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথবাবুর সামনে উপস্থিত করল ।

দুই হাত জোড় করে বিশ্বনাথ বললেন, নমস্কার । আপনার পরিচয় আমি জানি । আমাকে হয়তো আপনি চেনেন না । আমার নাম শুনে থাকবেন । হ্যাঁ, আমি সেই বিশে ডাকাত ।

ভয়ে ভয়ে প্রতিনমস্কার জানিয়ে দারোগাবাবু বসলেন, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন বিশ্বনাথের মুখের দিকে, সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা বিস্ময় এবং কিছুটা সম্ভ্রম হয়তো মেশানো ছিল । কেন যেন তাঁর মনে হল, একে ধরার জন্যে হুলিয়া জারি করেছে কোম্পানি, কিন্তু সহজে একে ধরা বুঝি সম্ভব না । কেন সম্ভব না, বিশ্বনাথের মুখের দিকে চেয়ে তা অবশ্য তিনি বুঝতে পারলেন না ।

বিশ্বনাথ বলল, মাপ করবেন । আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম । আপনাকে ডেকে না এনে নিজেও যেতে পারতাম অবশ্য ।

দারোগাবাবু বলে উঠলেন, তা'তে কি হয়েছে, কোনো কষ্ট হয় নি আমার । কি জন্যে ডেকেছেন বলুন ।

—আপনার সাহায্য চাই ।

—কি করতে হবে বলুন ।

বিশ্বনাথ বলল, নিশ্চয় জানেন, আজ রাত্রে নন্দীদের গদি লুঠ করব । এই কাজে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে ।

চমকে উঠলেন দারোগাবাবু, এ রকম প্রস্তাব তিনি জীবনে কখনো শোনেন নি । বিশু-ডাকাত তার ডাকাতির সহচর করতে চায় নাকি তাঁকে ?

—হ্যাঁ । তাই চাই ।

চারদিকে তাকাতে লাগলেন দারোগাবাবু, পালাবার রাস্তাই তিনি খুঁজছেন

কিংবা বিশ্বনাথের সঙ্গী-সহচরেরা কে কোথায় কেমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাই দেখছেন ?

কাঠের বাক্স খুলে একখণ্ড কাগজ বের করে দারোগাবাবুর সামনে রেখে দোয়াতদানি এগিয়ে দিল বিশ্বনাথ, বলল, এতে লেখা আছে সব। এই ডাকাতিতে আপনার সম্পূর্ণ মত আছে এবং আপনি এই কাজে আমাদের সহায়, আপনার যোগসাজসেই এই লুঠ করা হচ্ছে, সেই মর্মে এই একরারনামা। অনুগ্রহ ক'রে এর নীচে আপনার দস্তখৎ দিন।

—কেন, কেন ? এ প্রস্তাব কেন ?

বিশ্বনাথ বলল, দুটি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে, কোম্পানিকে জানিয়ে দেওয়া যে যাদের দিয়ে কোম্পানি আমাকে ধরার ফাঁদ পেতেছে তারাই আমার ফাঁদে বন্দী ; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, বিনা রক্তপাতে বিনা প্রাণহানিতে এই কাজ সমাধা করা।

—কিন্তু, কিন্তু—

দারোগাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই বিশ্বনাথ বলল, আপনার ক্ষতি হবে না। আমাকে চেনে আপনাদের কোম্পানি। তাদের বলবেন, জোর করে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছি। তারা বিশ্বাস করবে। নিন্, সইটা সেরে নিন্।

বিশ্বনাথের মুখের দিকে চেয়ে কাঁপা-হাতে স্বাক্ষর করলেন দারোগাবাবু। বললেন, করেছি।

উঠে দাঁড়াল বিশ্বনাৎ, বলল, চলুন। আমার সঙ্গে চলুন।

—কোথায় ?

—গদি লুঠ করতে।

যন্ত্রচালিতের মত বিশ্বনাথের পাশে-পাশে হেঁটে নন্দীদের গদি লুঠ করতে চললেন কালনার দারোগা।

কালনার সেই দারোগার কাছ থেকে এবার বিদায় নিল নদীয়া জেলার গাড়রাভাতছালা গ্রামের বাগদীর ছেলে বিশ্বনাথ। বিদায় নিয়ে সে এসে তার পাল্কীর মধ্যে বসল।

সঙ্গীদের বলল, নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে গিয়ে তারা পুজোর আয়োজন করুক। বলল, মহাসমারোহে পুজো চাই, সন্ন্যাসী। মা-কালীর কৃপায় সম্ভ্রমের সঙ্গে জোগাড় হয়েছে টাকা। ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে পুজোর মণ্ডপ তৈরি করো।

কৃষ্ণসর্দারের সঙ্গে রণপা চেপে সকলে বলাগড়ের দিকে ছুটল। সেখানে নৌকো বাঁধা আছে। সেই নৌকোয় নদী পাড়ি দিয়ে তারা ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকবে। আজ রাত্রেই।

ওপারে সন্ন্যাসীকে নামিয়ে দিয়ে নলদাহাকে সঙ্গে নিয়ে পান্সী ভাসিয়ে দিয়ে সেই রাত্রেই সুখসাগরের খাঁড়ির মধ্যে আশ্রয় নিল বিশ্বনাথ।

স্রোতের তোড়ে পাড় এখানে ভাঙছেই, শুধু ভাঙছে। এই ভাঙনের মধ্যে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে, এ ধারণা হবে না কারও। নদী যেখানে সরু একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে সুখসাগরের ভূখণ্ডের মধ্যে, সেই সরু জলের গলিতে দৈত্যের বিরাট আঙুলের মত ক'রে মাটি আঁকড়ে ধরা বটের শিকড়ের আড়ালে এসে পান্সী বাঁধল বিশ্বনাথ। এখানে বসে দেখা যায় ঐ গির্জার চূড়া। গির্জাটা ছিল— উপাসনার জায়গা না— ব্যারেটো সাহেবের হাতিবাহিনীর মাহুতদের থাকার আস্তানা।

আতঙ্কের একটা রাত্রি কেটে যাবার পর ভোরের হাওয়া লাগে বলাগড়ের প্রান্তরে। সে হাওয়া স্বস্তির। কত বড় কি ঘটনা ঘটে গেল সে খবর এখনো পৌছয়নি এখানে। বলাগড়ের কুঠিতে যখন গতরাত্রের রণপা-ধ্বনি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন সুখসাগরের ফাঁড়ির মধ্যে বসে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানছে সেই রণপা-বাহিনীর অধিনায়ক।

লিলি কুর্টিস বেরিয়ে এসেছে বাংলোর বারান্দায়। তার ছোট মাথাটি সোনালি চুলের ফুরফুরে উল্লাস দিয়ে ভরা, হাতির দাঁতের মত রঙ সারা গায়ে ছড়ানো, গোলাপের দুটো কচি পাপড়ির মত ফুটফুটে দুটি ঠোঁট, ঐ জোড়া ঠোঁটের আড়ালে ঐ যে দেখা যাচ্ছে সাচ্চা মুক্তোর দুটি ক্ষুদ্র মালা। বছর চোদ্দ-পনর বয়স হয়েছে মেয়েটার।

হ্যাঁ, রূপ পেয়েছে বটে মেয়েটা। মেয়েটার ভাগ্য ভালো। ছেলে তিনটি তো এমন রূপ পেল না।

মাদাম গ্র্যাণ্ডের স্মৃতি এখনো মুছে যায় নি এ অঞ্চল থেকে। চন্দননগরের সেই ফুটফুটে মেয়ে। তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল চার ধারে। মেয়েটাকে বলিহারিই দিতে হয় বটে, পনেরো-ষোলো বছরের কচি মেয়েটা হঠাৎ একটা জঘন্য কাণ্ড করে বসল। তার কথা নিয়ে কত কুৎসা কত কেলেঙ্কারি, তবু হঠাৎ

না মেয়েটা। এখন বয়স হয়েছে তার, বিস্তর ঠাটই তার ছিল বটে প্রথম-বয়সে, এখন প্রায় বুড়ো হয়ে গেলেও সেই ঠাটের গুঁড়া এখনো লেগে আছে গায়ে। নইলে চন্দননগরের সেই কচি মেয়ে সব বাধাবিপত্তি ঠেলে নিজের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে? এখন সে নাকি ফরাসি-দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির একজন প্রিয়পাত্রী। মেয়েরা না পারে হেন কর্ম নেই।

কাছারিতে ব'সে দূর থেকে লিলিকে দেখে গোমস্তা হৃদয়বাবু বলেন, রূপে মাদাম গ্র্যাণ্ড হয়েছে মেয়েটা। গুণে, অর্থাৎ ঐ বদ্‌গুণে, মাদাম গ্র্যাণ্ড না হলেই কুর্টিস-সায়েবের মান রক্ষা হয়।

একটু থেমে তিনি বললেন, অর্থাৎ কিনা বাপের গুণ পাক, মায়ের গুণ না পেলেই হল।

নায়েব বিনোদবিহারীবাবু একটু সাদা-মাটা গোছের মানুষ। সব রকম বিষয়েই তাঁর একটা-না-একটা নিজস্ব মত আছে বটে, কিন্তু তিনি কোনো ব্যাপারেই কোনো কড়া মন্তব্য করেন না। শ্রীমতী কুর্টিসের বিষয় নিয়ে হৃদয়বাবু একটু বেশি উৎসাহী, এবং একটু বেশি বিরূপ। তাঁর এই বিরূপতার কারণ যে কি, তা বোঝা কষ্ট। অনেক কথাই হৃদয়বাবুর বলার ইচ্ছে, কিন্তু নেহাত তাঁর মনিবকে নিয়েই কাণ্ডটা, তাই তিনি চাপা মন্তব্য করেন মাত্র। কিন্তু তাঁর সেই চাপা মন্তব্য সত্ত্বেও তাঁর মনের ভাব চাপা থাকে না।

যার যা চরিত্র, যার যা স্বভাব— সে তা নিয়ে খুশি থাক্। তার মধ্যে তোমার-আমার মাথা গলানো কেন। কুর্টিসের স্ত্রী কি করেছেন, কেন করেছেন; কিংবা কি করেন নি, কেন করেন নি— ইত্যাদি কথা নিয়ে নিজেকে বিব্রত করতে চান না নায়েব বিনোদবাবু। তাঁর যা কাজ তিনি তা করে যাচ্ছেন, খাজনা আদায় করে করে জমিদারের কাছে জমা দিচ্ছেন। কিন্তু গোমস্তা-মশাই করছেন কী। মাইনে পান তো মাসে তিরিশ টাকা— ছেলেমেয়ের সংখ্যাও তো কম না, অতএব সংসারও তো বেশ বড়। ঐ টাকায় সেই সংসার চালিয়ে অমন সম্পত্তিটা তিনি গড়ে তুললেন কী করে? দেড় শ বিঘে জমি, অত বড় দিঘি, অত বিরাট আমবাগান। এত হল কী করে? রায়তদের মেরে, তাদের ভাতে-মেরে তো? মোটা মোটা দস্তুরি নিয়ে তিনি এখন মোটা হয়ে উঠেছেন। যে দস্তুরিকে রায়তরা তাদের জীবনের অভিশাপ বলে মনে করে, গোমস্তা-মশাই তাকে তাঁর ন্যায্য পাওনা মনে করে মানুষকে পিষে মেরে নিচ্ছেন না সেই দস্তুরি? কিন্তু তাঁর এই স্বভাবটা নিয়ে মন্তব্য করতে যাচ্ছে কে?

সতীদাহ সম্বন্ধে এত গরজ গোমস্তা-মশাইয়ের। তাঁরও তো মেয়ে আছে, সেই বিবাহিত মেয়েটি— ভগবান না-করুন— আজ যদি বিধবা হয়, গোমস্তা-মশাই কি পারবেন তাকে হাসিমুখে তার স্বামীর চিতার আগুনে ছুঁড়ে দিতে? আগুনের আঁচ দেখে ভয় পেয়ে তাঁর মেয়ে যদি ঝাঁপ দেয় গঙ্গায়, তিনি কি তাকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঠাঁই দেবেন আবার? ঠাঁইয়ের অভাবে যদি সে মেয়ে কোনো একটা আশ্রয় বেছে নেয়, তা হলে নিশ্চয় তাকে ঘেন্না করবেন গোমস্তা-মশায়?

সতীদাহ রদ করবার জন্যে দেশের নামজাদা কয়েকজন মানুষ নানারকম চেষ্টা করছে। এ প্রথাকে তারা নিষ্ঠুর বলে মনে করছে। কিন্তু এই প্রথার উপর নির্ভর করে যাদের জীবিকা, তারা শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে এ প্রথা বলবৎ রাখার জন্যে ব্যস্ত।

এ প্রথা রদের জন্যে মানুষ ব্যাকুল হয়েছে। আর-একটি প্রথা সম্বন্ধে তাহলে তাদের কোনো ধারণা নেই— সে হচ্ছে এই দস্তুরি। এ জাঁতাকল থেকে নিরীহ রায়তদের বাঁচাবার জন্যে একজন পুরুষসিংহ তার পৌরুষ নিয়ে দেখা দিক, নায়েব-মশায়ের বুঝি এই ইচ্ছে। কিন্তু কার চরকায় কে তেল দেবে? নায়েব-মশায় যা উপরি পান তার নাম দস্তুরি না হলেও দস্তুরমত সেও হয়তো তাঁর ন্যায্য পাওনা না।

সুতরাং ও-সব ঝগড়ার মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভালো। আমাদের চোখের সামনে সদ্যফোটা একটা লিলিফুলের মত ঐ যে টুকটুকে মেয়েটি দাঁড়িয়ে, আমরা তাকে একটু দেখি। তার রূপ মাদাম গ্র্যাণ্ডের মতই হোক কিংবা নর্তকী নিকির মত, সে তুলনায় সময় খরচ না করে ঐ রূপটা দেখে নিতে ক্ষতি কি।

যদি তুলনাই করতে হয় একান্ত, তা হলে কোনো জীবের সঙ্গে তুলনা না করে আমরা তুলনা করতে পারি ফুলের সঙ্গে— বসরাই-গোলাপের সঙ্গে। তুলনা করতে পারি কচি দাড়িম্বের দানার সঙ্গে ঐ দাঁত, শঙ্খের সঙ্গে ঐ গলা, সিংহকটির সঙ্গে ঐ মাজা, হস্তিশুণ্ডের সঙ্গে ঐ উরু। পরিপূর্ণ যৌবন এখনো নামে নি ঐ অঙ্গে। হুগলী-নদীর জোয়ারের মত একদিন যখন যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে ঐ শরীর, তখন কত শত ফিলিপ ফ্রান্সিস হয়তো দেয়ালে মই লাগিয়ে ঐ শিখায় দগ্ধ হবার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

মাদাম গ্র্যাণ্ডের বয়সও তখন এমনি, এই লিলিরই প্রায় সমান বয়সী।

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী যে, সেই ফ্রান্সিসের মত পদস্থ মানুষও তার সান্নিধ্যলাভের জন্যে অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়ে তার অন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তার পরের ঘটনা কে না জানে? অত বড় মামলা আর অত বড় কেলেঙ্কারি— তার আগেও না, তার পরেও না—কখনো ঘটেনি কলকাতার আদালতে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে ঘটে গেছে ঘটনাটা, কিন্তু ব্যাপারটা এতই মুখরোচক যে, আজও সে কাহিনী লোকের মুখে-মুখে। যে কাহিনী এতদিনের বাসী হয়ে গিয়েছে সে কাহিনীর আমেজটা মনের মধ্যে পুষে রাখায় কতই যেন মজা। সে মজা ভোগ করতে হলে কাছে-ভিতের একজনের উপর সেই কেলেঙ্কারির অপবাদ আরোপ করে নিতে পারলে মজাটা বুঝি আরও ঘন হয়ে ওঠে।

গোমস্তা হৃদয়বাবুর মনোভাব অনেকটা এই। কুঠিবাড়ির কাছারিতে বসে কুঠির কাজে সময় আর লাগে কত। কাজ ফুরিয়ে গেলেই ফাঁকা মাথার মধ্যে অনেক রসের স্রোত কুলকুল শব্দে বয়ে যেতে শুরু করে।

হৃদয়বাবু বলেন, ফরাসডাঙার মেয়ে নিরুপমা করল একটা কাণ্ড, আর করালগঞ্জের এই বউ তার আগেই তার চেয়েও মস্ত কাণ্ড করে দিব্যি বিয়ে-করা বউ সেজে ফিরিঙ্গি-ভাতারকে নিয়ে ঘর করছে। সমাজটা গেল হে বিনোদবিহারী, এ সমাজের আর কোনো আশা নেই।

সমাজ নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই বিনোদবিহারীর। তার মাথাব্যথা সংসার নিয়ে, নিজের সংসারটা নিয়ে। তার মেয়েও সোমত্ত হয়ে উঠছে, বিয়েও দিতে হবে। বিয়ে দিতে হবে কিন্তু ঘরেই রাখতে হবে। কুলীন হওয়ার যা বিড়ম্বনা তা সইতে তো হবেই।

এইজন্যে বিনোদবিহারী হৃদয়নাথের কথায় যোগ না দিয়ে, এ-পর্যন্ত কত খাজনা আদায় হল সেই হিসাব যোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন মোট অঙ্ক।

কাছারি-ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলোর এই বারান্দা। লিলিকে সেখান থেকে দেখে নায়েবে-গোমস্তায় নানারকম আলোচনা হয়ে গেল। সে আলোচনা ঐখানেই শেষ হয়ে অবশ্য গেল না। কিন্তু আমরা এখন ও-আলোচনায় আর কান দিতে ইচ্ছুক নই।

লিলির পাশে এসে দাঁড়াল রবিনসন। এই ভাইবোনের মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের চোখের দৃষ্টি কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলাগড়-কুঠির কুঠিয়াল মিস্টার ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিসের এই পুত্র-কন্যাকে দেখে

আমাদের এতটা বিস্মিত হওয়ার অর্থ কি? এ অর্থ আমরা খুঁজে পাচ্ছি নে; কিন্তু তবু খোঁজার আগ্রহ আমাদের বাড়ছে।

গতরাত্রে সন্ধ্যার অন্ধকারে মশালের ধোঁয়াটে আলোর ঝাপসা শিখার মধ্যে আমরা এদের দেখেছিলাম অস্পষ্টভাবে। কিন্তু এই দিনের আলোয় এতটা স্পষ্ট করে দেখেও আমাদের চোখের যাবতীয় ধারণা এমন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন? এ কেনর উত্তর পেতে হলে আমাদের এখন পিছিয়ে যেতে হবে অনেকটা। কলকাতার আদালতে যখন মাদাম গ্র্যাণ্ড ও ফিলিপ ফ্রান্সিস সায়েবের ব্যভিচার নিয়ে মামলা শুরু হয়েছে, অনেকটা সেই সময় পর্যন্ত পিছতে হবে আমাদের। সার্ এলিজা ইম্পের কোর্টে তখন বিচার হচ্ছে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিসের। সেই সময়েই এক সন্ধ্যার স্তিমিত আলোর অন্তরালে গৌরহাটি-শ্মশানে ঘটে গেল এক ভয়ংকর বিপর্যয়— মৃত স্বামীর চিতার পাশে শায়িত এক যুবতী কুলকামিনী আগুনের শিখা দেখে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গঙ্গায়। গঙ্গার স্রোতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল সেই আর্তনাদ, এবং সেইসঙ্গে সোনার প্রতিমার মত এক জীয়ন্ত শরীর।

অতদূর পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের। কিন্তু এখন, এই বলাগড়ের নীলকুঠির চত্বরে দাঁড়িয়ে, অতটা পিছিয়ে যেতে আমরা ইচ্ছুক নই। আমাদের সম্মুখে বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ভ্রাতা ও ভগিনী, এখন আমরা তাদের মুখের দিকে চেয়ে একটু কৌতূহলী হতে ইচ্ছা করি।

আমরা নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করতে পারি কিসের এ কৌতূহল। অতএব বোঝা যাচ্ছে, এই স্পষ্ট আলোতেও আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি ঐ দুটি প্রাণী কে। ইংরেজ কুঠিয়ালের নন্দন ও নন্দিনী ওরা দু-জন, ওদের গায়ের বর্ণ তাই এত উজ্জ্বল, সেই ঔজ্জ্বল্যেই তাহলে আমাদের চোখে ধাঁধা লেগেছে। রঙই দেখেছি আমরা, কিন্তু রঙের আড়াল দিয়ে চেয়ে একবারও দেখি নি ওদের মুখ— মুখের ডৌল। এই ধরণের মুখ এর আগে আমরা কি দেখি নি কোথাও?

হয়তো দেখেছি, এবং দেখেছি বলেই আমাদের এ কৌতূহল।

এ মুখ আমরা দেখেছি। লিলি কুর্টিসের রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে আমরা কেবল মাদাম গ্র্যাণ্ডের কথাই মনে করব না। মাদাম গ্র্যাণ্ডকে আমরা দেখি নি, কিন্তু এ মুখ আমরা দেখেছি। অবিকল এই মুখ, একই আদল। এ আদল আমরা দেখেছি ফরাসডাঙার হরিশঙ্করের মেয়ের মুখে— রাধার মুখে। হরিশঙ্করের মুখ

গোঁফে-দাড়িতে ভরা হলেও ঐ রবিনন্দন-ছেলেটির মুখও অনেকটা হরিশঙ্করের মতই কি দেখায় না ?

কেন ? এ কেনর উত্তরের আর দরকার আছে কি না জানিনে। দরকার থাকলেও সে উত্তর লিখে জানাতে কলম সরে না। বঙ্গসমাজের এতবড় কলঙ্কের এবং এতবড় কেলেঙ্কারির কাহিনী নিয়ে হৃদয়নাথবাবু ব্যাকুল ও বিব্রত হয়ে আছেন, তাঁর সে ব্যাকুলতায় ইন্ধন যোগাতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই।

গৌরহাটি থেকে হরিশঙ্কর যাত্রা করল শান্তিপুরে। সেই নৌকোতেই আমরাও তার সঙ্গেসঙ্গে রওনা হলাম। বলাগড়ের কিনারে এসে এখানকার খ্যাতিমান কুঠিয়ালকে দেখার জন্যে আমরা নেমে পড়েছি এখানে। মাঝখানে অবশ্য আমরা বিশু-ডাকাতের সঙ্গে একটু ঘুরে এসেছি কালনা থেকে, সুখসাগর থেকে। শান্তিপুর থেকে হরিশঙ্কর কিসে ফিরবে জানিনে, যদি নৌকোতেই ফেরে তাহলে তখন আমরা উঠে পড়ব তার নৌকোয়, এবং সঙ্গেসঙ্গে গিয়ে জেনে নিতে পারব কি বার্তা নিয়ে এল সে শান্তিপুর থেকে। যতক্ষণ সে না ফেরে, আমরা বলাগড়ের মাঠে আর প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারি। খুব বেশি দেরি তার হবে বলে তো মনে হয় না।

চার দিকে বিশাল প্রান্তর। প্রান্তরের পার দেখা যায় না। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গাছ আর শুধু আগাছা। সেই প্রান্তরের মাঝে-মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত দু-একটা কুটির। ওইসব কুটিরে রায়তেরা বাস করে, কিংবা নিজাবাদী জমির মজুরেরা। আরও দূরে দেখা যায় সারি সারি নৈবেদ্যের মত আকাশে খড়ের চূড়া উন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি গোলা। ধানের গোলা নয় ওগুলি। নীলগাছের বীজ জমা করে রাখা হয়েছে ঐসব গোলায়। রায়তী জমিতে আর নিজাবাদী জমিতে বোনার জন্যে ঐ গোলা থেকে বিলি করা হয় বীজ।

নীলকুঠিতে কাজের জন্যে অনেক দূর দূর জায়গা থেকে মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড করেছে বলাগডের উপকণ্ঠে। মানভূম ও সিংভূমের জংলি আদিবাসীরা এসেছে— সেই ভুনা কুলীরা নদীর কিনারে খড়ের নীচু দোচালা ঘরে সংসার পেতে বসেছে। আরও অনেক মেয়ে-পুরুষ এসেছে মেদিনীপুর থেকে এই কুঠিতে খাটতে।

সারাদিন এরা খাটতে রাজি, কিন্তু কুঠির কাজ সারাদিনের না। মেদিনীপুরের মানুষদের কদর একটু বেশি, মাসে এরা চার টাকা মাইনে পায় ;

ভুনা-কুলীরা পায় তিন টাকা— এদের মেয়েরা পায় দু-টাকা করে। সারাটা বছর যদি এই মাইনেই তারা পেত তাহলেও হয়তো কথা ছিল না; কিন্তু কুঠির নীল-নিঙড়ানো কাজ বছরে মাত্র চার মাস। এই চারটি মাস খেটে এই রোজগার করার জন্যে এক-শ দেড়-শ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে তারা হাজির হয় কুঠিয়ালের দরবারে। কিন্তু কুঠিয়ালের মুখোমুখি হওয়ার সাধ্য কি তাদের। তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় গোমস্তা।

কুঠির কাজ চাইলেই পাওয়া যায় না। কাজ জোগাড় করে হয়তো দেওয়া যেতে পারে— কিন্তু দস্তুরি। দস্তুরি না হলে কি করে বহাল করা হবে কাজে।

মাথার পিছন দিকে এক-সার চুলের বেড়া দেওয়া টাক-মাথাটা নিয়ে হৃদয়নাথবাবু দৃঢ় ভঙ্গিতে ফটকে দাঁড়িয়ে কুলী-কামিনীদের গতরের শক্তি যাচাই করেন হয়তো। তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে, ইশারা করে কাছে ডেকে একটা চোখ ঈষৎ ছোট করে বলেন, খাটবি?

ফিক করে সে হেসে বলে, হাঁ বাবু।

দস্তুরির কথাটা খোলসা ক'রে বলেন না, হাত পাতেন হৃদয়নাথ, বলেন, দিবি নে?

হিহি করে হেসে ওঠে মেয়েটা, বলে, হাঁ বাবু। মিলনে, মিলবে।

এক পাশে তাকে সরে দাঁড়াতে বলেন হৃদয়নাথ।

একে-একে এইভাবে বাছাই করতে কিছুক্ষণ মাত্র সময় লাগে তাঁর। এই কাজ করতে করতে একেবারে পাকা হয়ে গিয়েছেন হৃদয়নাথ একেবারে পোক্ত।

রায়তদের কাছ থেকে আর নিজাবাদী জমির কুলীদের কাছ থেকে দস্তুরি তিনি আদায় করে থাকেন, কিন্তু এই ভুনা-কুলীদের কাছ থেকেও ঐ জিনিসটি দাবি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ তিনি করেন না। এইটেই বড় আশ্চর্য। নায়েব বিনোদবাবুরও উপরি আয়ে আসক্তি কম না, কিন্তু বছরে চার মাস যারা খাটতে আসে লম্বা রাস্তা পায়ে হেঁটে, তাদের কাছ থেকে দস্তুরি দাবি করতে দেখে বিনোদবাবুর বুঝি নায়েবী ছেড়ে দিতেই ইচ্ছে করে।

ম্যাকগ্রেগর কুর্টিস এই কুঠির জন্যে অনেক ব্যবস্থা করেছেন। অন্যের জমিতে চাষ করা নীল কিনে এনে কুঠির কাজ চালু রাখা এবং সেই সঙ্গে কুঠির উন্নতি করা সম্ভব না। এইজন্যে তিনি ক্রমে ক্রমে বিস্তর জমি কিনেছেন এই কুঠির নামে। এই বাংলোর সম্মুখে এখানে দাঁড়িয়ে দিগন্ত-ছোঁয়া ঐ যে

প্রান্তর দেখা যাচ্ছে— ও সব জমিই এই কুঠির। কুঠির চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্তে পরের জমির নীল কিনে আনা হত বটে প্রথম-প্রথম, কিন্তু এখন কুঠির নিজের জমিতেই সব চাষ হয়। এই জমিকে ছুইভাগে ভাগ করেছেন প্ল্যাণ্টার ম্যাক্‌গ্রেগর। অর্ধেকের বেশি জমিই নিজাবাদী, কুঠির তত্ত্বাবধানে চাষ হয়, ভাড়া-করা মজুর দিয়ে চাষ করানো হয়, ফসল যা হয় সবই কুঠির, বীজগোলা থেকে বীজ এনে ছড়ানো হয় মাঠে ; বাকি জমিতে চাষ হয় রায়তী প্রথায়।—রায়তরা জমির পত্তনী নিয়ে নিজেরা সেই জমিতে চাষ করে, প্ল্যাণ্টারের গোলা থেকে বীজ কিনে নেয়, শর্ত থাকে যা ফসল হবে এত দরে তা কিনে নেবে প্ল্যাণ্টার এবং সবচেয়ে কম ফসল কতটা হতে পারে তারও একটা পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়।

গোমস্তা-মশায়ের অসুবিধে নেই কোনোটাতেই। যে ধার দিয়েই যাও তাঁর হাতে কাটা পড়তেই হবে। হৃদয়নাথবাবু একটা শাঁখের করাত। নিজাবাদীর মজুররা দস্তুরি না দিয়ে জমিতে পাটার অধিকার পায় না ; রায়তরা মোটা দস্তুরি না দিলে জমির পত্তনীই পায় না, বীজ কিনতে এসেও বিপদে পড়ে যায়।

সুতরাং হৃদয়নাথবাবু সুখে আছেন। পৃথিবীটা যেমন আছে, বরাবর অবিকল, তেমনি থেকে যাওয়াটাই তাঁর অভিপ্রেত। এর কোনো পরিবর্তন তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু, তিনি একটু-একটু লক্ষ্য করছেন যে, কয়েকটা প্রথার বিরুদ্ধে দেশের কয়েকটা মানুষ বড লেগেছে। বৃদ্ধ হৃদয়নাথের অভিজ্ঞতা কম না, তিনি বোঝেন, এসব হচ্ছে কয়েকটা নিষ্কর্মা মানুষের বিলাস মাত্র। দিবানিদ্রা দিতে দিতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যারা, তারাই সন্ধ্যাব মজলিসে বসে-বসে হাই তোলার সঙ্গেসঙ্গে উঁচুউঁচু কথা বলে।

সত্যিই আরামে আছেন হৃদয়নাথবাবু। কলীকামিনীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে ঘরকন্নার কাজও করে দিয়ে আসে, আবার অন্যভাবে গতর খাটিয়ে আসে তারা হৃদয়নাথবাবুর বাড়িতে। বারো মাসে তেরো পার্বণ তাই লেগেই আছে গোমস্তা-মশায়ের গৃহে।

গঙ্গার জলের মধ্যে কুঠির চীনা-পাম্প বসানো, ভুনা-কুলীরা পা দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে সেই পাম্প ঘোরাচ্ছে, সেই লম্বা যন্ত্রটার মাঝে মাঝে এক-একটা কাঠের বাটি বসানো, সেই বাটি ভরে ভরে জল উঠে এসে কুঠির বাঁধানো পুকুরে এসে ঢেলে দিচ্ছে জল।

বাইরে থেকে বয়ে আনা হচ্ছে এই জল। কুঠির ভিতরে জমা হচ্ছে নীল-চারার স্তূপ। গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে নীল-গাছ এনে ঢালা হচ্ছে চত্বরে। রায়তেরা নিয়ে আসছে এই নীল। ওজনদার দাঁড়িয়ে আছে চোখে খরদৃষ্টি নিয়ে, তার হাতে ছয় ফুট আন্দাজ লম্বা একটা লোহার চেন, ঐ চেন দিয়ে এক বোঝা গাছের স্তূপ বেড় দিয়ে ধরছে, দু-এক গোছা কম হলে পাশের স্তূপ থেকে টেনে নিয়ে মাপ ঠিক করছে। ওজনদারকেও কিছু দস্তুরি দিতে হবে, তা না হলে মাপে ইতর-বিশেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। রায়তের সঙ্গে বনিবনা না হলে ঐ লোহার শিকল দিয়ে শক্ত করে এঁটে ধরলেই একটা বাণ্ডিলে অনেক বেশি নীলচারা লেগে যাবে। ওজনদার এখানে বাণ্ডিলে-বাণ্ডিলে মেপে চলেছে, ওদিক থেকে মেয়ে-কুলীরা মাথায় বয়ে সেই বাণ্ডিল নিয়ে যাচ্ছে ভ্যাটে। একসঙ্গে অনেকগুলি বাণ্ডিল নেবার জন্যে পুরুষরা জোড়ায়-জোড়ায় দুই হাতে দুটো বাঁশ ঝুলিয়ে তার উপর বাণ্ডিল চাপিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিচ্ছে ভ্যাটের উপর। এখানে স্তূপীকৃত নীলচারার উপর লম্বালম্বি অনেকগুলো বাঁশ পেতে নিয়ে তার উপর দলে-দলে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাড়াই ক'রে ঐ চারা থেকে নিঙড়ে বার করছে রস। এবং চীনা-পাম্প দিয়ে বয়ে আনা গঙ্গার জল ঢালা হচ্ছে সেই চারার উপর।

মাড়াই হতে হতে গাছ নিঙড়ে সম্পূর্ণ রস বের করা শেষ হল। এবার ঐ রস পিটাই শুরু হবে। কুলীরা প্রস্তুত। পরনের ছোট কানি তারা উরুর উপর পর্যন্ত টেনে তুলে প্রায় নেংটির মত করে নিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে নৌকোর দাঁড়ের মত মাথা-চ্যাপ্টা-করে কাটা বাঁশের লাঠি। দশ-বারো জন নেমে গেল উরু-ডোবা নীল-রসের মধ্যে। দু-সার হয়ে তারা মুখোমুখি দাঁড়াল সেই বৃহৎ চৌবাচ্চায়। বাঁশের চ্যাপ্টা মাথা দিয়ে পিটতে আরম্ভ করল ঐ রস। ভীষণ বেগে তারা দল বেঁধে আঘাত করতে লাগল, কখনো আবার লাঙল দেবার মত করে সেই রসের মধ্যে দিয়ে চালাল হাতের লাঠি। পিটতে পিটতে যেন ক্লান্ত আর অবশ করে দিল ঐ নীলরসকে। চৌবাচ্চার চার কিনার নীলাভ ফেনায় ভরে উঠল— প্রায় এক ফুট পুরু হয়ে উঠল সেই ফেনা।

তাদের এই পিটাই দেখে মনে হলে যেন ঐ রসের চৌবাচ্চায় তারা দাঙ্গা আরম্ভ করেছে। ঘণ্টা-দুই ধরে কখনো মুখোমুখি, কখনো পাশাপাশি, কখনো সবাই পিছন ফিরে নির্দয়ভাবে ঐ তরল পদার্থটিকে আঘাত করতে লাগল, আর সমস্বরে গাইতে লাগল গান—

গ্রাণ্ডি-বিবি রাণ্ডি হল,

রাণ্ডি হল গ্রাণ্ডি বিবি—

কাঠকরবী ধুত্রো-বিচি

ধুত্রো-বিচি কাঠকরবী।

ওই আঘাতে চৌবাচ্চার রস একটা বিরাট নীলাভ আবর্তের মত পাক খেয়ে উঠল।

শেষ হয়েছে পিটাই। অনেকক্ষণ বাদে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল ঐ রস। তখন এক বিচিত্র চেহারা দাঁড়াল তার। তার রঙ কখনো পীত, কখনো সবুজ, কখনো গোলাপি, কখনও-বা নীলচে দেখাতে লাগল।

ভ্যাট থেকে উঠে এসেছে ওরা। চেনা যায় না কাউকে, মাথার চূড়া থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা পর্যন্ত ঘননীলের আবরণ দিয়ে ছাওয়া। ওদের গলার গানেরও যেমন কোনো মানে চেনা যাচ্ছে না, ওদের চেহারারও যেন কোনো মানে নেই। ওরা মানুষ, না অন্য কোনো জীব— সে কথা বলা এখন বড় কষ্ট।

এবার গোমস্তা-মশাই এলেন কুঠিয়াল ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে। ভ্যাটের রসের রঙ পরীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। রঙমিস্ত্রি এসেও দাঁড়াল পাশে। একটা সাদা প্লেটের উপর ঐ তরল পদার্থ একটুখানি নিয়ে হাওয়ায় শুকানো হল। ঐ রস অনেকক্ষণ ভ্যাটে স্থির হয়ে থাকার পর রসের অন্তরীক্ষে লুকানো নীলচূর্ণ যখন থিতিয়ে নীচে পড়ল, তখন নল দিয়ে বাজে জল বের করে দেওয়া হল ভ্যাট থেকে।

ছোবড়াগুলি কুলীরা নিয়ে গেল। ঐগুলি থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ লাগছে গোমস্তার ও কুঠিয়ালের নাকে। কিন্তু যারা বয়ে নিয়ে চলেছে এ-গন্ধে তাদের কোনো বিকার নেই। ঐ জ্বালানি দিয়ে জ্বালা হবে উনুন, তার তাত দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হবে ভিজা নীলচূর্ণ। শুকানো চূর্ণ কাঠের ছাঁচে ফেলে নীলের দানা তৈরী হচ্ছে পাশের ঘরে। বলাগড়ের ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে, নৌকো-বোঝাই হয়ে নীলদানা চালান যাবে দূরে— বহুদূরে।

বাইরে, কুঠিবাড়ির গায়ে লম্বা করাত দিয়ে কাঠ-চেরাই হচ্ছে। চীনা-পাম্পের কাঠামো আর বাটি তৈরি হবে ঐ কাঠে, নীলের ছাঁচ তৈরি হবে।

বলাগড়ের কাজ নিয়মিত চলেছে, শৃঙ্খলায় কোনো ত্রুটি নেই। সামান্য যেসব ত্রুটি আগে ছিল, সেসব সংশোধন করে নিয়েছেন ম্যাক্‌গ্রেগর। তিনি

বল্লেন, বলাগড়কে তিনি এমন-একটা ইউনিট করে তুলতে চান যে, এ কুঠিকে নির্ভর করতে হবে না কারও উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, অমনটি করে তোলার আর বাকি নেই কিছু। সবই এর আছে। কিন্তু নেই মাত্র একটা জিনিস। নেই আত্মরক্ষার ভরসা। কাল রাত্রে রণপার শব্দে বুকের সমস্ত রক্ত ঐ ভ্যাটের রসের মত নীল হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বনাথের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনো ভরসা নেই, সেইটেই একমাত্র অভাব। নামমাত্র ভরসা হচ্ছেন ফোর্ট উইলিয়মের বর্তমান শেরিফ মিস্টার হেনরি চার্চিল ; কিন্তু তাঁর টার্ম তো ফুরিয়ে আসছে, এর পর শেরিফ হচ্ছেন নাকি আর্কিবল্ড সিম্পসন। ম্যাক্‌গ্রেগরের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ, কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার দরুণ একদিন রাত্রে নাহয় ডিনারে নিমন্ত্রণ পেতে পারেন, কিন্তু ডাকাতের হাত থেকে ধনপ্রাণ রক্ষার নিশ্চয়তা নিশ্চয় পেতে পারেন না। এ ছাড়া শেরিফদের দপ্তরে তাঁর পুত্রও আছে, সেও কি কোনো ভরসা দিতে পারে তার পিতাকে ?

কারও কাছেই কোনো ভরসা নেই বটে, কিন্তু বরাত বলতে হবে— চাঁপদানি খন্যান দ্বারবাসিনী ও গোপীগঞ্জের কুঠিতে লুঠ হয়ে গেল পর পর কয়েকদিন, এর আগেও লুঠের খবর পাওয়া গিয়েছে কতই-না কুঠি থেকে এবং কত জমিদারগৃহ থেকে ; কিন্তু বলাগড়টা বেঁচে গিয়েছে সেইসব হানার হাত থেকে।

যাকে দেখে এত ভয় সেই মানুষটি কিন্তু সুখসাগরের খাঁড়ির মধ্যে সুখনিদ্রায় কাল কাটাচ্ছে না। সে এখন নদী পাড়ি দিয়ে নেমেছে গৌরহাটির ঘাটে। কিন্তু এই দিনের আলোতে নৌকো থেকে নেমে কিসের তার এই অভিযান ? হয়তো আমরা পরে জানতে পারব তার এই পদব্রজ-যাত্রার কারণ। তার পাল্কীতে যে লগি-দুটো আছে, সে দুটো শুধুই লগি না। ও দুটি বিশ্বনাথের নিশাভিযানের রণপা। আজ রাত্রেই তাকে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে নদীয়ার ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে, সেখানে উৎসবের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল। গৌরহাটির কাজ সেরে পুনরায় সে নদী পাড়ি দিয়ে সুখসাগরে নেমে সেখান থেকে রণপা চেপে যাত্রা করবে আজ সন্ধ্যাতেই।

নিরীহ ভালোমানুষ এই সাদাসিধে জীবটিকে নিয়েই এই যন্ত্রণা চারদিকে। কিন্তু গরিটির গাঙ্গুলি-বাড়ির পিসিমা এই মানুষটিকে দেখেন অন্য চোখে— এই বিশু যে ডাকাত-বিশু এ কথা তাঁকে বিশ্বাস করানো কম যন্ত্রণা নয়। বিশু এখন সেই পিসিমার কাছে গেল। পিসিমা কি নাকি বিপদে পড়েছেন, খবর পেয়েছে বিশ্বনাথ।

গাঙ্গুলি-বাড়ির পিসিমা কিসের বিপদে পড়েছেন আমরা তা এখনো জানিনা, কিন্তু ম্যাক্‌গ্রেগরের বাড়িতে তাঁর মিসেসের বিপদ যেন সমূহ। তাঁর এ বিপদ আর কিছুর নয়, এ বিপদ তাঁর মনের। কিছুদিন থেকে মনে-মনে তিনি বড় বিপন্ন হয়ে আছেন।

সারাটা দিন বড় নির্বিঘ্নে কেটে গেল বাংলো-বাড়ির আবহাওয়া। যথারীতি বিকেলবেলায় তিনি বারান্দায় এসে বসলেন। ফটকের কাছে জমাদার হরকিষণ বর্শা-হাতে যথারীতি পাহারায় দাঁড়িয়ে, গাছের গুঁড়ির কাছে বসে আছে পোষা হরিণ-দম্পতি। লনের ধারে ফুটে উঠেছে পরিপূর্ণ দুটি চন্দ্রমল্লিকা। ঝাউয়ের ঝিরঝিরে পাতার উপর তিরতির ক'রে নেচে নেচে খেলা করছে গঙ্গার হাওয়া।

বেশ চমৎকার অপরাহ্ণ। স্বামীর পাশে এইভাবে পরম আরামে বসে অবসর-যাপন করতে পায় ক'টা মেয়ে? সামনের চৌকির উপর জুতো সমেত পা তুলে দিয়ে আলবোলার নল মুখে দিয়ে বসে আছেন ম্যাক্‌গ্রেগর। এখন তাঁর চেহারা কুঠিয়াল-ম্যাক্‌গ্রেগরের মত মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তিনি হাজব্যাণ্ড-ম্যাক্‌গ্রেগর। সাধ্বী স্ত্রীর পাশে বসে আছেন যেন গর্বিত স্বামী।

টুকিটাকি কথা বলছেন দুজনে। নিজেদের অতীত নিয়ে আর নয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, সেই সঙ্গে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও। মেয়েটা যে এত সুন্দরী হয়ে উঠল, এখন উপায়?

কুর্টিস সায়েব মৃদু হেসে বললেন, উই আর টু ফাইণ্ড আউট এ হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান ফর হার্।

তা তো বটেই। কিন্তু পাত্রটি মনের মত হলে হয়। এবং এমন একজন ইয়ংম্যান খুঁজতে হবে যে এই ইয়ং উওম্যানটিকে তার ইউথ দিয়ে জিল দিয়ে অ্যাফেকশন দিয়ে নিজের করে রাখতে পারে। মস্ত বাড়িতে দাসী আর জমাদারের কাছে জিম্মায় রেখে ক্লাবে গিয়ে মদ গিলে গিলে রাত কাবার যেন সে না করে। ঐ রকম করতে গিয়েই তো মিস্টার গ্র্যাণ্ডের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে তার অন্দরে গিয়ে তার স্ত্রীর সর্বনাশ করার সুবিধে পেল সেই মানুষটা। এখন সে নাকি নাইটহুড পেয়ে গেছে বিলেতে, সে এখন নাকি শুধু ফিলিপ নয়, স্যার্ ফিলিপ ফ্যান্সিস! সে এখন নাকি এম. পি.— মিলিটারি পুলিশ নয়, পার্লামেন্টের মেম্বার। কিন্তু মেয়েটা— ঐ মাদাম গ্র্যাণ্ড— হাজার মানুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে এখন সে ফরাসি দেশের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর বিয়ে-করা বউ হয়েছে,

সেই সুবাদে নেপোলিয়নের হয়েছে প্রিয়পাত্রী। যতই যা হোক সে, কিন্তু সে কি সুখী হয়েছে? তা কিন্তু মনে হয় না মিসেস কুর্টিসের। অতুল ঐশ্বর্য, অশেষ মান, অপর্যাপ্ত মর্যাদা— যতই সে লাভ করে থাক্, একটি রাত্রির ঘটনা তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে কি দেয় নি। মান? কে সম্মান করে মাদামকে? সমীহ হয়তো করে সকলে, কিন্তু শ্রদ্ধা কি কেউ করে সেই মহিলাকে?

মিস্টার কুর্টিস বললেন, অনেক সিবিলিয়ান আসছে, তাদের মধ্যে থেকে মনের মত ছেলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

—গেলে ভালো। কিন্তু সে যেন মানুষ হয়, মানুষের মত মানুষ।

কথাটা ব'লেই মিসেসের চোখ কেন-যেন ছলছল করে উঠল। গাউনের পকেট থেকে ছোট রুমাল বের করে তিনি তাঁর কোণ দিয়ে চোখের জল শুষিয়ে নিলেন।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল মিস্টার কুর্টিসের— হোয়াট মেক্‌স্ ইউ স্যাড। কিন্তু তিনি নলের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে একবার ঐ মুখের দিকে তাকালেন মাত্র। চৌকির উপরে তোলা ছিল দুই পা, পা-দুটো নামিয়ে বসে সোজাসুজি তাকালেন তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে। স্যাড হবার কারণ যে নেই একেবারে এমন নয়। সে কথা কুর্টিস বোঝেন। এই নতুন সমাজ নতুন পরিবেশ নতুন আবহাওয়ার মধ্যে এত দীর্ঘ বছর কাটিয়েও সেই পুরাতন সমাজ-সংসারের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়া স্বাভাবিক।

সেই বহুদিন আগের কথা মনে হয় মিস্টার কুর্টিসেরও। তখন তিনি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একজন ইয়ং ম্যান। কলকাতা থেকে আসছিলেন এই বলাগড়ে বজরা চেপে। ধীরে ধীরে ভেসে ভেসে চলে আসছে তাঁর বজরা। সেদিনও আজকের মতই এমনি একটি সায়াহ্ন ঘনিয়ে এসেছিল গঙ্গার বুকের উপর। ধীরে ধীরে নেমে আসছিল অন্ধকার। উত্তরপাড়া কোন্নগর রিষড়া মাহেশ শ্রীরামপুর শ্যাওড়াফুলি পার হতে হতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ষোলো দাঁড়ের বজরা। হঠাৎ কানে ভেসে এল ভীষণ কোলাহল। মাঝি-দাঁড়িদের জিজ্ঞাসা করলেন ঐ হাহাকারের হেতু। যা শুনলেন তাতে চমকিত হলেন মিস্টার কুর্টিস। গৌরহাটির কিনার তখন লোকে লোকারণ্য, আধো-অন্ধকারে একপাল প্রেতাত্মার মত মনে হচ্ছিল সেই ভিড়। কৌতূহল হল কুর্টিসের। মাঝগাঙে দাঁড় করিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন বজরাটি।

বজরার ভিতরে বসে জানলা দিয়ে কুর্টিস চেয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু ঢাকের বাদ্য ও কোলাহলের মাত্রা যখন চরমে উঠল তখন তাঁর শরীরেও উত্তেজনার স্রোত বুঝি প্রবল হয়েই উঠল। বাইরে বেরিয়ে এসে বজরার গলুয়ের কাছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

পারে ভেড়াতে ইচ্ছে হল নৌকো। কিনারে গিয়ে নেমে স্বচক্ষে তিনি দেখার জন্য ব্যগ্র হলেন ঐ দৃশ্য। ঐ যে নৃত্য হচ্ছে মশালের। ঐ আলোয় দৃশ্যটা আরো ভৌতিক হয়ে উঠল।

মাঝিরা বলল, না সায়েব। ওরা এখন ক্ষেপে আছে। কিনারে গেলে বজরায় আগুন দিয়ে দিতে পারে।

—কিন্তু এখানে থাকলে, এই মাঝগাঙে অপেক্ষা করলে?

মাঝিরা জানাল, তাতে ক্ষতি নেই।

যাতে কোনো ক্ষতি নেই, সেই পথই গ্রহণ করলেন কুর্টিস। মিড-স্ট্রীমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বজরার গায়ে ছলছল করে বাজছে জলের বাজনা। তার নৌকোর গা দিয়ে একে-একে এদিকে-ওদিকে চলে যাচ্ছে নানা ধরণের নৌকো— ভাওলিয়া পান্সী ও খড়-বোঝাই নৌকো। কিন্তু মাঝগাঙে বিপরীত দিকে দাঁড় টেনে-টেনে মাঝিমাল্লারা বজরাটিকে যথাসাধ্য স্থিরভাবে রাখার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

মশালের উন্মাদ নৃত্য চলেছে, বিকট শব্দে কোলাহল উঠল, যুদ্ধের দামামা-ধ্বনির মত বেজে উঠল ঢাক। সেই শব্দের মধ্য থেকে শোনা যাচ্ছে ও কিসের শব্দ? মাঝিরা জানাল, ও হচ্ছে শঙ্খধ্বনি, আর ওই হচ্ছে হুলুধ্বনি— শুভকাজের সময় জানানারা ঐ ধ্বনি করে।

হঠাৎ জলে উঠল একটি অগ্নিকুণ্ড, অমনি সমস্ত শব্দ ভেদ করে কানে এল ও কিসের আওয়াজ? এ যেন জানানার গলা, এ যেন তার আর্ত চিৎকার।

কি ঘটনা ঘটল বুঝতে-না-বুঝতেই ছলাৎ ক'রে শব্দ হয়ে উঠল জলের মধ্যে। কুর্টিস একটু কিনারে নিতে বললেন নৌকোটি, কিন্তু মাঝিরা রাজি না। তারা ভয়ার্ত চোখে কুর্টিসের দিকে চেয়ে বলল, না সায়েব, ওখানে গেলে জানেই মেরে ফেলবে ওরা।

কিন্তু জলে শব্দ কিসের? ডাঙায় নৃত্যরত মশালগুলো হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই-বা গেল কেন? ঢাকের শব্দ থেমে গেল কেন? জলের দিকে চোখ রাখার চেষ্টা করলেন কুর্টিস সায়েব। তাঁর মনে হল, অন্ধকারে-ঘেরা ঐ জলে

ছোট একটি ছায়া যেন ভাসছে। একেবারে কিনারে না, মাঝিদের অনুরোধ করার মত ক'রে ব'লে বজরা একটু পাশে সরিয়ে নিয়ে এলেন, ঐ অন্ধকার থেকে অস্ফুট শব্দ যেন কানে এল তাঁর— মা মা মা।

যেন জানানার গলা। কুর্টিস ঝুঁকে দাঁড়ালেন। আর অনুরোধ নয়, ব্যস্ত হয়ে এবার আদেশ করেই উঠলেন কুর্টিস, বললেন, ইউ ফুল্‌স্‌, টেক দি বোট দেয়ার। কুইক।

সায়েবের কড়া গলা শুনে ষোলোটা দাঁড় নড়ে উঠল একসঙ্গে।

কুর্টিসের হুকুমে ওরা টেনে তুলল একটা অর্ধচেতন দেহ। টেনে এনে বজরার কামরার ভিতরে নিয়ে গিয়ে টান করে শুইয়ে দিল সেই দেহটি।

মোমের চারটি আলো জ্বলছিল চার কোণে। সেই আলোয় কুর্টিস দেখলেন, এ বিউটিফুল লেডি— এ ভিনাস, সিক্তশরীরে উঠে এসেছে জল থেকে।

এই ডেঞ্জারাস জায়গায় আব অপেক্ষা করতে নিষেধ করলেন কুর্টিস। ষোলোটা দাঁড় একসঙ্গে ঝাঁপিযে পড়ল জলে। মাঝগাঙ দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে গেল বজরা— চুঁচুড়া হুগলী বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী পার হয়ে।

এই দিনটার কথাই সেদিন উল্লেখ করেছিলেন কুর্টিস। এই দিনটাই হচ্ছে তাঁর সেই ষ্যাট ডে।

এ দেশের হালচাল রীতিনীতি তখনো ভালো করে তাঁর জানা হয় নি। এর বছর-তিন আগে মাত্র তিনি এসেছিলেন এখানে। একই জাহাজে, যে জাহাজে এসে কলকাতার বন্দরে নামলেন গবর্নব জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বাররূপে ফিলিপ ফ্রান্সিস। এমনিই এক অক্টোবরের বিকেলে, চাঁদপাল-ঘাটে, ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ফিলিপ ফ্রান্সিস আশা করেছিলেন তাঁর সম্মানে একুশটি তোপধ্বনি হবে, কিন্তু গবর্নর জেনারেল হেষ্টিংসের নির্দেশে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বুম-বুম শব্দে তোপধ্বনি হল মাত্র সতের বার। ফ্রান্সিস নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন, এবং হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হল। কত ঘটনাই যে ঘটে গেল তার পর তার সংখ্যা নেই। আলিপুরের বেলভেডিয়ারে হেষ্টিংসে-ফ্রান্সিসে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল, মিসেস গ্র্যাণ্ডের কামরায় নৈশ-অভিযানের জন্যে ফ্রান্সিসের নামে মামলা হল।

কলকাতার আদালতে তখন এই মামলা চলেছে। হিকি সায়েব তাঁর জার্নালে এই কেচ্ছাকাহিনী বেশ রসালো ক'রে বর্ণনা ক'রে চলেছেন। সকলের মুখে শুধু ফ্রান্সিসের নাম, গ্র্যাণ্ডের নাম।

ঠিক সেই সময়ে, হ্যাঁ, অবিকল সেই সময়ে শৌমছাটির কিনারে কুর্টিসের জীবনেও ঘটে গেল একটি বিরাট ঘটনা।

ত্রিবেণী পার হয়ে যখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে বজরা তখন ঐ জলসিক্ত ভিনাসের শরীরে যেন শিহরন জেগে উঠল, বন্ধ দুটো চোখ ধীরে ধীরে খুলে মোমের মোলায়েম আলোয় উৎকণ্ঠিত এই বিদেশীর মুখের দিকে তাকাল এই ভেনাস। আতঙ্কিত হয়ে উঠল তার দৃষ্টি, চার দিকে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করল, এ কোথায় সে এসেছে।

দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে অভয় দিল কুর্টিস, বলল, ইউ আর সেফ। নো ওরি, নো ফিয়ার, মি ইউর ফ্রেণ্ড।

দুই চোখ দিয়ে ধারা নামল ঐ সোনার প্রতিমার।

উঠে দাঁড়াল কুর্টিস। কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মাঝিদের বলল, ওকে সমঝাও, ওর ডর নেহি।

ষোলো দাঁড়ের চার দাঁড় থেমে গেল। চার জন বৃদ্ধ মাঝি কামরার মধ্যে এসে অভয় দিতে লাগল হরিশঙ্করের মাতাকে। কিন্তু অভয় পেলেই কি ভয় ভুলে যাওয়া যায়? কি হবে তার জীবন নিয়ে? আগুন দেখে ভয় পেয়ে ঝাঁপ দিল জলে, কিন্তু এখন যেখানে এল সে কি আগুনের থেকে কম উত্তপ্ত? এখান থেকে আর ফেরা যাবে না সমাজে, এখান থেকে আর ফিরে যাওয়া যাবে না সংসারে। মনে পড়তে লাগল তার ছোট্ট ছেলেটির কথা—সে বুঝি এখনো দাঁড়িয়ে আছে পাড়ে।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে। উঠে পড়ে ছুটে যেতে চাইল, ঐ জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দেওয়ার বুঝি তার ইচ্ছে।

আর সংকোচ নয়, কুর্টিস চেপে ধরল তার হাত, বলল, নো ওরি, নো ফিয়ার, আয়্যাম ইয়োর ফ্রেণ্ড।

তার পর ধীরে ধীরে কেটে গেল অনেক বছর। কেবলমাত্র ফ্রেণ্ড ছিল মাত্র কিছুদিন; তার পর শুধু ফ্রেণ্ড না, সেইসঙ্গে হাজব্যাণ্ডও হয়ে উঠল মিস্টার ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিস।

বাঁধা পড়ে গেল কুর্টিস সায়েবও। কলকাতায় এসেছিল ভাগ্য-অন্বেষণে, ভাগ্যের দেখা পেলেই দেশে ফিরবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নতুন মায়ায় আবদ্ধ হয়ে দেশের মায়া একেবারে ছাড়তে হয়েছে তাঁকে।

মেয়ের জন্যে পাত্র-সন্ধানের কথা বলতে বলতে অনেক দূর অতীত-সন্ধান

করে ফিরে এলেন কুর্টিস। এ অতীত-সন্ধানে তাঁর বেশ আনন্দ আছে, পিত্তালরির আমেজ আছে তাঁর এই অতীত-মন্থনে।

কিন্তু মিসেস ভুলে থাকতে চান ঐ অতীত। ও কথা চিন্তায় তাঁর বেদনা আছে, গ্লানি আছে। কেন তাঁকে নিতে হল এই নতুন জীবন? তাঁর নিজের সমাজে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ব'লে, এবং সেই সঙ্গে— মিসেস এখন এতদিনের সহবাসে ইংরেজি রপ্ত করতে পেরেছেন বলে ইংরেজিতে চিন্তা করতেও শিখেছেন— এবং, সেইসঙ্গে, ঐ মানুষটার প্রতি একটা গ্র্যাটিচিউড। লোকটা তাকে জীবন দিয়েছে, আর, জীবনের চেয়েও বুঝি বেশি, লোকটা তাকে মান দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে। তার মেয়ের জন্যে মানুষের মত মানুষ চাই বলে তার যে দাবি, সে মানুষও বুঝি কুর্টিসের মত হওয়া চাই— এই পুরুষটাই পুরুষদের আদর্শ হোক, মিসেসের এই যেন ইচ্ছে।

মুখ থেকে নলটা নামিয়ে চেয়ারের হাতলের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে রাখতে কুর্টিস বললেন, আওয়ার থ্রি সন্স মাস্ট হেল্‌প আস ইন ফাইণ্ডিং আউট এ ম্যাচ ফর আওয়ার ডটার।

—শিওর।

কথাটা বলেই শিউরে উঠলেন মিসেস কুর্টিস। থ্রি সন্স কেন? ফোর। চারটি পুত্রের মাতা তিনি।

তাঁর প্রথম পুত্রের কথা এখনো ভুলতে পারেন নি তিনি।

তিনি জানেন না, তাঁর সেই সন্‌ তাঁদের এই বলাগড়ের কিনার দিয়ে নৌকো চেপে ভেসে ভেসে চলে গেছে শান্তিপুরের দিকে। জানতে পারলে হয়তো গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলন্ত গাউন দুই হাতে ঈষৎ টেনে তুলে ছুটতে ছুটতে তিনি নদীর কিনারে গিয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠতেন— ও রে হরি রে, ও রে হরিশঙ্কর, শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌। একবার দেখা দিয়ে যা তোর মাকে। আমি পাপী না রে, আমি ব্যভিচারী না। তোদের সমাজে আমার নামে যে কুৎসা রটেছে, সেসব মিথ্যা, ঝুটা, মেকি, ফল্‌স্‌।

অন্ধকার নেমে এসেছে গাঢ় হয়ে। কাল অমাবস্যা। ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে মা-কালীর পুজার জন্যে ধুম পড়ে গেছে নিশ্চয়। বিশ্বনাথ নিশ্চয় এতক্ষণ নদী পাড়ি দিয়ে সুখসাগরের খাঁড়ি থেকে উঠে পাল্কীর লগি-জুটো খাড়া করে দাঁড় করিয়ে তার উঁচু গিঁঠে পা রেখে বনবাদাড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সেই পুজামণ্ডপের দিকে।

কিন্তু, এখানে, এই বারান্দায় কোনো বেগ নেই। দুজনে বসে আছে পাশাপাশি। লিলি আর রবিনসন ঘরের মধ্যে আছে। আলো জেলে দিয়ে গেল ফরাস।

মিসেস হাঁকলেন, আবদার।

হুজুরে হাজির হল আবদার।

মিসেস বললেন, পানি, জল, ওয়াটার।

—বরফ-পানি? ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আবদার।

—নেহি। বেগার-বরফ।

এক নিশ্বাসে লম্বা গেলাসের সবটা জল খেয়ে ঠোঁটের কিনার রুমাল দিয়ে মুছে ভালো হয়ে বসলেন তিনি।

কুর্টিস উঠে পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়। পায়চারি করতে করতে ধীরে ধীরে নেমে এলেন লনে। হরকিষণ বর্শাটা সোজা করে টান হয়ে দাঁড়াল। হরিণ-দুটো তাদের কান খাড়া করে চকিত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল কুর্টিসের দিকে।

কিছুক্ষণ লনের ঘাসের উপর বুটের চাপ দিয়ে দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। তার পর বাংলোর পিছন দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আমাদের চোখের সামনে থেকে।

মিসেসের মন আজ বড় ভারি। তিনি বারান্দায় বসে চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। ওই সপ্তর্ষী নীল আকাশের বুকে ওই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে কোন্ প্রশ্ন করছে আজ তাঁর কাছে? জীবনের ধ্রুবসত্য সন্ধান করার ইঙ্গিত নিয়েই বুঝি আকাশে তার আবির্ভাব। কিন্তু সে সত্য কোথায়? আজ যে ঘটনা জীবনে পরমসত্য বলে মনে হয়, আগামীকাল তা বাসী আর মিথ্যে হয়ে যায় কেন? তাঁর জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল যে সমাজে, গায়ের চামড়ার মত সারাটা জীবন সেই সমাজ তাঁর সর্বাঙ্গের আবরণ হয়ে থাকবে— এই তো স্বাভাবিক নিয়ম, এই তো সহজ সত্য। কিন্তু সে সত্যের দাম আজ কোথায়? আজ নতুন সমাজ দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে তাঁকে থাকতে হচ্ছে, নতুন সমাজ নতুন ভাষা নতুন অঙ্গবাস নতুন আচার-আচরণ। কিন্তু এইসব নতুনেরা চিরদিনের সহচরই যে থাকবে তার নিশ্চয়তা কি? ইচ্ছে ক'রে জীবনের এই পরিবর্তন নিয়ে আসেন নি মিসেস কুর্টিস। বলতে গেলে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই এই জীবন এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে তাঁর পাশে। এ জীবন নিয়ে অসুখী নন তিনি,

তবুও বিগত জীবনের কথা মনে করলে এখনো কেঁদে ওঠে অন্তরাত্মা। সেদিনের সেই প্রতিবেশী-পরিজনের কথা মনে পড়ে না আজ? পড়ে। কিন্তু উপায় কি। সমাজের বিধান লঙ্ঘন করে গঙ্গায় যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে, একজন ম্লেচ্ছের হাতের স্পর্শে যে কলুষিত করতে পারে নিজের পবিত্রতা, তাকে কখনো ফিরিয়ে নিতে পারে না সেই অকলঙ্ক সমাজ। সুতরাং, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলতে হবে, তিনি গ্রহণ করলেন নতুন জীবন। সমবয়সী এক ইংরেজ ভদ্রলোকের ঘরণী হলেন। লোকে বিশ্বাস করুক আর না-করুক, বিবাহ তাঁদের হয়েছে; যাগযজ্ঞহোম হয়নি বটে, কিন্তু ব্যাণ্ডেলের গির্জায় গিয়ে শপথ উচ্চারণ করে এসেছেন তাঁরা।

তবু, তবু কেন লোকে তাঁর কুৎসা রটনা করে, কেন হৃদয়নাথবাবুর মনোভাব অতটা বক্র, কেন মাদাম গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে মানুষে। তিনি কি নাচের আসরে গিয়ে নাচতে-নাচতে কারো কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন যে, অমুক রাত্রে স্বামী রাত কাটাবেন ক্লাবে, চুপ করে তুমি চলে এসো প্রাচীর টপকে, প্রতীক্ষায় বসে থাকব আমি, চাকরানীকে মোমবাতি নিয়ে আসার জন্যে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে সেই ঘরে চুপ করে ঢুকিয়ে নেব তোমাকে, ডিয়ার?

লিলির মা তিনি। তিনটি ছেলে হয়েছিল, বেশ ছিল; শেষে এই মেয়েটি না এলেই ভালো হত। তা হলে কোনো উদ্বেগ বা অশান্তি হত না তাঁর। রূপে আবার মেয়েটা হয়ে উঠেছে রূপময়ী, এখন লোকে ঐ রূপের জন্যে ওকেও বলতে আরম্ভ করেছে মাদাম।

গ্র্যাণ্ড। গ্র্যাণ্ড যুক্তি মানুষের। তুলনাই যদি করার ইচ্ছে, তুলনা করতে পার উর্বশীর সঙ্গে, ভেনাসের সঙ্গে, এবং— নিজের আগের চেহারার কথা মনে হল তাঁর— এবং ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গেও তুলনা করতে পারা যেতে পারে। কিন্তু, যাকে নিয়ে এত কেলেঙ্কারি হয়ে গেল তার নাম ঐ নিষ্পাপ মেয়েটার সঙ্গে যোগ করা কেন?

ডেকে উঠেছে ঝিঁঝি, জোনাকি দপদপ করছে গাছে গাছে। ঝাউয়ের পাতা ঝালরের মত ঝিরঝির করছে, অন্ধকার আকাশ ভরে ফুটে উঠেছে অভ্র তারা।

স্তব্ধ হয়ে গেছে চার ধার। স্তব্ধতা ভেদ করে দূর থেকে ভেসে এল শব্দ— 'লা এল্লা ইল্ লি উল্লা, মহম্মদ-রসুলুল্লা— মাহবুদ, মাহবুদ'।

চমকে উঠলেন মিসেস কুর্টিস। ঐ শব্দটা তাঁর জীবনের অভিশাপের মত তাঁকে যেন ঘিরে ধরার জন্যে চারধারে পাক খাচ্ছে।

পাগলা মিরন শা বেরিয়েছে। বেরিয়েছে ও আজ না— পথে বেরিয়ে পড়েছে সে অনেকদিন। আর কোনো দিন কোনো ঘরে ঢোকে নি। পথই তার ঘরবাড়ি, গাছের তলাই তার আশ্রয়। শীতে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ ও এই হেমন্ত— সবই তার কেটে যাচ্ছে এইভাবে। কেবল জীবনের বসন্ত-কালটা তার সঙ্গে নেই, সে কাল সে হারিয়ে এসেছে অনেক আগে।

মুখ-ভরা দাড়িগোঁপ, কাপড়ের শত টুকরো একত্র করে একটা বিচিত্র আলখাল্লা তার গায়ে। পাগলা মিরন শা তার গলার শব্দে প্রান্তর উচ্চকিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে-মাঝে প্রায় হুঙ্কার দেওয়ার মত করে হাঁকছে— 'মাহবুব, মাহবুব'।

স্বরটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে, কি যেন ছড়া কাটছে মিরন শা। এই ছড়া কেটে কেটেই তার পথপরিক্রমা। কি এই ছড়া, কি এর মানে, কোথা থেকে সংগ্রহ হল এই ছড়া— এ প্রশ্নের কোনো উত্তর কেউ পায় নি মিরন শার কাছে। উত্তরে সে শুধু তার ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনির্দিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠেছে— 'মাহবুব, মাহবুব'।

ঘরের মধ্যে টুংটুং শব্দে বাজছে পিয়ানো। কিন্তু সে সুরেলা ধ্বনিতে কান নেই মিসেসের। তিনি ঐ বেসুরো ধ্বনির দিকেই কান পাতলেন। মিরন শা নতুন-কোনো বার্তা নিয়ে এল কিনা, এই বুঝি তাঁর জানার আগ্রহ। ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন লনে।

—হরকিষণ, ও কৌন হায় ?

বর্শাটা ডান হাতে ভালো করে ধরে হরকিষণ বলল, পাগলা মিরন, মেমসায়েব।

—কি বলছে ও ?

—কেয়া মালুম। বহুৎ কুছ বুড়া বাত বোলতা। পাগলা আদমি।

এবার স্পষ্ট শোনা গেল মিরন শার কথা, আক্রোশের সঙ্গেই যেন সে বলছে—

গ্রাণ্ডি-বিবি রাণ্ডি হল,
রাণ্ডি হল গ্রাণ্ডি-বিবি—
কাঠকরবী ধুতরো-বিচি
ধুতরো-বিচি কাঠকরবী।

বেশ সুর করে করে গাইছে মিরন শা। হাতে বুঝি একতারা আছে, গুবগুব করে শব্দ করে উঠছে যন্ত্রটা।

কোথাও দাঁড়ায় না ও। মাহবুব-ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে নীলক্ষেতের ঘন অরণ্যের মাঝখান দিয়ে পথ কেটে সে ধীরে ধীরে চলে যায় উত্তর দিকে।

ভুনা-কুলীরাও ঐ গান করছিল না? এবার বোঝা গেল, ওরা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে এই ছড়া। ভুনা-কুলীরা কুঠির চৌবাচ্চায় নেমে যা-ইচ্ছে গান করুক, কিন্তু মিরন শা ঐ গান শোনাবার জন্যে, এত জায়গা থাকতে, কুঠিয়ালের এই বাংলোর সম্মুখে এল কেন। এখানে তার কিসের আকর্ষণ?

নীলক্ষেতের গাঢ় অন্ধকার অরণ্য ডিঙিয়ে গুবগুব শব্দ এসে পৌছচ্ছে এখানে, এবং সেই সঙ্গে গ্রাণ্ডি-বিবি গ্রাণ্ডি-বিবি রবটা।

হৃদয়নাথের মুখটা ভেসে ওঠে মিসেস কুর্টিসের চোখের সামনে। তিনি আর দাঁড়ালেন না, তরতর করে চলে এলেন লন পার হয়ে বারান্দা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে।

পিয়ানোয় বসে টুংটুং করছে লিলি, রবিনসন তার পিঠের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইছে।

একটা নীচু চৌকিতে গাউন ছড়িয়ে বসে পড়লেন মিসেস কুর্টিস, বাইরের সমস্ত কোলাহল আর সমস্ত-কিছু শব্দ তিনি যেন মুছে দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছেন এখন, লিলিকে বললেন, সিং, লিলি, সিং হ্যাট সং—

মেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মিসেস বললেন—

Each other place is hot as hell
When breezes fan you—

মার নির্দেশ পেয়ে লিলি কুর্টিস গাইতে লাগল—

Had I ten houses all I'd sell
And live entirely at Bandel.

মিস্টার কুর্টিস এসে বসলেন স্ত্রীর পাশে। জমে উঠল এই পারিবারিক আসর। অনেকক্ষণ ধ'রে চলল এই গান।

পাশের কামরায় মেঝেয় জোড়াসন হয়ে বসে সুপুরী কাটছে দাসী—সুন্দরী। ওদিকের দরজার পরদা একটু তুলে ধরে দুটো মূর্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে, আবদার-মহসীন ও ফরাস-ইয়াকুব।

জাঁতির ফাঁকে আঙুল রেখে চাপ দিয়ে সেটা কেটে ফেলার মত ক'রে সুন্দরী ওদের যেন হুঁশিয়ার করল। দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল— তোবা তোবা।

একটু পরেই জিভ কেটে নিজেদের উক্তি বুঝি সংশোধন করে নিল, বলল, বা বা তোফা। সুন্দরি, তোফা।

সুন্দরী মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল, আপন আপন হুদ্দার কাজ আঞ্জাম কর-না। এখানে মরতে এসেছিস কেন?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সুন্দরীকে চুপ করতে ব'লে ওরা কানে আঙুল দিল, যেন বলতে চায় যে, হামলা কোরো না, গান শুনছি, গান শুনতে দাও। তোফা, তোফা গান।

এ বাড়িতে খানসামা আছে, খেদমতগর আছে, মশালচী আছে, বাবুরচি মেহতর বেহারা পেয়াদা চৌকিদার দরবান— কী নেই? সবাই আছে, কিন্তু তারা তো এখন মেয়েমানুষ দেখলেই ভিরমি খায় না। কিন্তু এই দুটো জানোয়ার এসেছে কোথা থেকে— এই আবদারটা আর এই ফরাসটা?

সুন্দরী উঠে পড়ল। পরদা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়ল ওরা দু-জন। ওদের এখন আর কাজ নেই, ওরা চলে গেল ওদের ঘরে, বাংলো'র চৌহদ্দির মধ্যেই পশ্চিম কোণে কয়েকটি খোলার খাপরা, ওই হচ্ছে ভৃত্যদের আস্তানা।

গান চলেছে তখনো, ইংরেজিতে গান হচ্ছে। ওতে মিসেস কুর্টিসের মন যেন পরিপূর্ণ তৃপ্ত হচ্ছে না, মনে-মনে তিনি ওই গান বাংলায় গাইতে চেষ্টা করছেন—

দুনিয়ার সব ঠাই নরকের তুল্য
ব্যাণ্ডেলে হাওয়া খেয়ে প্রাণমন ভুলল।
বিক্রয় ক'রে বাড়ি খান দশ-বিশটা
এইখানে ঘর বাঁধি, এই শুধু চেষ্টা।

কিন্তু ব্যাণ্ডেলের এ স্তুতি কেন, এ স্তুতি হওয়া উচিত বলাগড়ের। ব্যাণ্ডেলে যারা ঘর বেঁধেছে তারা সেখানকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক, তাতে কোনো আপত্তি নেই মিসেস কুর্টিসের। কিন্তু বলাগড়ে এসে বাসা বাঁধল যারা তারা এর স্তবগান করবে কি দিয়ে, সে গান বেঁধে দেবে কে?

মিরন শা? ওই পাগোলটা? ওর নাম মনে হলেই মনটা তিক্ততায় ভরে ওঠে। বেচারার জীবনের কাহিনী হৃদয়বাবু যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে ওর জন্যে করুণা হওয়াই উচিত। কিন্তু মিসেসের মনে করুণা কিছুতেই কেন-যেন আসছে না। পাগোলের শত দোষ মাপ করতে তিনি রাজি, কিন্তু দারুণ দুঃস্বপ্নের মত ওর ওই ভয়াবহ আবির্ভাব এবং অদৃশ্য প্রেতাত্মার মত ওর

ওই আকস্মিক আর্তস্বর তাঁকে ভয়ার্ত করে রেখেছে। এইজন্যে মিরন শা-র উপর কোনো সহানুভূতি তাঁর নেই।

তবে, পারে বটে একজন। পারে ঐ ফিরিঙ্গি-কবি, ওই আনটুনি। কিন্তু এমন এলাকায় সে বাসা বেঁধেছে যে এলাকা মিসেসের কাছে একেবারে নিষিদ্ধ। এ জীবনের মত সেখানে তাঁর প্রবেশনিষেধ। ওই কবিকে একবার ডেকে নিয়ে এলে হয় এই কুঠিতে। বলাগড়ের সুখ্যাতি ক'রে যদি গান একান্ত বেঁধে না'ই দিতে পারে— ক্ষতি নাই, দেশের মাটির একটা জীবকে দেখতে পেলেও অনেক শান্তি।

ঘরের মধ্যে চলেছে পারিবারিক উৎসব। এই অবসরে সুন্দরী চলে এসেছে বাইরে, হরকিষণের সঙ্গে চাপাগলায় কথা বলছে। ফিকফিক করে হাসছে। বর্শাটা বগল-দাবা করে নিয়ে খইনি ডলতে ডলতে হরকিষণ বলছে, তুর কী ডর আছে, হাম আছে না? তাগদ আছে না এই ছাতিমে?

সুন্দরী বলল, খুব সমঝ গিয়া। কিন্তু ছাখ্ হরোকিষণ, তোর সঙ্গে রাতে একত্তর থাকি, তাই মনে করিস না আমি বারোদুয়ারি। আমারও সোয়ামি আছে, আমিও পতিবৃতা। মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙাবি তো তোর সঙ্গে আমার সম্বন্দ শেষ।

হরকিষণ নীচের ঠোঁটের ফাঁকে খৈনি গুঁজে দিয়ে বলল, সব নিশুতি হোবে, তোবে না?

সুন্দরী তার শরীরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, হোবে না, হোবে না। শোবে না শোবে না।

—পালা। কৌন আতা হায়। হরকিষণ শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

নীলক্ষেতের ওপার থেকে একটা আলোর শিখা দেখা গেল। সুন্দরী ঘরের মধ্যে গিয়ে শুপুরি কাটতে বসল।

ওরা সকলে ঘরের মধ্যে, পিয়ানো এখনো বাজছে টুংটুং শব্দে। এদের ডিনার নিয়ে বসে আছে খানসামা-বাবুর্চিরা।

বাইরে আবার ও কিসের গলা, কার গলা? এ তো বড় বিপদ, এ তো বড় সংকট ওই পাগলাটাকে নিয়ে। অজগরের আকর্ষণে পাখি যেমন তার চারি দিকে ঘুরে ঘুরে পাখা ঝাপটায়, ওই পাগোলটার কি সেই দশা হল? এই বাংলোটাকে কেন্দ্র করে ও কেবল ঘুরে বেড়াবে এইভাবে?

সবার আগে বাইরে বেরিয়ে এলেন মিসেস। মিরন শা নয়, মুশকিল-আসান।

তার হাতের বাতি থেকে অনর্গল ধোঁয়া উঠছে, সে মন্ত্রপাঠ করার মত করে বলছে—

দমদম বলিয়ে ফকির ছাড়িলেন জিগির
কালুঘোষের মায়ে বলে— ঐ এল ফকির।
সুবুদ্ধি মানুষের মনে কুবুদ্ধি নাগিল
বাথানের জ্যাস্ত গোরু বাথানে মরিল।
সোনার পালঙ্ক ছিল, রুপা হইয়া গেল,
আত্মীয়-কুটুম্বরে মারীতে মারিল।
যে-মন সরল ছিল সে-মন হৈল বাঁকা,
ফুঁ দিয়া দম ফুরাইল, না ধরিল আখা।
সুবুদ্ধি মানুষের মনে কুবুদ্ধি আসিয়া
পঙ্গপালে ক্ষেতের ফসল দেয় বিনাশিয়া।

ধোঁয়ার মধ্যে আঙুল দিয়ে মনে-মনে বিড়বিড় ক'রে কি-যেন বলল এই ফকির, গলা খাঁখারি দিয়ে আবার আরম্ভ করল একটু উঁচু গলায়—

দমদম বলিয়ে ফকির ছাড়িলেন জিগির
নন্দঘোষের মায়ে বলে— ঐ এল ফকির।
কুবুদ্ধি মানুষের মনে সুবুদ্ধি নাগিয়া
তিনদিনের মরা গোরু উঠিল বাঁচিয়া।
মুশকিল-আসান কয়— মন কর সাফ
মনে-মনে লুকাইয়া না রাখিয়ো পাপ।
আসান আসান হবে মুশকিল-আসান
পোড়া মাঠে দেখা দিবে ফসলের ধান।
মুশকিল-আসান।

ওরা সকলে দাঁড়িয়ে রইল পিছনে। মিসেস এগিয়ে এলেন, তাঁর কপালে সন্তর্পণে কালো টিপ পরিয়ে দিল ফকির। বলল, মুশকিল-আসান।

বলাগড় ঘিরে আলোর রত্নমালা ঝোলানো। আকাশ তারাময়, গাছের পাতা দেখা যায় না— জোনাকিতে ভরা। আর, আরো দূরে নায়েব-মশায় ও গোমস্তা-মশায়ের গৃহশীর্ষে আকাশপ্রদীপ।

দিনের বেচাকেনা শেষ হয়েছে আজকের মত। রতন মুদী দোকানের ঝাঁপ ঈষৎ নামিয়ে দিয়ে মেটে-তেলের প্রদীপ জেলে পাঠ করছে রামায়ণ। দূরে

কুকুরের ডাক থেকে-থেকে উচ্চকিত করে তুলছে আকাশ, শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। রাত্রি এখনো গভীর হয় নি, কিন্তু চারদিক স্তব্ধ হয়ে উঠেছে।

হাতে মোটা লাঠি খালি পা খালি গা হনহন করে অন্ধকার রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছেন হৃদয়নাথ। হৃদয়নাথের হাঁটার মধ্যে হঠাৎ এ শক্তি এসে গেছে কি করে যেন। পায়ের শব্দ শুনে রতন মুদী রামায়ণ থেকে চোখ তুলে একটু শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করল, যায় কে?

কোনো উত্তর না দিয়ে যে যায় সে চলে যেতেই লাগল, রতন পাশে-শোয়ানো লাঠিটা হাতে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে যায়, যায় কে গো?

—আমি হৃদয়। হৃদয়নাথ।

—কে, গোমস্তামশায়। এই রাতে একা? এই অন্ধকারে! আর-কিছু না হোক, পায়ের কাছে কিছু পড়তেও পারে তো। লতা—

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে হৃদয়নাথ বললেন, কাটুক রতন, কাটুক। তাই চাই আমি।

উঠে এল রতন মুদী। ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কি হল গোমস্তামশাই, কি হল হঠাৎ।

—সর্বনাশ হয়েছে, রতন, সর্বনাশ।

হুহু করে কেঁদে ফেললেন হৃদয়নাথ। রতন তাঁর হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি হয়েছে, শুনিই ব্যাপারটা।

—মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে। খড়দহে আমার জামাইকে সাপে কেটেছে কাল রাতে। আজ মরেছে সে।

—বলেন কি গোমস্তামশাই! এ কী অঘটন ঘটল। এ যে বিশ্বাস করা যায় না।

—বিশ্বাস আমিও করছি না, রতন। বিশ্বাস আমিও করছি না। যে খবর নিয়ে এসেছে তাকে আমি মারতে গিয়েছিলাম এই লাঠি দিয়ে। শয়তানটা ধরে ফেলল লাঠি, বেঁচে গেল।

রতন গোমস্তামশাইয়ের হাত চেপে ধরে বলল, কিন্তু আপনি চললেন কোথায়?

—ভটচাজ-পাড়ায় বিধান চাইতে। স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হলেও স্ত্রীকে সহমৃতা হতে হবে কিনা।

গোমস্তামশায়ের হাত চেপে ধরল রতন, বলল, তারা কি বিধান দেবে, তা কি জানেন না? বিধান চাইতে হলে অন্য কারো কাছে যান, ও পাড়ায় না। ওরা ফর্দ নিয়ে বসে আছে, গোমস্তামশায়। বিধান জানতে হলে অন্য কারো কাছে যান।

হৃদয়নাথ রতনের মুখের দিকে তাকালেন, অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না, তবুও হৃদয়নাথ সেই মুখের দিকেই তাকালেন, বললেন, গত বৈশাখে বিয়ে দিয়েছি মেয়ের। কত খরচ করেছি, কত দানসামগ্রী দিয়েছি, সবই তো জানো তোমরা। কিন্তু সেসব যাক। ওরা যে নিতে এসেছে আমার মেয়েকেও। কি করব, রতন? আমাকে তোমরা একটা উপায় বলে দাও।

কিন্তু নিরুপায় রতনেরা কোন্ উপায় বলে দেবার যোগ্যতা রাখে? সমাজে বাস করার জন্যে সকলেই এসেছে এ সংসারে। তার উপরে সে ব্যাপারী মানুষ। তার ধোপা-নাপিত বন্ধ না করেও সকলে মিলে তাকে বর্জন করলেই তার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে।

রতন বলল, কী পরামর্শ দেব আপনাকে? প্রাণে-মনে যা বুঝতে পারছি, মুখে তা উচ্চারণ করি এমন সাধ্য নেই গোমস্তামশায়।

—বেশ। আমি চলি তবে। যাই, নায়েবমশাইকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

—সে বেশ কথা। ভালো কথা। চলেন, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে। ও রে মদন রে, দোকানটা দেখিস বাছাধন। আমি নায়েব-কুঠি থেকে ঘুরে আসছি।

রতন চলল হৃদয়নাথের সঙ্গে। কিন্তু নায়েবেরই-বা করার আছে কি। রায়তদের উপর, মজুরদের উপর, কুলীকামিনীদের উপর জুলুম করার অধিকার আছে বটে, তাদের পীড়ন করতে পারেন, তাদের উপর অত্যাচার করতে পারেন, তাদের কাছ থেকে দস্তুরি পযন্ত আদায় করতে পারেন, কিন্তু তবুও এঁরা সমাজের কত অসহায় জীব আজ এখনি যেন তার প্রমাণ এঁরা পেয়ে যাচ্ছেন। জীবন বড অসার ব'লে মেনে নিতে বড ইচ্ছে হচ্ছে হৃদয়নাথের।

বিনোদবিহারীর নৈশ আহার সমাপ্ত হয়েছে। ভিতরের দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানছিলেন, গৃহিণী পাশে বসে সারাদিনের ঘরকন্নার খুঁটিনাটি বিষয় স্বামীর গোচরে আনছিলেন। কোন্ মেয়েটা দেখতে-দেখতে বড় হয়ে উঠছে, কোন্ ছেলেটা ডানপিটে হয়ে উঠছে— স্বামীর কাছে তার বিবরণ পেশ করছিলেন।

এমন সময়ে বাইরে থেকে ডাক পাওয়া গেল, নায়েবমশায়, নায়েবমশায় গো! ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

যেন হৃদয়নাথের গলা, কিন্তু হৃদয়নাথের গলায় এই ব্যাকুল আর্তস্বর কেন? বিনোদবিহারী ব্যস্তসমস্তভাবে গিন্নির হাতে হুঁকোটি দিয়ে উঠোন পার হয়ে খিড়কির দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ কি হল হৃদয়বাবু?

হৃদয়নাথের ঐ এক কথা, বললেন, সর্বনাশ।

বাইরের দিকের পুবমুখী ঘরটার দাওয়ায় চট বিছানোই ছিল, সেখানে ওদের বসিয়ে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন বিনোদবিহারী। সংক্ষেপে বললেন, অদৃষ্ট।

অদ্ভুতই লাগছে বিনোদবিহারীর, ভীষণ আশ্চর্যই বোধ হচ্ছে তাঁর। এই তো মাত্র কালকে— কালকেই তো— তিনি হৃদয়নাথের হৃদয়হীন আচরণের বিরুদ্ধে মনে মনে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এই ধরণের কথাই ভেবে ফেলেছিলেন। ভগবানও বুঝি হৃদয়নাথের মতই হৃদয়হীন। ভগবান না-করুন ব'লে বিনোদবিহারী সেই অশুভ চিন্তা কাটান্ দেবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু ভগবান যা না করার শেষাংশে তাই করে বসলেন।

বিনোদবিহারীর হাত চেপে ধরে হৃদয়নাথ বললেন, একটা পরামর্শ দিন। জামাই গেল, মেয়েও যাবে?

অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন বিনোদবিহারী, হৃদয়নাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন।

হৃদয়নাথ বলে উঠলেন, কি জানি। অন্তঃসত্ত্বা হলে নিশ্চয় জানতে পারতাম। তা তো জানি নে।

—সে খবরটা তবে নিন।

ব্যস্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন হৃদয়নাথ, বিনোদবিহারী বললেন, খবরটা নিতে হবে না। আপনার মেয়েকে যে নিতে এসেছে তাকে বলে দিন ঐ কথা। ভটচাজ-পাড়াও এ অবস্থায় ঐ বিধানই দেবে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সহমৃতা হওয়া নিষেধ আছে।

হৃদয়নাথ কি-যেন বলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। বারবার কিন্তু কিন্তু করে উঠছেন।

বিনোদবিহারী বললেন, বুঝতে পেরেছি। যদি অমন-কিছু না হয়ে থাকে তবে শেষরক্ষা করবেন কী করে তাই বলতে চাচ্ছেন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি বলব তখন?

—তার কি কিছুই উপায় নেই, হৃদয়বাবু? উপায় নিশ্চয় আছে।

কথাটা শুনে হৃদয়নাথের শরীর শিউরে উঠল। তিনি হয়তো একটা জঘন্য উপায়ের কথা ভেবে ফেলেছেন। এ ধরণের না'কে হাঁ করাতে হলে কতটা পাপপথে টেনে নিয়ে যেতে হবে মেয়েকে সেই কথা ভেবে বসলেন হৃদয়নাথ। তাঁর সারা শরীর শিরশির করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েকে দিয়ে ব্যভিচার করাব?

যেন ব্যভিচারের উপর কত ঘৃণা হৃদয়নাথের! যেন তিনি জীবনে কখনো ব্যভিচার করেন নি। মেদিনীপুরী কুলীকামিনীদের কাজে বহাল করার আগে তাদের কাছে ইঙ্গিতে কিসের প্রস্তাব করে থাকেন হৃদয়নাথ? তাদের বাছাই করার আগে তাদের কাজের যোগ্যতার বদলে কি জিনিস পরখ করে নেন তিনি। হৃদয়নাথ আজ বিপন্ন, সেইজন্যে সেসব রূঢ় কথা বলতে ইতস্তত করছেন বিনোদবিহারী। কিন্তু তাঁর এ শোক প্রশমিত হোক, তাঁর কন্যা আজ রক্ষা পাক, বিনোদবিহারী এ কথা তুলবেন। পুরনো প্রথা অটুট থাক্ আর অটল থাক্— হৃদয়নাথের হৃদয়ে আজ সে ইচ্ছা আগের মতই প্রবল কিনা জানার কৌতূহলও হচ্ছে আজ নায়েব-মশায়ের। কিন্তু থাক্, আজ ও কথা নয়।

বিনোদবিহারী এই দুঃখের মধ্যেই একটু হাসলেন, বললেন, চিন্তান্বিত হবেন না। কোনো জটিল কথা বলি নি।

যেন আশ্বস্ত হয়ে উঠলেন হৃদয়নাথ, বললেন, তবে?

—রতন বুঝেছে। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

রতন এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার কথা বলল, বলল, নষ্ট হয়েও তো যেতে পারে। সেই কথা জানালেই হবে কিছুদিন পরে। এই কথাই-না বলছেন নায়েব-মশায়?

নায়েব-মশায় বললেন, হ্যাঁ। এই কথাই বলছি।

আর দেরি না। আর ভটচাজ-পাড়ায় যাওয়া না।

রতনের হাত ধরে শোকার্ত হৃদয়নাথ ছুটলেন তাঁর বাড়ির দিকে। বাড়ির লোকে শোকে অস্থির হয়ে আছে, তার উপর মেয়েকে নিতে এসেছে যে মানুষটা তাকে যমদূত বলে মনে করেছে। যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁদা যায় না। এই দুঃখেও তাই তাদের বুকে কোনো কান্না নেই।

অন্ধকার পথ ধরে গাছ আর আগাছার জঙ্গল পার হয়ে ছুটে চলেছে দুটি প্রাণী। সন্থবিধবা মেয়েকে বাঁচাবার রক্ষাকবচ যেন হৃদয়নাথের হাতে।

দূর থেকে আওয়াজ আসছে— মাহবুদ মাহবুদ।

রতনের হাত চেপে ধরে হৃদয়নাথ ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের শব্দ ওটা, রতন?

আজ হৃদয়নাথের সব-কিছুতেই ভয়, ও-শব্দ তিনি বুঝি শোনেন নি কখনো?

রতন বলল, মিরন শা।



॥ চতুর্থ স্ফুলিঙ্গ ॥

উত্তুরে বাতাস উঠেছে হুগলী-নদীতে। সেই হাওয়ায় দুলে উঠেছে পাল। দক্ষিণমুখে তীরবেগে ভেসে চলেছে নৌকা।

রাসের এখনো দিন-পনেরো বাকি। কিন্তু এর অনেকদিন আগে থেকেই শান্তিপুরে রাসের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্বচক্ষে দেখে এল হরিশঙ্কর। দুর্গাপূজা-সমাধা হবার পর থেকেই রাসোৎসবের জন্যে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। বড়গোস্বামী, পাগলাগোস্বামী, খাঁচৌধুরী— সব বাড়িতেই এখন আনন্দের বন্যা। সেইসঙ্গে রাসকালী-পটেশ্বরীর কর্মকর্তারা, রায়বংশের কর্তৃপক্ষেরা, জাদুনাথ কাঁসারী, প্রামাণিক-বংশ, মহাভারত দে, হীরালাল সাহা, ভজহরি পোদ্দার, কালাচাঁদ পোদ্দার— রাসোৎসবের জন্যে তৈরি হচ্ছেন সকলেই। হাজার-হাজার ঢাকীর বাদ্য-সহকারে প্রত্যেকে যোগ দেবেন রাসের শোভাযাত্রায়। সোনারুপোয় সজ্জিত বিগ্রহের হাওদা, রাধিকারাজার হাওদা, বালক-বালিকা-নৃত্যের হাওদা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, আর হরেকরকম রোশনাই নিয়ে এই শোভাযাত্রা নগরপ্রদক্ষিণ করবে। ধনীর বিলাসই একে বলা হোক, কিংবা ধর্মপ্রাণের ধর্মসাধনা আখ্যাই দেওয়া হোক— এ এক বিরাট উৎসব। এই উৎসবের আয়োজন চলেছে শান্তিপুরে।

ভবানীশঙ্করদের ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। অজস্র মোহরে ভরে উঠেছে সিন্দুক। সেইজন্মেই হয়তো দশ-বারো বছর হল এই রাসের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছে শঙ্করবাড়িও।

নৌকোয় বসে হরিশঙ্কর একটু চিন্তান্বিত হয়ে আছে, এই চিন্তায় সামান্য উদ্বেগ আছে, এবং সেইসঙ্গে হয়তো একটু গৌরবও।

শোভাযাত্রায় হাওদা চেপে বিগ্রহের হাওদার পিছনে প্রত্যেক বাড়ির রাধিকারাজার যাওয়ার নিয়ম। প্রত্যেক বাড়ির সুন্দরী মেয়েকেই সাজানো হয় এই রাইরাজা। ভবানীশঙ্করের তিন মেয়ে এই কয় বছর পর পর সেজেছে। তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ছোটটার বিয়ে হল গত বৈশাখে কলকাতার হাতিবাগানে। বংশের মেয়ে কিংবা নিকট-জ্ঞাতির মেয়ে ছাড়া এই গৌরব আর কেউ পাবে না। খাঁচৌধুরীদেরও ঘরের মেয়ে ফুরিয়েছে, তাই তাঁরা মেয়ে আনাচ্ছেন তাঁদের জ্ঞাতির বাড়ি কালনা থেকে। ভবানীশঙ্কর এবার চান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধাকে।

রাইরাজা হবে রাধা, এ তো সুখের কথা, আনন্দের কথা— কিন্তু এই সুখ ও আনন্দের মধ্যেই কোথায় যেন সামান্য একটু কাঁটা।

কলকাতার বিভিন্ন পল্লী থেকে, হুগলী চুঁচুড়া থেকে, শ্রীরামপুর থেকে এই রাসের উৎসব দেখতে আসেন ধনীরা, ধনী-নন্দনেরা। মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই হরিশঙ্করের। কিন্তু চৌষট্টি-বেহারার কাঁধে চাপানো হাওদার মধ্যে বসা তাঁর মেয়েকে দেখে যদি পছন্দ করে বসে কেউ, তখন সেই ধনীর ঘরে কন্যাদানের লোভ সম্বরণ করতে কি পারবে হরিশঙ্কর? রাইরাজাদের পাত্র তো এইভাবেই নিয়ত জোগাড় হচ্ছে। মধুতে আর সুবাসে পূর্ণপ্রস্ফুটিত ফুল দেখে মধুকরেরা মত্ত না হবে কেন। মধুকরদের প্রতি বিদ্বেষ নেই হরিশঙ্করের, কিন্তু তার ভয় হয় ধনী-নন্দনদের— নব্যবাবু হয়ে উঠেছে তারা। সুন্দরী বউ তারা চায়, সে স্ত্রীকে তারা স্ত্রী মনে করে না। হয়তো, মনে করে— রাসের মেলায় কেনা সূক্ষ্মকাজ-করা হাতির দাঁতের মসৃণ একটি পুতুল।

এইখানেই ভয় হরিশঙ্করের। বিত্তশালী ভ্রাতার অনুরোধে অসম্মত হবার শক্তি তার নেই। অসম্মতি জানাবার ইচ্ছেও অবশ্য নেই, প্রকৃতপক্ষে এ তো গৌরবের কথাই। এমন সম্মান বাংলাদেশের ক'টি মেয়ের ভাগ্যে ঘটে?

তার মেয়ে রাধা পেয়েছে সেই সম্মান। রাইরাজা হবে সে। তাকে নিয়ে আবার রওনা হতে হবে দু-এক দিনের মধ্যেই।

বলাগড়ের কিনার দিয়ে গেরুয়া পালে বাতাসের অফুরন্ত উল্লাস পূর্ণ করে ঐ ভেসে চলেছে হরিশঙ্করের নৌকা।

এইসঙ্গে আমরাও ত্যাগ করলাম বলাগড়। পড়ে রইল ওখানে মিরন শা, পড়ে রইল গোমস্তা হৃদয়নাথ আর তার সন্তবিধবা কন্যা, তার অদৃষ্টে শেষপর্যন্ত কি ঘটল সে খবর নেবার অবসর আমাদের হল না। সেখানে পড়ে রইল আরও অনেকে। বলাগড়ের কিনার ত্যাগ করার সময় কানে ভেসে এল একটা শব্দ— মাহবুদ, মাহবুদ।

গরিটির ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। চালতে-গাছটা উত্তুরে বাতাসে থরথর করে পাতাসুদ্ধ কাঁপছে। হরিশঙ্কর একবার ঐ গাছটার দিকে চেয়ে নৌকো থেকে কিনারে নামল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে মাঝিকে বলল, আর কোনো যাত্রী নেবে না ইয়াসীন। রাস-পর্যন্ত তোমার এ নৌকো আমার জানোই তো। তুমি সাজিয়ে রাখো নৌকো, মেয়ে নিয়ে আমি আসছি শিগগিরই। কাল-পরশুর মধ্যেই।

বুড়োমানুষ ইয়াসিন-মিঞা, এ নদীর অনেক জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তার পরিচয়, বলল, এ তো আপনাদেরই না' বাবুমশায়, আমরা তো আপনাদের ভ্রেত্য। নোকরকে যা হুকুম করবেন, নোকর তাই তামিল করবে বাবুমশায়।

ইয়াসিনের হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে পনর-বিশ দিনের জন্যে নৌকোটা ভাড়া করে রেখে হরিশঙ্কর পাড় ভেঙে উঠে এল রাস্তায়। ডান হাতে তার একটা পুঁটুলি।

কেলীর কুঠির সামনে দিয়ে থেলো হুঁকোটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে রওনা হল ধীরে ধীরে। একবার তাকাল ডানদিকে-- ওই বাগানবাড়িটার দিকে। কাউকে দেখা গেল না। পথে এখন লোক নাই। বিকাল হয়ে এসেছে, সূর্যের তেজ কমে এসেছে কার্তিকের বাতাস লেগে।

এই মিঠা বাতাসে গাছের নীচে বসে জিরোচ্ছে দুটো রামছাগল। এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা শালিখ।

ঢোলক ঘাড়ে করে আসছে কে ওটা? হারুডোমের ছেলে ছিরু না? হ্যাঁ, ছিরুই।

—ও রে ছিরু, আছিস কেমন? যাস কোথায়?

যেন অনেকদিন দেশছাড়া, বিদেশে বহুদিন কাটিয়ে দেশে ফিরে এসে দেশের মানুষের তত্ত্বতালাস করছে যেন হরিশঙ্কর।

মাথা অনেকটা নীচু করে প্রণাম জানিয়ে ছিরু বলল, সায়েবের কাছে যাই।

—কোথাও যাচ্ছিস নাকি রাসে?

—হঁ্যা গো বাবু। কাশিমবাজার যাব।

কুড়ি-বাইশ বছরের তাজা ছেলে এই ছিরু। সায়েবের গানের সঙ্গে ঢোলক বাজাবে আসরে। বাপ-কা ব্যাটাই হয়েছে ছিরু। ডুগ-ডুগ শব্দে যখন বাজায় এই ঢোল, তখন সেই ঢোলের বোলের সঙ্গে তার চোখের তারা-দুটোও বুঝি বোল ব'লে ওঠে। মাথাব কালো কুচকুচে চুল তেলে চিকচিক করছে, জুলপির গা দিয়ে তেলের গাদ গডিয়ে নামছে।

হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, কি গাইবে রে তোর সায়েব?

ছিরু বলল, রাইরাজার গান।

—কিসের গান? কিসের গান?

—রাইরাজার গো। রাইরাজার।

ছিরুর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে হরিশঙ্কর বল, আচ্ছা, যা।

আবার নীচু হয়ে প্রণাম ক'রে ছিরু হাঁটতে লাগল।

হরিশঙ্কর ডাকল আবার, এই ছিরু, এই শ্রীহবি।

ফিবে এল ছিরু ডোম।

—কার সঙ্গে লডাই রে তোর সায়েবেব?

—ভোলা ময়রার সঙ্গে পেবথমে। তার পর রামবাবুব সঙ্গে, যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গেও হবে শুনছি।

হরিশঙ্করের মনে বিস্তর প্রশ্ন এসে গেল কেন-যেন। এ দেশে অনেক দিন সে অনুপস্থিত যেন ছিল, ফিরে এসে খুঁটিনাটি খোঁজখবর যেন নিচ্ছে।

হরিশঙ্করের জিজ্ঞাসার উত্তরে ছিরু বলল, ময়রা ভোলা ছিকিষ্ট সাজবে, এনটুনি সায়েব সাজবে রাধিকারাজা। কোন্দল হবে দু-জনের।

হেসে, তার মুখের দিকে চেয়ে, হরিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল, আর তুই কি সাজবি রে, ডোমের ব্যাটা?

ছিরুও হাসল, ঢোলে একটু হাত বুলিয়ে বলল, আমি আবার সাজব কেন, বাবু। আমি তো ছিরিহরি।

বাঃ বাঃ, বেশ বলেছে শ্রীহরি-ডোম। ওর আর সাজগোজ নেই। ও হচ্ছে আসল শ্রীহরি।

ছিরু চলে গেল গরিটির বাগানবাড়ির দিকে, হরিশঙ্কর রওনা হল ফরাস-গঞ্জের দিকে।

বিকেলের সাংসারিক কাজকর্মের জন্যে কুয়ো থেকে জল তুলছে হেমাঙ্গিনী, রাধা দাঁড়িয়ে আছে আমতলায়। এখান থেকে জল গড়িয়ে যাবার জন্যে উঠোনের মধ্যে নালা কাটা হয়েছে, আমগাছটার গুঁড়ি ঘেরাও করে একটা পাক খেয়ে গিয়েছে নালাটা, একটা মস্ত আলবাল তৈরি হয়েছে ঐ গাছের গোড়ায়।

গাঙ্গুলি-বাড়ির পিসিমা কাঁকালে একটা ছোট ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে। সুখদুঃখের নানা কথা, ভাইয়ের সংসারে লাথিঝাঁটা খেয়ে থাকার করুণ কাহিনী। জীবনটা তো কেটে গেল বাপের বাড়িতেই, স্বামীর ঘব এ জীবনে দেখা হল না, তাতে আর আক্ষেপ নেই পিসিমার, কিন্তু স্বামীর মুখ যে কখনো দেখেন নি এই আক্ষেপটা এখনো তাঁর চোখে জল আনে। বাপের বাড়িতেই আছেন, বাপ গত হয়েছেন কয়েক বছর হল, এখন ভাইয়ের সংসাবে গলগ্রহ। কিন্তু ভাইয়েরও তো বয়স হল, সে আর কতদিন?

বললেন, তার আগে যদি চোখ বুজতে পারি এই কামনা কর, বউ। ভায়ের ছেলের বউদের যা মতিগতি, তাদের অন্ন যেন খেতে না হয়। কদম্বটার কথাও ভাবি। তাদের এই বোনকেও তারা দেখবে না।

এসব কথার কোনো উত্তর হয় না। সহানুভূতি জানাবার ভাষাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল চুপ কবে মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। হেমাঙ্গিনী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

এক ঠিলি জল তুলে কলসীতে ঢালতে ঢালতে বলল, আসেন পিসিমা, বসেন।

কিন্তু না, বসতে চাইলেন না পিসিমা। বললেন, না বউ, আর বসব না। যা-তা বলবে আবার বউরা— পাডাবেড়ানি, সাঁঝের কাজকাম কিছু নাই?

বলতে বলতে পিসিমা বারান্দায় বসে পডলেন পা ঝুলিয়ে।

হেমাঙ্গিনী বলল, রাধা, আসন দে পিসিমাকে। ও কি, মাটির মধ্যে বসে পডলেন কেন?

আসন দিয়ে হেমাঙ্গিনী পাশে বসল, জিজ্ঞাসা করল, কে রেঁধেছিল আজ ?

—বড়বউ রান্ধিয়াছে। মাজাবউ কুটনাবাটনা করে দিয়েছে।

—কি কি রান্না হল আজ, পিসিমা ?

পিসিমা বললেন, আজ রান্দা ভালো মতনই হয়েছিল। মাজাবউয়ের বাপ এসেছিল হালিশহর থেকে। তাইতে শাকের ঘণ্ট, সুক্তানি, বাগুনভাজা, মুগের ডাইল, ইলসা-মাছের ভাজা আর ঝোল, মাছের ডিমের বড়া, আর পাকাকলার অম্ল।

একটু থেমে পিসিমা বললেন, আর, আমার ঘরে আমি রান্ধি খেসারির ডাইল আর বাগুন-ছেঁচকি। মাজাবউটা অঙ্গ লাড়ে না, সদায় তার ঝকড়া, সকল কাজই বড়বউ করে। বড়বউ তবু মন্দের ভালো, সংসারের কাজকাম করে, ছেলেপিলেরদের খাওয়ায়, আচিয়ে দেয়, আমারদের সেবাসুস্থও করে। কিন্তু মাজাবউ—

আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে পিসিমা জোড়হাত কপালে ঠেকালেন, বললেন, খুরে দণ্ডবৎ। আমার দিন তো ফুরিয়ে এল, ভাবি শুধু কদমের কথা। ওই জোয়ান মেয়ে সারাটা জন্ম এই বাড়িতে কাটাবে কি করে। কথায়-কথায় ঐ মাগী কদমকে বলে, নাথিয়া তোর মুখ থেথুয়া করে দেব।

পিসিমার পাশে বসে গালে হাত দিয়ে এই দুঃখের কাহিনী শোনে হেমাঙ্গিনী। শোনে, আর হয়তো নিজের মেয়ের কথা ভাবে। কী যে আছে মেয়ের অদৃষ্টে কে জানে। কার হাতে পড়বে, কী দশা হবে, ভাইয়েদের সংসারে আবার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে কিনা।

পিসিমা বললেন, চুপ করে শুনে গেলেই হয়। কদমেরও বড় মুখ, বলে, তুই যদি না মরিস তবে তোর পুতের মাথা খাস। বাড়িতে আগুন জলে ওঠে বউ। মাজাবউ শাসানি ছাড়ে—ভালখাকী তুই যে প্রকার মেয়েমানুষ তা কে না জানে, বড়গলা করে সব মাৎ করতে চাস বুঝি। ওদের বোঝাবুঝি বুঝিনে বউ, এ ওকে বলে ভাতারখাকী, ও একে বলে হারামজাদী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন পিসিমা, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, অসহায় মানুষ আমরা, আমাদের ভরসা বাবা-বিশ্বনাথ। তাঁর কৃপাতেই বেঁচে আছি, কৃপা যদি তাঁর বহাল থাকে তবে আর ভাবি নে, বউ।

বাবা-বিশ্বনাথের নাম শুনে হেমাঙ্গিনীও হাত ঠেকাল কপালে। হায়, তাঁর চরণদর্শন করা হবে না এ জীবনে। কেবল তাঁর নাম শুনেই তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম

জানিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। সেই কাশী সেই বারাণসী— সে কি এখানে? একমাসের দেড়মাসের পথ। ভদ্রেশ্বরের চক্রবর্তী-বাড়ির সেজ-ঠাকরুন সেবার গেলেন কাশীতে— ওঃ, সে কি ঘটা। পঞ্চাশ জন পেয়াদা, বত্রিশ জন আশাশোটাধারী, চব্বিশ জন পালকি-বেহারা। সে এক সমারোহ। একজন মানুষের তীর্থযাত্রার জন্যে এক শ জনের উপর মানুষ লাগল। অমন ঐশ্বর্যও নেই হেমাঙ্গিনীর, অত আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই, বিশ্বনাথের চরণদর্শনের ভরসাও তাই নেই। কিন্তু, তাঁর নাম শুনলে প্রাণের ভিতরটা হুহু করে ওঠে। রাধার মঙ্গল করুন তিনি, এত দূরে বসে এই কামনা জানাল হেমাঙ্গিনী।

বলল, হ্যাঁ, পিসিমা। আমাদের মত হতভাগিনীদের তিনিই ভরসা। কোথায় কাশী আর কোথায় এই ফরাসগঞ্জ, এত দূরদেশের প্রার্থনা তার কানে নিশ্চয় পৌঁছয়?

পিসিমা তাকালেন হেমাঙ্গিনীর দিকে। হেমাঙ্গিনী তবে বুঝি বুঝতে পারে নি পিসিমার এ বাবা-বিশ্বনাথ কে। বুঝতে যখন পারেই নি, তখন বুঝিয়েও আর দরকার নেই। কোম্পানি আবার নাকি হুলিয়া জারি করেছে ওর নামে। কোম্পানির তো আর কাজকম্ম নাই, মানুষ তো চেনেনা ওরা —ভিনদেশী চোখ নিয়ে এই বিদেশে-বিভুঁয়ে এসেছে এ দেশের ধন-মান লুঠ করতে। তাদের নামে হুলিয়া জারি করে কে তার ঠিকানা নাই, তারা এসেছে অন্যের ইয়েতে ইয়ে করতে।

হেমাঙ্গিনীর কথার উত্তরে পিসিমা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে খিড়কির দরজায় হরিশঙ্কর এসে উপস্থিত হল।

মাথার কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল হেমাঙ্গিনী, পিসিমাও উঠে পড়লেন, বললেন, চলি বউ। এর আবার দুধ খাওয়ার সময় হল।

ছেলেটাকে কাঁকালে তুলে নিয়ে হরিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো ছিলে তো? কি খবর নিয়ে এলে?

ডান হাতের পোঁটলা বারান্দায় রাখল হরিশঙ্কর, হেমাঙ্গিনী তার হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে নিল।

হরিশঙ্কর বলল, তা, খবর একটা এনেছি। ভালো কি খারাপ বুঝছি না পিসিমা। সবই জানতে পারবেন।

হরিশঙ্করের কথা শুনে পিসিমা উদ্বিগ্ন চোখে তার দিকে তাকালেন।

—উহুঁ, উহুঁ। খারাপ কিছু না।

—তা হলেই ভালো।

পিসিমা ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

পরদিন সকাল হতে-না-হতে খবরটা ছড়িয়ে গেল চার ধারে। ফরাসগঞ্জের রাধা যাচ্ছে শান্তিপুরে— রাইরাজা হবে সে। এ একটা খবরের মত খবরই বটে। এ মান কি পায় যেমন-তেমন মেয়ে? মেয়ের পক্ষে এ যে মস্ত ভাগ্য। শ্রীরাধিকার মত সুন্দরী মেয়ে পাওয়ার জন্তে, শ্রীকৃষ্ণেরা নয়, ধনী ব্যক্তিদের কার্তিকের মত নন্দনেরা উন্মুখ হয়ে আছে। ফরাসগঞ্জের এই ছোট সংসারের আমগাছের ছায়ায় মানুষ হল যে মেয়ে, সেই মেয়ে এখন সোনার পালঙ্কে পা তুলিয়ে দাসী-বাঁদিদের ফাই-ফরমাশ করে দিন কাটাবে।

এই তো সেবার ঐ খাঁচৌধুরীদের মেয়ে রত্না রাইরাজা হয়ে যেই বেরিয়েছে হাওদা চেপে, অমনি কলকাতার কলুটোলার অত বড় ব্যাপারী মনোহরবাবুর মধ্যমপুত্র তাকে লুফে নিয়ে গেল না?

রাধা ঘরের মধ্যে চৌকিতে বসে ছিল মাথা নীচু করে, কদম্ব তার থুৎনিতে আঙুলের ঘা দিয়ে বলল, কার সোহাগী হতে চললি লো? কদম-মাসিকে মনে থাকবে তো?

উঠোনে মানুষ জমে গেছে অনেক। কৈবর্তপাড়া তেলীপাড়া আর গোয়ালপাড়ার বউ-ঝিরা এসেছে দলবেঁধে। সকলের মুখেই উল্লাসের ছায়া। তাদের দেশের মেয়ে যাচ্ছে রাইরাজা হতে, এতে তাদের গর্ব বুঝি কম না।

কলকল শব্দে নানারকম কথা বলে নিচ্ছে তারা। বাজারের হালচালের কথা— ফিরিঙ্গি-মিনসেদের মায়্যালোকের পিছু নেওয়ার কথা, সতীত্ব রাখা নিয়ে ল্যাঠার কথা।

কাল হাটবার, সেখানে যারা সুতা বেচতে যাবে—সুতার দর কি, তাও এই সুযোগে সবাই দেখে নিচ্ছে।

—সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে গো, আগুন। পোড়াকপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সুতাখান। সে সকল সুতা আমি এক কাহন বেচেছি বটে।

—তাই বটে। সেকাল নাকি আর নাই। কোম্পানির দাদন নাই। যে-কাপড় ছিল বারো টাকা, তা নয়-দশ দাম হয়েছে। হাটে তাই সুতা ছুঁতে চায় না। আগুন লাগবে না তো কি, বুন।

নবনী গয়লার মেয়ে পদ্ম বলে, সুতাও যেমন দুধও তেমন। হাটে গেইছি, মিনসেরা এসে শুধোয়, দাম কত। দাম বলি। মিনসে পিটপিটিয়ে চায়, বলে, কেমন দুধ তোর গয়লানি। বলি, ভালো দুধ গো। বাঁকা চোখে চেয়ে বলে, দেখি। বলি, চোখে দেখবে কেন, চেখে দেখ, খেয়ে দেখ ; ঘরে তো মা নেই। হারামজাদা মিনসে জবাব শুনে পালায়। ওরা হাটে আসে হাট করতে না লো, মায়্যামানুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে। ভরা কলসী মাথায় বয়ে নিয়ে যাই, ভরা কলসী নিয়ে ফিরি। বেচাকেনার এই অবস্থা।

—কলকাতার হাওয়া এয়েচে গো। বাবুরা ওখানে বাই নাচাচ্ছে। গাঁয়ের মানুষের মাথায়ও ঐ বাই জেগেছে। মায়্যামানুষকে নিয়ে ওরা নাচতে চায়। আমরা কি সব নেকী-নাচুয়ে, না, চন্দননগরের সেই গাঁদি-বিবি ? কি ভেবেছে গো ওরা, পদ্ম ?

দাঁতে মিসি আর অঙ্গে স্বাস্থ্য নিয়ে খিলখিল করে হাসে পদ্ম-গয়লানি। তার হাসির রকম দেখে হাটের বেচাকেনার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ব'লে মনে হয় না।

গাঁয়ের মানুষ এরা, তবু খবর রাখে দেখা যাচ্ছে মেলাই। চন্দননগরের কাহিনীটা কিংবদন্তীর মত নাহয় ছড়িয়ে আছে এ তল্লাটে, কিন্তু কলকাতার নিকি-নর্তকীর নামও যে এদের কানে এসে পৌঁছেছে, সে খবর আগে জানা ছিল না।

হেমাঙ্গিনী উঠোন পারাপার করে এ-ঘর ও-ঘর করছে। সাংসারিক কাজও বেড়ে গেল নাকি ? না, কাজ বাড়েনি। হেমাঙ্গিনীর সারা শরীরে চঞ্চলতা এসেছে— কিছুটা খুশির, কিছুটা বুঝি উদ্বেগের। মেয়েকে যেন শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে সে। ছেলে-দুটির পাঠশালা যাওয়া আজ বন্ধ হয়েছে, তাদের কোনো কাজ নেই, কিন্তু তাদের দিদিকে ঘিরে বাড়িতে এই ঘটা দেখে মুরলী আর নবীনও অকারণে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাড়া ভেঙে যারা এসে জড়ো হয়েছে তাদের সঙ্গেও বুঝি কথা বলার সময় নেই হেমাঙ্গিনীর।

তবু পদ্ম বলল, ও দিদি গো। শুনিই-না একটু বার্তা। কবে রওনা হবে মেয়ে। তোমার মেয়ে হবে রাজা, তুমি তো দিদি রাজমাতা।

হেমাঙ্গিনী দাঁড়াল, ওদের মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা আশীর্বাদ করো মেয়েকে, যে-মান ও পাচ্ছে সে-মানের মর্যাদা যেন রাখতে পারে।

সকলে যেন একসঙ্গেই বলে উঠল, তোমার মত ভালো মানুষের বেটি, মান রাখতে পারবে না কেন, দিদি। কিন্তু রওনা হবে কবে? দিন ঠিক হয়েছে?

—কাল যাবে। কাল পঞ্চমী-তিথি, দিন নাকি ভালো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুড়ো হরিদাসী-তেলিনী বলল, রাজমাতা হও। রাজ-জামাতা ঘরে এনে তোলো, আমরা একটু মচ্ছবে এসে জুটে আমোদ করে যাই।

—আশীর্বাদ করো হরিদাসী।

হরিদাসীরা দল বেঁধে বুঝি আশীর্বাদই করল।

ওদের এই আগ্রহ ও ব্যাকুলতায় অভিভূতই হল বুঝি হেমাঙ্গিনী। তার চোখ ছলছল করে উঠল।

মুরলী ও নবীন মায়ের আঁচল ধরে আব্দার জানিয়ে বলল, আমরাও যাব, মা। বাবাকে বলো। নৌকোয় অনেক জায়গা।

কিন্তু বাবাকে বলার সাধ্য কি। তিনি ঘরের মধ্যে চৌকিতে অটলভাবে বসে তামাকই টেনে চলেছেন। কোনো কথার মধ্যে যাচ্ছেন না, কোনো কাজের মধ্যে না। পুঁটুলীতে বেঁধে শান্তিপুর থেকে মেয়েকে সাজাবার জন্যে পাঁচ-ছয় খানি শাড়ি এনেছেন, সেই শাড়ির দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবছেন, এই শৌখিন শাড়ি পরালে রাধার শ্রী আরো বেড়ে উঠবে কতখানি।

নদীর ঘাটে দেখা হবে জানিয়ে ওরা-সব উঠোন ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ঘরের এক কোণে ব'সে কদম আদর করেই চলেছে রাধাকে। বলছে, ওখান থেকেই চলে যাস নে যেন শ্বশুরবাড়ি। এখানে এসে দেখা দিয়ে যেতে ভুলিস নে, বুঝলি?

কদম-মাসির কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছে না রাধা। সে যাচ্ছে তার জ্যাঠার বাড়িতে। এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ির কথা এরা আনছে কেন বার-বার? লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে তার চোখ, কদমের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে বার বার।

—ওরে ছুঁড়ি, এরই মধ্যে বাঁকা চোখে চাইতে শিখেছ দেখছি! হাওদায় বসে এদিক-ওদিক যেন চেয়োনা অমন চোখে। চোখ দুটো রাখবে স্থির। নইলে—

কানে-কানে কি-যেন বলল কদম। রাধা তার হাত সরিয়ে দিয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, অমন কোরো না, কদম-মাসি।

কিছুই তো করে নি কদম। তার নিজের জীবনের কোনো আশা কিংবা কোনো আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। জীবনে কত স্বপ্ন আর কত কল্পনাই তার ছিল, কিন্তু সবই কেমন আলুথালু হয়ে গিয়েছে। মুখে তার রঙ্গ আছে বটে, কিন্তু প্রাণে বুঝি রঙ্গ আর নেই। আজ তাকে কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। চোখের কোল-দুটো একটু যেন কালি-পড়া, ঠোঁট-দুটো একটু যেন শুক্‌নো।

রাধার হাত ধরে কদম বলল, রাগ করিস নে, রাধা। কদম-মাসির কষ্ট তোরা জানিস নে। মুখে রঙ্গ করছি কেবল বেঁচে থাকার জন্যে। কিন্তু আমি বোধ'য় আর বাঁচব না।

চমকে তাকাল রাধা, জিজ্ঞাসা করল, কেন, তোমার শরীর খারাপ নাকি, কদম-মাসি।

—হ্যাঁ রে, খারাপ। ভীষণ খারাপ।

—কি হয়েছে ?

—কিছু না রে, কিছু না।

আমোদ করতে করতে কদম-মাসি হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল দেখে রাধা তার হাত ধরে বলল, অসুখ করলে ওষুধ খাও।

দেয়ালের দিকে চোখ রেখে কদম বলল, খাবো রে, খাবো। ওষুধই খাবো।

আর-কোনো কথা বলল না কদম, হঠাৎ উঠে চলে গেল ঘর থেকে। গঙ্গাজলী কাপড আজ আর নেই তার পরনে, একটা আধ-ময়লা খড়কে-ডুরেতে অঙ্গ জড়ানো। কিন্তু যে অঙ্গ লাবণ্য দিয়েই জড়ানো সে অঙ্গের সুষমার জন্যে গঙ্গাজলীর দরকার কি। ম্লান মুখে সে চলে গেল, মনে হল যেন, একখণ্ড কালো বিদ্যুৎ চমকে দিয়ে গেল বারান্দাটা।

কদম্বের এ আচরণের নানা অর্থ হতে পারে। কিন্তু কদম্ব জানে এর অর্থ মাত্র একটাই। রাধার ভাগ্য দেখে এতটুকু হিংসা জাগে নি তার মনে, কিন্তু ঐ ভাগ্যের পাশে নিজের ভাগ্যকে রেখে সে বুঝতে পেরেছে কতবড হতভাগ্য সে। বসে বসে তাই নিজের ভাগ্যকেই বুঝি তিরস্কার করছিল। তা ছাড়া ভর্ৎসনা করবে আর কাকে। আর তো কেউ নেই তার নাগালের মধ্যে। যার অবহেলার জন্যে তার জীবন এমন বিষময় হয়েছে, সে মানুষটা যে এখন কোথায়, কে তার ঠিকানা বলবে ? কত কাজ তাদের। কদম নামে ফরাসগঞ্জের গাঙ্গুলি-বাড়ির এই মেয়ের খবর রাখার সময় তাদের কই।

হেমাঙ্গিনী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও অমন করে চলে গেল কেন রে ?

রাধা বলল, কি জানি।

স্তব্ধ হয়ে একটু দাঁড়ালেন হেমাঙ্গিনী, তার পর বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডাকলেন, এই মুরলী, শোন্।

আমের ডাল দিয়ে নালার মধ্যে কাদা খোঁচাচ্ছিল ছেলে, মায়ের ডাক শুনে তাঁর দিকে তাকাল।

হেমাঙ্গিনী বললেন, ছুটে যা তো বাবা একবার। তোর কদম-মাসি একা গেল। শিগগির ছোট্।

আমের লাঠিটা হাতে নিয়ে খিড়কির দরজা পার হয়ে মুরলী দৌড় দিল।

নিজের মনেই হেমাঙ্গিনী বললেন, মেয়েটা একদিন বিপদ ঘটাবে। যা ফিরিঙ্গির উৎপাত চার দিকে।

কিছুক্ষণ পরে মুরলী ফিরে এসে আবার আমতলার নালায় হাতের লাঠি দিয়ে কাদা খোঁচাতে আরম্ভ করল।

হেমাঙ্গিনী কুয়োতলায় এসে দড়ি-শুদ্ধ ঠিলি জলে নামিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে। দেখে এলি?

—হ্যাঁ।

—পৌঁছেছে বাড়িতে?

মুরলী বলল, বাড়ির দিকেই গেল। তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল হারুদার সঙ্গে। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি রে। আমি বললাম; মা পাঠাল তোমাকে দেখতে।

—হারুদা কে রে?

—হারুদাকে চিনলে না, মা? হারুদা!

চিনতে পারলেন হেমাঙ্গিনী। ওর সঙ্গে আবার কদমের জানাশোনা হল কি করে, তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে আবার ওর কথা কিসের, কিছু বোঝা গেল না। ফরাসডাঙার মিস্তিরদের হারু, এদিকে কেলীর কুঠিতে নাকি কাজ নিয়েছে। ছেলেটার নামে নানারকমের বদনাম, তার সঙ্গে কদমের কথা না বলাই ঠিক। কিন্তু তার সঙ্গে কথা কেন? হেমাঙ্গিনী একটু বিরক্তই বুঝি হলেন কদমের উপর। যাক গে, কি দরকার তাঁর পরের কথায়, পরের বাড়ির মেয়ের কথায়।

ঠিলির জল কলসীতে ঢেলে, কাঁকালে কলসী নিয়ে তিনি চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

মুশুরির ডাল ভিজিয়ে রেখেছেন হেমাঙ্গিনী এক গামলা। পাটা পেতে সেই ডাল বাটতে বাটতে বেলা হয়ে গেল অনেক।

রাধাকে নিয়ে এসে কুয়োতলায় বসিয়ে তার মাথায় গায়ে ঐ ডালবাটা মেখে-মেখে মেয়ের গায়ের সোনা-রঙ মাজা-সোনা করে তুলতে লাগলেন তিনি। মাথার চুলের গোডায় গোড়ায় জমেছে বুঝি আঠা, এক-এক গোছা চুল ধরে সমস্ত ময়লা সাফ করে দিতে লাগলেন।

কে কে সঙ্গে যাবে, এই নিয়ে অনেক কথা হয়ে গেছে। কিন্তু না, কেউ না। মুরলীও না, নবীনও না, কেউ যাবে না। হেমাঙ্গিনী বললেন, যার মেয়ে সেই নিয়ে যাক সঙ্গে করে।

হরিশঙ্করও তাই বলেন।— এ তো আর বেডাতে যাওয়া নয়, একটা কর্তব্যপালনের জন্যে যাওয়া। যাকে নিয়ে কর্তব্যপালন, তাকে নিয়ে একাই যাব আমি। কি বলিস, রাধা?

রাধা কিছু বলে না। বাবার পাশে লক্ষ্মী-মেয়েটির মত সে নীরবে বসে রইল।

ফরাসগঞ্জে নেমে এল নতুন ভোর, পঞ্চমীর সকাল। আজ এই পল্লীর জীবনে এক নতুন সমারোহ।

নৌকোটাকে দিব্য সাজিয়েছে ইয়াসীন। তাঁতের নতুন শাড়ি দিয়ে মুড়ে দিয়েছে ছই। এসব ভবানীশঙ্করের দেওয়া। ছইয়ের ভিতরে মেদিনীপুরী মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে, মোটা মোটা তাকিয়া দিয়েছে গডিয়ে। যে-গেরুয়া পালে হাওয়া লাগিয়ে নিয়ে এল এই নৌকা, বদল হয়েছে সে পাল, আসমানী রঙের নতুন পাল দিয়ে শৌখিন করে তুলেছে নৌকা।

গরিটির ঘাট আজ লোকে লোকারণ্য। সারা গাঁ ভেঙে এসে পডেছে এই কিনারে। রাধাকে তারা এই নৌকোযাত্রায় শুভকামনা জানাতে এসেছে। পদ্মরা এসেছে, হরিদাসীরা এসেছে, বডবউ-মেজবউকে নিয়ে পিসিমারা এসেছেন—কেউ বাকি নেই।

এই ঘাটের একটু তফাতে বড়-বড় ভারি নৌকো দাঁডিয়ে সোরা গন্ধক আর লবণ নামাচ্ছিল। তারা হাতের কাজ বন্ধ রেখে এই উৎসবের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টুপিওয়ালা সায়েবলোকেরা দূর থেকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে। এই ঘটার কারণ তারা ঠিক বুঝছে না।

মায়ের হাত ধরে একটা ছোট্ট পুতুল যেন হেঁটে চলেছে। চারদিকে একবার তাকাল রাধা। ভিড় দেখে তার মনে কেমন খটকা লাগল যেন। ঐ যে সেই চালতে-গাছটা। ঐ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অনেকটা এইরকম একটা ভিড় সে দেখেছিল অনেকদিন আগে। সে ভিড়ের মানে সেদিন সে ভালো বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন একটু-একটু বোঝে। এইজন্যে এই ভিড়টা তার কেন-যেন ভালো লাগল না।

নৌকোর গলুই ডাঙার দিকে এগিয়ে দিল ইয়াসীন। এতে উঠতে সুবিধে হবে, নইলে কাদায় ডুবে যাবে পা।

গায়ে কুর্তি মাথায় টুপি, কে এসে দাঁড়াল ওই উঁচু পাড়ে? হরিশঙ্কর চেয়ে দেখল।— অ্যাণ্টনি।

হাসতে হাসতে নেমে এল অ্যাণ্টনি, জিজ্ঞাসা করল, কি, হরিবাবু? ব্যাপারটি কি?

হরিশঙ্কর তাকে ব্যাপারটা খুলে বলতেই সে হেসে উঠল প্রাণ খুলে। বলল, রাইরাজা?

মাথা নীচু করে রাধার মুখের দিকে চেয়ে তাকে বলল, তুমি রাইরাজা হবে? কি গাইবে?

লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়াল রাধা।

অ্যাণ্টনি বলল, আমিও সাজব রাইরাজা। বলো, কাকে ভালো মানাবে। বলো, দেখ আমার দিকে তাকিয়ে।

ঐ নিরুদি আসছে। সারা অঙ্গে স্বাস্থ্য যেন নদীর জলের মত ছলছল করছে। সে এসে দাঁড়াল পাশে। অ্যাণ্টনি আবার ঐ প্রশ্ন করল রাধাকে।

এই দু জনকে এত কাছে থেকে একত্রে কখনো দেখেনি পদ্মরা। তারা ফিসফিস শব্দে কি-সব মন্তব্য করতে লাগল। কিন্তু তাদের কথায় কান দেয় কে। এরা রাধার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

রাধার চিবুক ধরে সোহাগ করে নিরুপমা বলল, ভাগ্যবতী মেয়ে। দুনিয়ার সব ভাগ্য কেড়ে নিয়ে আসা চাই, বুঝলে?

অ্যাণ্টনি চাপা গলায় বলতে লাগল—

রাজা হল শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ ভাবে মনে
এমন রাজার দেশে থাকিব কেমনে।

নিরুপমার কথা চুরি করে কথা বলছে দেখে আনটুনিকে বাধা দিয়ে নিরুপমা বলল, চুপ করো, সায়েব। চুপ করো। কাশিমবাজারে গিয়ে এই ছড়া কাটলেই ভোলা তোমার কবিয়ালি ভুলিয়ে দেবে।

উত্তরে অ্যান্টনি কি যেন বলতে গেল। কিন্তু নিরুপমার বাধা পেয়ে থেমে গেল।

ওরা নৌকোয় ওঠার জন্যে তৈরি হচ্ছে। গাঁয়ের মেয়েরা একসঙ্গে শঙ্খধ্বনি করে উঠল, নদীর কিনার সেই মঙ্গলধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সকলের চোখে-মুখেই উল্লাসের আর আনন্দের ছায়া।

হঠাৎ সেই ভিড় ভেদ ক'রে এগিয়ে এল কদম, রাধার কাছে এসে বলল, ভুলিস নে যেন তোর কদম-মাসিকে। বল্, ভুলবি নে।

রাধা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, একটু পরে বলল, ভুলব কেন, ভুলব কেন।

—সারাজীবন মনে থাকবে ?

ঘাড় কাৎ করল রাধা।

হেমাঙ্গিনী কদমের মুখের দিকে একবার তাকালেন। কিছু বলার ইচ্ছে বুঝি ছিল, কিন্তু বললেন না।

নৌকোয় উঠল হরিশঙ্কর আর রাধা। মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রইল নবীন ও মুরলী।

বৈঠা নিয়ে বসল মাঝিরা। হেমাঙ্গিনী একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, সাবধানে যেয়ো। সাবধানে রেখো মেয়েকে। লম্বা পথ, ভয় হয়, পথে আবার—

—কোনো ভয় নেই। কিছু ভেবো না। ইয়াসীন মিঞা আছে, এই আমাদের ভরসা।

কিন্তু কিসের ভয়, সে কথা প্রকাশ করতে পারল না হেমাঙ্গিনী। এই নদীর দু পারে কত ডাকাতিই-না হচ্ছে, সেই কথা মনে পড়ে গিয়েছিল হেমাঙ্গিনীর।

কিনার থেকে ধীরে ধীরে জলের গভীরে চলে যেতে লাগল নৌকো। কিনারে অজস্র চোখ একদৃষ্টে চেয়ে রইল নৌকোটার দিকে। বাবার হাত এক হাতে ধরে, অন্য হাতে ছই ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের দিকে চেয়ে রইল রাধা। ধীরে ধীরে গরিটির কিনার তাদের কাছ থেকে চলে যেতে লাগল দূরে।

হুলুধ্বনি বেজে উঠল নদীকিনারে, বেজে উঠল আবার শঙ্খধ্বনি। পাড়ে-দাঁড়ানো ঐ অগণিত মানুষেরা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল রাধার চোখ থেকে। তবু সে চেয়ে রইল ঐ দিকে।

নৌ-যাত্রা রাধা করেছে এর আগেও অনেক বার। গরিটির এই ঘাট থেকে নৌকো চেপে চানকে গিয়েছে কত বারই। কিন্তু আজকের এই যাত্রাটা তার জীবনে একেবারে নতুন। আশপাশের গ্রামসুদ্ধ এতগুলো মানুষ আজ তাকে তুলে দিতে এসেছে নৌকোতে। মনে থাকবে, চিরদিন তার মনে থাকবে এই দিনটির কথা। এ কি কখনো ভোলা যায়? এতগুলো মানুষের আগ্রহ, আর এতগুলো মানুষের এই আশীর্বাদ?

ভোলা যায় না। ভুলবে না সে কখনো। সেইসঙ্গে ভুলবে না ওকে— ওই কদম-মাসিকে। বড় কষ্ট কদম-মাসির, বড় দুঃখ।

অনেক দূরে চলে গেছে নৌকো। ঐ যে অনেক দূরে ঐ বজরাটার আড়ালে পড়ে গেল।

নিরুপমার হাত ধরে নদীপাড়ের চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে উপরে উঠতে লাগল অ্যাণ্টনি। এদের এই বেহায়াপনা দেখে পদ্মরা আশ্চর্য হয়ে গেছে। আড়ালে গিয়ে যা-খুশি কর্-না মিনসে, হাটবাজারে লোকের চোখের সামনে নিজের মেয়েমানুষকে এমন সোহাগ করা কেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে ধীরে-ধীরে যার যার বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। যে জায়গাটা কিছুক্ষণ আগে শঙ্খ আর হুলুধ্বনিতে মঙ্গলময় হয়ে উঠেছিল, এখন সেখানে শুধু একটি মাত্র ধ্বনি বাজছে— কলকল শব্দে বাজছে জলতরঙ্গ।

নোনাদিঘির দিক থেকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে হাজির হল মনোহর। এ কি, পাড় একেবারে শূন্য— খাঁখা করছে। ব্যাপার কি, এই দিক থেকেই-না শঙ্খের আর উলুর শব্দ উঠছিল। ঐ শব্দ কানে যাওয়া মাত্র সে ছুটতে আরম্ভ করেছে। সারা পথটা ভাবতে ভাবতে এসেছে— দেরি হয়ে গেল, দেরি হয়ে গেল বুঝি। এখানে এসে পৌঁছে বুঝল, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু এতটা দেরিই কি করে ফেলল সে? কোনো দিকে তো কোনো চিহ্নও নেই— না কোনো পোড়াকাঠ, না কোনো ছাই। তবে এত উল্লাসটা হল কিসের?

হাত দিয়ে সূর্য আড়াল করে মনোহর চার দিকে তাকাতে লাগল।

খোঁজ নেবার জন্যে খোঁড়া মনোহর রওনা হল ফরাসগঞ্জের দিকে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে ফরাসগঞ্জে। এক দুই তিন ক'রে দিন গুনছে না হেমাঙ্গিনী। দিন গুনছে তিথি দিয়ে— সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী একাদশী, এই ভাবে। আর মাত্র চারটি দিন আছে পূর্ণিমার। ঐ দিনে রাজা হবে তার মেয়ে। উৎকণ্ঠায় এক-এক সময় শরীর শিরশির করে কেঁপে ওঠে।

মুরলী আর নবীন কেবল জিজ্ঞাসা করে তাদের দিদির কথা— দিদি এখন কি করছে, মা। দিদি বুঝি এখন খাচ্ছে, দিদিকে বুঝি এখন সাজাচ্ছে? রাজার মত মুকুট পরাবে নাকি দিদিকে? হাতে তলোয়ার দেবে, বসার জন্যে সিংহাসন দেবে?

—চুপ কর, চুপ কর, চুপ কর। ওরা তাকে নিয়ে কি করবে না-করবে এখানে বসে আমি বলব কী করে। তাদের মেয়ে তারা যা-ইচ্ছে করবে। আমি কী করে জানব বাছা।

মায়ের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় ছেলেরা। দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছে, তাতেই মায়ের এত রাগ কেন। মায়ের মন বুঝি ভালো না?

একটা মানুষের অভাবে বাড়িটা কেমন শূন্য হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, কাজকর্ম যেন কমে গিয়েছে কত। একটা মানুষের অভাবেই বলতে হবে। এই তো, হরিশঙ্কর ক-দিন এখানে ছিল না, তখন তো বাড়ি এমন ফাঁকা ঠেকে নি।

রান্নাঘরের চালে বসে ঝগড়া করছে কয়েকটা শালিখ। তাদের কিচিরমিচির তো নতুন না, কিন্তু আজ বড় বিরক্ত লাগছে ওদের ওই কিচমিচ শব্দে। হাত তুলে হেমাঙ্গিনী বললেন, দূর হ, দূর হ।

আমডালে বসে কোয়া-কোয়া করে ডেকে উঠল কাক। তেড়ে এলেন হেমাঙ্গিনী। বললেন, যা যা যা, দুনিয়ায় জায়গা নেই, আমার বাড়ির বুকে বসে ঐ রব না ছাড়লেই নয়?

কিছুই ভালো লাগে না হেমাঙ্গিনীর। কেবলই মনে হয়, সঙ্গে গেলেই হত। নাহয় না-ই বলেছেন ভাশুরঠাকুর, তাদের বাড়িরই তো বউ সে। তার নাম করে তাঁরা বলে দেন নি বলে অভিমান না করলেই হত।

নিরাপদে পৌঁছেছে নিশ্চয়। পথে এমন-তেমন কিছু ঘটলে খবর নিশ্চয় পৌঁছত। কেলীর কুঠিতে খবরাখবর সবচেয়ে আগে পৌঁছয়। ইচ্ছে হল, একবার পাঠাবে নাকি নবীন বা মুরলীকে তাদের সেই সাতজন্মের হাকদাটার কাছে। কিন্তু থাক্, দরকার নেই।

পাটার উপর ভিজা হলুদ নিয়ে নোড়ার মাথা দিয়ে সেগুলো থেঁৎলে নিতে লাগল হেমাঙ্গিনী। কি সুন্দর হলুদ, ঠিক তার মেয়ের গায়ের রঙ যেন।

বেশ নিরিবিলি আর নিশ্চুপ এই পল্লী। আজ দুপুর থেকে আবার হঠাৎ পথে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি উঠল বেজে। ফরাসডাঙা থেকে ফরাসিরা আসছে দলে-দলে। হঠাৎ তাদের এখানে আসার কারণ আবার কি ঘটল? ইংরেজে-ফরাসিতে কোনো ঝগড়া বেধে উঠল নাকি? বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই, এই সময়ে এখানে একপাল বিদেশী হানা দিতে এসেছে দেখে হেমাঙ্গিনী একটু আতঙ্কিতই হল।

ঘোড়ার দড়বড়ির সঙ্গেসঙ্গে আবার পালকি-বেহারার হুমহুম শব্দও এল কানে। খিড়কির দরজার কপাট বন্ধ করে তার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল হেমাঙ্গিনী। পালকির দরজা দিয়ে মুখ বা'র করে চার দিক চেয়ে-চেয়ে দেখছে সাদামুখো কতকগুলো মেয়েলোক।

ফরাসিদের জীর্ণ নাট্যশালাটির দিকে চলে গেল ওরা ধীরে ধীরে। আজ বুঝি জীর্ণ নাটমঞ্চটি ফরাসি ললনাদের কোমল পায়ের স্পর্শ পেয়ে গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে।

পোর্তুগিজদের ভাঙা গির্জার অন্ধকারে বাদুড়েরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই গির্জার গা দিয়ে চলে গেল ঘোড়ার দড়বড়ি ও পালকির মিছিল। মেহেদি গাছের বেড়ায় উড়ে এসে পড়তে লাগল ধুলো।

শ্মশানের মত মৃত হয়ে পড়ে আছে যে নাচঘর, আজ তার ধুলো সাফ করা হচ্ছে, আজ ওখানে নাটক হবে।

কালে-ভদ্রে এই ফরাসগঞ্জ পুরাতন নামে পরিচিত হয়ে উঠবার জন্যে যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আজ এত ফরাসির আগমনে এই জায়গা আবার যেন হয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ গার্ডেন।

তা উঠুক। কিন্তু ওরা এই সময়টায় এখানে উৎপাত করতে না এলেই পারত। এখন হেমাঙ্গিনী একেবারে একা। হরিশঙ্কর থাকলেই সে যে কোনো দুরাত্মার সঙ্গে লড়াই করতে পারত, এমন নয়। তবু, পুরুষমানুষ থাকলেও তো একটা ভরসা।

এক ঝাঁক পালকি চলে যাবার পর আর-এক ঝাঁক আবার গেল, কিছুক্ষণ বাদে আবার এক ঝাঁক।

পল্লীর ছেলেদের মনে বুঝি পুলক এসে গেছে। জীর্ণ নাট্যশালার সম্মুখে সারি-সারি গাছের মত তারাও গিয়ে দাঁড়াল সার বেঁধে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইংলণ্ড আক্রমণ করার জন্যে তোড়জোড় করছে সাতসমুদ্র তেরো নদী পারে। কিন্তু এখানকার ফরাসিরা ওসব যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের জড়িত করতে বুঝি ইচ্ছুক না, কেননা, জড়িত করলে তাদের বিশেষ সুবিধে নেই— এইসব ভেবেচিন্তে চন্দননগরের ফরাসি-ঘাঁটি ফরাসিদের মন অন্যদিকে ব্যাপৃত রাখার জন্যে এই নৃত্যানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেছে।

কোনো কুমতলব তাদের নাই। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে ঢুকতে গেছে কে। বাইরে থেকে তাদের হঠাৎ এই ঘোড়ার দড়বড়ি দেখে পল্লীর মানুষেরা একটু চকিত হবে অবশ্যই।

মুরলী আর নবীন ছুটে এসে বলল, অনেক সায়েব-মেমসায়েব এসে গেছে মা। মেলা, অনেক।

—কেন রে, হঠাৎ এল কেন ওরা ?

—আজ নাচগান হবে ওখানে।

—নাচগান ? হাসল হেমাঙ্গিনী, নিজের মনেই বলল, ভাঙা মন্দিরে কাসর-ঘণ্টা। বাদুড় তাড়িয়ে বুঝি বাঁদরনৃত্য হবে।

সারাটা দুপুর খাঁখা করতে লাগল বাড়ি। একটা মানুষ নাই যে, তার সঙ্গে মনের দু-একটা সুখদুঃখের কথা বলা যায়। একেই ফিরিঙ্গিদের উৎপাতে বাড়ি থেকে কেউ বেরয় না বড-একটা, তার উপর আজ ওদের ওই মাতামাতি দেখে নিশ্চয়ই সকলে ঘরের দরজা দিয়েছে।

এদিকে হেমাঙ্গিনী এখানে নিজেকে নিয়ে ব্যাকুল, ওদিকে গাঙ্গুলিবাড়িতে দেখা দিয়েছে এক নতুন বিপর্যয়। বিপযয়ই বটে। এতদিন সকলে একটু-আধটু সন্দেহ করছিল, আজ খোলাখুলি জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

বডবউ বিশেষ কথা বলছে না, কথা বলছে বেশি মেজবউ। এবার বাগে পেয়েছে সে তার ননদকে। আজ সে ছেড়ে কথা বলতে রাজি না।

বড়বউ বার বার তার জা'কে সাবধান করে বলছে, আস্তে মেজবউ, আস্তে। ঘরের কলঙ্কের কথা কাক-কোকিলকে জানতে দিতে নাই। গলা অত বড় কোরো না, চারদিকে শত্রু, তারা কান পেতে আছে।

মেজবউ বলল, যার-যার ঘর সে-সে সামলাক। আমাদের ঘরের কথায় পাডাপ্রতিবেশীর কান দেওয়ার কি দরকার। আর আর মাগীরা দিনরাত্তি কচকচ-ঝকঝক করছেই, তার কামাই নাই— রাবণের চিলুর মত জলছেই। তাদের দরকার কি আমাদের কথায় কান দেওয়ার।

ওদিকের বারান্দায় দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজে বসে আছে কদম্ব। তার জীবনে যা ঘটার তা তো ঘটে গেছে, এখন এ জীবন সে কী করে বয়ে বেড়াবে —এই তার চিন্তা। সমাজ আছে, সমাজে বাস যদি করতে চায় তার দাদারা, তাহলে কদমকে বা'র করে দিতেই হবে সে সমাজ থেকে।

উঠোনের মধ্যে হামাগুডি দিয়ে দিয়ে বডবউয়ের কোলের ছেলেটা কাক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কাকটাও বুঝি খেলা পেয়েছে। উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না, এক পাশ থেকে উড়ে আর-এক পাশে গিয়ে বসছে।

রান্নাঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন পিসিমা। আজ তাঁর রান্নার বালাই নাই, আজ একাদশী। বসে-বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলেন। তাঁর নিজের জীবন দিয়ে বিচার করছিলেন বুঝি কদমের জীবনটা। তাঁর জীবনেও প্রলোভন কি আসে নি? কত বার এসেছে। আজ তিনি বৃদ্ধ, মনের সমস্ত কামনা আজ মরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একদিন তো ছিল, যখন ঐ কামনা ছিল জীবন্ত। তখন মনের মধ্যে কত ইচ্ছা জেগেছে, কত লোভ এসেছে, গভীর রাত্রে ইচ্ছে করেছে ছুটে চলে যেতে, এবং, আজ তিনি মনে-মনে নিজের কাছে স্বীকারোক্তি যেন করছেন— ছুটে কি যান নি তিনি? গিয়েছেন। সে কতদিনেব কথা হয়ে গেল, সে মানুষগুলোর কথা একটু-একটু আজও মনে পড়ে। তাদের শরীরের উত্তাপ এখনো বুঝি সবটা ভুলে যাওয়া যায় না। এ যদি অপরাধ, তবে তিনিও সে অপরাধে অপরাধী। কে না করেছে এ অপরাধ। এ যদি পাপ, তবে ক'জন কুলীনের মেয়ে আছে নিষ্পাপ। মাথায় ফুল ফেলে দিয়ে যে-মেয়েদের স্বামী চিরদিনের জন্তে চলে যায় চোখের আডালে, তাদের স্ত্রীদের জীবনেও যে ফুল ফুটতে পারে, এ খোঁজ হয়তো রাখে না তারা। এ খোঁজ না রাখা যদি তাদের অপরাধ না হয়, তাহলে—

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে কদম্ব। তার সমস্ত শরীর বুঝি সংকোচে আর সন্ত্রাসে এখন কণ্টকিত। পিসিমা তার দিকে তাকাচ্ছেন আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন।

মেজবউ বড়ই কটকট করছে। ভাগ্যটা বুঝি ওর ভালো, তাই অন্তের দুর্ভাগ্যের মর্ম বুঝতে পারছে না ও। স্বামীর ঘর করার সেই ভাগ্য পেয়ে গেছে কুলীন-কুলের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও— এই বুঝি অহংকার। যদি পিসিমার মত কিংবা কদমের মত তাকে পড়ে থাকতে হত বাপের ভিটেতে, তবে কত

সাধ্বী থাকতেন ঐ স্বামীসোহাগিনী দেখা যেত। ঐ ছিরির চেহারাই তখন পাড়ায়-পাড়ায় ফিরি করে বেড়াতেন কি না সতীনারী, একবার তা উনি ভেবে দেখুন।

বোনের এই কাণ্ডের কথা শুনে ভাইয়েরা বসে পড়েছে। বউদের মুখ চেপে ধরতে পারে না, তাই তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মুখ চেপে যেন বসে আছে।

পিসিমা উঠে তাদের কাছে গেলেন। এর বিহিত ব্যবস্থা একটা-কিছু তো করা দরকার। দেশময় ব্যাপারটা রাষ্ট্র হলে মানুষের কাছে মুখ দেখানো হবে কি করে।

—কি করতে হবে, বলো পিসিমা। কাশীতে পাঠিয়ে দিই ওকে। লোকে জানুক, ও ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

—অত কঠিন হবি ?

—তবে, কি করব বলো।

তাঁর ভাইপুতদের সঙ্গে পিসিমা অনেকক্ষণ ধরে সলাপরামর্শ করলেন। অনেক বুদ্ধি দিলেন তাদের।— নিজের মায়ের পেটের বোন একটা ভুল যদি করে ফেলেই থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দিলে জীবনে আরো অনেক ভুল করার পথই তো দেখিয়ে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে একটু বুঝে চলা দরকার। বউদেরও একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

পিসিমার কথা বুঝল ওরা। সংসারের কলঙ্ক চাপা দিতে পারলে তো ভালোই। কিন্তু এতে চাপা পড়বে তো ?

দেখা যাক।

পিসিমা বাইরে এসে কদমের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কাঁদিস নে। কেঁদে কি আর লাভ, কদম। যা, ঘরে যা।

উঠোনে এখনো হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে বাচ্চাটা। পিসিমা তাকে কোলে নিলেন। তার গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, চল্, বেড়িয়ে আসি। আজ রান্না-খাওয়াও নাই, কাজকম্মও নাই, ঘরে বসে থেকে কি হবে।

বাচ্চাটা কিছু বুঝল না হয়তো, তার ঠানদির মুখের দিকে তাকাতে লাগল। পিসিমা তাকে আদর করতে করতে বললেন, চল।

গুটিগুটি পায়ে ছেলে কাঁকালে ক'রে পিসিমা বেরলেন পাড়া বেড়াতে। প্রথমে গেলেন ভিমু পণ্ডিতের বাড়ি।

পিসিমাকে দেখে তিনু পণ্ডিতের মেয়ে রত্না বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চুল আঁচড়াচ্ছিল বুঝি ঘরে, পিঠময় ফাঁপা চুল ছড়িয়ে, কাঁকুই হাতে নিয়ে রত্না এসে বলল, কি খবর, পিসিমা।

পিসিমা বললেন, ও রে রত্না, কাল রাতে তোদের ঠাকুরজামাই এসেছিল। অনেক রাতে এসে পৌঁছল, কদম আমাকে বার বার বলল, আর কাউকে না হোক, রত্নাকে একবার খবর দাও, পিসিমা। তা, কি করি বাছা, চারদিকে ফিরিঙ্গিদের দৌরাত্ম্যি, বুড়োমানুষ হলে কি হবে, তারা বুড়ি-ছুঁড়ি মানে না। তোরা যাবি, একটু ঠাট্টা মসকরা করবি, কত আমোদ হবে। কিন্তু আসতেই পারলাম না। তাই আজ এসেছি খবরটা দিতে।

চিরুনির থেকে চুল আঙুলে জড়াতে-জড়াতে রত্না বলল, তা বেশ তো। আজ যাব। দুপুরেই যাব, পিসিমা।

—আজ গিয়ে হবে কি, বাছা। তার নাকি রাজকাজ, ভোররাতে উঠে চলে গেছে।

থমকে গেল রত্না, বলল, চলে গেল? সে কি, একটা দিন থাকতে পারল না?

একটু রঙ্গ করলেন পিসিমা, বললেন, দিন কাটাতে কি আসে ওরা? ওরা যে জন্যে আসে তা তো জানাই। রাত কাটাতে আসে।

পিসিমার কথা শুনে হাসতে লাগল রত্না, বলল, এত মজা করেও কথা বলতে পার তুমি পিসিমা। কদম বলে কি? খুব খুশি তো? আজ যাব একবার।

—কি জানি বাছা, খুশি কি দুঃখী কে বলবে। মুখ গোমরা করে বসে আছে দেখে এলাম।

রত্না বলল, বুঝেছি। খুব মান-অভিমান গেছে সারারাত। আর, মুখ গোমরা না করবে কেন। পাঁচ বছর বাদে, প্রায় পাঁচ বছরই তো হল, না পিসিমা— এতদিন বাদে এসে মাত্র একটা রাত্তির কাটিয়ে গেলে কোন্ মেয়ে খুশি হয়, বলো!

—কি জানি বাছা। ও-বয়সও নেই, ও রসও নেই। কিসে কি হয় তা তোরাই ভালো বুঝবি।

পিসিমা আর অপেক্ষা করলেন না। খবরটা আরও কয়েক বাড়ি দিতে হবে, বললেন, যাই, মাধবীকে স্নেহকে গীতাকে বলে আসি খবরটা। শুনে তারাও তোমার মতই খুশি হবে।

আশপাশের কয়েকটা বাড়ি ঘুরে অবশেষে তিনি এসে পৌঁছলেন হেমাঙ্গিনীর কাছে। হেমাঙ্গিনী বারান্দায় বসে আছে বিষণ্ণ মুখে।

ঢুকেই বললেন, ওকি হেম। তোমারও কি ওই দশা? হরিশঙ্কর চলে গেল বলে তোমার মুখ ভার? ওদিকে দেখ গিয়ে কদমকে, সেও বসে আছে তোমার মত মুখ করে।

—কেন, তার কি হল?

—কী না হল, বলো। কোলের ছেলেটিকে বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, অত রাতে এলি, একটা দিন থেকে যা। এতদিন পরে তোকে পেল মেয়েটা, দু-দণ্ড তোর গায়ের তাপটা তার সারা অঙ্গে মাখতে দে। না, ভোরে উঠেই দৌড়।

—কিছু বুঝলাম না, পিসিমা।

—আমরাই কি কিছু বুঝলাম ছাই। তাদের মতিগতি কে বুঝবে বলো। এলি অতরাত করে, আর-একটা রাত থেকে যা।

একটু থেমে পিসিমা গলার স্বর নামিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন, বললেন, এসেছিল কাল রাতে। রাতটা কাটিয়েই ভোর হতে-না-হতেই ছুট। কি নাকি কাজ আছে। কাজ তো খুব জানি। আবার কোনো বাড়িতে রাত কাটাতে ছোটা। কুলীনের তো প্রাণ নেই, আছে শুধু ইয়ে।

এতক্ষণে ভালোমত বুঝতে পারল হেমাঙ্গিনী, বলল, ওঃ, এসেছিল বুঝি জামাই?

—হ্যাঁ। দয়া হয়েছিল তার।

—কদম তবে আজ খুব খুশি নিশ্চয়? আহা বেচারী।

পিসিমা বললেন, গোমরা মুখ করে বসে আছে। মুখ গোমরা হবে না কেন বলো। ফুলের মধু লুঠেই তুই দৌড় মারবি। একটু আঘ্রাণ নে, মালা করে গলায় একটু জড়া। তবে না ফুলের মর্যাদা হল, কি বলো।

—তা তো বটেই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির হয়ে এবার বসে পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, এত সমারোহ কিসের আজ তোমাদের এদিকে। ভাঙা গির্জেটার কাছে লোক গিসগিস করছে। পালকিতে-পালকিবেহারায়-ঘোড়সওয়ারে পথঘাট একেবারে ভরা।

—কি নাকি নাচগান হবে ফিরিঙ্গিদের।

—সাবধানে থেকো বাছা। মদ গিলে ওরা মানুষ থাকে না। তবু রক্ষে, ওরা নিজেদের মাগীদের নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে, তাদের নিয়েই মত্ত থাকবে। নইলে—

পিসিমা বসে রইলেন অনেকক্ষণ। পিসিমাকে পেয়ে হেমাঙ্গিনীরও ভালো লাগছে। এতক্ষণ একা থেকে প্রাণ অস্থির করে উঠেছিল।

পিসিমা বললেন, আমারও তাড়া নাই কোনো। আজ একাদশী।

হেম অমনি জিজ্ঞাসা করল, পূর্ণিমার আর তো দিন-চারেক বাকি?

পিসিমা আঙুল গুনে হিসাব করে বললেন, মাঝে তিন দিন আছে—মঙ্গল বুধ বেস্পতি। আজ সোমবার, শুক্কুরবারে রাস।

—নির্বিঘ্নে কেটে যায় দিনটা, তবেই বাঁচি।

—কাটবে বই-কি বাছা, কাটবে। কোনো চিন্তা কোরো না।

—এতটা নদীপথ। সঙ্গে কচি মেয়ে। পথে ডাকাতের ভয়।

পিসিমা একটু ভাবলেন, বললেন, ওই পাঁচু সর্দারকে যা ভয়। কিন্তু বিশু-ডাকতের কাছে ও কাবু। দিক তো কেউ কোনো মেয়ের গায়ে হাত, বিশু তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর, কি জান বউ, এ-নদীর দুই পার বিশুর দখলে। কোনো ভয় নেই। তোমার-আমার শত্রু ও নয়, ও হচ্ছে শত্রুর যম।

গলা নামিয়ে পিসিমা বললেন, বিপদে পড়লে খবর দিয়ো ওকে, দেখবে তোমার বিপদ উদ্ধার করে দিয়েই উধাও হয়ে যাবে।

—কী যে বলেন! তাকে আমি খবর দেব, সে বুকের পাটা কি আমার আছে? খবর দেওয়ার মত কি লোকই আছে আমার?

—লোকের অভাব কি। নিতাই-ডুবুরি কুয়ো ঝালতে আসে না? মাধু-ঘরামি রান্নাঘর-গোয়ালঘর ছাইতে আসে না? ওদের বলে দিলেই ওরা চেষ্টা করে পৌঁছে দেবে খবর।

একটু শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, ওরা বুঝি বিশু-ডাকাতের লোক?

—তা হবে কেন। ওরা বিশুর কেউ নয়, বিশুই ওদের লোক।

পিসিমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে হেমাঙ্গিনী তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, কদমকে একবার আসতে বলবেন। তার মুখ থেকে শুনব কাল রাত্রের কাহিনী।

—বলব আসতে। কিন্তু কী আর শুনবে তার মুখে?

যা-যা শুনবে না, সেইসব কাহিনী ধীরে ধীরে বর্ণনা করলেন পিসিমা। অনেক আক্ষেপ দিয়ে, অনেক বেদনা দিয়ে, এবং অনেক হাহাকার দিয়ে রচনা করা সে কাহিনী। কদমের জবানিতে পিসিমা বুঝি তাঁর নিজের জীবনের বেদনার কাহিনীই বলে গেলেন এই বারান্দায় বসে।

পিসিমার চোখের জলের সঙ্গে হেমাঙ্গিনীও চোখের জল ফেলল। তার চোখে জল আসার কোনো হেতু নেই। পিসিমাদের মত জীবন তার নয়। সে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে ঘর করছে। তার চোখের জলের কারণ অন্য। তার চোখের জলের কারণ তার কন্যা। অনেকদিন আগে এই বংশে একটা মর্মঘাতী কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, সে ঘটনাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেউ করছে না বটে, সে ঘটনা ভুলে থাকার জন্যেই সকলে প্রস্তুত বটে, কিন্তু তাই বলে তা মুছে যাবার কথা তো নয়। গাদি-বিবির ঘটনার মতই মুখরোচক ঘটনা সেটা, কিন্তু পল্লীর মানুষ বুঝি একটু বুঝদার, তাই তারা গাঁদি-বিবির কথা মাঝে-সাঝে তুললেও সে ঘটনাটার কথা উল্লেখ করে না।

সেই বংশের মেয়েই যে রাধা, এইজন্যে রাধাকে নিয়ে বড আতঙ্ক।

—ভেবো না বউ। তোমার মেয়ে রাইরাজা হয়েছে, তোমার মেয়ে রাজরানী হবে।

—আশীর্বাদ করুন পিসিমা।

পিসিমা আশীর্বাদ করে উঠছিলেন, আবার বসে বললেন, কী ভুলই করেছি। বাবাও কি ভুলই করে গেছেন। ঐ চিতার আগুনে পুড়ে মরাই ভালো ছিল বউ। এখানে দগ্ধে-দগ্ধে মরছি। যাই, এই ছেলেটাকে নিয়ে না এলে আর-একটু বসতাম। একে এখন নাওয়াতে-খাওয়াতে হবে, বেলা হয়েছে। চলি। হ্যা, নিশ্চয়। কদমকে বলব আসতে। কিন্তু মেয়েটার মন বড খারাপ।

—তা, খারাপ তো হবেই। এতদিন পরে এসে দুটো দিন অন্তত থেকে যাওয়া উচিত ছিল জামাইয়ের।

কিন্তু তাদের কৌলীন্য আছে। সাধারণ মানুষের মত সব উচিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব না, এই কথাটা ভুলে গেছে বুঝি হেমাঙ্গিনী।

ভাঙা নাটমঞ্চে সারাদিন ধরে গীতবাদ্য চলছে. তার শব্দ একটু-একটু আসছে এখানেও। সেই শব্দে কান পাতে হেমাঙ্গিনী, আর অশ্বক্ষুরের চকিত শব্দে চমকে ওঠে এক-একবার।

সেদিন ঐ যে কদমের পিছু নিয়েছিল একটা ফিরিঙ্গি, আজকে সে আবার কদমকে খুঁজতে খিড়কির দরজায় এসে উঁকি না দেয়, এই রকম ভয় নিয়ে বসে রইল হেমাঙ্গিনী।

এখানে বসে হেমাঙ্গিনী নানা কথা ভাবছে। এই বংশের সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনার কথা আর নিতাই-ডুবুরি ও মাধু-ঘরামির কথা, সেই সময়ে সুখসাগরের ঘাটে নৌকো বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ। ব্রাহ্মণীতলার জঙ্গলে কয়েকদিন ধরে মহা উৎসব চলল, সে উৎসব শেষ হয়েছে। বিশ্বনাথের চোখে-মুখে বুঝি একটু ক্লান্তিই লেগে আছে।

তার চর ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, তাকে ধরার জন্যে কোন্ দিকে কি আয়োজন চলেছে, নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়টের সঙ্গে পাঁচুর ষড়যন্ত্র এগিয়েছে কতটা, এলিয়ট সাহেবের দোস্ত কৃষ্ণনগরের নীল-কুঠিয়াল ফ্যাডি সাহেবের টাকাকড়ি যাতায়াত করছে কোন্ পথে ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ত খবর এসে পৌঁছচ্ছে বিশ্বনাথের কাছে। বিশ্বনাথ বসে বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে চারি দিকের বিবরণ শোনে আর মাঝেমাঝে তার ভ্রূ দুটো একটু কুঁচকে ওঠে।

সন্ন্যাসী এসে খবর দিল, আজ মস্ত খবর আছে, ওস্তাদ।

—কি খবর?

—আজ বিকেলের দিকে কলকাতা থেকে বিস্তর মোহর যাচ্ছে বলাগড়-কুঠিতে।

কথাটা শুনে বিশ্বনাথ এতটুকু উত্তেজিত হল না, একটু নড়লও না। ধীরে ধীরে নলের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। বলল, অন্য খবর দ্যাখো। বলিনি, বলাগড়ে আমরা আমাদের দাপট দেখাতে চাই না, দাপট দেখাবার অনেক জায়গা আছে?

—কিন্তু ওখানকার কুর্টিস সায়েবের দাপট কিন্তু ভারী।

—হোক। বলাগড়ের উপর কেউ হামলা করতে আসছে কিনা সেই খোঁজ নাও। কুর্টিস সায়েব কড়া লোক হলেও ওর কলিজা আছে, দিল্‌ও বড় ভারী।

এতবড় একটা মওকা ছেড়ে দিতে চাচ্ছে কেন বিশ্বনাথ সে কথা বুঝতে না পেরে সন্ন্যাসী তার মুখের দিকে তাকাল। যেন খোলসা করে সে জানতে চাইল এর কারণ।

বেশি কথা বলা অভ্যাস নয় বিশ্বনাথের, তবু সন্ন্যাসীর আগ্রহকে দেখে একটু আভাস দিল মাত্র।—গাঙের জলে ভেসে যাচ্ছিল যে, তাকে ডাঙায় তুলে

নিজের কাছে ঠাই দিয়েছে, এমন যার দিল্ তাকে ঘা দিতে নেই রে, সন্ন্যাসী। ঘা দিবি কাকে! মেয়েলি ভাষায় যাকে বলে ঠেকার দেমাক গিদের— সেইসব দম্ভ নিয়ে যারা ঘোরে, ঘা দে তাদের। ঘা দে ঐ কেষ্টনগরের ফ্যাডি সায়েবকে, ম্যাজিস্ট্রেটের ইয়ার ব'লে মনে করেছে বাংলা-মুলুকে বাঘ নেই, সবই বুঝি বুনো-হাঁস। জলায় নেমে গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজ ক'রে যারা পাখি মেরে শিকার করে তারা কখনো মানুষ না। ঐ অমানুষদের মার্, সন্ন্যাসী।

তা যদি হুকুম, তাই হবে তবে। ফ্যাডির উপরেই যদি বিশ্বনাথের তাক্, তাহলে সেই খবর নেবার জন্যে এবার তৈরি হতে হয়।

এখান থেকে নৌকো ভাসিয়ে ভাসিয়ে চূর্ণী-নদীর জলে চলে যায় বিশ্বনাথ, নদীই তার ঘরবাড়ি বটে, কিন্তু অন্য ঘরবাড়িও তার আছে। একটি হচ্ছে গাডরাভাতছালা, আর-একটি দিগ্‌নগরের ইটুলে গাঁ। সেখানে সে যায় বটে, কিন্তু এখন যাওয়া বড় অসুবিধে। কোম্পানি তার পিছনে খুবই লেগেছে। এই বিপদ না কাটা পর্যন্ত তার শান্তি নাই। কিন্তু আসলে কোম্পানিকে সে তেমন ডরায় না, কোম্পানির ঘাড়ে কয়টা মাথা যে তার সঙ্গে পেরে উঠবে। কিন্তু ঐ পাঁচুর শয়তানি, আর— পরিতাপেরই কথা— বৈদ্যনাথও যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। ধর্মপুত্র করে নিয়ে যাকে সে লালন-পালন করল সেই বৈদ্যনাথ শেষে হল কি না তার দুশমন। বৈদ্যনাথও এখন গোয়েন্দা, বিশ্বনাথের সব আড্ডাই তার জানা, সুতরাং সুখসাগরে নূতন ঘাঁটি নিতে হয়েছে তাকে।

সারাদিন বিশ্বনাথ নৌকোতে কাটায়, রাত্রি নামলে পান্সীর লগি নিয়ে তার গিঁটে পা দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে কখনো দেখা করে আসে মায়ের সঙ্গে, কখনো বা ইটুলে গাঁয়ে গিয়ে—

মা বলে, বিয়ে কর্, বিশু। সেই কবে ছেলে হতে গিয়ে বউ মরল, আর বিয়ে করলি নে। বৈদ্যনাথকে মানুষ করলি, ছেলের মতন পালন করলি— এখন সে পাঁচুর সঙ্গে মিশে হল কোম্পানির গোয়েন্দা। ছেড়ে দে এ ব্যবসা, চাষ-আবাদে মন দে। আবার বিয়ে দিই তোকে। যদি চাস, ইটুলের ঐ মেয়েটাকেই বিয়ে কর্। ঘর-সংসার পাত্। বনে-বাদাড়ে ঘুরে-ঘুরে কেন এসব করছিস।

—কেন, তা জানি না, মা। কিন্তু যাদের অনেক টাকা তাদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিতে না পারলে আমার শান্তি নেই। যা লুঠি তা কি পুঁজি করি? তোমার বিশু লাখটাকা লুঠ করেও যে-ফকির সেই-ফকির।

বিশুকে কি আর জানেন না তার মা ? জানেন।

বিশু একটু পরে বলল, আমার এই বিপদটা কেটে যাক, তারপর শুনব তোমার কথা। কোম্পানি আমার শত্রু, তাকে ভয় হয়তো করি, কিন্তু ঘেন্না করি নে। কিন্তু ঘেন্না হয় কার উপর জান মা ?

—কার কথা বলছিস ?

—বৈষ্ণনাথের কথা। গোয়ালা-জাতটার উপরেই ঘেন্না ধরিয়ে দিল ও। ওকে পুষলাম, পাললাম, আমার নাড়িনক্ষত্রের খবর জানালাম, সঙ্গেসঙ্গে নিয়ে ঘুরলাম। এখন ও হল কোম্পানির চর। আমাকে ধরিয়ে দিয়ে ও বুঝি মোটা বকশিশ চায়। আমার কাছে চাইলে আমিও তো দিতে পারি—একদিনের লুঠের সব টাকা। সোনার মোহর দিয়ে ওকে কবর দিয়ে দিতে পারি।

মা বলল, কার উপর রাগ করছিস। সে কি মানুষ ? কালকেউটে। তোর দুধকলা খেয়ে তোকেই দংশন করতে চাচ্ছে।

ডাকাত-বিশুর চোখ ছলছল করে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, একদিনে খতম করে দিতে পারি ওকে, কিন্তু মায়া হয়— কাঁধে-পিঠে নিয়ে মানুষ করেছি, মনে পড়ে যায় সেই কথা।

গভীর রাত্রে গাডরাভাতছালার কুঁড়ে ঘরে বসে মেটে তেলের আলোয় মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে বিশ্বনাথ। চল্লিশের উপর বয়স হয়েছে এখন তার, তবু মায়ের সামনে বসে সে যেন শিশু হয়ে গিয়েছে।

মাথায় হাত বুলিয়ে মা তাকে স্নেহ জানিয়ে বললেন, বিপদটা কাটিয়ে তোল। তোকে বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘর করি। ইট্‌লেতে পড়ে আছে ও—কেন ফেলে রেখেছিস, বিয়ে করে নিয়ে আয় ঘরে।

—আনব মা আনব। যদি সুদিন পাই, তোমার সব ইচ্ছে পূর্ণ করবে তোমার বিশ্বনাথ।

পুব দিকে আলো যেন চমকে উঠছে, গাছে-গাছে পাখা ঝাপটাচ্ছে পাখি, রাত শেষ হয়ে এল বুঝি। তবে আর না, আর এখানে থাকা নিরাপদ না।

চতুর্দশীর চাঁদ পশ্চিম-আকাশে ঢলে পড়েছে। ঘনবনের আড়ালে সে প্রায় অদৃশ্য।

মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়ল বিশ্বনাথ। তারপর রণপা চেপে নদীর দিকে রওনা হল, নদীর কিনার ধরে তীর বেগে ছুটে

চলল একটা সুদীর্ঘ ছায়া। মনে হয়, কলকাতার কুমারটুলির গোবিন্দমিত্তিরের নবরত্ন মন্দিরের চুড়ার সমান উঁচু ওই ছায়া।

ক্রমে ধূসর হতে হতে মিলিয়ে গেল ছায়াটি।

চতুর্দশীর ভোর শেষ হল। পূর্ণিমা এসে উপস্থিত হল বাংলার আকাশে।

ঢাকার জন্মাষ্টমী, বৃন্দাবনের ঝুলন, আর শান্তিপুরের রাস— এ তিন ভুবনে এই তিন উৎসবের তুলনা নেই। প্রায় শতবর্ষ আগে শান্তিপুরের খাঁচৌধুরী-বংশের চারি ভ্রাতা রামগোপাল রামজীবন রামচরণ ও রামভদ্র এই উৎসব ও মেলার প্রবর্তন করেন, এই কাজে তাঁদের সহায়তা করেন গোপীকান্ত দেব। এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামচাঁদের মন্দির, মন্দিরটির কাজ শেষ হবার পর-বছরই রাজপথে শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত হয়।

তারপর ধীরে ধীরে কত বৎসর গত হল। যতই দিন যায় ততই এই উৎসবের সমারোহ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

কালনা কাটোয়া কৃষ্ণনগর কলকাতা হুগলী চুঁচুড়া শ্রীরামপুর নবদ্বীপ এবং সুদূর মণিপুর— কত নাম করা যায়— সব জায়গা থেকে নারীপুরুষ-বৃদ্ধযুবা নির্বিশেষে হাজার-হাজার মানুষ শান্তিপুরে সমাগত হয়েছে। সমস্ত দিক আনন্দে মত্ত, সকলের চোখে-মুখে উৎসবের উল্লাস। সকলেরই অন্তঃপুর-কপাট ও হৃদয়-কপাট আজ উন্মুক্ত। রাসের এই উৎসবে চতুর্দিকে রসের ছড়াছড়ি।

শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন দিকে— এ একটা ঐতিহাসিক তথ্য বটে, কিন্তু অদ্বৈতমঙ্গলের সে উক্তি এখন খাটে না। এখন গঙ্গা মাত্র এর একদিকে বহতা, এর দক্ষিণ দিকে। সেই গঙ্গার পূতসলিলে পুণ্যবতী হয়ে উঠেছে হয়তো এ জনপদ। পুণ্যের এই নিকেতন কেবল নামসংকীর্তন ও সাধনভজন নিয়েই দিনযাপন করে না, কোম্পানির দৌলতে এখানকার তন্তুবায়দের ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত বছর এখান থেকে কোম্পানির কমার্শিয়াল এজেন্ট যে-মসলিন বিলাতে প্রেরণ করেন তার মূল্য নাকি দেড় লক্ষ পাউণ্ড। ইংলণ্ডীয়গণের মধ্যে ঐ সময় আলোড়ন উপস্থিত হয়— ভারতের ন্যায় এইরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র কিভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে, ইংলণ্ডবাসী সে-বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন।

পলাশি-যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সারা বাংলাদেশে তার আধিপত্য দৃঢ়মূল করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। যাবতীয় বিষয়েই এখন কোম্পানি সর্বেসর্বা। কিন্তু বাংলাদেশের যেসব জিলা তার করায়ত্ত সেইসব জিলার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থার উপর আধিপত্য-বিস্তারের উপযোগী শাসনপ্রণালী গড়ে তুলতে পারেনি কোম্পানি। এই কারণে প্রত্যেক জিলার অধিপতি নিজের নিজের গোয়েন্দা-পুলিশবাহিনী ও নিজের নিজের দেওয়ানি আদালত পরিচালনা করে চলেছেন। অথচ, এই ব্যবস্থার আশুপরির্তন কোম্পানির কাম্য। ধীরে ধীরে জিলার যাবতীয় কার্যের উপর হস্তক্ষেপেব প্রণালী উদ্ভাবন করার দিকে কোম্পানি তাই মনোযোগ দিয়েছেন।

কোম্পানির এই মনোযোগের ফলে গত মাসে নদীয়ার উখরা পরগনা নিলাম হয়ে গেছে, এবং নদীয়া-রাজ গিরীশচন্দ্রের সমস্ত জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গেছে। যে জমিদারী চৌরাশী পরগনায় বিভক্ত ছিল, এবং ক্রমশ পাঁচ-সাতখানি পরগনায় এসে পৌছেছিল, এই বছর— অর্থাৎ ১৮০৬ সালের সেপ্টেম্বরে— সেই সমস্ত পরগনা নদীয়া-রাজের হস্তচ্যুত হয়ে গেল।

রাসের উৎসব রসেরই উৎসব। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে উৎসবে যোগ দেবার জন্যে বহু মানুষের সমাগম ঘটেছে এখানে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের মনে একটু খেদ ও সামান্য বিষাদেব চিহ্ন যেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শান্তিপুরের মনে আজ একটু অশান্তি।

কিন্তু অশান্তির মধ্যে সান্ত্বনা দানের জন্যেও কোম্পানির ব্যগ্রতা কম নয়। রাসের কয়েক সপ্তাহ আগে এখানে দেশী মদের ভাঁটি স্থাপন করলেন কোম্পানির কমার্শিয়াল এজেণ্ট। রাসের শান্তিপুরে রসের জোগান পাওয়া গেল নতুন করে।

খেয়া পার হয়ে দলে-দলে উৎসবার্থীরা এখনো এসে পৌছচ্ছে। সেই ভিড়ের সঙ্গে এসে পৌছচ্ছে নানাবয়সী বারাঙ্গনা। গঙ্গার কিনার-বরাবর সোজা সড়কের উপর ছাউনি পড়েছে, সেখানে আস্তানা নিচ্ছে তারা।

সারা পল্লীর প্রাণে সাড়া এসে গেছে। দলে-দলে মেয়েরা গলা-ধরাধরি করে পথের পাশে দাঁড়িয়ে মিশি-মাখা দাঁত দিয়ে পরিষ্কার হাসি হাসছে— এরা বারাঙ্গনা নয়, এরা বরাঙ্গনা। কিন্তু এই উৎসবের দিনে অন্তর-কপাটের সঙ্গে অন্দর-কপাটও উন্মুক্ত করে দিয়েছে তারা।

শান্তিপুর বুঝি আজ একটি পরিপূর্ণ মৌচাক। তার কোষে-কোষে মধু সঞ্চিত। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে মেয়েরা স্বাস্থ্যের প্রচুর পসরা।

নিয়ে খিলখিল শব্দে হাসছে। সে-হাসির সঙ্গে অন্য কারো হাসি-বিনিময় হোক কি না-হোক, সে দিকে যেন মন নেই তাদের। তারা নিজেদের নবযৌবনের রসে রসিত, রাসের এই পর্বে তারা সেই রসের অন্তত কিছুটা উপঢৌকন যেন দিতে চায় এই পথের ধূলাকেই।

ধূলো-মুঠিও তাই সোনা হয়ে উঠল আজ। এই ধূলি সারা অঙ্গে মেখে নিজেকে স্বর্ণরেণু-ভূষিত করার জন্যে বুঝি ব্যগ্রতা চার দিকে।

রাস্তার ধারে কিছু তফাতে-তফাতে ফরাস পাতা হয়েছে। সারা গায়ে চুন-মাখা চালকুমড়োর মত ধবধবে সাদা তাকিয়া একা-একা পড়ে আছে সেইসব ফরাসের উপর। বাঁশের খুঁটি গেড়ে তার উপর কাঠের মস্ত চৌকি বসানো হয়েছে, তার উপর গদি বিছিয়ে চাদর পেতে তৈরি হয়েছে এই ফরাস। দিনের রোদ ও রাতের শিশিরের হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে তার উপর তোলা হয়েছে শৌখিন চাঁদোয়া।

সারা নগর প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে শোভাযাত্রা। এইজন্যে বৃত্তাকার রাস্তার প্রায় সর্বত্র দর্শনার্থীদের জন্যে এই বন্দোবস্ত। অবশ্য সাধারণ মানুষদের জন্যে এ আয়োজন নয়, এ আয়োজন বড বড খানদানী জায়গা থেকে আসা শৌখিন বাবুদের জন্যে। যারা সাধারণ, তাদের জন্যে এ অসাধারণ বন্দোবস্ত হবে কেন, তারা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, গাছের গুঁড়ির উপর ভর দিয়ে, কিংবা পথিপার্শ্বের দোকানের ঝাঁপের নীচে মাথা রেখে শোভাযাত্রা দেখবে।

দোকান বসেছে কাতারে-কাতারে— অনন্ত অগুন্তি। কত খাবারের দোকান। যত দোকান, তার চেয়েও বেশি মাছি— তারা ভনভন শব্দে উড়ে-উড়ে খাবারের অঙ্গ থেকে বুঝি মধু লুঠ করছে। কত খাবার— রসকরা ক্ষীরপুলি বাদামতক্তা ছানাবড়া সরভাজা গজা বরফী বুন্দে।

সারারাত বেচাকেনা হবে আজ। ওদিকের ঐ গঙ্গার কিনারের নতুন বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি ছাউনি থেকে আরম্ভ ক'রে এইসব মিষ্টান্নালয় পর্যন্ত।

প্রত্যেকটি পল্লীই আজ আনন্দে মুখর। গোঁসাইপল্লী থেকে আরম্ভ করে বেড়পল্লী পর্যন্ত সকলে। কিন্তু বড়গোঁসাই-পাড়া মদনগোপালগোঁসাই-পাড়া ও হাটখোলাগোঁসাই-পাড়াতেই আনন্দের মাত্রা বুঝি বেশি। সেখানে সাজ-সাজ রব। বিরাট-বিরাট চত্বরে মেলা করে বসেছে ঢাকীর দল, হাওদার বেহারারা কাঁধে গামছা নিয়ে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ওদিকে বিগ্রহের হাওদা সাজাচ্ছেন পুরোহিতেরা, রাইরাজার হাওদা সাজাচ্ছে

মালাকরে— অন্দরে-অন্দরে রাইরাজাদের পরিচর্যায় রত হয়ে আছেন পুরস্ত্রীরা। তাদের সাজাবার জন্যে কাজল পাড়া হচ্ছে রুপোর কাজললতায়, টিপ পরাবার জন্যে কুঙ্কুম তৈরি হচ্ছে। বালকবালিকা সাজবে যেসব ছোকরা তারা নহবৎখানার পাশে বসে মুখে রঙ মাখার জন্যে রঙ গুলছে। সঙ যারা সাজবে তারা তাদের রকমারি আর ঝকমারি সাজ নিয়ে বড় বিব্রত। বাইরের বিশাল উঠোনে-উঠোনে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাওদা অপেক্ষা করে বসে আছে রাত্রের সওয়ারির জন্যে।

তিলিপাড়া বেজপাড়া কাশ্যপপাড়া দত্তপাড়া ডাবরিয়া-পাড়া— সব পল্লীই আজ আনন্দের উৎসবে যোগ দিয়ে বসে আছে নিজনিজ অন্দরে।

কোম্পানি যে গিরীশচন্দ্রের জমিদারি লুঠ করে নিয়েছে, সেজন্যে কোম্পানির উপরে রাগ কমে গেছে। কোম্পানির সুখ্যাতিই এখন গাইছে সকলে। হুগলী থেকে কলকাতা থেকে যেসব বাবুরা এসেছেন তাঁরা তো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি ও রাণ্ডি, তাঁদের আর অসুবিধে কি। কিন্তু যাদের অমন মেগদার নাই তাদের কথা ভাবে কে। কোম্পানি এবার তাদের মুখের দিকে চেয়েছেন।

গঙ্গার কিনারের নতুন ছাউনিগুলো পার হয়ে গেলেই নতুন ভাটিখানাটি। ব্রহ্মতলার কাছাকাছি। দিনের বেলায়ই ঐ রাস্তায় লোকের ভিড় জমে গেছে। কিন্তু চাক বেঁধে যায় নি এখন, এখন ঐ জনস্রোত গঙ্গার জলস্রোতের মত তিরতির করে বয়ে চলেছে। দিনের রৌদ্রে থামতে পারে না ঐ স্রোত, রাত্রের জ্যোৎস্নায় হয়তো থমকে থেমে যাবে। রাসের রাত্রে রসের অভাব হবে না কোনো।

চাঁদোয়া-আচ্ছাদিত ফরাসের অধিকারীরাও এসে পৌছে গেছেন। কলকাতা থেকে এসেছেন বিখ্যাত আট বাবু— হাটখোলার তনুবাবু এসেছেন এই আট জনের মধ্যে একজন হয়ে নয়, ঐ আট জনের মধ্যে প্রথম হয়ে— বাবুয়ানিতে তাঁর জুড়ি নেই ; বাগবাজারের গোকুল মিত্র, শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ, ছাতুবাবু, লাটুবাবু, পোস্তার রাজা সুখময়, চুঁচুড়ার বাবু নীলমণি হালদার ও পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ। বিকেল থেকেই তাঁরা নিজনিজ ফরাসে বসে আসর উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তাঁদের আশে-পাশে তাঁদের ইয়ারবন্ধুরা আছেন এবং আছেন গাইয়ে-বাজিয়েরা ও বাদ্যযন্ত্র। নিধুবাবুরও আসার কথা ছিল এঁদের সঙ্গে, কিন্তু আসতে পারেন নি— এই আসরে বসে টপ্পা হবে এই

রকম ইচ্ছে ছিল রাজা সুখময়ের। কিন্তু শরীর অসুস্থ হল নিধুবাবুর, সুখময়ের ইচ্ছে পূর্ণ হল না।

চুঁচুড়া থেকে আরও এসেছেন বিখ্যাত বেনিয়ান রূপচরণ রায়, দেওয়ান মধুমোহন সেন, নবকিশোর মিত্র। হুগলী শ্রীরামপুর চন্দননগর থেকে এসেছেন অনেকে, তার মধ্যে শ্রীরামপুরের যুগল আঢ্যের জাঁক একটু বেশি।

বিকেল হয়েছে, এখনো মানুষ আসার বিরাম নাই শান্তিপুরে। বক্তারের ঘাট পার হয়ে নবদ্বীপ থেকে এখনো দলেদলে ন্যাড়ানেড়ি এসে উপস্থিত হচ্ছে এখানে। মহম্মদ বক্তিয়ার গত হয়েছে সেই কবে, তবুও স্থানীয় লোক তার নামটি ভুলে যায় নি, ইতিমধ্যে ছয়-সাত শ বছর গত হয়েছে তবুও ঐ ঘাটটির সঙ্গে যুক্ত রেখেছে ঐ নাম। শান্তিপুর ও বয়ড়ার মাঝামাঝি এই জায়গা থেকে বক্তিয়ার গঙ্গা পার হয়ে অধিকার করেছিল নাকি নবদ্বীপ। সেই বক্তারের ঘাটও আজ লোকে পরিপূর্ণ— শান্তিপুরের রাসে এসে জড়ো হবার জন্যে তাদের মধ্যে কত তাড়া।

লোকে লোকারণ্য আজ শান্তিপুর। প্রতি অলিতে-গলিতে যাত্রীর কলরব। পুকুরপাড়ে দুর্গন্ধের জন্য তিষ্ঠানো দায়। ব্রহ্মতলার পিছনে হাজার-হাজার আমগাছ একত্র হয়ে বিরাট আমবাগান। সে আমবাগানের কিনারে তিল ধারণের স্থান নাই— প্রতিটি গাছের ডালে ভাতের হাঁড়ি ঝুলছে।

পথে-পথে ঐ চলেছে রসের খেঁড়ু। অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে গান গাইতে-গাইতে চলেছে একদল যুবক। ওদের অঙ্গের ঐ ভঙ্গি ও গানের ঐ ভাষা একত্র মিশে এক অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হচ্ছে। কোলের ছেলেটির মাথা আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে তাকে স্তন পান করাতে করাতে এঁটো হাতে ঐ দৃশ্য দেখে খিলখিল করে হাসছে যাত্রীরা। রাস্তার দু-পাশে হাসির খিলখিলানি যতই বেড়ে উঠছে খেঁড়ুর দলে অঙ্গের ভঙ্গি ততই উৎকট হয়ে উঠছে। ওদের তামাশায় যুবতী মেয়েরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, খুশিতে উপচে উঠছে বুঝি ওদের অন্তরাত্মা।

ঐ গানের ভাষা আমরা শুনছি বটে, বুঝছি বটে, কিন্তু এখানে লিখে রাখতে পারছি নে।

ওই ভঙ্গিকে অশ্লীল ও ওই ভাষাকে অশ্রাব্য বলছে না কিন্তু কেউ। সকলের প্রাণেই পুলক দিয়ে চলেছে ওই রসের খেঁড়ু।

সারা পল্লী টহল দিয়ে এসে ভাবরিয়া-পল্লীতে থমকে দাঁড়াল এই দল। পাড়াটা ছোট, কিন্তু বড় দুর্ধর্ষ। অবস্থাপন্ন তাঁতীদের বাস এখানে। কোম্পানির

কমার্শিয়াল এজেণ্টের কল্যাণে বিলাতে চালান দেওয়ার বস্ত্র জোগান দিতে দিতে এদের অবস্থা হালে আরো বড় হয়ে উঠেছে। তিলিপল্লী কাঞ্চপপল্লী পার হয়ে এল এই খেঁড়ু— অঙ্গের ভঙ্গির বাঁধ আর ভাষার আল ভেঙে গেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু কোনো পল্লীর রুচিতে বাধেনি। বেজপল্লীতে বাস করেন বৈদ্যেরা, তাঁদের রুচি আছে বলে খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁরা অতিমাত্রায় ভদ্রলোক, সেইজন্যে খেঁড়ুর গা থেকে সরে গেছেন, কিছু বলেন নি। বেড়পল্লীর মুসলমানেরাও সয়ে গেছে এই উৎকট সঙ, কিন্তু সঙ এসে বাধা পেল তাঁতীদের কাছে—ডাবরিয়ায়।

বাধা দিতে চায় তারা, কিন্তু শান্তিপুরের শান্তি নষ্ট করতে চায় না।

এগিয়ে এসে বাধা দিল হলধর তাঁতী, বলল, ঘরে মাগ নাই, ঘরে বুন নাই, ঘরে মা নাই? অঙ্গের ঐ ভঙ্গি করে হাওয়ার বুকে খোঁচা মারছ যে বড়। ভাগো সব।

মারমুখী হয়ে উঠল খেঁড়ুর দল। তাদের এই আনন্দে বাধা দেবার জন্যে জলধরকে মারতেই উদ্যত হল ঐ সঙ।

হলধর একাই বাধা দিতে পারত কি না, কিংবা তার সঙ্গে তার ছেলেরা এবং পাড়ার আর-পাঁচটা তাঁতী এসে জুটত কি না, সেসব দেখার আগেই হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়াল এক বিরাট মূর্তি। সুদীর্ঘ সেই চেহারা, লোহার মত শক্ত যেন ঐ শরীর।

আশানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আস্ত একটা ঢেঁকি তুলে নিয়ে একাই ইনি তাড়া করে খেদিয়ে দিয়েছেন একটা বড় ডাকাতের দল। হয়তো দলটা ছিল পাঁচু সর্দারের। শূলপি সানা তলোয়ার বর্শা আর বন্দুক নিয়ে এসেছিল ঐ দল। কিন্তু আশানন্দ তাদের নিরাশ করে দিয়েছেন। ঘটনাটা একেবারে টাটকা।

তাই আশানন্দকে দেখা মাত্র খেঁড়ুর দল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। তাদের অঙ্গের ভঙ্গি গেল থেমে, মুখের ভাষা গেল স্তব্ধ হয়ে।

স্থানীয় লোকেরা আশানন্দের উপাধি দিয়েছে— ঢেঁকি। এঁর সাহস বিক্রম শক্তি ও হাতিয়ার স্মরণে রাখার জন্যেই বুঝি এই উপাধি দিয়েছে তারা। তিনি এখন তাই আর মুখোপাধ্যায় বলে চিহ্নিত নন— তিনি এখন আশানন্দ ঢেঁকি। বলা যায় না, এখন তাঁর খ্যাতি নদীয়া-জিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু কালে হয়তো তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে সারা বাংলায়, সকলেই তাঁকে তখন ঐ নামেই হয়তো চিনবে।

হলধরের কাঁধে হাত রেখে আশানন্দ বললেন, সাবাস। ঐ মানুষগুলো সব জন্তু হয়ে গেল নাকি ?

হলধর বলল, ও-কথা বলবেন না দাদাবাবু। জন্তুরাও অমন কাজ কখনো করে না।

হলধরের কথা শুনে খুশি হয়ে আশানন্দ তার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে পুনরায় বললেন, সাবাস।

কাঁধটা ঐ চাপে একটু চিবিয়ে উঠল জলধরের, কিন্তু আশানন্দের কাছ থেকে সাবাস পেয়ে চাগিয়ে উঠল বুঝি বুড়ো হলধরের জীবনের আশা।

খেঁড়ুর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক চলে গেল। ডাবরিয়া-পল্লী তাদের এই কাজের তারিফ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল। তারা স্থির করে ফেলল, এই খেঁড়ু বন্ধ যদি তারা করতে না পারে তাহলে তাদের তাঁতই বন্ধ করে দেবে তারা।

ওদিকে শুঁড়িখানায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। তার পাশের ছাউনিতে-ছাউনিতে কাকলি ও কাঁকনকিঙ্কিণী উঠেছে বেজে। বিস্তর ঢলাঢলি ও তারও বেশি মাতামাতিতে গঙ্গার ঐ কিনার এখন সরগরম। ব্রহ্মতলায় দাঁড়ালেও ওদের কলকণ্ঠ শোনা যায়।

গঙ্গার ধারেই বিরাট বটগাছ। দৈত্যের আঙুলের মত তার শিকড় আঁকড়ে ধরে আছে মাটি। ওখানে এসে বসেছে কয়েকটা বাউলদম্পতি। শিকড়ের উপরে মেলে দিয়েছে আলখাল্লা, মাটি গর্ত করে আগুন জেলে মাটির পাতিলে রাঁধছে খিঁচুড়ি।

বটের শিকড়ের মত কঠিন আঙুল দিয়ে কাকে যেন আঁকড়ে ধরার জন্যে ব্যাকুল ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল যুবা। ইতিউতি তাকাচ্ছে তারা, তাদের চোখমুখে লালসার চিহ্ন।

রায়েদের বাড়িতে গোঁসাইবাড়িতে খাঁচৌধুরী-বাড়িতে নৃত্যগীত চলেছে— ভাড়াকরা নাচিয়ে-গাইয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। কখনো কখনো নহবতের পোঁ উঠছে বেজে।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

চাঁদোয়া-ঢাকা আসরে-আসরে বৈঠক বসে গেছে। কেউ সোনা-বাঁধা কেউ রুপো-বাঁধা গুড়গুড়িতে, কেউ-বা আলবোলায় গুড়ুক-গুড়ুক শব্দে তামাক টানছেন। জরি দিয়ে মোড়া নল রুপোলি সাপের মত বাবুদের হাত পেঁচিয়ে

ধরে আছে। চাঁদির পানের বাটা পাশে রাখা, মাঝে-মাঝে মসলাদার পান মুখে ফেলে মিষ্টিমিষ্টি হাসির সঙ্গে সেগুলো চিবচ্ছেন তাঁরা। ঐ পানের বাটার মতই গোলাকার, কিন্তু চাঁদির নয়, সবাঙ্গ সোনা দিয়ে তৈরি, আস্ত একটি চাঁদ দেখা দিল পুব-আকাশে।

রাসপুর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। সকলে একবার চেয়ে ঐ চাঁদের বদন যেন পরখ করে দেখে নিয়ে তারিফ করতে লাগল তার রূপের।

সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে চাঁদবদনী মেয়েরা। সন্ধ্যার আবছা আলোয় তাদের বদনের রূপ সবটা দেখা গেল না স্পষ্ট করে।

আলোর মালায় সেজে উঠল শান্তিপুর। তার গলায় সে মালা পরল, না, তার নিতম্বে দুলে উঠল চন্দ্রহার? চাঁদের দিকে চেয়ে বলতে ইচ্ছে করে— আজ রাতে আর মালা নয়, আজ রাতে মেখলা। এমন চাঁদ এমন আলো ছড়িয়েছে যে-দেশে সে-দেশে নিতম্বিনীরা গলার হার খুলে শ্রোণীতে দুলিয়ে দিক তা মালার মত। চন্দ্রহারে মণ্ডিত হয়ে উঠুক সমস্ত গুরুনিতম্ব।

শোভাযাত্রা আসতে এখনো কিছু দেরি আছে। আসরে-আসরে টপ্পা বেজে উঠেছে। নিধুবাবু আসতে পারেন নি ব'লে নিধুবাবুর টপ্পা এখানে আসবে না কেন? ভারি গলায় কে যেন গাইছে সেই গান—

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে
আমার স্বভাব এই— তোমা বিনে আর জানি নে।
শ্রীমুখে মধুর হাসি
আমি বড় ভালোবাসি
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসি নে।

ঐ গান শোনার জন্যে চাঁদোয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে গেছে কয়েকটা শ্রীমুখ। তারা গান শুনে হেসে কুটিকুটি। ওই গানে-গানে যে কথা বলা হচ্ছে তা কি তবে সত্যি?— তাদের দেখতে এসেছে বুঝি এই মিনসেরা? কিন্তু চোখের দেখা দেখেই চলে যদি যায়, তবে ঐ আদিখ্যেতার গানে দরকার কি।

কিন্তু বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়ায় না এই যাত্রিনীরা। এখানে তারা এসেছে শুধু আসরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কাটাবার জন্যে নয়। এ ওর শাড়ির খুঁট ধরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল ভিড় ভেদ করে।

প্রত্যেক রাসবাটীর আয়োজন প্রস্তুত। এবার একে-একে বের হবে শোভাযাত্রা। প্রথমে যাবে বড়গোঁসাইদের দল, তারপর অন্যান্য গোঁসাইদের

দল, তারপর খাঁচৌধুরী। শঙ্করবাড়ির দল সব শেষে। তারা নূতন আরম্ভ করেছে এই উৎসব, তাই তাদের স্থান ঐখানেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

সব বাড়ির রাইরাজারাও সুসজ্জিত হয়েছে। তারা বুঝি এক-একটা রাইরাজা না, যেন প্রত্যেকে পূর্ণিমার চাঁদের এক-একটা টুকরো।

শঙ্করবাড়ির মেয়েরা এসেছে পিত্রালয়ে। হীরায়-জহরতে মণ্ডিত তাদের অঙ্গ। কলকাতার হাতিবাগান থেকে ছোটমেয়েও এসেছে। যে দেখছে সেই বলছে, এবার শঙ্করবাড়ির রাইরাজা সব রাজার সেরা রাজা হবে। কথাটা শুনে ছোটমেয়ে মাধবী একটু বাঁকা চোখে তাকাল, তার গায়ে লাগল বুঝি! গত বছর সে যে সেজেছিল রাইরাজা তা কি মনে নেই কারো?

মাধবী বলল, কি রে রাধা, তুই নাকি সব রাজার সেরা হচ্ছিস?

রাধা এখন রাধা না, সে এখন অন্য মানুষ, এখন সে রাইরাজা। তাই বুঝি কথা বলতে নেই। অত যত্ন ক'রে সাজানো হয়েছে তাকে, এখন কোনো কথার মধ্যে গিয়ে তর্ক আরম্ভ করলে মুখে তার ছাপ পড়ে যেতে পারে।

মাধবী আবার কাছে সরে এল তার, আবার বলল, গতবার আমাকে যা দেখতে হয়েছিল, শুনেছি, শান্তিপুরে নাকি কোনোকালে অমনটি হয় নি।

রাধা কিছু বলল না, একবার শুধু তার টানা চোখ-দুটি তুলে তাকাল মাধবীর মুখের দিকে।

মাধবী তার গায়ে একটু ধাক্কা দিয়ে বলল, কই, জিজ্ঞাসা করলি নে তো, কে বলেছে ঐ কথা?

অস্ফুট শব্দে রাধা জিজ্ঞাসা করল, কে বলেছে?

শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল মাধবী, তার কানের ঝুমকো-দুল দুলে উঠল ঐ ঝাঁকিতে, বলল, বুঝতে পারলি নে? যারা ঐসব কথা বলে। দূর্ বোকা, এখনো বুঝতে পারলি নে?

মাধবী ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি-যেন বলল, তারপর আবার বলল, তোমাকেও শুনতে হবে ঐ কথা। আমি শুনছি হাতিবাগানে, তুমি হয়তো শুনবে সিংহবাগানে।

নিজের রসিকতাতে নিজেই হেসে খুন হল মাধবীলতা।

আর দেরি না। বড়গোঁসাইদের শোভাযাত্রা রওনা হয়েছে, এবার তৈরি হতে হয়। রাধাকে এবার গিয়ে বসতে হবে হাওদায়।

কাঁচের গেলাসে লম্বা-লম্বা মোমবাতি জ্বেলে আলোকিত করে তোলা হয়েছে রাধিকা-রাজার হাওদা, তার সম্মুখে বিগ্রহ মদনমোহনের হাওদায়ও অনুরূপ আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির মেয়েরা রাধাকে ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে চলল বাইরের চত্বরে।

বড়গোঁসাইদের শোভাযাত্রা আরম্ভ করেছে। পথে এখন ভিড়ের ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসি। মেয়েপুরুষ সেই চাপে এক হয়ে গিয়েছে। দুই পাশে এই ভিড়, মাঝখানে অপ্রশস্ত রাস্তা। ঐখান দিয়ে যেতে হবে শোভযাত্রাকে। দুই পাশের ভিড় অসম্ভব অবশ্যই, কিন্তু শোভাযাত্রীদের সংখ্যাও সামান্য নয়।

ঐ আসছে। পাঁচ শ ঢাকীর বিরাট এক বাহিনী উৎফুল্ল নৃত্য করতে করতে দৌড়ে-দৌড়ে আসছে, তাদের পিছনে প্রায় চার শ বাঁশিওয়ালা— সুদীর্ঘ বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে আসছে ঐ বংশীবাদকেরা। তার পিছনে স্বর্ণরৌপ্য খচিত বিগ্রহের বিরাট হাওদা আলোয় আলোময়। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ঐ হাওদা— চৌষট্টি বেহারার স্কন্ধে চেপে চলেছেন ঐ বিগ্রহ। তারপর বিরাট থাকা— পুতুল দিয়ে তৈরি একটি রাজসভা, আশাসোটাধারী পাইক। এবার এল চৌষট্টি বেহারার স্কন্ধে বিরাট একটি হাওদা— উপরে আলোর মালার মধ্যে ব'সে কে?

সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, রাইরাজা। রাইরাজা। গোঁসাই-বাড়ির রাইরাজা।

ধীরে ধীরে এল বালকবালিকার হাওদা। বত্রিশ বেহারা বহন করে নিয়ে আসছে ঐ হাওদা। হাওদার উপরে নৃত্য করছে দুটি কচি ছেলে, ওর মধ্যে একজন সেজেছে মেয়ে— হাত ধরাধরি ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুজনে শরীর পাশাপাশি দোলাচ্ছে ও পা আছড়াচ্ছে।

তারপর এল ময়ূরপঙ্খী— তার উপর নর্তকনর্তকীরা নানা প্রকার নৃত্য দ্বারা দর্শকদের পুলকিত ও রোমাঞ্চিত করতে লাগল।

পুতুলের মিছিল চলল তারপর, গো-গাড়িতে করে ধীরে ধীরে এই পৌত্তলিক শোভাযাত্রা চলল। ইন্দ্রের সভা, রাবণের সীতাহরণ, লবকুশের রামায়ণগান ইত্যাদি এই মূর্তির দ্বারা অভিব্যক্ত।

সব শেষে গো-গাড়িতে চেপে এল বাউল, উঁচু বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে। তাদের মুখে স্বরচিত গান, সামাজিক রাজনৈতিক পারিবারিক বিভ্রাট

নিয়ে তৈরি এইসব গান, চারদিকে চেয়ে-চেয়ে নেচে-নেচে তারা গাইতে লাগল—

বাবুরা নিদ্রাহারা
ব্রহ্মতলায় জল উঠেছে, মাথায় যেন ঝুলছে খাঁড়া।
দাঁড়া রে একটু দাঁড়া, বাবুদের শুধাই তবে—
ব্রহ্মতলা ডুবলে দেশের দশাটি কি হবে, বাবু।

বাবুরা হেসে আকুল। পাঁচ-ছয় বছর আগের সেই বিশাল জলস্ফীতির কথা বলছে এরা, যে-বান এসে গৌরহাটির কিনারে একটি জলচিতা নিভিয়ে দিয়েছিল, সেই বানের উচ্ছ্বাস এতদূর পর্যন্ত এসে কিনার ছাপিয়ে উঠে পড়েছিল ব্রহ্মতলা পর্যন্ত। শান্তিপুরের ইতিহাসে সে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। অনেকবার বান এসেছে, অনেক রকমের বিপর্যয় ঘটেছে, কিন্তু ব্রহ্মতলা পর্যন্ত জল আগে কখনো ওঠেনি।

এইজন্যে এ-ঘটনাকে এখানকার মানুষ একটি অশুভ ঘটনা বলে মনে করেছে। এইজন্যেই আজ এদের মুখে বেজে উঠেছে ওই গান।

অন্যান্য বাড়ির শোভাযাত্রা এল পর-পর। ঢাকীর সংখ্যা কমে আসতে লাগল ধীরে ধীরে, সেইসঙ্গে বংশীধারীর সংখ্যাও। কিন্তু সকলেরই ঐ একই প্রকারের শোভাযাত্রা— সেই বিগ্রহ, সেই রাইরাজা, সেই বালকবালিকা, সেই ময়ূরপঙ্খী, সেই বাউল।

চাকফেরা-গোস্বামীদের রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের চারিদিকে যুগ্ম গোপ ও গোপী সমূহ পরস্পরের হাত ধ'রে একটি কাষ্ঠচক্রে ঘুরতে ঘুরতে বেহারা-বাহিত হয়ে চলে গেল। একে-একে তাদের অন্যান্য হাওদা আলোকমালায় ভূষিত হয়ে নগরপ্রদক্ষিণে রত হল।

তার পর এল খাঁচৌধুরীদের শোভাযাত্রা।

এক-একটি দল মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে। এতে সময় লাগছে অনেক। রাত্রি গভীর হচ্ছে ক্রমশ। কার্তিকের কুয়াশায় পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু ঐ শোভাযাত্রায় রোশনাইয়ের যে ব্যবস্থা আছে তাতে জ্যোৎস্নার এই ঘাটতি এতটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

রাস্তার ভিড়ও কমে নি। চাঁদোয়ার নীচেও কোনো ক্লান্তির আভাস নেই।

এবার এলেন পটেশ্বরী— রাসকালী। এত বিশাল এই মূর্তি যে, পটেশ্বরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।

মধ্যরাত্রি অতীত হয়ে গিয়েছে। ঢাকীর সংখ্যা যাদের বেশি, সমারোহ যাদের কল্পনাতীত, একে-একে তাদের শোভাযাত্রা চতুর্দিকে শোভা বিতরণ করতে-করতে এগিয়ে গেল।

এবার বুঝি ক্লান্তি এসেছে কারো-কারো চোখে। যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, এবং মাঝে-মাঝে পা বদল করে করে নিচ্ছিল, এবার তারা উবু হয়ে বসে পড়েছে পথের ধারে।

শঙ্করবাড়ির মিছিল আসছে এবার। চল্লিশ বেহারার কাঁধে চেপে এলেন তাদের বিগ্রহ। তার পর পুতুল দিয়ে তৈরি থাকা, তারপর বালকবালিকা, তার পর রাইরাজা।

উঠে দাঁড়াল সকলে। এ একটা পুতুল কিংবা একটা প্রতিমা? কিংবা, কিংবা এ একটা মানুষ?

হাত থেকে নল সরিয়ে রেখে পান চিবনো বন্ধ রেখে স্তম্ভিত চোখে তাকাতে লাগলেন সকলে।

শঙ্করবাড়ি কি ধাপ্পা দিচ্ছে? তাদের ঘরের মেয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে ব'লে নিয়ম কি এভাবে লঙ্ঘন করা উচিত?

ভবানীশঙ্কর বিগ্রহের হাওদায় হাত রেখে সঙ্গেসঙ্গে হেঁটে চলেছেন। হরিশঙ্কর রাইরাজার হাওদায় হাত রেখে চলেছেন। তাঁদের কানে নানারকম বিপরীত মন্তব্য এসে পৌছচ্ছে। কিন্তু কোনো কথায় কান না দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

একেবারে অনড ঐ মূর্তি। চোখের পাতা পডছে কিনা লক্ষ্য করার জন্যে সকলে অপলক চোখে চেয়ে রইল ঐ মূর্তিটির দিকে। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল, কিন্তু না, পাতা তো পডে না। তবে, এ কোনো জীব নয়, এ নিশ্চয় নির্জীব পুতুল। পুতুলই যদি না হবে, এমন রূপের আধার তৈরি হল কি ক'রে। ভগবানের হাতে এমন রূপ সৃষ্টি হয় না, এ নিশ্চয় কোনো মানুষের সৃষ্টি।

চোখের পাতা পড়ে না বলে যারা স্থিরসিদ্ধান্ত করল, তারা বুঝতে পারল না, তাদের অপলক চোখেও পলক পড়েছে। যে মুহূর্তে তাদের চোখের পাতা পড়েছে সেই লহমার মধ্যেই ঐ মূর্তির চোখের পাতা পডাও নিশ্চয় বিচিত্র নয়।

শঙ্করবাড়ির রাইরাজা চলেছে রাস্তার দুই পাশের জনতার মধ্যে বিস্ময়-বৃষ্টি করতে করতে। তার পায়ের কাছে ব'সে গতবছরের রাইরাজা মাধবী একটি চামর দিয়ে বীজন করছে তাকে।

পটেশ্বরীর বিশাল মূর্তিটি সামনের বট গাছটার ডালের জন্যে বাধা পেয়েছে। থেমে গেছে তাই তাদের গতি। পিছনের এই শোভাযাত্রাটিও সেইজন্যে হঠাৎ থেমে গেল।

ঐ ঝাঁকিতে ঈষৎ চমকে উঠল রাধা।

সঙ্গেসঙ্গে উল্লাস করে উঠল জনতা। তারা এবার ধরে ফেলেছে— এ নির্জীব কোনো প্রতিমা নয়, সজীব একটি প্রাণী।

নিজেদের কাছেই নিজেদের বিজয়ী বলে যেন ঘোষণা করে উঠল তারা। তাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কিংবা তাদের সকলকে ধাপ্পা দেওয়া অত সহজ নয়।

চুঁচুড়ার রূপচরণ রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ধন্য। যার মেয়ে ঐ মেয়েটি ধন্য সেই পুরুষ।

চন্দ্রাতপের নীচ থেকে তিনি নেমে এলেন, তাঁর বুঝি ইচ্ছে পদব্রজে এগিয়ে গিয়ে আর-একবার দেখে আসেন শ্বশুরবাড়ির ঐ রাইরাজাটি।

তন্থবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন, সোজা হয়ে উঠে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, পালাচ্ছেন নাকি রায়-মশায়?

—হ্যাঁ। যাই। শেষ হয়ে গেল না?

তন্থবাবু বললেন, শেষ কোথায়? উৎসবের কি শেষ আছে কখনো? যতদিন জীবন ততদিন উৎসব।

রূপচরণ সে কথায় বিশেষ কান করলেন না যেন। মাথায় পাগড়ি-টুপিটা চেপে বসিয়ে নিতে নিতে তিনি এগিয়ে চললেন। সঙ্গেসঙ্গে তটস্থ হয়ে উঠল পেয়াদা বরকন্দাজ চোবদার সোটাবরদার, তারাও চলল তাঁর পিছন-পিছন।

চাঁদোয়া-ঢাকা আসরে-আসরে তখন গান চলেছে, তবলায়-তবলায় বোল বাজছে ও গাইয়েদের গলায় গান।

ওদিকে ডাবরিয়া-পল্লীর দিকে আম্রকুঞ্জে ঘনগাছের অন্তরালে মনিপুরীদের যাত্রা হচ্ছে। তার ভাষা সকলে বুঝতে না পারলেও রামসীতার কাহিনী বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কারো। ব্রহ্মতলার দিকে নতুন বাখারির ছাউনিতে তখন উৎকট প্রমোদ চলেছে।

মধ্যরাত্রের শিশিরে শরীর শিরশির করছে। গঙ্গাকিনারে গিয়ে ঐ প্রমোদলীলা দেখলে শরীর আরো শিউরে উঠবে।

রূপচরণ রায় ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পরে। রাজা সুখময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমন হন্তদন্ত হয়ে কী দেখতে গেলেন রায়-মশায় ?

সংক্ষেপে উত্তর দিলেন রূপচরণ, বললেন, রাইরাজা।

ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর আসর একটু দূরে। নীলমণি হালদার বললেন, হ্যাঁ, দেখার মত জিনিস বটে। আইভরির একটা পুতুল—অবিকল। কার মেয়ে ও ? শঙ্কর-পরিবারের মেয়ে নাকি ফুরিয়েছে।

রূপচরণ চাঁদোয়োর খুঁটিতে একটি হাত রেখে বললেন, ঐ পরিবারেরই মেয়ে। ভবানীশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ফরাসগঞ্জ থেকে নিয়ে এসেছে।

—ফরাসগঞ্জ ? অর্থাৎ আমাদের সেই ফ্রেঞ্চ গার্ডেন ?

একটু থেমে নীলমণি হালদার একটু তামাশা করেই বুঝি বললেন, তা হলে ঠিক আছে। ফরাসি রক্ত না হলে অমন রূপ হবে কি করে। কি বলেন বেনিয়ান-মশায় ?

বেনিয়ান-মশায় এ কথার উত্তর না দিয়ে একটু মুচকে হাসলেন, মাথা একটু নীচু করে দাঁড়ালেন, তাঁর টুপির ঘেরে তাঁর মুখ ঢাকা পড়ে গেল, এবার বললেন, ব্লাড বাঙালিরই, গার্ডেনটা ফ্রেঞ্চ। ওর বাপের নাম হরিশঙ্কর।

ফরাসগঞ্জের গয়লানিরা যাকে বলে গাঁদি-বিবি, সেই মাদাম গ্র্যাণ্ডের কথা বলার জন্যে নীলমণি হালদার একটু বুঝি চঞ্চল হলেন।

কিন্তু রূপচরণই বললেন কথাটা। বললেন, মাদাম গ্র্যাণ্ডের ছবি দেখেছি শ্রীরামপুরে, সে ফরাসি বিবিটির চেয়ে—

নীলমণি অট্টহাস্য করে উঠলেন, মুখে একটা পান ফেলে দিয়ে বললেন, ঐ কথাই বলছিলাম। ফরাসি-বাগানের একটা আস্ত লিলি-ফুল।

কিন্তু এই ফুলের পিছনে বৃদ্ধ রূপচরণ এ ভাবে ছুটলেন কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হলেও কেউ কিছু বলল না। আজ আর কারো কোনো কথা বলার বুঝি ইচ্ছে নেই, আজ এই রাসের রাত্রে সব নিয়মের ব্যতিক্রম করার জন্যেই সকলে বুঝি প্রস্তুত। রূপচরণ বৃদ্ধ হয়েছেন বলে কে ? তাঁর বয়সটা বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তিনি তো সেই জন্যে নিজেকে বুড়ো বলে মনে না করতেও পারেন।

শোভাযাত্রা চলে গেল ধীরে ধীরে। রূপচরণের মনের মধ্যেও একটি শোভার মিছিল বুঝি ঐভাবেই ধীরে ধীরে চলেছে। তিনি তাঁর ফরাসে গিয়ে তাকেয়া ঠেসান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, এবার এই বয়সে আসা তাঁর সার্থক

হয়েছে। এবার ভগবানের কৃপায় তাঁর মনের ইচ্ছা যদি পূর্ণ হয় তাহলেই তিনি কৃতার্থ হবেন।

পরিপূর্ণ চাঁদ থেকে কুয়াশা-মাখা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, ঐ আলোর নীচে অফুরন্ত উল্লাসে গান চলেছে। ভোর হবার আগে এ গান বুঝি থামবে না।

নদীয়ার কমার্শিয়াল এজেন্ট মোটা টুপি মাথায় চাপিয়ে মোটা বুটের আওয়াজ তুলে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন পদব্রজে পেয়াদা-বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে।

মিশনারির মেয়েরা উঁচু হিলের জুতো পরে নডবড়ে ভাবে হাঁটতে হাঁটতে এতক্ষণে বের হয়েছে। রাস নয়, তারা যেন দেখতে এসেছে ভাঙা-রাসে।

তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি চারদিকে ছড়াতে ছড়াতে তারা কি-যেন বলতে-বলতে চলেছে। গানের আওয়াজে ও তবলার বোলে তাদের বুলি শোনা যাচ্ছে না। পাৎলা-পাৎলা ঠোঁট কেবল তরতর করে নড়ছে।

রূপচরণের মনে ঢুকেছে এক চিন্তা। ঐ মেয়েটিকে তাঁর পুত্রবধূ করে ঘরে যদি তিনি তুলতে পারেন তাহলে তাঁর ঘরে সত্যি লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা হবে। বেনিয়নগিরি করে অনেক অর্থ তিনি পেয়েছেন পাচ্ছেন ও পাবেন। কিন্তু ঘরে লক্ষ্মী না এলে ঘরের শ্রী ফেরে না।

সকাল হতে দেরি আছে। এ দেরি বুঝি তাঁর সয় না। তিনি স্বয়ং শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছেন। বলা যায় না, ঐ প্রতিমাটিকে পাবার জন্যে আরো কারো ব্যগ্রতা তো এসে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই আবার কেউ গিয়ে কথা পেড়ে ফেলেছে কিনা কে জানে!

ওদিকে তখন গান বাজছে একটানা—

ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসি নে
আমার স্বভাব এই—

কিন্তু ও-গানে কান দিতে ইচ্ছে করছে না রূপচরণের। তাঁর কানের মধ্যে একই ধ্বনি যেন বাজছে, সে ধ্বনি বুঝি রাধিকারাজার নূপুরের নিক্বণ।

ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে গান, ক্রমশ ভোর নেমে আসছে শান্তিপুরের সমারোহের উপর।

এই একই ভোর নামছে ফরাসগঞ্জেও। ভোররাত্রের স্বপ্ন দেখে বিছানার উপর উঠে বসেছেন হেমাঙ্গিনী। নবীন ও মুরলীর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাকুল ভাবে বসে আছেন তিনি। এ কী স্বপ্ন দেখলেন তিনি ? ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয় না। আবার শুয়ে পড়লেন, আবার ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নটা মিথ্যে করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু তবু চোখ থেকে কিছুতে মুছে যাচ্ছেনা ঐ স্বপ্নটা—

সোনার হাওদা থেকে কারা যেন এসে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সোনার বিগ্রহটা, তাদের দুই পায়ে পড়ে কত কাঁদলেন হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু কী নিষ্ঠুর তারা। তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়ে তারা বিগ্রহটা নিয়ে পালাল। তাদের সেই ধাক্কায় পাশের ডোবাটায় তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, অমনি ঘুম গেল ভেঙে। চৌকির কিনারে এসে পড়েছিলেন, আর-একটু হলেই হয়তো পড়ে যেতেন হেমাঙ্গিনী।

এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন ! এ কী অশুভ স্বপ্ন দেখলেন তিনি ! এই ব্যাকুলতায় তাঁর দুই গাল বেয়ে জল নামল।

কাক ডাকছে বাইরে। প্রত্যহ এই সময়ে এসে ওরা ঠিক এইভাবেই ঠিক ওই ডালে বসেই ঐ রবই করে থাকে। কিন্তু আজ তাদের ডাক শুনে হেমাঙ্গিনী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, হাত তুলে ওদের তাড়া করে বললেন— যা যা। কোন্ অমঙ্গলের কথা কোথা থেকে নিয়ে এলি তোরা ?

আজ এগারো-বারো দিন হল রাধা গিয়েছে, এর মধ্যে কোনো খবর তিনি পান নি। পিসিমা এসে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছেন, এবং অনেক সাহস। —ভালোই আছে ওরা, ভালোই আছে, ব্যাপারের বাড়ি, সকলেই ব্যস্ত— ওর মধ্যে লোক পাঠিয়ে খবর দেয় কী করে ?

হেমাঙ্গিনীও তা বোঝে, কিন্তু তবু বুঝতে খুব ভরসা যেন হয় না। এই জলের পথ, দু-ধারে কত দস্যু আর ডাকাত। মঙ্গল-মত গিয়ে যদি পৌঁছে থাকে তবেই ভালো।

তা নিশ্চয় পৌঁছেছে, ঠিক-মত না পৌঁছলে ভাশুরঠাকুর ঠিকই লোক পাঠিয়ে দিতেন।

কিন্তু, সবই যদি ঠিক আছে, তবে ঐ স্বপ্ন দেখলেন কেন হেমাঙ্গিনী— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেলা হয়ে গেল অনেক। নবীনকে ও মুরলীকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়ে এখন তিনি একা।

ফিরিঙ্গিদের নাচগান হাসিহুল্লোড মিটে গেছে। ভাঙা নাটশালা ত্যাগ করে তারা আবার চলে গেছে ফরাসডাঙায়। এইজন্তেই জায়গাটা বড় বেশি ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে এখন।

জলের কাছে বললে দুঃস্বপ্ন নাকি মিথ্যে হয়ে যায়। এইজন্তে হেমাঙ্গিনী কুয়োতলায় গিয়ে মুখ নামিয়ে মন্ত্রপডাব মত করে ধীরে ধীরে বলতে লাগল সেই স্বপ্নের কাহিনীটা। বলতে লাগল— সোনার বিগ্রহ হরণ করে নিয়ে গেল দস্যু, দস্যুরা নিয়ে গেল বিগ্রহ।

পিসিমা এসে উপস্থিত হলেন। ঢুকেই বললেন, ও কি, কুয়োয় কিছু পডল নাকি বউ?

তাঁকে দেখে হাঁফ ছেডে বাঁচল বুঝি হেমাঙ্গিনী। পিসিমার ও কথার উত্তর না দিয়ে বলল, আসুন পিসিমা, আসুন আসুন, বসুন।

কোল থেকে ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে পিসিমা বসে বললেন, অসময়েই এসে পডলাম, বউ। তোমার কথা মনে পডল। মেয়েটিকে ছেডে একেবারে একা হয়ে আছ। ভাবলাম, যাই, দেখে আসি বউকে।

—ভালোই করেছেন, পিসিমা। একা-একা ভালো ঠেকছিল না।

পিসিমা বললেন, কাল তো রাস গেল। ভালোয-ভালোয় উৎসব কেটে গিয়েছে নিশ্চয়। কল্যাণ হোক মেয়েটার।

গুমরে উঠল হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা। নিশ্চয়, নিশ্চয়, উৎসবটা ভালো-মতই কেটে গেছে নিশ্চয। কিন্তু কি স্বপ্ন সে দেখেছে ভোররাত্রে সে কথা পিসিমাকে বলল না— দুঃস্বপ্নের কাহিনী কাউকে বলতে নেই, বললে ফলে যায়। আতঙ্কটা বুকে চেপে নিয়ে সে চুপ করে বসল।

এ কথা ও কথার পর পিসিমা আসল কথা তুললেন, বললেন, আমাদের বাড়িতেও উৎসব বুঝি লাগল। এখনি অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, আরো দু-চার দিন গেলে ধরা যাবে।

—কি হল, পিসিমা।

—কদম্ব। শরীরটা তার ভালো না।

—ওঃ, তাই নাকি।

—হ্যাঁ, মা। তাই মনে হচ্ছে। ওয়াক-ওয়াক করছে শুধু, মুখে কিছু রুচছে না।

হেমাঙ্গিনীর ম্লান মুখে একটু হাসি ফুটল, বলল, যাক, মেয়েটার একটা অবলম্বন হল। সারাটা জীবন তো কাটাতে হবে এই ভাবে।

—তা বই-কি। কুলীনের মেয়ে হলে এ ছাড়া আর গতি কি। উনি তো এলেন, একটা রাত্তির থাকলেন, একটু ফুর্তি করলেন, ব্যস, কর্তব্য শেষ। এই তো ওদের ধরণ, এই তো ওদের চরিত্তির। তবু, ভগবান আছেন। তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন মেয়েটার দিকে, তাইতে-না—

পিসিমা গলার স্বর নামিয়ে খুঁটিনাটি নানা বিবরণ দিতে লাগলেন, অবশেষে বললেন, আমরা যা আশা করছি, শেষপর্যন্ত তা হলেই বাঁচি। আর কটা দিন না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

হেমাঙ্গিনীও একটু চিন্তা করে দেখে পিসিমার সঙ্গে একমত হল। কিন্তু তার মনেও একটু খটকা লেগেছে, কিছুদিন থেকেই কদম্বের চেহারা তার চোখে একটু অন্যরকম ঠেকছে। অথচ ও কথা এখন তোলা ঠিক না। অন্যের ঘরের হিসেব-নিকেশ নেওয়ার দরকারটাই-বা তার কী। তার ঘরেও মেয়ে আছে, নিজের মেয়েকে নিয়েই তার যথেষ্ট চিন্তা।

এদিকে পিসিমা তাঁর কথা শেষ করে ধীরে-ধীরে উঠলেন।

ওদিকে রূপচরণও।

কলকাতার এতবড় বেনিয়ান চুঁচুড়ার এই ভদ্রলোকটি ভবানীশঙ্করদের বাড়িতে এসে ভবানীশঙ্করকে যেন ধন্য করে দিয়েছেন।

বাইরে তাঁর পালকি রাখা, বারো জন বেহারা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মোটা মোটা পাগড়ি-আঁটা আশাসোটাধারী চোবদার আর সোটাবরদার দাঁড়িয়ে, চিত্রবিচিত্র-করা মস্ত তালপাখা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাখাওলা, পাশেই ছাতা-বরদার।

ফটক পর্যন্ত এলেন ভবানীশঙ্কর, হরিশঙ্কর তাঁর পাশে-পাশে।

রূপচরণ একটু দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাদের সৌজন্যে পরম প্রীত হয়েছি। পরিচয় যখন হল, পুনরায় আবার দেখা হবে।

—অবশ্যই, অবশ্যই। আপনার মত মানুষের পদধূলি পড়েছে এ-গৃহে; আমরাও গৌরব বোধ করছি।

বিনয়ে নম্র হয়ে দাঁড়িয়ে রূপচরণ বললেন, ওই কন্যাটি যেদিন গৃহে নিয়ে যেতে পারব, সেদিন চতুর্গুণ গৌরব বোধ করব আমি। আশা করি সে দিনের খুব বিলম্ব হবে না।

ভবানীশঙ্কর যুক্তকরে কপাল স্পর্শ করে বললেন, সবই মদনমোহনের কৃপা। তাঁর ইচ্ছাতেই রাস, তাঁর অভিপ্রায়েই এই উৎসব, তাঁর করুণা পেয়েছি বলেই আপনাকেও এত কাছে পেলাম।

বিনয়ের প্রতিযোগিতা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলত, কিন্তু রূপচরণের মাথায় রোদ লেগেছে, ছাতা-বরদার প্রায় ছুটে এসে তাঁর মাথার রোদ আড়াল করে দাঁড়াল।

বেহারারা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে। নমস্কার-বিনিময় সমাপ্ত করে রূপচরণ পালকির মধ্যে গিয়ে বসলেন। বারো-বেহারার পালকি ধীরে ধীরে চলে গেল। সামনে-সামনে চোবদার ও পেয়াদা, পাখা-বরদার পাশে পাশে চলল পাখাটি নাড়তে নাড়তে। যতক্ষণ ঐ বাহিনী ও পালকি চোখের দৃষ্টির বাইরে না গেল ততক্ষণ ভবানীশঙ্কর ও হরিশঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল ফটকে।

হরিশঙ্কর প্রথম কথাই বলল, ছেলেব আয়ুষ্কালটা ভালো জ্যোতিষীকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে, দাদা।

ভবানীশঙ্কর কারবারী মানুষ, সুতোর নম্বর তার দাম— সব খুঁটিনাটি দেখে দেখে তবে নিজের মত প্রকাশ করা তাব অভ্যাস। হরিশঙ্করের কথা শুনে বলল, তার আগে ছেলের চেহারা ছেলের চরিত্র ছেলের চলনবলন দেখে নিতে হবে। আয়ুটা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভাগ্যের উপর আর-সব ছেড়ে দেওয়া যায় না।

—তা তো বটেই। সেসব খোঁজ অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু—

—আর কিন্তু নেই। ভদ্রলোক যখন আমার বাড়ির দরজায় এনে পালকি নামিয়েছেন তখনই দায়িত্বে বেঁধেছেন আমাকে।

দুই ভ্রাতা কথা বলতে-বলতে অন্দরের দিকে যেতে আরম্ভ করল। দোতলার জানলায়-জানলায় তখনো মেয়েদের ভিড় লেগে আছে। এদের ভিতরে আসতে দেখে তারা জানলা থেকে সরে গেল।

মাধবী তখন রাধাকে নিয়ে পড়েছে। জীবনে তার নতুন অভিজ্ঞতা জমেছে অনেক, তারই দু-এক টুকরো ছড়িয়ে দিচ্ছে রাধার মুখের সামনে, রঙ্গ করে বলছে—

আয় চুয়াচন্দনে সাজাই
চুঁচড়ো থেকে আসবে জামাই
তার পিরীতের পিরীতিনী
হবে মোদের রাধারানী।

তার বুকেরি ফুলদানীতে
রাখব গুঁজে ফুলকুঁড়িটে।

পাশের থেকে ঠানদি-ধরণের বেজপল্লীর বিন্তিবুড়ি বলে উঠলেন, এত ছড়া শিখলি কোথায়, মাধু?

মাধবী গর্ব করে বলে উঠল, হাতিবাগানে গো হাতিবাগানে। হরিঘোষের গোয়ালের নাম শুনেছ? পালে-পালে মানুষ সেখানে ঢুকছে আর গোগ্রাসে গিলছে। তাদের তো কাজকম্ম নেই হরিঘোষটার গামলায় মুখ ডোবানো ছাড়া। তারাই রোয়াকে বসে-বসে ছড়া কাটে। ও সে কত ছড়া, ঠানদি, ছড়ার ছড়াছড়ি। যাবে ঠানদি আমার শ্বশুরবাড়ি? তার গায়েই ওই গোয়াল— হরিঘোষের বাড়ি।

রস দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, না রে ছুঁড়ি, না। তোর ঠানদি হয়েই কেটে যাক দিন। তোর সতীন হতে পারব না। আমাকে নিয়ে গেলে আর কি পাবি তোর তাকে?

—একেবারে নিয়ে নেবে নাকি, ঠানদি?

মাড়ি বার করে হেসে তিনি বললেন, আমি নিতে যাব কেন রে, আমাকেই লুফে নেবে সে।

হাসি-মশকরায় আনন্দে-উল্লাসে দিন কাটতে লাগল শান্তিপুরে। শঙ্করবাড়ির অন্দরে-বাহিরেও সেই উল্লাস ও আনন্দের প্লাবন বয়ে চলেছে। উৎসব শেষ হয় নি এখনো। এ তো গেল রাস, এখন ভাঙা-রাসের জন্যে আবার সকলের মন প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

ধনাঢ্য ব্যক্তি যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁরা-সব উঠেছেন রামনগরে জমিদার-বাড়িতে। তাঁরা ঐ বাড়ির অতিথি। জমিদার অনিমেষ চৌধুরী একত্রে এতগুলো বড়মানুষ পেয়ে পরম প্রীত হয়েছেন। তাঁর জমিদারি যতবড় তার চেয়ে বড় তাঁর নাম। কেননা, তাঁর ঠাকুরদার আমলে এই বাড়িতে এক ঐতিহাসিক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি হচ্ছেন কলকাতার অন্ধকূপ-হত্যার প্রধান নায়ক হলওয়েল সায়েব। নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনারা এই ব্যক্তিটিকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দারুণ রৌদ্রের মধ্যে নগ্নপদে যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মুরশিদাবাদে, তখন মাঝপথে এই শান্তিপুরের রামনগরের জমিদার মহীতোষ চৌধুরীর কাছে নাকি নিয়ে যায়। জমিদার-মশায় তখন সাহেবটিকে একটি জেলেডিঙিতে উঠিয়ে নাকি পাঠিয়ে দেন মুরশিদাবাদে। মাঝপথে

কাশিমবাজারের ফরাসি ও ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষেরা এবং আরমানিয়ান বণিকেরা হলওয়েলের উপর একটু সদয় ব্যবহার করেছিল ব'লে লোকটি নাকি বেঁচে যায়। তা না হলে রোদে-জলে ঐ খোলা নৌকোয় বসে সায়েবটার আধমরা প্রাণটা পুরোপুরিই মরে যেত।

সেই থেকে শান্তিপুরের এই চৌধুরী-বংশের কদর একটু আলাদা। এই কদর আছে বলেই তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছেন রাজা সুখময় থেকে আরম্ভ করে চুচুঁড়ার রূপচরণ বেনিয়ান পর্যন্ত সকলে।

সে বাড়িতে রাস নেই বটে, কিন্তু উৎসবের ঘটা সেখানে কম না। রাসের বাড়িগুলি সোনার বিগ্রহ নিয়ে আর ঘরের মেয়েকে রাইরাজা সাজানো নিয়ে বিব্রত। কিন্তু এ বাড়িতে বিগ্রহবা সবই জীয়ন্ত মানুষ, আর রাইবাজারা-সব পরের ঘরের মেয়ে— সাটিনের পায়জামার উপর মসলিনের ঘাগবা দিয়ে তাদের নীচের অঙ্গ ঘের দেওয়া।

রাসের বাড়িতে উৎসব। কিন্তু মজা যা-কিছু তার সবই এখানে। এটা রাসের বাড়ি নয়, রসের বাড়ি এটা।

এইজন্যে অনেক লোকের ভিড জমেছে এখানে। কলকাতার বাবুদের দেখার জন্যে বুঝি ততটা না, ঐ বিবিদের দেখাব জন্যে। কাল বাত্রিটা কেটে গেছে পথের ধারে, সবার মন তাই ঘরের পথে।

বাইজিদেব ঘুঙুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে এই পথের ধার থেকেও, তারা এখন নাচছে না, হেঁটে বেডাচ্ছে মসলিনের ফরাসের উপর। তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক-এক বাবুর কাছে গিয়ে বুঝি পিয়ার করে আসছে একে-একে।

ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কির গন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে। সেই গন্ধের সঙ্গে বাবুদের ও বিবিদের চটকে ঝলসে যাচ্ছে চোখ।

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল— আর্তচিৎকার করতে করতে শিরীষ গাছের ডাল থেকে নিম গাছের দিকে উডে চলে গেল একটা পাখি।

ঐ আর্তস্বর শুনে কদম্বের সমস্ত শরীর আর্তনাদ করে উঠল বুঝি। পাশ ফিরে সে শুল। অনেকদিন গত হয়ে গেল, এখনো ফিরল না রাধা। ফিরতে না কি দেরিও আছে ওর। ওর জ্যাঠা ওকে রেখে দিয়েছেন। বড দেখতে ইচ্ছে করছে মেয়েটাকে। কবে ফিরবে কে জানে। বড ভাগ্যবতী মেয়েটা, চুঁচুডায় বিয়ে হবে। এখান থেকে কত আর দূর চুঁচুডা। ওর কদম-মাসিকে

দেখতে মাঝে-মাঝে নিশ্চয় আসবে ও। কিন্তু চিনতে কি আর পারবে তখন এই মাসিটিকে। পরের ঘরে গলগ্রহ হয়ে দিন কাটাতে হবে কদমকে, আর রাধা হবে কত বড ঘরের বউ। ঐ বাড়ির বউ কি এত ছোট উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে আগের মত গলা ছেড়ে ডাকবে— কদম-মাসি, কদম-মাসি ?

আবার ডেকে উঠল পাখিটা— চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল।

পাখিদের ডাকের আর বিরাম নেই। বউ-কথা-কও পাখিটা অমন ব্যাকুল ভাবে ডেকে-ডেকেই তো কদমের মনে জাগিয়ে তুলল এক ব্যাকুলতা। ঐ ডাক শুনে শুনে তার কেবলই মনে হত, কই, কোনো মানুষ তো তাকে কোনোদিন অমন সোহাগ করে কখনো ডাকল না। কী মিষ্টি ঐ ডাকটা। শুনতে-শুনতে কত কথা ভাবত কদম্ব। কত ইচ্ছে জাগত তার মনে— কত বাসনা, কত কামনা, কত আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছে হত, শুধু একবার, শুধু একবার কেউ তাকে ডাক দিক ঐভাবে। সারাটা জীবন তবে ধন্য হয়ে যাবে বুঝি।

তাই, আজ মনে পড়ে, ঠিক ঐ ডাক নয়, ঐ ধরণের একটা ডাক কানে এল তার ঐ তেঁতুলতলায়— ভরদুপুরে তেঁতুলতলার ছায়ায়-ভরা অন্ধকারে।

আবার পাশ ফিরল সে, মচমচ করে উঠল চৌকি। কিন্তু তার মনে হল যেন চৌকি না, তার বুকের পাজরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দ ওটা।

ঐ তেঁতুলতলাই তার জীবনে এনেছে এই সবনাশ। যা রটাবার রটিয়ে বেড়াচ্ছেন পিসিমা। পিসিমা তার উপর একটু প্রসন্ন আছেন, এইজন্তে এখনো সে মুখ দেখাতে পারছে সকলের কাছে। কিন্তু পিসিমার রটানো কাহিনী কয়জন বিশ্বাস করছে সে-খোঁজ নিয়ে লাভ নেই। ইতিমধ্যে আশে-পাশে সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে কথাটা। ঘরের বার হতে এখনো তাই পারছে কদম্ব।

কদম্ব উঠে পড়ল। আর ভালো লাগে না এইভাবে একা শুয়ে থাকতে। সে উঠে সোজা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। উঠোন পার হতেই পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, উঠলি কেন ?

—একটু ঘুরে আসি পিসিমা রাধাদের বাড়ি থেকে।

কদমের মুখের দিকে একবার তাকালেন পিসিমা। রাধাদের বাড়িতে যাবার জন্তেই এই ব্যাকুলতা, কিংবা এ-ব্যাকুলতার কারণ অন্য ?

পিসিমার চাউনি দেখেই কদম বুঝি বুঝল, বলল, বিশ্বাস করো পিসিমা।

পিসিমা বললেন, আর অবিশ্বাস করেই বা লাভ কি।

অর্থাৎ ঘটনায় যা ঘটে যাবার তা তো ঘটেছে, এখন আর শাসনে বেঁধে রাখার দরকার কি।

কদম চলল। আমবাগানের গা দিয়ে ঝাউবনের তলা দিয়ে রত্নাদের বাড়ি পাশে রেখে ধীরে ধীরে সে চলেছে। হাওয়া লেগে শিরশির করে উঠছে গা। শীতের আমেজ লেগেছে বাতাসে। এই হাওয়ায় শরীর কিন্তু শিউরে উঠছে না, অত ঠাণ্ডা হয় নি এখনো হাওয়া। রোদের সঙ্গে এই হাওয়া মিশে অনেকটা যেন কাঁচামিঠে আমের মত স্বাদ হয়েছে বাতাসের।

তেঁতুলতলায় পৌঁছে থমকে থেমে একটু এদিক-ওদিক চেয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল কদম্ব। কাঁচামিঠে আম হঠাৎ করমচার মত কষ-কষ ঠেকল, কিংবা নিম-ফলের মত তেতো?

তেঁতুলতলা পিছনে ফেলে এবার একটু বেগে হেঁটে চলেছে কদম্ব। তার নিতম্ব নৃত্য করতে করতে চলেছে তার পিছন-পিছন। কক্ষে কলস নেই, অথচ মনে হচ্ছে পূর্ণকুম্ভ বহন করে চলেছে ঐ ললনা। চকিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকাবার সঙ্গেসঙ্গে ভ্রূ-দুটি ছিলা-টানা ধনুকের মত বক্র হয়ে উঠছে, চক্ষের তূণে আজ আর শর-সঞ্চয় করে রাখে নি কদম্ব। পঞ্চশরের পদে সে বুঝি উপঢৌকন দিয়ে ফেলেছে সেই শরজাল। আজ সে নিঃশর, আজ সে নিঃসম্বল, আজ সে নিঃসহায়।

চোখের আকাশে তাই আজ মেঘ জমেছে কাদম্বিনীর।

আজ হঠাৎ এসে দেখা দিক কোনো ফিরিঙ্গি, এই নির্জন পথে নির্যাতন করুক তাকে, নিরাভরণ করুক— বাধা দেবে না কাদম্বিনী। তার জীবনের লজ্জা দূর হয়ে গেছে, তার জীবনের অহংকারও চূর্ণ হয়েছে। সেই অনাগত ফিরিঙ্গির অত্যাচারের অজুহাত দিয়ে সে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারবে তা হলে। এ-জীবনের উপর আর কোনো মায়া নেই তার।

ডেকে উঠল একটা পাখি। কি ডাক যেন? কান পাতল কাদম্বিনী।

স্পষ্ট মানুষের মত গলা। পাখিটা ডাকছে— খোকা হোক, খোকা হোক।

এ ডাক আগেও শুনেছে সে। কিন্তু এমন করে কান পেতে শোনে নি, আকাশের দিকে তাকিয়ে ঐ ডাক শুনতে লাগল সে এক মনে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠল কদম্বের, কণ্টকিত হয়ে উঠল সে। অসহায় নিঃসম্বল আর নিরাশ্রয় বলে মনে হয়েছিল নিজেকে একটু আগে, জীবন

বিসর্জন দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু অকস্মাৎ অসীম মায়ায় ভরে উঠল তার মন। ঐ পাখির ডাকে নয়, কার বুকের হৃৎস্পন্দন শোনার জন্যে যেন সে কান পাতল।

মাতৃত্বে টনটন করে উঠল বুক। ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল সে। শরীরে অমন ঝাঁকি দিয়ে হাঁটলে, বলা যায় না, কোনো ক্ষতিও তো হয়ে যেতে পারে কারো। আঁচল দিয়ে অঙ্গ ঢেকে নিয়ে সে চলল।

বাঁশঝাড়ের বাঁকটা নিতেই সম্মুখে হরিশঙ্কর। হাতে খেলো-হুঁকো, কাঁধে চাদর, মুখ-ভরা গোঁফদাড়ি।

—কোথায় চললে কদম ?

—আপনাদের বাড়ি। রাধা ফিরবে কবে ?

—দেরি আছে। দাদা ছাড়তে চাইলেন না। মাঘ মাসের আগে হয়তো আসবে না।

কার্তিকের এটা শেষ। মাঝে আরো দু মাস, অঘ্রাণ আর পউষ। তারপর সেই মাঘ। এতদিন ধরে থাকবে ওখানে ?

হাঁটতে হাঁটতেই কদম জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে তো প্রায় পাকা ?

—হ্যা। পাকাই বলতে পার।

—ছেলেটিকে দেখেছেন ?

—দেখেছি।

—কেমন দেখতে ?

—বেশ। সুন্দর দেখতে। কার্তিকের মত বলতে পার।

কদম হেসে উঠল, বলল, না না, তা বলতে পারব না। আমরা বলব কেষ্ট-ঠাকুরের মত। রাধার বর কেষ্ট হবে না তো কী হবে ?

হরিশঙ্করও হাসলেন। কয়েকদিন হল ফিরে এসেছেন তিনি। এতটা বয়স তাঁর হল, কিন্তু এতদিনের মধ্যে শান্তিপুরের রাস তাঁর দেখা হয় নি। এ একটা লজ্জারই কথা। রাসের শান্তিপুরের চেহারাই আলাদা। এবার চোখ সার্থক করে এসেছেন তিনি। এইসব কথা বলতে-বলতে তিনি চললেন।

খিড়কি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বললেন, এই দেখ গো, কাকে ধরে নিয়ে এলাম।

হরিশঙ্করের গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল হেমাঙ্গিনী। বলল, ও মা,

আমি ভাবলাম, কে বুঝি। ভাবলাম, রাধা বুঝি আচমকা ফিরে এল। এস, এস, কদম এস।

ওরা বসল ঘরের মধ্যে গিয়ে। কাঁধের চাদর নামিয়ে রেখে হরিশঙ্কর চৌকির উপর বসে বললেন, এবার আমাদের অদৃষ্ট বড প্রসন্ন। এদিকে সবই সুসমাচার।

কদমের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার হবে খোকা। বড বাড়িতে বিয়ের কথা হচ্ছে রাধার। আর আমাদের ফিরিঙ্গি আনটুনি— তারও জয়জয়কার। কাশিমবাজারে যা গেয়েছে সে, রানীমা খুশি হয়ে সোনার শিকলি দেওয়া একটা ঘড়ি ওকে উপহার দিয়েছেন। সেই হার গলায় ঝুলিয়ে ফিরে এসেছে ফিরিঙ্গি।

কান্তবাবুর পুত্র কাশিমবাজারের মহারাজা লোকনাথ গত হয়েছেন গত বছর, রাজকুমার হরিনাথ এখন শিশু। এবার হতই না কবিগান। কিন্তু রানীমা সুসারমোহিনীর আগ্রহেই আসর বসেছিল। আনটুনি যে মান রাখতে পেরেছে এই ঢের। নিরুপমার গর্ব বুঝি ধরে না।

হরিশঙ্কর বলল, ফিবিঙ্গির প্রাণে রস আছে। নৌকা থেকে নেমেই নাকি নিজের গলার হারটা নিরুপমার গলায় পরিয়ে দিয়ে গেয়ে উঠেছে—

ঘডির বদল ঘণ্টা এ নয়,
আমার মতন দু হাত বাডায়—
এই দেখ-না কাঁটায় কাঁটায়
মানাবে এ তোমার গলায়।
মিলে যাক বোদের আঁচে
সোনাতে আর সোহাগায়।

হেমাঙ্গিনী নডে বসে বলল, ঘাটে-আঘাটায় অমন সোহাগ দেখানো ওদেরই সাজে। গলার হার খুলে পরিয়ে না দিলেও সোহাগ দেখানো যায়— ফিরিঙ্গিরা ওসব বুঝি বোঝে না।

কদম্ব হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল, বলল, কিন্তু বড ভাগ্যবতী মেয়ে ঐ নিরুদি। আগে ওর সম্বন্ধে যা-তা ভেবেছি, কিন্তু এখন দেখছি, সাহস ওর আছে। সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ও তো যা-খুশি করল। এখন ওকে নিয়ে ঐ ফিরিঙ্গিটাও খুশি, আর, আমরাও তো দিন-দিন খুশি হয়েই উঠছি।

আরো-কিছু বলত হয়তো হরিশঙ্কর। কিন্তু কদমের মন্তব্য শোনার পর তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। চার বার, হাঁ, চার বারই তো হল। দু বার যাতায়াত নিয়ে চার বার ও ওই জায়গাটা পার হয়েছে। ওর কিনার দিয়ে যাবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে ওই কুঠির দালান। কিন্তু সাহস হয় নি তার। কিনারে নৌকোটা বেঁধে, ইয়াসিনকে একটু অপেক্ষা করতে বলে একবার নেমে গিয়ে দেখা করে আসতে ভরসা হয় নি তার। পুরাতন ক্ষতে খোঁচা দিয়ে আবার সেই ক্ষত কাঁচা করে তুলতে না চাওয়ার জন্যেই তার এ সংকোচ নয়। নতুন সমাজ নতুন সংস্কার নতুন আবহাওয়া আর নতুন সাজসজ্জায় ভূষিতা হয়ে আজ যদি তিনি চিনতে না পারেন হরিশঙ্করকে। যদি তার পরিচয় জানতে চান, পরিচয় দেবার পরেও যদি তিনি—

নিরুপমার সাহস এবং তার সৌভাগ্যে খুশি হয়ে হয়তো উঠছে সকলে, কিন্তু সকলের সাহসে ও সকলের সৌভাগ্যে কি এমনি খুশি হয়ে উঠতে রাজি হবে সকলে?

রূপচরণ রায় মানুষটি বড সজ্জন। তিনি খুঁটিনাটি পরিচয় নেবার পর এই পরিবারের এই দুর্ঘটনাব কথা নিজেই উল্লেখ করলেন। বলাগড়ের কথাও বললেন। ম্যাক্‌গ্রেগর-সায়েবের নামও শুনেছেন বললেন। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও রাধাকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আগ্রহ কম দেখালেন না। মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল না হরিশঙ্করের, কিন্তু এখন মত তার বদল হয়েছে।

দিন কেটে চলেছে ধীবে ধীরে। কার্তিক পার হয়ে অঘ্রাণও শেষ হয়ে গেল। ফরাসগঞ্জে এখন পউষের হাওয়া। চারদিকে গাঁদার অরণ্য। হলুদবর্ণ ফুলে উড়ে বেডাচ্ছে প্রজাপতির পাল।

সকালবেলা ধোঁয়ার কুযাশা নেমে আসছে ভারি হয়ে। ক্রমশ কদমের শরীরও ভারি হয়ে উঠছে।

ফাল্গুনে রাধাব বিয়ে। বন্দোবস্ত পাকা। কথা ঠিক।

হায়, ঐ বিয়েতে মনের খুশি নিয়ে হাল্কা শরীর নিয়ে আনন্দ করতে পারবে না কদম। কেন, আষাঢে বিয়ে হলে ক্ষতি ছিল কি, জ্যৈষ্ঠে হলেও হত— কিন্তু ও-মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে নাকি হয় না। বেশ তো, আষাঢে হলেই কদম এর মধ্যে ঝাডাঝাপটা হয়ে উঠতে পারত।

নিজের শরীর নিয়ে বিব্রত কদম, আর কদমকে নিয়ে বিব্রত তার বউদিরা।

তারা কদমকে যা-বলতে-নেই তাই বলছে। নানাভাবে গঞ্জনা দিয়ে চলেছে, কিন্তু মুখ বুজে আছে কদম। তার কিছু বলার মুখ নেই।

হঠাৎ দু-জন অতিথি এসে উপস্থিত হল গাঙ্গুলিবাড়িতে। চারদিকেই যেখানে সুসমাচার, সেখানে তারা নিয়ে এসেছে দুঃখের সংবাদ। অনেক দূর থেকে এসেছে এই অতিথিরা— মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে।

দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত হয়েছেন। কদম্বের স্বামী।

অতিথিরা খিড়কির বাইরে পুবমুখী ঘরের দাওয়ায় বসে কদমের বড়দাদার সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের পা ধোয়ার জন্যে জল গেছে, কিন্তু এখন হাত-পা ধোয়ার সময় নাকি তাঁদের নেই। তাঁরা আতিথ্যগ্রহণের জন্যেও ব্যস্ত নন। যে জন্যে তাঁরা এসেছেন, তার ব্যবস্থা শীঘ্র করে দিলে তাঁরা এখনি রওনা হতে পারেন— ঘাটে নৌকো বেঁধে এসেছেন। চারদিকেই লোকজন গেছে খবর নিয়ে, এঁরা দুজন এসেছেন ফরাসগঞ্জে।

ভিতরে খবর এল। সব-প্রথমে আর্তনাদ করে উঠলেন পিসিমা।

বউরা কোলের ছেলে নামিয়ে রেখে উবু হয়ে বসল গালে হাত দিয়ে। কদম্ব পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খুঁটি ধরে।

শব-সৎকার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে কদম্বকে নিয়ে গিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিতে হবে।

পিসিমা ইশারা করে ডাকলেন কদমের দাদাকে, ফিসফিস করে বললেন, অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের সহমরণ হয় না। শাস্ত্রেও লেখে না, আইনেও না, জানোই তো।

— কিন্তু—

কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল কদমের বড়দাদা হরিপদ।

পিসিমা আবার বললেন, কিন্তু নাই কিছু। বলে দাও। ওদের যেতে বলো।

দুই চোখ ছল ছল করে উঠল হরিপদর। কিছুতেই তার মুখ দিয়ে কথা যেন সরছে না।

পিসিমা আবার বললেন, কে অত হিসেব রেখেছে। কুলীন জামাইরা অমনিই তো ঘুরে বেড়ায়। তার গতিবিধির অত খোঁজ কে রেখেছে! বলে দাও, পুজোর আগে এখানে এসেছিল।

—কিন্তু—

—আর কিস্তু কোরো না, হরিপদ। আর কোনো কিস্তু নেই।

হরিপদ বলল, আছে। হঠাৎ মারা যান নি উনি। বাতে পঙ্গু হয়ে ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

মাথায় বজ্রঘাত হল পিসিমার। কপালে সজোরে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, হা অদৃষ্ট। হা অদৃষ্ট। হা অদৃষ্ট।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কদম্ব। যত চাপাগলাতেই হোক, সব ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। তাকে নিয়ে একটা বিরাট সংকটের সৃষ্টি যে হয়েছে, বুঝতে এতটুকু অসুবিধে তার হচ্ছে না।

তাকে যদি ছেড়ে দেয় ঐ অতিথিদের সঙ্গে, তবে গাঁয়ের লোককে কী কৈফিয়ত দেবে। অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে কে কবে কোথায় এভাবে ছেড়ে দিয়েছে? আর, তাকে ছেড়ে যদি না দেয়, কী কৈফিয়ত দেবে ঐ অতিথিদের কাছে।

কদমের নাকের ডগায় এসে মস্ত-একটা ফোঁটা হয়ে জমেছে চোখের জল। মুক্তোর নোলকের মত টলটল করছে।

খুঁটি ছেড়ে দিয়ে কদম সরে গেল।

গাঁ-ময় ছড়িয়ে গেল নিমেষের মধ্যে এই সংবাদ। কদম বিধবা হল— এইটুকুই যা দুঃখ, তার চেয়ে বেশি দুঃখিত কেউ হল না। প্রাণে বেঁচে গেল মেয়েটা, গাঁয়ের লোকের মনে এ একটু সান্ত্বনার মত মনে হল।

খবর রটে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠোন ভরে গেল অগুন্তি মেয়ের ভিড়ে।

কার মুখ থেকে কি কথা বেরিয়ে পড়ে, এবং অতিথিদের কানে যায় কোন্ কথা, এই আতঙ্কে পিসিমা সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে নিষেধ করতে লাগলেন কোনো কথা না বলতে, কোনো আলোচনা না করতে। বলতে লাগলেন, চুপ চুপ, কোনো কথা না। মেয়েটা বড় অধীর হয়ে পড়েছে, তার কানে কোনো কথা না যায়। একা-একা নিরিবিলিতে ও একটু কাঁদুক।

অনেকক্ষণই বুঝি কাঁদতে সময় দেওয়া হয়েছে কদমকে। এবার পিসিমা উঠে ঘরের মধ্যে গেলেন, কি করে সংকট এড়ানো যায় এখন পর্যন্ত তার কোনো ব্যবস্থাই হয় নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিসিমা বললেন, কদম কই?

কই তো কই। সকলে মিলে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল শোকাতুর মেয়েটিকে। রম্ভাদের বাড়ি, রাধাদের বাড়ি— সর্বত্র। কিন্তু কোথাও নেই কদম।

তারা কদমকে যা-বলতে-নেই তাই বলছে। নানাভাবে গঞ্জনা দিয়ে চলেছে, কিন্তু মুখ বুজে আছে কদম। তার কিছু বলার মুখ নেই।

হঠাৎ দু-জন অতিথি এসে উপস্থিত হল গাঙ্গুলিবাড়িতে। চারদিকেই যেখানে সুসমাচার, সেখানে তারা নিয়ে এসেছে দুঃখের সংবাদ। অনেক দূর থেকে এসেছে এই অতিথিরা— মেদিনীপুরের ঘাটাল থেকে।

দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত হয়েছেন। কদম্বের স্বামী।

অতিথিরা খিড়কির বাইরে পুবমুখী ঘরের দাওয়ায় বসে কদমের বড়দাদার সঙ্গে কথা বলছেন। তাদের পা ধোয়ার জন্যে জল গেছে, কিন্তু এখন হাত-পা ধোয়ার সময় নাকি তাঁদের নেই। তাঁরা আতিথ্যগ্রহণের জন্যেও ব্যস্ত নন। যে জন্যে তাঁরা এসেছেন, তার ব্যবস্থা শীঘ্র করে দিলে তাঁরা এখনি রওনা হতে পারেন— ঘাটে নৌকো বেঁধে এসেছেন। চারদিকেই লোকজন গেছে খবর নিয়ে, এঁরা দুজন এসেছেন ফরাসগঞ্জে।

ভিতরে খবর এল। সব-প্রথমে আর্তনাদ করে উঠলেন পিসিমা।

বউরা কোলের ছেলে নামিয়ে রেখে উবু হয়ে বসল গালে হাত দিয়ে। কদম্ব পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খুঁটি ধরে।

শব-সৎকার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে কদম্বকে নিয়ে গিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিতে হবে।

পিসিমা ইশারা করে ডাকলেন কদমের দাদাকে, ফিসফিস করে বললেন, অন্তঃসত্বা মেয়ের সহমরণ হয় না। শাস্ত্রেও লেখে না, আইনেও না, জানোই তো।

— কিন্তু—

কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল কদমের বড়দাদা হরিপদ।

পিসিমা আবার বললেন, কিন্তু নাই কিছু। বলে দাও। ওদের যেতে বলো।

দুই চোখ ছল ছল করে উঠল হরিপদর। কিছুতেই তার মুখ দিয়ে কথা যেন সরছে না।

পিসিমা আবার বললেন, কে অত হিসেব রেখেছে। কুলীন জামাইরা অমনিই তো ঘুরে বেড়ায়। তার গতিবিধির অত খোঁজ কে রেখেছে! বলে দাও, পুজোর আগে এখানে এসেছিল।

—কিন্তু—

—আর কিছু কোরো না, হরিপদ। আর কোনো কিছু নেই।

হরিপদ বলল, আছে। হঠাৎ মারা যান নি উনি। বাতে পঙ্গু হয়ে ছয় মাস শয্যাশায়ী ছিলেন।

মাথায় বজ্রঘাত হল পিসিমার। কপালে সজোরে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, হা অদৃষ্ট। হা অদৃষ্ট। হা অদৃষ্ট।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কদম। যত চাপাগলাতেই হোক, সব ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। তাকে নিয়ে একটা বিরাট সংকটের সৃষ্টি যে হয়েছে, বুঝতে এতটুকু অসুবিধে তার হচ্ছে না।

তাকে যদি ছেড়ে দেয় ঐ অতিথিদের সঙ্গে, তবে গাঁয়ের লোককে কী কৈফিয়ত দেবে। অন্তঃসত্বা মেয়েকে কে কবে কোথায় এভাবে ছেড়ে দিয়েছে? আর, তাকে ছেড়ে যদি না দেয়, কী কৈফিয়ত দেবে ঐ অতিথিদের কাছে।

কদমের নাকের ডগায় এসে মস্ত-একটা ফোঁটা হয়ে জমেছে চোখের জল। মুক্তোর নোলকের মত টলটল করছে।

খুঁটি ছেড়ে দিয়ে কদম সরে গেল।

গাঁ-ময় ছড়িয়ে গেল নিমেষের মধ্যে এই সংবাদ। কদম বিধবা হল— এইটুকুই যা দুঃখ, তার চেয়ে বেশি দুঃখিত কেউ হল না। প্রাণে বেঁচে গেল মেয়েটা, গাঁয়ের লোকের মনে এ একটু সান্ত্বনার মত মনে হল।

খবর রটে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠোন ভরে গেল অগুন্তি মেয়ের ভিড়ে।

কার মুখ থেকে কি কথা বেরিয়ে পড়ে, এবং অতিথিদের কানে যায় কোন্ কথা, এই আতঙ্কে পিসিমা সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে নিষেধ করতে লাগলেন কোনো কথা না বলতে, কোনো আলোচনা না করতে। বলতে লাগলেন, চুপ চুপ, কোনো কথা না। মেয়েটা বড় অধীর হয়ে পড়েছে, তার কানে কোনো কথা না যায়। একা-একা নিরিবিলিতে ও একটু কাঁদুক।

অনেকক্ষণই বুঝি কাঁদতে সময় দেওয়া হয়েছে কদমকে। এবার পিসিমা উঠে ঘরের মধ্যে গেলেন, কি করে সংকট এড়ানো যায় এখন পর্যন্ত তার কোনো ব্যবস্থাই হয় নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিসিমা বললেন, কদম কই?

কই তো কই। সকলে মিলে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল শোকাতুর মেয়েটিকে। রত্নাদের বাড়ি, রাধাদের বাড়ি— সর্বত্র। কিন্তু কোথাও নেই কদম।

পোর্তুগিজ গির্জার এলাকা, ভাঙা নাট্যশালার চার ধার, গরিটির পোড়ো বাগানবাড়ি, কেলীর কুঠি— সর্বত্র খুঁজে বেড়ানো হল তাকে। সকলে মিলেই খুঁজতে লাগল দল বেঁধে। অতিথিরা ওদিকে বসে, তাদের বিদায় দিতে হবে, সে কথাই বুঝি ভুলে গেল সকলে।

কদম্ব গিয়ে নৌকোয় উঠে বসেছে কিনা দেখার জন্যে নবীন ও মুরলী ছুটল নদীর ঘাটে। কিছুক্ষণ বাদে তারা খবর নিয়ে এল, না, নেই সেখানে।

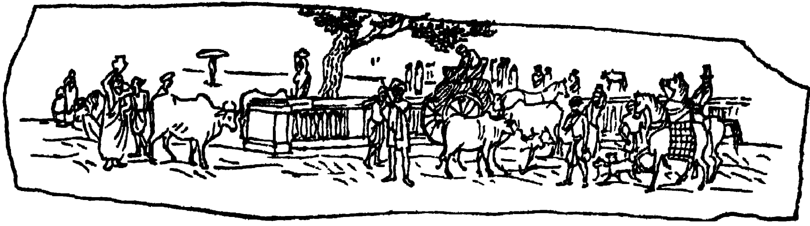
পিসিমার মনে কেমন সন্দেহ হল— পালাল নাকি মেয়েটা কারো সঙ্গে, সবার চোখে ধুলো দিয়ে? কিন্তু যাবে কোথায় এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে।

অতিথিরা তখনও অপেক্ষা করে বসে। তাঁদের নৌকো এখনও ঘাটে ভেসে ভেসে হাওয়া খাচ্ছে, হাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে দোল খাচ্ছে।

বিকেল হয়ে এল, তবুও কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না কদম্বের।

অবশেষে পাওয়া গেল কদম্বকে। তেঁতুলতলার অন্ধকারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে তার ধড। কাছে-ভিতে কেউ কোথাও নেই, কেবল মুসলমান-পাড়ার নেড়ি-কুকুরটা তার মাথার কাছে বসে জিব বের করে ধুঁকছে।

ধুতরো-বিচির খোলা ছড়ানো চার দিকে।



॥ পঞ্চম স্ফুলিঙ্গ ॥

ইতিহাসের অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই ভূমিতে। সুবেবাংলার অধীশ্বরের অধীনস্থ বিশাল ভূখণ্ডের সামান্য একটি অংশ মাত্র এই ভূমি— এই হুগলী। কিন্তু সেই মোগলাই শাসনের ও শোষণের মধ্যেও তার বুকের উপর নিত্যনূতন শাসক এসে উপস্থিত হয়েছে। সেইসব নবপ্রভুর অত্যাচারে ও শোষণে শেষ হয়ে যাবার কথা এই ভূমির। কিন্তু ভাগীরথীর কল্যাণ-প্রবাহেই এ ভূমি মরুভূমি হয়ে ওঠে নি হয়তো।

বহু নদী ও সমুদ্র পার হয়ে এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল পোর্তুগিজ। আমরা আগেই জেনে নিয়েছি এদের কথা। বাংলাদেশের অনেক জমি দেখে-দেখে ও চেখে-চেখে বেড়িয়ে অবশেষে তারা এসে ঘাঁটি নিল এখানে। প্রথমে হুগলী-নদীর মোহনা পর্যন্ত এসে হাজির হল তারা। ঐ নদীমুখ দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল ব্যবসায়ীরা। জাহাজ আর এগোয় না, তাই অবশেষে তারা ঘাঁটি নিল ঐ নদীর কিনারে— বেতড়ে। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার জন্যেই তখন তাদের রক্তে হয়তো এই নদীর ঢেউয়ের মতই উৎসাহের তরঙ্গ উঠেছে। আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে তারা আস্তানা নিল শালিখায়। ওদিকে হাট বসেছে সুতানটিতে— সেই হাটে কেনাবেচার কাজ চলল বেশ স্বচ্ছন্দেই। আরো এগিয়ে চলল পোর্তুগিজেরা। এসে উপস্থিত হল

ত্রিবেণী-সংগমের কাছে সপ্তগ্রামে। এ জনপদের অবস্থা তখন বেশ সমৃদ্ধ। এমন জায়গাই ব্যবসায়ীর আদর্শ স্বর্গ। সেই স্বর্গে পদার্পণ করল এই বিদেশী অভিযাত্রীর দল। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার হাতিয়ার কই মানুষের? গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর তিনটি ধারা এসে মিলিত হয়ে পুণ্যার্থীদের তীর্থক্ষেত্র এবং অর্থগৃধ্নুদের স্বর্গধাম রচিত হয়েছিল যে-জনপদ, তার প্রতি অপ্রসন্ন হলেন বুঝি প্রকৃতি। সরস্বতীর ধারা এল শুকিয়ে, মজে গেল নদীটা। সপ্তগ্রামের লক্ষ্মী ধীরে অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু পোর্তুগিজেরা বেঁধে রাখতে চায় তাদের লক্ষ্মীকে। এই জন্যে তারা সরে এল গঙ্গার ধারে—এই হুগলীতে। এই বণিকদের গুদামঘরে পরিণত হল জায়গাটি। কোনো নাম বুঝি ছিল না এর, কোনো পরিচয়ও না। তাই এর পরিচয় হল ওগলি, অর্থাৎ গুদামঘর। দিল্লির মসনদে তখন আকবর-বাদশা।

সেই পরিচয় এখন পরিণত হয়েছে নামে। এখন এ যদিও শুধুমাত্র গুদামঘর নয়, তবুও এর নাম দাঁড়িয়েছে হুগলী।

ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে দুর্বুদ্ধি নাকি অবলীলাক্রমে এসে যায়। পোর্তুগিজেরা তাদের গুদামখানায় জমায়েত হয়ে হঠাৎ ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠল। একটু তফাতে ব্যাণ্ডেলে তৈরি করল মস্ত একটি গির্জা। এই পর্যন্ত হলেই হয়তো ক্ষতি ছিল না। এ দেশের মানুষকে ধরে ধরে খ্রীষ্টান বানাতে লাগল তারা। আর ছেলেমেয়েদের খ্রীষ্টান বানিয়ে তাদের চালান দিতে আরম্ভ করল বিদেশে। ক্রীতদাসের ব্যবসা তখন খুব জোর চলেছে।

এদের আচরণের খবর পেয়ে নড়ে উঠল দিল্লির সিংহাসন। দেড় লক্ষ সেপাই দিয়ে আকবর হুগলী আক্রমণ করতে পাঠালেন কাশীম খাঁকে। সেই আক্রমণে বিতাড়িত হল পোর্তুগিজেরা। অনেকদিন পরে অবশ্য তারা বাদশার কৃপালাভ করে আবার ফিরে আসতে পারে।

কিন্তু এ নাকি প্রকৃতির নিয়ম—কোনো স্থান ফাঁকা নাকি সে রাখে না। পোর্তুগিজরা বিতাড়িত হবার সঙ্গেসঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হল ওলন্দাজ।

মোগল-মালিকের চোখের সামনেই ঘাঁটি নেওয়া নিরাপদ-বোধ না করে তারা তাই হুগলীর কিঞ্চিৎ তফাতে আস্তানা গাড়ল চুঁচুড়ায়।

ইংরেজরাও ইতিমধ্যে ভারতের মাটির স্বাদ পেয়েছে—সুরাটে ও মাদ্রাজে উঠেছে তাদের কুঠি। এবং সেইসঙ্গে উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরেও। ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় বসে ফলাও ব্যবসা করছে দেখে বাংলার মাটিতে পদার্পণ

করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল ইংরেজ। এই ব্যগ্রতা বেশি দিন বুকের মধ্যে পুষে না রেখে হুগলীতে এসে উপস্থিত হল ইংরেজ বণিকও। ইতিমধ্যে আশপাশে এসে জুটেছে ফরাসি ও দিনেমাররাও।

দিন বয়ে চলেছে একে একে, এবং একে একে বছর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট হয়ে হুগলীতে এলেন জব চার্নক। মোগলের সঙ্গে তাঁর বিবাদ উপস্থিত হল খাজনা নিয়ে, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পরিণতি হল ইংরেজে-মোগলে সংঘর্ষ। এতে ইংরেজরা জিতে গেলেও, শায়েস্তা খাঁর শাসানি শুনে চার্নক হুগলীতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা না করে সদলবলে রওনা হলেন বালেশ্বর অভিমুখে। কিন্তু অতদূর যাবার আগেই মাঝপথে নেমে পড়লেন সুতানটিতে।

বিদেশীরা এইভাবে আঘাত হেনেছে এই মাটির উপর। অতঃপর দেশী লোকের আঘাতও এসে পড়ল এই মাটিতে। মেদিনীপুরেব তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হয়ে আশপাশের গ্রাম ও জনপদ লুঠ করতে-করতে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে পরাজিত ক'রে সোল্লাসে এগিয়ে আসতে আসতে চারদিকে তাণ্ডব বর্ষণ ও সকলের মনে ত্রাস সঞ্চার করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন এই হুগলীতে।

তারপর এল আর-এক হাঙ্গাম— এল বর্গীরা। সুদূর নাগপুরের পার্বত্য অধিত্যকা ভেদ করে বের হল একদল ঘোড়সওয়ার— তাদের হাতে তীরধনুক, কোমরে তরোয়াল, বুকে সাহস ও চোখে হিংস্রতা। সুবেবাংলাকে মোগলের হাত থেকে মুক্ত করে নেবার জন্যে মারাঠীদের এই অভিযান। তাদের একমাত্র দাবি— খাজনা। দেশের মানুষের সবনাশ ক'রে তাদের গৃহছাড়া করেও তাদের তৃপ্তি নেই, তারা চায় টাকা। বলে, খাজনা আনো— রুপেয়া লাও। বিশ হাজারের বেশি বর্গী নিয়ে বনজঙ্গল-নদনদী অতিক্রম করে বাংলার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন ভাস্কর পণ্ডিত। চতুর্দিকে হাহাকার বেজে উঠল তাদের অত্যাচারে। বহু গ্রাম ও জনপদ পার হয়ে তারা এসে উপস্থিত হল এখানে— দখল করে নিল এই হুগলী।

ওদিকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে কলকাতা। ভাগীরথীর পশ্চিম পারই ছিল সমৃদ্ধ, নদীটা পার হয়ে সেই সমৃদ্ধি ক্রমশ গিয়ে জমা হয়ে উঠেছে ওই পারে। কিন্তু সে ইতিহাস আলাদা।

অনেক ইতিহাস পার হয়ে আমরাও আজ এসে উপস্থিত হয়েছি হুগলীতে।

এখন এ-জায়গাটা আর নামহীন একটি গুদামঘর মাত্র নয়, এ এখন একটা নগরী। চারদিকে দোমহলা তিনমহলা কোঠাবাড়ি উঠেছে। বিদেশী বণিকের সংস্পর্শে এসে অনেক দেশী মানুষ এখন হয়ে উঠেছে ধনশালী। কেবল ঐশ্বর্য নয়, ঐশ্বর্যের সঙ্গে এসেছে জাঁকও। বিগতকালের অত্যাচার ও অনাচারের চিহ্ন এর মাটি থেকে প্রায় মুছে গেছে, এবং সেই সঙ্গে হয়তো মানুষের মন থেকেও। কিন্তু সবটা বুঝি মুছে যায়নি। এখনো সেই অত্যাচারের রেশ ছড়িয়ে আছে হয়তো দু-চারটি ছড়ায়।

আমরা এসেছি এই হুগলীতে। চারদিকে চেয়ে বিস্মিত হচ্ছি আমরা। এত আঘাতে এত অত্যাচারে যে-মাটি মরে না, সে-মাটির প্রাণ তবে লুকানো কোথায়? ঐ নদীটার অগাধ অতলে কোনো সোনার কৌটোতে কেউ তবে লুকিয়ে রেখেছে নাকি সেই প্রাণটি?

প্রাণের দেখা পাওয়ার কিংবা সেই প্রাণের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে লালসা নেই আমাদের। আমরা কেবল এসেছি এই স্থানটি দেখতে।

কদম্বকে ফেলে এসেছি সেই তেঁতুলতলার অন্ধকারে। সেই অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসে সে আমাদের দৃষ্টির নেপথ্যে চলে গেছে বটে, কিন্তু মন থেকে হয়তো এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। এখনো মনের নেপথ্যলোক সন্ধান করলে বর্ষার কদম্বপুষ্পের মত আমাদের সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে কণ্টক এড়িয়ে আমরা চলব এখন। আমরা শুভকার্যে যোগ দিতে এসেছি, মনে এখন শুধু মাত্র শুভচিন্তা ছাড়া আর-কোনো চিন্তা এখন আমাদের নেই।

শোকের শীত কেটে গেছে। মধুমাস এসে উপস্থিত হয়েছে বনে-বনান্তরে। ফাল্গুন-বাতাসের স্পর্শে পুলকিত ও পুষ্পিত হয়ে উঠেছে বন আর উপবন।

এখানেও চারদিকে পুষ্পের সম্ভার।

সোজা রাস্তা। আঁকাবাঁকা গলি। গাছ আর আগাছায় ভরে উঠেছে পথের দু ধার। বাবলা-বনে হলুদ বর্ণের ফুল উঠেছে ফুটে, কাঁটাজবার বনে রক্তের যেন ছড়াছড়ি, কৃষ্ণকলির ডালে-ডালে রঙের রোশনাই। ঝাউঝাড় হাওয়ায় দুলে দুলে আকাশের গায়ে চামর বীজন করছে।

ফুলের সমারোহ চলে গেছে সোজা চুঁচুড়া অবধি— রূপচরণের প্রাসাদ পর্যন্ত। সেখানে আজ বধূবরণের উৎসব। পালকির শোভাযাত্রা ক'রে লোক-লস্করের জনতার মধ্যমণি হয়ে ফরাসগঞ্জের রাধা আজ আসবে তার শ্বশুরবাড়ি।

হুগলীর পথে-পথে ঘুরছে লোকজন। চুঁচুড়ার উৎসবের কাহিনী এখানেও সকলের মুখেমুখে। রূপচরণ যা আয়োজন করেছেন তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া নাকি কারো সাধ্য নয়। সে নাকি এই হুগলী-চুচুঁড়ার ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। কাশিমবাজারের মহারাজা কান্তবাবু তাঁর পুত্র লোকনাথের বিবাহ দিয়েছিলেন খুব ঘটা করে, আজও লোকের মুখে তার আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু চুঁচুড়ার বেনিয়ান রূপচরণ বুঝি মহারাজার সেই কীর্তিকেও ম্লান করে দিতে উদ্যত হয়েছেন।

পথের ধারের কুয়োতলায় ভিড জমেছে মেয়েদের, কারো কোলে ছেলে, কারো কাঁকালে কলসী। তারা বুঝি রূপচরণের কাণ্ড শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।

আরনাকালীর বুক নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল কোলের ছেলেটা, তাকে একটা ধমক দিয়ে কাঁধের উপর উপুড করে ফেলে সে তিন্নুর মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, লোকটা ডাকু নাকি। বিশু-বাগদীকে ধরতে চায় কোম্পানি, এটাকে ছেড়ে রেখেছে কেন। অত টাকা মানুষটা পায় কোথায়?

—পায় কোথায়? মাগীর কথার ছিরি দেখ। ডাকুগিরি না করলেই বুঝি টাকা হয় না? আমাদের মহসীন পেল কোথায়?

ফিক করে হেসে উঠল আরনাকালী, বলল, সে কথায় কাজ কি তিন্নুর মা। কার টাকা, কে করছে খয়রাত। কিন্তু রূপচরণের মা'ও বিধবা হয়ে অমনি নিকে করে রূপচরণের জন্ম দিয়েছে বলে তো শুনি নি।

—যাক মা। তিন্নুর মা বুঝি হার মেনে নিল, বলল, অমন ধাম্মিক মানুষকে নিয়ে এ-রকম আলাপ করতে চাই না, আন্না।

কারফরমার বাড়ির বউ এলোকেশী পিঠময় চুল ছড়িয়ে কোমরে কলসী নিয়ে এসে দাঁড়াল। বলল, হল কি, তিন্নুব মা।

—কিছুই না বাপু। কথা হচ্ছিল চুঁচড়োর রূপচরণকে নিয়ে। তার মধ্যে আন্নাটা তুলল বেআক্কিলে কথা। যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া— এও হয়েছে তাই।

—কি, হয়েছে কি রে আন্না?

—আর না ভাই আর না। ওই ভাতারখাগীর সঙ্গে কথা বলে কে।

তিন্নুর মা এই কথা শুনে তেতে উঠল, বলল, পুতের মাথা খা তুই। যে-কুয়ো থেকে জল নিতে এসেছিল, এ-কুয়ো পিতিষ্ঠে করেছে কে? আমি

নাহয় ভাতার খেইছি, তুইও কি চোখের মাথা খেয়েছিস লা? এই কুয়ো থেকে জল খেয়ে বাঁচছিস, নইলে ঐ গঙ্গার জল খেয়ে ওলাউঠা হয়ে কবে তুই মরতিস।

এলোকেশী তার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে জড়াতে-জড়াতে বলল, কি ঝগড়া আরম্ভ করেছ এই পথের ধারে। বলি, ব্যাপারটা কি।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই না। আরনাকালীই বুঝিয়ে বলতে লাগল। কথাটা রূপচরণকে নিয়ে, তার ছেলের বিয়ের ঘটা নিয়ে। তার টাকা নিয়ে। কথায় কথায় উঠল মহম্মদ-মহসীনের কথা। শুধু মাত্র ডাকুগিরি করেই তো মানুষ টাকা পায় না, তার অন্য পথও আছে। আমাদের বুড়ো মহসীন যেমন পেয়ে গেছে। সে যেমন দান-ধ্যান আরম্ভ করেছে। আরনাকালী বলল, তাই, বলার মধ্যে শুধু বলেছি, কার টাকা কে করে খয়রাত। অমনি ঐ বুড়োমাগী মারতে এল?

—মারতে উঠেছি লা হারামজাদী, মারতে উঠেছি? প্রায় তেড়ে এল তিনুর মা, বলল, কোলে ছেলে নিয়ে গিদের দেখানো হচ্ছে। কিন্তু মার কা'কে ব'লে জানো না? স্বামীর হুড়ো খাওনা নিত্যি রাতে। কত্ কত্ ক'রে কেঁদে ওঠা আসে না এই কানে? স্বামী খেইছি বটে, এই কান-দুটো তো খাই নি, চোখ-দুটো তো খাই নি। পুত কাঁকালে করে এসেছিল না এই কুয়োতলায়?— জানতে কিছু বাকি নেই। যার সর্বাঙ্গে কলঙ্ক, মহসীনের জন্ম নিয়ে কথা বলতে আসে সে, চোখের চামড়া নাই।

গাঁয়ের লোকের সুবিধের জন্যে এই কুয়ো প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন মহম্মদ মহসীন। তাঁর প্রতিষ্ঠা-করা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে তাঁর সম্বন্ধে ঐ ধরণের আলোচনা শুনে তপ্ত হয়ে উঠেছে তিনুর মা। অকথ্য ভাষায় অনর্গল গালি দিতে লাগল সে আরনাকালীকে।

এলোকেশী আর বাধা দিল না। এই ঝোঁকে অনেক মজার কাহিনী জানা হয়ে যাচ্ছে তার। মুচকি-মুচকি হাসতে হাসতে সে আরনাকালীর মুখের দিকে চাইতে লাগল।

ছেলের মুখ বুকের মধ্যে গুঁজে নিয়ে আরনাকালী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনুর মা দম নেবার জন্যে থামার সঙ্গেসঙ্গে সে বলে উঠল, আমার নামে যা-সব বললি সব যদি সত্যিই হয়, তাতে ঐ মানুষটা সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমি যা বলেছি, ঠিক বলেছি। কুয়ো খুঁড়ে দিয়েছে বলেই তার সব দোষ কি গুণ হয়ে যাবে? যাবে না, যাবে না, যাবে না।

কারফরমার বাড়ির বউ জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করল। বলল, এমন কোন্দলও জান তোমরা বাপু। যাকে নিয়ে তোমরা এখানে চুলোচুলি করছ, সে হয়তো এখন কোরান নিয়ে ডুবে আছে। তার কানেও যাবে না এসব কথা, এসব কথা নিয়ে মাথাও ঘামাবে না সে।

ওদিকে মুদিখানায় সওদা করতে এসে খরিদ্দার দোকানীর সঙ্গে জিনিসপত্রের দর নিয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ বলে ফেলছে চুঁচড়োর ঘটার কথা।

কামারশালায় হাঁসফাঁস করে হাঁপাচ্ছে হাপর। নেহাইয়ের উপর গনগনে লাল লোহার পিণ্ড রেখে হাতুড় দিয়ে পিটতে গিয়ে চমকে থেমে যাচ্ছে হাতুড়িয়া। কিসের শব্দ বুঝি কানে এসেছে তার। চুঁচুড়ার সানাই না?

ঘোষালের চৌপাডীতে বসে ধারাপাত মুখস্ত করতে-করতে ছেলেদের ভুল হয়ে যাচ্ছে শতকিয়া। শুভঙ্করীর আর্যা পড়ছে আর-একদল

কুর্বা কুর্বা কুর্বা লিঝ্যে
কাঠায় কুর্বা কাঠায় লিঝ্যে
কাঠার-কাঠায় ধুল পরিমাণ—

এই পর্যন্ত বলেই গুরুমশায়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করছে, রাস্তা ধুলোময় হয়ে যাবে আজ, তাই না গুরুমশায়।

চৌচালা ঘর, চুড়োটা খুব উঁচু, কিন্তু চারটি চালের কিনার প্রায় এসে ঠেকেছে মাটিতে, ভিতরটা আলো-আঁধারি, টুলে বসে ঢুলছিলেন বুড়ো গুরু, চমকে চেয়ে বললেন, ধারাপাতের মধ্যে ধুলো এল কোথা থেকে রে?

—এখন আসেনি। কিন্তু বিকেলে আসবে।

—কেন, বিকেলে কি?

পোড়োরা আশ্চর্য। তারা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। আজ বিকেলে কী, তা জানে না তাদের গুরুমশায়? ওই রাস্তা দিয়ে যে যাবে মিছিল— বর-বউ যাবে চুঁচুড়ায়।

চালে গোজা ছিল বেত, সেটা পেড়ে নিয়ে গুরুমশায় কাঠ হয়ে বসে বললেন, জেগেই ছিলাম। দেখছিলাম, তোরা কতদূর যাস। সব পড়্, শট্‌কে পড়্।

পোড়োটা সট্‌কে পড়াব জন্যেই ব্যাকুল। বিকেলের মিছিলের জন্যে তারা বড চঞ্চল হয়ে আছে। কিন্তু উপায় নেই ব'লে তারা সমস্বরে পড়তে লাগল— একের পিঠে এক এগারো, একের পিঠে দুই—

কিন্তু তাদের মনে পড়তে লাগল অন্য কথা— হাতির পিঠে হাওদা ঘোড়ার পিঠে জিন, জলদি চল জলদি চল ওয়ারেন হেষ্টিন।

ওদিক থেকে আজানের হাঁক আসছে মুকদুম-সাহেবের দরগা থেকে।

দরগার অদূরেই ইমামবাড়া। ইমামবাড়ার অভ্যন্তরে কোরান হাতে নিয়ে বসে আছেন একটি বৃদ্ধ। অতিসাধারণ মানুষের মত তাঁর চেহারা, কিন্তু চোখ-দুটির মধ্যে যেন কত করুণার ছাপ। গায়ে খাটো একটা কুর্তা।

মহম্মদ মহসীন। পুরো সাতাস বছর বাদে ফিরে এসেছেন হজ থেকে বছর-তিন-চার আগে। হজ থেকে ফিরে হয়েছেন হাজী।

এই ইমামবাড়া তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন আগা মোতাহার খাঁ, কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই লোকান্তরিত হন তিনি। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন তাঁর কন্যা মান্নুজান ও জামাতা সলালউদ্দীন। ইমামবাড়ার ভিতরে তাজিয়া রক্ষিত আছে— মহরম হয় এখানে। দলেদলে লোক আসে সেই ধর্মানুষ্ঠান দেখতে।

অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হাজী মহম্মদ মহসীন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন কপর্দকশূন্য এক দরবেশ। যে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী তিনি হয়েছেন, সম্প্রতি তা সবই দান করে মহসীন-ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছেন। এখন সত্যিই তিনি কপর্দকহীন। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যে সবই তিনি সমর্পণ করেছেন ঐ ভাণ্ডারের হাতে।

সত্তরের বেশি বয়স এখন মহসীনের। তিনি বসে বসে কোরান পাঠ করছেন, ধর্মানুরক্ত শ্রোতারা বসে সেই কোরান-বাণী শুনছে।

এই ইমামবাড়া তৈরি আরম্ভ করেন আগা মোতাহার খাঁ। শতবর্ষের কিছু বেশি হবে, দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে জায়গীরদারী নিয়ে এই হুগলীতে এসে উপস্থিত হলেন এক ইস্পাহানী সওদাগর, ইনিই আগা মোতাহার খাঁ। পোর্তুগিজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসায়ের এই পীঠস্থানে এই সওদাগর আরম্ভ করলেন তাঁর সওদাগরী। অল্পদিনের মধ্যেই হুগলীতে তিনি হয়ে উঠলেন প্রায় দ্বিতীয় বঙ্গেশ্বর, বাংলার অদ্বিতীয় অধীশ্বর তখন মুর্শিদ কুলী খাঁ।

এই ইস্পাহানী সওদাগর আগা মোতাহারের এক মাত্র কন্যা মান্নুজান। মান্নুজান তখন শিশু, সেই সময়ে অকস্মাৎ আগা মোতাহারের মৃত্যু হল। কিছুদিন পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী বিবাহ করলেন আর-এক পুরুষকে— তাঁর নাম আগা ফয়জুল্লা। মহসীন এই ফয়জুল্লার পুত্র

মহসীন উদাস প্রকৃতি নিয়েই বুঝি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। গৃহে বসে গৃহ-শিক্ষকের কাছে পাঠ করে তিনি আরবি ও ফরাসীতে ব্যৎপত্তি লাভ করলেন। পরে মুর্শিদাবাদে গিয়ে কিছুকাল শাস্ত্রপাঠ করে তিনি বহির্গত হলেন দেশভ্রমণে— এবং গেলেন মক্কায় হজ্ব করতে।

দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে এসে দেখেন মান্নুজান ইতিমধ্যে বিধবা হয়েছে। তার হাতে তার পিতা আগা মোতাহারের বিপুল সম্পত্তি। স্ত্রীলোককে প্রবঞ্চনা করে তার সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য প্রতারকরা চতুর্দিকে ব্যস্ত। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে হাজী মহম্মদকে সেই সম্পত্তি দেখাশুনার ভার নিতে হল বাধ্য হয়ে।

তার পর, অল্পদিনের মধ্যে মান্নুজানেরও মৃত্যু হল। আগা মোতাহারের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হলেন সন্ন্যাসী এই মানুষটি— মহসীন।

মহসীন তখন প্রকৃতই বৃদ্ধ। শরীরও অবসন্ন, মনও উদাসীন।

এই অতুল সম্পত্তি দেখাশুনা করতে পারে বংশে এমন আর দ্বিতীয় মানুষ নেই। নিজেও অবিবাহিত, এবং বৃদ্ধও হয়েছেন। সুতরাং ওয়াকফত-নামা লিখতে হল। উইল লিখে সমস্ত সম্পত্তি একটি ট্রস্টের হাতে দিয়ে দিতে হল। শর্ত রইল শুধু মাত্র একটি— দেশের ও দশের সেবায় ব্যয়িত হবে এই অর্থ।

আরনাকালীর মন্তব্যটি বুঝি এইজন্য, সে বলছিল,, কার টাকা, কে করছে খয়রাত।

কারফরমার বাড়ির বউটি আরনাকালীকে চুপিচুপি ডেকে কি-যেন বলতে বলতে ও শান্ত করতে করতে নিয়ে গেছে কুয়োতলা থেকে, এইটুকু মাত্র শোনা গেছে— চল চল, পালিয়ে চল। অমন দশায় পড়লে আমরাও দাতা হতে পারি— দাতাকর্ণ। খরচ নেই, হাঙ্গামা নেই।

কিন্তু দেশের সব মানুষ কারফরমার বাড়ির বউ নয়, সকলেই আরনাকালীর মত মুখরা নয়। হাজী মহম্মদের উপর তাই সকলের ভক্তি ঐ তিনুর মায়ের মতই।

ইমামবাড়ার প্রশস্ত রোয়াকে বেরিয়ে এলেন মহসীন। ছোট-খাট দেখতে মানুষটি, কিন্তু মনটি বুঝি তাঁর শরীরের মত ক্ষুদ্র নয়। উঠোনে জমায়েত ভিখারীরা তাঁর দেখা পেয়ে উল্লাস করে উঠল। মহসীনের নির্দেশ পেয়ে তণ্ডুল বিতরণ শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে। মহসীন তাদের মধ্যে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন নানা কথা। তারা মহসীনকে এত কাছে পেয়ে ধন্য বুঝি হয়নি, তারা হয়েছে আশ্বস্ত। তারা ভিক্ষাজীবী বটে, কিন্তু গৃহস্থের দুয়ারে-

দুয়ারে গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে না তাদের। তারা কেবল মহসীনের দরজায় এলেই ঝুলি পূর্ণ হচ্ছে।

নাম ছড়িয়ে পড়ছে দিকে-দিকে। ঐ যারা নিয়ে যাচ্ছে তণ্ডুল তারাই ওঁর নামকীর্তন করতে-করতে চলে যাচ্ছে। আর তাঁর দানের টাকা দিয়ে চারদিকে মাদ্রাসা গড়ে উঠছে, বাংলাদেশের সর্বত্র— ঢাকা চট্টগ্রাম হুগলী রাজশাহী। পুব-বাংলা পশ্চিম-বাংলা ও উত্তর-বাংলায় ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর নাম।

কিন্তু রূপচরণের তো অর্থ এভাবে পাওয়া নয়। তাঁর আয়োজনের বহর দেখে মনে হচ্ছে তিনিও যেন তাঁর সমুদয় সম্পত্তি ও সম্পদ সমর্পণ করেছেন এক ট্রস্টের হাতে. শর্ত হল, সব অর্থ ব্যয়িত হবে একটি কাজে— পুত্রের বিবাহে।

একটি মাত্র পুত্র তাঁর। আর কোনো সন্তান নাই, আর কোনো দায় নাই। বেঁচে থাক্ ইংরাজ, আর আয়ু লাভ করুন তিনি নিজে। তাহলেই বেনিয়ানি করে তিনি এর চতুর্গুণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন দু-চার বছরে।

ইমামবাড়ার গা থেকেই ঐ দেখা যাচ্ছে গঙ্গা। ওপারে ঐ হালিশহর। নদীর জল নৌকোয় ও নৌকোর পালে পরিপূর্ণ। কত নৌকো তার অন্ত নেই। পানসী বজরা ভাউলে। পাটনা থেকে নৌকা-বোঝাই হয়ে আসছে সোরা। দূরের গঞ্জ থেকে চিনি লবণ মসলা। এসব প্রত্যহের যাত্রা, কিন্তু আজ নদীর চেহারা আলাদা। শৌখিন নৌকোই আজ বেশি। বিবিধ বাদ্য বাজছে নৌকোয় নৌকোয়। জলের স্রোত ধরে ভেসে আসছে চুঁচুড়ার সানাইয়ের সুর —বড় করুণ শোনাচ্ছে ঐ সুরটি। এই উৎসবের দিনে অমন করুণ ভাবে বাজছে কেন ঐ বাঁশি? ঐ সুরের আঘাতেই বুঝি রোদের নীচে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে চলেছে গঙ্গার স্রোত।

এখন ফরাসগঞ্জের আয়োজন কত দূর অগ্রসর হল, আমরা জানতে পারছি নে। রাধা এখন কোন্ ঘরে কি সাজে বসে আছে, আমগাছের নীচের বড় উঠোনটি কোন্ সাজে সজ্জিত হয়েছে, নালা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা— সে খোঁজ রাখার সুবিধে আমাদের এখন নেই। আমরা এখন চুঁচুড়ার পার্শ্বে হুগলীতে বসে অপেক্ষা করছি তার আগমন।

এই উৎসবের দিনে কদম-মাসির কথা কি মনে পড়ছে রাধার? রাধার বিবাহ দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল যে, বার-বার করে যে বলত রাধা যেন মনে

রাখে তার কদম-মাসিকে, তার কথা এখন মনে পড়ার কথা নয় রাধার। সে এখন নববধূর সাজে সজ্জিত হয়ে ব'সে সলজ্জ দৃষ্টি নিজের কোলের উপর নিবদ্ধ রেখে হয়তো ভাবছে তার নতুন জীবনের কত-কি সম্ভাবনার কথা। তার পাশেই বসে আছে তার জীবনের নতুন সঙ্গী। সে-সঙ্গীর মুখের দিকে তাকাবার শক্তিও নেই, সুযোগও নেই। কেমন যেন দেখতে ঐ মুখটা? ভুলে গেছে রাধা। শুভদৃষ্টির সময়ে অতগুলি এয়োর চোখের দৃষ্টির মধ্যে কি ভালো করে দেখা যায় কোনো মুখ?

রাজরানী হতে চলেছে রাধারানী। কেমন-কেমন ভয় করছে বুঝি তার। তার ঐ ফরাসগঞ্জের সেই সাধারণ সংসারের তুল্য আর-একটি সংসার যদি সে পেত এই উৎসবের মধ্য দিয়ে, তবে বুঝি এমন ভয় তার করত না। গরিব-ঘরের মেয়ে সে, এজন্যে নিশ্চয় কেউ সেখানে তাকে অবজ্ঞা করবে না, অবহেলা করবে না? কিন্তু বড-বড ঘরের ছেলেদের নামে সে আজে-বাজে গল্প শুনেছে কত— সেসব সত্যি না বলেই সে বাঁচে। আর, হোক-না সত্যি, নিজের উপর বিশ্বাস আনতে চেষ্টা করছে বুঝি রাধা, সত্যি যদি হয়ই— হোক। রাধা তার নিজের চেষ্টা দিয়ে নিষ্ঠা দিয়ে প্রেম দিয়ে প্রীতি দিয়ে সেসব মিথ্যে করে দেবে।

হুগলীতে হাওয়া উঠেছে ফুরফুরে। রাস্তায় লোক-চলাচলের বিরাম নেই। ইমামবাডার গা দিয়ে সরু রাস্তা গিয়েছে এঁকে-বেঁকে, নদীর কিনার থেকে নগরীর মধ্যে। দু-পাশে অপরাজিতার অরণ্য, সিসু-গাছের ডাল জড়িয়ে জডিয়ে উঠেছে তার লতা। নীল রঙের ফুল সবুজ এই বনে অপরূপ শোভার সমারোহ সৃষ্টি করেছে।

পেয়ারা গাছের গায়ে চটা উঠছে। তার ডালে এসে বসেছে দুটো সবুজ টিয়া।

পাশেই খোড়ো ঘরের দাওয়ায় বসে হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে ছেলেকে ঘুম পাডাচ্ছে দিনু বসুর সেজকন্যা। হাঁটু দোলাচ্ছে আর ঝিনুক দিয়ে বাজাচ্ছে বাটি, সুর করে বলছে—

ছেলে ঘুমালো পাডা জুডালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।

কিন্তু ছেলের চোখে ঘুম নেই। মায়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে মায়ের ঠোঁট-দুটোর ওঠা-নামা দেখছে সে একমনে।

ক্লান্ত হয়ে পড়ল বুঝি দিনু বোসের মেয়ে। ছেলেকে সস্নেহে ধমক দিল এবার— ও রে দস্যি ছেলে! চল্‌, দিয়ে আসি বর্গীর হাতে, নিয়ে যাক ভাস্কর পণ্ডিত।

কিন্তু ওতে কোনো ভয় নেই শিশুটির। মায়ের পাথাল কোলে শুয়ে সে পরম নিরাপদে আছে।

দিনু বোসের মেয়ে বলতে লাগল, না ঘুমালে এখন। কিন্তু বিকেলে যদি না ঘুমোও, ঠিক ধরিয়ে দেব জুজুবুড়িকে দিয়ে। নতুন বউ আসবে আমাদের চুঁচড়োয়, জানিস নে বোকা? আমাকে দেখতে যেতে হবে না? মিসলবন্দী হয়ে আসবে কত মানুষ, কত পালকি, কত ঘোড়া, কত হাতি।

আবার সুর করে সে বলতে লাগল নিজের মনের মত ছড়া—

ও রে সোনা রে জাদু সোনা রে, ঘুমো রে আমার সোনা।
তোর দুয়োরে দিব রে জাদু অনেক খাজোনা।

কিন্তু ঘুমোবার সাধ নেই জাদুর। মায়ের এই স্নেহের খাজনা আদায় করার জন্যে সে জেগে শুয়ে থাকতে চায়। কখনো মায়ের মুখে কখনো ঐ পেয়ারা গাছের টিয়াপাখির দিকে চোখ মেলে তাকাচ্ছে সে।

ছেলের এই তামাশা দেখে মায়ের খুশি বুঝি ধরে না, বলছে—

আমার সোনা লাল-টুকটুক— টিয়াপাখির ঠোঁট,
দেখবি কে কে রূপের বহর, এই উঠোনে জোট।

দেখতে দেখতে সত্যিসত্যিই উঠোন ভরে গেল অনেক মানুষে। টিয়া-পাখির ঠোঁট দেখার জন্যে নয় অবশ্য, এদের আসার কারণ অন্য।

অনেক বউ ও অনেক ঝি এসেছে দিনু বোসের উঠোনে। ফরাসগঞ্জ থেকে বড় সড়ক ধরে আসবে রূপের মিছিল, সেই রূপ দেখার জন্যে এরা সব লালায়িত কিন্তু তাদের দেখে কে?

কারো পরনে গড়া-শাড়ি কারো পরনে মিহিন, কিন্তু ঐ মোটা আর মিহিতে শরীরের সুঠামের কোনো ইতর-বিশেষ হয় নি। গাঁয়ের মানুষের স্বাস্থ্যই বুঝি এমন, গা উপছে পড়তে চায়।

সেই উপছানো শরীর নিয়ে তারা কলকল শব্দে কথা বলছে উঠোনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের গলার শব্দে পেয়ারা গাছের টিয়ারা চম্পট দিয়েছে।

— রূপচরণের ব্যাটা আজ বউ নিয়ে আসছে রে! দেখবি কোন্‌ চুলোর

দুয়ারে দাঁড়িয়ে ? সব ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়েছে মদ্দা মানুষেরা। তারা মাচা তয়ের করেছে, মাদুর বিছিয়ে ব্যাটারা ল্যাটা পেড়ে বসেছে ঐ মাচায়।

হরিমতির গলা শুনে খলখলিয়ে হাসতে লাগল সকলে।

কোঠমাদের বাড়ির আইবড় মেয়েটি এগিয়ে দাঁড়াল দুই কোমরে হাত রেখে, সেই ভঙ্গিতে দাঁড়ালে তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরানো দায়, সে বলল, থাম্ বাপু তুই হরিমতি। ব্যাটাদের দেখে ভয় কি। জায়গা না ছাড়ে তো তাদের কাঁধে চেপে বসব।

জিব কাটল হরিমতি, সে বুঝি দৃশ্যটা একবার আন্দাজ করে নিয়েছে, বলল, আহা হা, কী সুন্দর মানাবে, মরি মরি। তুই তাই চড়িস।

কোঠমা-বাড়ির মেয়ে কোমর থেকে হাত নামিয়ে দুই হাত তুলে এলোচুল জড়াতে জড়াতে এগিয়ে দাঁড়াল, বলল, আর তুমি কি করবে ?

ফিক করে হেসে হরিমতি বলল, আমাকে রাখিস তুই ওই বুকে। না কি, ওর জন্যে কারো দাদন নিয়েছিস ?

নিস্তারিণী কালীতারা আর মোক্ষদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদের কলকলানি শুনছিল। দিনু বোসের মেয়েও বারান্দা থেকে নেমে এসেছে উঠোনে। এমন সময়ে এসে ঢুকল কারফরফার বউ।

— এই যে এলোকেশী, কামিনী কি বলে শোনো।

— কি বলে ?

—বলে, মিসলবন্দী হয়ে আসবে ঐ বর-বউ, ও নাকি তাই দেখার জন্যে কার কাঁধে উঠবে।

কামিনী কোঠমার কানে কথাটা যেতেই সে বলল, আর আর আর। তুমি নাকি উঠবে কার বুকে ?

— না বাপু। হরিমতি একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, কে জানে কে বায়না করে গেছে, ওতে হাত দিয়ে জেহেলে যাব ?

এলোকেশী আগে ব্যাপারটা বুঝে নিল, তার পর বিন্দুর সারা গায়ে চোখ বুলিয়ে বলল, আমারো একটু লোভ হচ্ছে, একটু তামাশা করতে সাধ জাগছে লা বিন্দু। কিন্তু মনে পড়ছে আরনাকালীর কথা। কার ধন নিয়ে কে করবে খয়রাত।

কেউ কিছু বুঝল না দেখে এলোকেশীকে সবটা খুলে বলে বুঝিয়ে দিতে হল। তারা এখন কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে হেসে আকুল হয়ে যেতে লাগল। সে হাসি বুঝি থামে না।

কালীতারা এখন মুখ খুলল, বলল, তা তো সত্যিই, তা তো সত্যিই। ঐ চিনির কল বসেছে, তার বলদের মত দশা শুধু কামিনীরই নয় লো। আমাদের সকলেরই। আমরা কেবল বয়েই বেড়াব। মালিক এসে করবেন ভোগদখল।

সবাই ঢলাঢলি করে হাসতে লাগল।

কামিনী বলল, তবেই বোঝো হরিমতি। দাদন নেওয়ার বা বায়না নেওয়ার মালিক তবে আমাকে ভাবছ কেন?

হরিমতি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে। এবারকার মত মাফ করে দাও কামিনী।

হয়তো মাফ করে দিল কামিনী। কিন্তু তার মন বুঝি একটু উদাস হয়ে গেল। এই ফাল্গুনের মিষ্টি হাওয়ায় মন তেতো করতে ভালো লাগে না। তাই হাসি দিয়ে আর খুশি দিয়ে মন মাতিয়ে রাখতে হয়। আজ তাই ঐ মিছিলের পদশব্দ শোনার জন্যে সারা মন ব্যাকুল করে রেখেছে সে। কিন্তু এই ব্যাকুলতার অন্দরমহল একটু তালাশ করলেই হয়তো ব্যাকুলতার আসল হেতু চোখে পড়ে যাবে।

ঠিক হল, নন্দীদের কুলগাছ। ঐখানে মেলা করে দাঁড়াবে তারা। ওখানে কোনো মাচা পড়ে নি এখনো।

কোমরে চন্দ্রহার দুলিয়ে আগে-আগে হেঁটে চলে গেল কালীতারা। রুপালি সাপ যেন নিবিড় বেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছে চন্দনবৃক্ষ। মিহি কাপড় ভেদ করে কালীতারার শরীরের শুভ্রবর্ণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একে দেখে অন্য একজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সে হচ্ছে গরিটির নিরুপমা। ঐ সাপকে তাড়া করে পিছন-পিছন চলল বুঝি একদল বেজি— মোক্ষদা এলোকেশী কামিনী নিস্তারিণী।

বোসেদের বাড়ির উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছে খোকা। ঘরের মধ্যে তাকে শুইয়ে দিয়ে এল মল্লিকা।

বেলা হয়ে এসেছে। আর দেরি করা ঠিক না। স্নানের জন্যে তৈরি হতে লাগল মল্লিকা।

প্রস্তুত হয়ে সে নামল এসে কুয়োতলায়। হিম জল। নীচের ঐ অগাধ অতল থেকে জল টেনে তুলে ঢালতে লাগল মাথায় ও গায়ে।

আমরা এখন এখানে দাঁড়াব না। সে নিশ্চিন্ত মনে স্নান সেরে নিক, আমরা সরে দাঁড়াই।

মিছিলের রাস্তা ঠিক হয়েছে বেশ লম্বা— পাঁচ ক্রোশের উপর। সোজা

চু চুড়ায় নয়, অনেকটা ঘুরে হুগলী হয়ে যাবে ঐ মিছিল। ফরাসগঞ্জ থেকে গরিটি হয়ে ভদ্রেশ্বর, তার পর দিগরা বিঘাটি হাকিমপুর বেণীপুর বাগডাঙা নোয়াপাড়া যাদবপুর জগন্নাথবাটী সুগন্ধা রাজহাট দেবানন্দপুর মানুষপুর ব্যাণ্ডেল বাল্লি হুগলী— তারপর চুঁচুড়া।

এই ঘুরপথে এসেছে বলে হুগলীবাসীর আজ এই আনন্দের সুযোগ ঘটেছে। সড়কের দুই ধারে তাই বসে গেছে মানুষের মেলা। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যেই আজ সীমাহীন উল্লাস। যেমন শোনা যাচ্ছে, এমন উৎসব এ অঞ্চলে কখনো হয় নি। নিজেদের চোখে এই ঘটা দেখার জন্যেই তাই এত কৌতূহল। দুই লক্ষ টাকা খরচ করছেন নাকি রূপচরণ। কাশিমবাজারের কান্তবাবু তাঁর পুত্র লোকনাথের বিবাহ দিয়েছিলেন খুব ঘটা করে, সুসার-মোহিনীকে ঘরে এনেছিলেন অনেক জাঁক করে— সে-জাঁকের অনেক গল্প শোনা যায়। সারা গাঁয়ের লোককে নিমন্ত্রণ করে তিন দিন ধরে খাইয়েছিলেন। কিন্তু রূপচরণ কাশিমবাজারের মহারাজাকেও ছাড়িয়ে যেতে চান নাকি?

ঐ পাওয়া যাচ্ছে গড়ের বাদ্যের শব্দ। ব্যাণ্ডেল বুঝি পেরিয়েছে ইতিমধ্যে। সমস্ত জনতা ব্যাকুল কৌতূহল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিকালের পড়ন্ত রোদ গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে পথের ধুলোর উপর। আবছা আলপনার মত চিত্রিত হয়েছে ঐ ধুলো। সত্যি, কী ভাগ্যবতী ঐ মেয়েটি। ওর জন্যে এত মানুষের মেলা তো বসেছেই, ওর জন্যে ঐ পথে আঁকা হয়ে গেছে আলপনাও?

নন্দীদের কুলতলায় জড়ো হয়েছে ওরা। ওরা বলাবলি করছে নানা কথা। সে কথার বিরাম নেই, লাগামও নেই সে কথার। অনেক রসের কথা হচ্ছে এবং অনেক তামাশার। ও-পাশের বকুলতলার মাচায় বসে গোঁফ চুমরে চুমরে এদের দিকে চেয়ে দেখছে কয়েকটা জোয়ান। কামিনীর দিকেই বুঝি চোখ তাদের বেশি। কামিনী সেটা বুঝছে, এবং বুঝছে ব'লেই ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি। কখনো হাত বাড়িয়ে কুলের ডাল ধরছে, কখনো পিছন দিক থেকে কালীতারার গলা জড়িয়ে ধ'রে থুৎনিটা তার কাঁধে রেখে ইতিউতি চাইছে।

ঐ মাচা থেকে গান ভেসে আসছে—

কুলের কাঁটা বিষম কাঁটা
বিঁধলে কাঁটা খসান্ দায়।
চল্ বঁধুয়া চল্ রে চুঁচুড়ায়।

কালীতারার কানে-কানে কামিনী বলল, শোন্, শুনছিস? ঐ শিমুলেদের বচন শোন।

বেশ জমে উঠেছে পথের কিনার। বকুলতলার মাচায় গান থামছে না, হাঁটু পিটে-পিটে তারা গেয়ে চলেছে—

কোন্ সে কুলের কামিনী গো, কোন্ কুলেরই কুলবালা
কার গলাতে দোলাব রে, এই বকুলের বকুলমালা।

কামিনী ফিসফিস করে বলতে লাগল, তোর বোনের গলার দিগে যা।

কালীতারা হাসতে লাগল কামিনীর কথা শুনে।

ব্যাগপাইপের আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠছে। বকুলতলার মাচার গান থেমে গেছে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে মাচার উপর।

হঠাৎ বেসুরো একটা আওয়াজ কানে এল, অন্য ধরণের একটা শব্দ। সকলে কান পাতল।— হরিধ্বনি, সেইসঙ্গে কান্নার আওয়াজ।

পথের ওপাশের বকুলতলার গা দিয়ে চলে এল একটা ছোট মিছিল। চার বেহারার কাঁধে চেপে চলেছে এক ছোট হাওদা। হুগলীর ঘাটের দিকে।

সঙ্গে আরও অনেক মানুষ। এবং মাঝবয়সী একটা বউ আমের ডাল হাতে নিয়ে চলেছে কাঁদতে কাঁদতে। সঙ্গে চলেছে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এক পুরুৎ।

কালীতারার কাঁধ থেকে থুৎনি তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল কোঠমাদের মেয়ে কামিনী, বলল, ইশ। ঐ মাগীটাও আজ দগ্ধ হবে বুঝি। পুরুষজাতটা মরে গিয়েও রেহাই দেয় না গো।

ব'লেই সে ওদিকের মাচার দিকে তাকাল, তার চোখে একটু আগুনই বুঝি জ্বলল।

হরিধ্বনি দিতে দিতে নন্দীদের বাড়ির গা ঘেঁষে বনবাদাড়ের মধ্যে দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে চলে গেল ঐ মিছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মোক্ষদা, বলল, পোড়া কপাল।

কার কপাল যে পুড়েছে, সে কথা আর খোলসা করে বলল না মোক্ষদা। মল্লিকা এলোকেশী নিস্তারিণী দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

মোক্ষদা বলল, অলুক্ষুণে কাণ্ড। ঐ মড়া এখন যেতে দিল কেন এখান দিয়ে। এই পথে বর-বউ যাবে না?

ওদের পায়ের চাপে ধুলোয় আঁকা আলপনা এঁকে-বেঁকে গেছে, ইতিমধ্যে

আরও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বর-বউ আসতে আসতে হয়তো মুছেই যাবে একেবারে।

যে উল্লাস ও যে উৎসাহ ছিল এই পথের দু ধারে, হঠাৎ তা কেমন মলিন হয়ে এল। নিরুৎসুক হয়ে গেল সকলের চোখ।

নিস্তারিণী বলল, এ ভালো না। ঠিকই বলেছ মোক্ষদা। এ লক্ষণ বড় খারাপ।

কি দিয়ে কিসের লক্ষণ স্থির করা হয় জানি নে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীও সেদিন দুঃস্বপ্ন দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন। বিগ্রহ চুরি হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন হেমাঙ্গিনী। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে করে দেবার জন্যে তিনি কূপের গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিলেন সেই কাহিনী। কিন্তু তা'তেই সে-স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল কি না, তিনি জানেন না।

এসে গেছে মিছিল।

কলকাতার ফোর্টউইলিয়মের গোরারা লাল-নীল রঙের পল্টনি পোশাক প'রে মাথার টুপিতে পালক গুঁজে বাজাতে বাজাতে আসছে দশ-বিশটা পাক-মারা মস্ত-মস্ত পিতলের বাঁশি। তার পিছনে ব্যাগপাইপ, তার পিছনে সোটাবরদার আসাবরদার বাণবরদার গুরুজবরদার, তার পিছনে বরবধূ— ঝালরদার লাল মখমলী চাঁদোয়ার নীচে খোলা মসনদে সোনার মুকুট পরে বসা। দুপাশে পেয়াদা বরকন্দাজ ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত। তার পিছনে দিশি বাদ্য— ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশি, তার পিছনে নওবত— প্রায় আধ ক্রোশ লম্বা এই মিছিল।

ধীর গতিতে হুগলী পার হয়ে চলে গেল রাধারানী।

কামিনী বলল, আশ্চর্য। অসম্ভব রূপ। রূপচরণ নাকি বলেছেন, ঘরের লক্ষ্মী। কিন্তু লক্ষ্মী এ নয় রে, এ লক্ষ্মী নয়। রূপে বুঝি তারও বাড়া।

—এ তবে কী রে?

কামিনী বলল, পরী।

কালীতারা বলল, পরীর তো ডানা থাকে শুনেছি। এর ডানা কই।

— হয়তো লুকনো আছে এখন, হয়তো গুটনো আছে।

— সে আবার কেমনধারা কথা হল?

কালীতারার এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কামিনী কুলগাছের শিকড়ের উপর থেকে ধীরে ধীরে নামতে নামতে বলল, তোরাও যে সব বর্গী হলি। কথায় কথায় খাজনা চাস। কথার উপরেও খাজনা বসাতে ইচ্ছে বুঝি?

চোখে চমক দিয়ে যায় নি ঐ রূপ, চোখকে যেন নিঃসাড় করে দিয়ে গেছে। রূপচরণ রূপ চেনেন। বাছাই তাঁর উত্তম হয়েছে। কিন্তু তাঁর পুত্রের মেগদার কি, তা কেউ জানে না। সে ছোঁড়া যদি লক্কা-পায়রাটি হয়ে ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায় তাহলে এ-পরীও ডানা মেলবে।

বকুলতলার বাবুরা গোঁফ চুমরাচ্ছেন, চুঁচুড়ার ঐ ছোকরার ভাগ্য দেখে তাঁদের টনক বুঝি নড়ে গেছে। গোঁফের দুই কিনার যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করে নিয়ে তাঁরা মাচা থেকে নামতে লাগলেন। কার গলাতে বকুলমালা তাঁরা দেবেন, সে ঠিকানাই বুঝি তাঁদের হারিয়ে গেল।

কলকল ছলছল শব্দ করতে করতে চলে গেল কামিনীরা। কোঠমাদের বাড়ির কাছে এসে গোলাঘরের গায়ে দাঁড়াল ঐ মেয়ে-জনতা।

মোক্ষদা বলল, মেয়ে না, যেন উর্বশী।

— সে কে জান মোক্ষ? সে হল স্বর্গের বেশ্যা। তার সঙ্গে কি নতুন বউয়ের তুলনা দিতে আছে?

মোক্ষদা হেসে বলল, তার গুণের সঙ্গে তুল করছে কে, তুল করছি তার রূপের সঙ্গে।

কামিনী আর কথা বলল না। তার ঐ মত পাকা। এ মেয়ে পরী।

হ্যাঁ, পরীই এ, আসল পরী। ডানা আছে কি নেই, সে খোঁজে কোনো দরকার করে না। এর রূপের বহর ও রঙের বাহার দেখে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না যে, এ পরী।

রূপচরণের জয়জয়কার। সকলে দল বেঁধে তাকে খুশি জানাবার জন্যে ব্যস্ত। সকলেই বলছে, এমন বউ কারো ঘরে আসে নি এই চুঁচুড়ায়। এখানকার অন্দরমহলের ইতিহাসে এ একটা অক্ষয়কীর্তি।

নীলমণি হালদার রূপো-বাঁধা ছড়ি হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, চোখ আছে বটে তোমার, রূপচরণ। অমন লম্বা একটা মিছিলের মধ্যে থেকে, অতগুলি রাইরাজার মধ্যে থেকে তুমি যে-রাই বাছাই করলে, তার তুলনা নেই।

নীলমণি হালদারেরও পুত্র আছে। তার সেই পুত্র নীলরত্নের জন্যে তিনিও তো নিয়ে আসতে পারতেন এই রত্নটি। কিন্তু তাঁর মনে অমন খেয়ালই হয় নি। নইলে, বলা যায় না, হয়তো রূপচরণের বাড়িতে এই উৎসব আজ না হয়ে তাঁরই বাড়িটা হয়ে উঠত সরগরম।

কিন্তু এজন্যে কোনো আক্ষেপ করছেন না নীলমণি হালদার, বরং তারিফই করছেন রূপচরণকে। মানুষটা টাকার কুমির। ইংরেজদের হয়ে মাল কেনা-বেচা করছে ব'লে নিজের পারিবারিক কর্তব্যপালনে ত্রুটি নেই একেবারে।

আয়োজন যা করেছেন রূপচরণ, নীলমণি ঠিক এতটা নিশ্চয়ি করতে পারতেন না। এ উৎসব বুঝি শুধুমাত্র রূপচরণ রায়ের নয়, সারা চুঁচুড়ার। তাই সমস্ত পল্লী মেতে উঠেছে এই উৎসবের আনন্দে।

কলকাতা থেকেও এসেছেন অনেক অতিথি। অনেক সাহেব, অনেক সাহেবান, অনেক বিবিলোক এবং তৎসহ বিস্তর বাবালোক।

লোকজনে পরিপূর্ণ আজ চুঁচুড়া। বরবধূকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্দরে। সেখানে স্ত্রীআচার চলেছে হুলুধ্বনির সঙ্গে। প্রধান ফটকে একটানা সুরে বেজে চলেছে নওবত— বাজছে আশাবরী। চতুর্দিকে যেন ঐ সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে আশা-বৃষ্টি করা হচ্ছে, যে-তাল বাজছে তা বুঝি মধ্যমান— জীবনকে মধ্যপন্থা ধরে অগ্রসর হবার জন্যেই বুঝি ঐ নির্দেশ।

অন্যান্য বাজনদারেরা ফুলবাগিচার ভিতরে প্রবেশ করে তাদের ব্যাগপাইপ ও ড্রাম-বাঁশি ইত্যাদি পার্শ্বে রেখে পদচারণা করে বেড়াচ্ছে। এতটা রাস্তা হেঁটে এসে তারা বুঝি কিঞ্চিৎ ক্লান্ত।

সন্ধ্যা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। আকাশে অমাবস্যার সংকেত। কিন্তু ঐ অন্ধকারকে পরাস্ত করার জন্যে নীচে রচনা করা হয়েছে সহস্র-চন্দ্রের পৌর্ণমাসী।

গবর্নমেণ্ট গেজেটে ইশতাহার দিয়েছেন রূপচরণ।— তার পুত্রের বিবাহ ১৫ ফাল্গুন সম্পন্ন হইবে, বিবাহ-উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডীয় সায়েবদের জন্য ১৭ ফাল্গুন নিরূপিত হইয়াছে, ঐ দিবস তাঁহারা তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতে গিয়া নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। অন্যান্যেরা— অর্থাৎ আরব মোগল ও হিন্দুদিগের জন্য ১৮ ফাল্গুন নিরূপিত হইয়াছে, তাঁহারাও উপযুক্ত মত আমোদ-প্রমোদ করিবেন।

ইশতাহারের প্রভূত সাড়া পাওয়া গিয়েছে। স্থলপথে পালকিতে ও জলপথে বজরায় চেপে আজ আসছেন দলে-দলে শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী।

তাঁদের খানার বন্দোবস্তের জন্যে পাকশালায় রসুইয়ে ও খানসামারা ব্যস্ত হয়ে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে ভোজের আয়োজন করছে।

আরমানি গির্জা থেকে আরম্ভ করে রূপচরণের গৃহ পর্যন্ত পোয়া ক্রোশ রাস্তা সুন্দর আলোয় সুসজ্জিত হয়েছে। গৃহের বিশাল চৌহদ্দি বেষ্টন করে রচিত হয়ে অপরূপ বাগিচা। আম কাঁঠাল আনারস কামরাঙা দাড়িম্ব আতা ও নানাজাতির ফুল রচিত হয়েছে নানাবর্ণের কাপড়ের দ্বারা— কিন্তু কারিগরি এমনি অপরূপ যে গুগুলি যে কৃত্রিম ফলফুল তা বোঝার উপায় নেই। এইরূপ ফলফুল দিয়ে তৈরি প্রায় এক শ নকল বাগিচা দিয়ে রূপচরণ বেষ্টন করিয়েছেন তাঁর গৃহ। এ ছাডা কাঁচেব গেলাসে মোমবাতি দিয়ে রচিত হয়েছে পৃথক এক গেলাসী বাগিচা। চারদিকের এই উদ্যান অপরূপ একটি নিশ্চল শোভাযাত্রার মত দেখাচ্ছে।

নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হচ্ছেন একে-একে। বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্যবর্গে বেষ্টিত হয়ে রূপচরণ আগবাডান হয়ে সাহেবদের সঙ্গে হস্তমর্দন করছেন। তারপর তাঁদের এক তামজামের উপর আরোহণ করিয়ে উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিয়ে নানাশ্চর্য দৃশ্য দেখাতে লাগলেন।

নর্তকীরা নাচছে ঘবে-ঘরে। সম্মুখে ফরাসে ও কেদারায় বসে সেই নাচ অবলোকন করে খুশি হচ্ছেন সকলে, মাঝে-মাঝে ঘুঙুরের শব্দ ডিঙিয়ে জডিত কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে— বেরি গুড, বেরি গুড।

কলকাতা থেকে এসেছে বাইজীরা, তাবা নাচছে। এব মধ্যে একজন বডই কচি, কিন্তু নাচে ও চোখের কাজে কচি মনে হচ্ছে না, তার নাচ দেখে সাহেবলোকেদেব মধ্যে হুলুস্থুল পডে গেল। বাইজীটির নাম নিকি। এর মধ্যে তার নামও যেমন চডেছে, দামও তেমনি চডা।

বেনারস থেকে এসেছে জীনত বাই। আব এসেছে বেগম জান ও হিঙ্গুল।

নান্নিজান ও সুপন্জান এখনো নাচ শুরু কবে নি, সাজঘরে বসে তারা ঘাগডা পরছে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধছে। সেখান থেকেই মৃদু মৃদু যে শব্দ আসছে তাতেই নেশা কেটে যাচ্ছে অনেকের চোখের।

ওদিকে সঙ-নৃত্য চলেছে নদীর বুকে নৌকোর উপর। এক আশ্চয সঙ করা হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভের যুদ্ধ চলেছে এক নৌকায়, আর-এক নৌকায় দশভুজা দেবীমূর্তি সেজেছে মানুষে। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর সেখানে আরম্ভ হল নতুন পালা— রাধাকৃষ্ণ সেজে নৌকাখণ্ড যাত্রা আরম্ভ হল।

নানাবর্ণের রোশনাইতে আলোকিত নদী। সেখানে এসে জমায়েত হয়েছে কাতারে-কাতারে মানুষ।

জলস্থল একাকার করে দিয়েছেন রূপচরণ। তিনি যে কীর্তি রেখে গেলেন, চুঁচুড়াবাসীদের ধারণা এ স্থানের ইতিহাস থেকে তা কখনো মুছে যাবে না।

ঘরে-ঘরে বাজনা বাজছে। খানসামারা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে, আবদারেরা মদ্য শীতল করার জন্যে ঘর্মাক্ত হচ্ছে।

এত আনন্দ এত উল্লাস ও এত উৎসব যে-মানুষটিকে নিয়ে, সে এখন অন্দরের অন্তঃপুরে দোতলার দক্ষিণদুয়ারি ঘরে সুউচ্চ পালঙ্কে বসে আছে, ঝালরদার পাখা দিয়ে তাকে হাওয়া করছে দু-জন ওড়িয়া পরিচারিকা। উচ্চ ছাদ থেকে ঝুলছে টানা-পাখা, সোনালি ঝালরে ঝলমল করছে সেই পাখার পাড়।

ওদিকে চলেছে তুমুল আনন্দ, কিন্তু নিরানন্দ এই অন্তঃপুর। অত রূপ আর অত সৌন্দর্য যার চেহারায়, তাকে দেখতে এখন তেমন রূপসী ঠেকছে না, মুখ কেমন ম্লান। এই ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে সে। এত আমোদ এত আনন্দ— কিন্তু মানুষ কই এখানে? তাকে এ রকম একা ফেলে কোথায় চলে গিয়েছে এই বাড়ির মানুষেরা?

বাবার জন্যে মন কেমন করতে লাগল রাধার, মাকে দেখার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল। নবীন আর মুরলী কী করছে এখন? আর, আর— তার মনে পড়ল তার কদম-মাসির কথা।

এত সুখ ও সম্পদের মধ্যে বসেও নিজেকে বড় অসহায় আর নিঃসম্বল বলে ঠেকছে তার। এইভাবে একা যদি ফেলে রাখবে তাকে, তবে কেন তাকে এত জাঁক করে নিয়ে আসা?

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে রাধা। এ সবই নাকি তার। সে এখন এই অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু এত ঐশ্বর্য দিয়ে কাজ কি, এবং এত অধিকার দিয়ে? এর চেয়ে সে কি ভালো ছিল না ঐখানে? তাদের ফরাসগঞ্জের সেই আমের ছায়াটা ঐ ঝালরদার পাখার হাওয়া থেকে মিষ্টি ছিল না কি অনেক?

কিন্তু কে বলবে কোন্‌টা ভালো। তার মনে হচ্ছে নানা রকম কথা, কিন্তু সব কথা ভালো করে ভাবতে সে পারছেনা এখন।

এখানে বসেই কানে আসছে নানা সুর নানা স্বর এবং নানারকমের

কোলাহল। কিজন্যে অত আনন্দ করছে ওরা ভেবে পায় না রাধা। এই যে হয়ে গেল একটা অনুষ্ঠান, এর জন্যে আনন্দ বা দুঃখ করতে পারে রাধা। এই অনুষ্ঠানে যদি পরিবর্তন কিছু হয়ে থাকে তা হল কেবল রাধারই। যদি আমোদ আর ফুর্তিই করতে ইচ্ছে হয়ে থাকে কারো তার জন্যে কেবলমাত্র এই উপলক্ষটা বেছে নেবার হেতু কি।

আর, ওরা তো সকলেই আমুদে মানুষ। সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে ফুর্তি আর ফক্কড়ির জন্যেই। তারা যা-খুশি করার করুক। তার সঙ্গে মেতে গেছে আরও সকলে, এইটেই কেমন বিদখুটে লাগছে তার।

যদি মেতেছই তাহলে সকলকে নিয়ে মেতে যাও, মেতে যাও এই রাধাকে নিয়েও। রাধা এমন একা বসে থাকতে পারছে না।

ওড়িয়া মেয়ে-দুটি এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। বড অস্বস্তি ঠেকছে এতে, বড় অশান্তি বোধ হচ্ছে।

এখানকার ধরণ-ধারণ সে জানে না। হাওয়া করতে নিষেধ করাটা নিয়ম কি না কে জানে। কিন্তু হাওয়া তার দরকার নেই আর। ঐ যে ছাদ থেকে ঝুলছে পাখা, কোথায় বসে কে টানছে কে জানে, ওর হাওয়াই তার পক্ষে এখন যথেষ্ট।

ইশারা করে রাধা জানাল, থাক্।

অমনি থেমে গেল পাখা-দুটো। কিন্তু দুর্গাপ্রতিমার দুই পাশের লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মত দাঁড়িয়ে রইল এরা দুজন বাধার দুই পাশে।

সুউচ্চ পালঙ্ক। প্রায় এক-বুক উঁচু। তার এ পাশের তিনটি পা দেখা যাচ্ছে, বাঘের তিনটি থাবার মত মাটি আঁকড়ে ধরছে যেন। খাটের পায়ের দিকে কাঠের মই লাগানো।

ওড়িয়া মেয়ে-দুটি দুই বোন। নামও ওদের লক্ষ্মী আর সরস্বতীই।

নিজেদের মধ্যে কি যেন কথা বলল তারা, কিছুই বুঝতে পারল না রাধা। তার শুধু একবার ইচ্ছে হল যে, সে জিজ্ঞাসা করে— এ বাড়ির মানুষরা সব কোথায়। তাদের বাড়িতে নতুন বউ নিয়ে এসেছে তারা, এ কথা তারা ভুলে গেল নাকি।

দুটো চেড়ির হাতে তাকে সঁপে দিয়ে তারা কি মত্ত হয়েছে উৎসবে? কিন্তু অশোক-বন বলে এ-জায়গাটিকে বোধ হচ্ছে না রাধার। এ যেন কোনো প্রাসাদ নয়, লোকালয় নয়— এ একটা শোক-বন।

এমন দিনে শোক করতে নেই, দুঃখ করতে নেই, বিলাপ বা আক্ষেপ করতে নেই এমন দিনে। কিন্তু এই শুভদিনেই তার বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠছে ক্রমাগত। তার ভয় হচ্ছে— এই ইটের অরণ্যে সে বুঝি হারিয়ে ফেলেছে পথ। শোকের বুদ্বুদ বুঝি গিলে গিলে ফেলছে রাধা।

অনুমতি না নিয়েই আবার বীজন করতে আরম্ভ করল তারা। তারা তাদের কাজে কোনো ত্রুটি রাখতে চায় না, যে কাজের জন্যে তারা বহাল হয়েছে সে কাজ সুষ্ঠুভাবে তারা করে চলল আবার।

সোনায় সালঙ্কারা হয়ে, সূক্ষ্ম মসলিনের আবরণে শরীর আবৃত করে আছে সে। কিন্তু এত মিহি সাজে তার শরীর যথেষ্ট আবৃত নয়— এই তার সংকোচ। এর চেয়ে তাকে যদি পরিয়ে দিত মটরাদার শাড়ি, তা হলে আবরণ তাতে হয়তো হত। বাউটিতে বিজটায় ও বাজুতে তার উপর-হাত ও নীচ-হাত ভরা, গলায় কণ্ঠী, মাথায় সিঁথি, কানে কানপাশা, নাকে নোলক, পায়ে পাঁয়জোড়।

পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠেছে, কিন্তু পিপাসা মিটাবার কোনো পানীয় নেই এখানে। চার দিকে ধীরে ধীরে তাকাল রাধা। ঝলমল করছে আলোর ঝাড়। ওই আলোতে কি মেটে কারো পিপাসা?

হায়, কান্না পাচ্ছে রাধারানীর। এ কোন্ মরুভূমিতে এসে পড়ল সে? এ দেশ বুঝি এমনি পিপাসায় কাতর হয়ে যাবার জন্যেই সৃষ্টি? এখানকার মানুষেরা তবে বাঁচে কি করে?

আলো আর ঐশ্বর্য দিয়ে যদি মানুষের পিপাসা মিটে যেত পৃথিবীতে তাহলে এত জল থাকত না। বাবার কথা মনে পড়ছে রাধার, তার বাবাই একদিন বলেছিলেন, পৃথিবীর তিন-ভাগের দুই-ভাগই জল, স্থল মাত্র এক-ভাগ; এর থেকেই বোঝা যায় মানুষের ও অন্যান্য জীবজন্তুর পক্ষে জল দরকার কতখানি— জলের অপর নাম জীবন, জলই নাকি নারায়ণ!

নারায়ণ? চমক লাগল রাধার। যাক, ও তো উচ্চারণ করে নি ঐ নাম, মনে-মনে বলেছে। স্বামীর নাম মনে-মনে বলায় নিশ্চয় দোষ নেই। বেশ হয়েছে মজাটা— এখন ভগবানের নামপর্যন্ত উচ্চারণ করতে বারে-বারে থতমত খেতে হবে তাকে।

রূপনারায়ণ রায় এখন বহির্বাটীতে। বর-বেশে ঠিক নয়, রাজবেশে ভূষিত হয়ে কথাবার্তা বলছেন তাঁর ইয়ারদের সঙ্গে। বিশাল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে

খসে ঈষৎ-ঈষৎ চুমুক দিচ্ছেন পানীয়ে, আর জোরা ভুরু ঈষৎ কাঁপিয়ে খবর নিচ্ছেন নাচঘরের। তায়েফা-তায়েফা বাই এসেছে নাকি? নিকি আর নাম্নিজান নাকি নাচছে আজ প্রাণ-মাতোয়ারা?

কালো মখমলের মত কালো কুচকুচে গোঁফ-জোড়া চুমরে পাশে ঈষৎ হেলে ইয়ারের কানে ফিসফিস ক'রে কি-যেন কথা ব'লে শরীর কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে হাসছে রূপনারায়ণ।

ইয়ার গুনগুন করে গেয়ে শোনাচ্ছে—

কেন গো, সজনী আমার, উড়ু-উড়ু করে মন
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারই আকিঞ্চন।

অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতির একমাত্র দুলাল আজ আনন্দে উচাটন। পিঁজরে-বাঁধা পাখির মত প্রাণ নাকি ছটফট করছে তার। চার দিকে নৃত্যগীত, হাসির হুল্লোড়, আলোর ঝিলিমিলি। এর মধ্যে বর সেজে বসে থাকাটা কেমন ববর ভাব বলে মনে হচ্ছে বুঝি তার।

উৎসব আজই শেষ নয়, এখনো চলবে কয়দিন ধরে। আজ ইংরেজদের খানাপিনা, আরব মোগল আর হিন্দু ভাগ্যবানেরা আসবেন কাল। কালও তাঁদের জন্যে হাসি-তামাশার ব্যবস্থা হয়েছে। কালকের সেই হাসি-গান কালই তো শেষ হবে না। এখনো জের চলল এর।

রূপনারায়ণের পাশেই বসেছে তার ইয়ার মতিলাল। অনেকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখছে রূপনারায়ণের মুখ। ভোল যেন বদলে ফেলেছে একেবারে, একেবারে অন্য মানুষ বলে যেন মনে হচ্ছে রূপনারায়ণকে।

বলল, তোমাকে আজ সত্যিই বর-বর দেখাচ্ছে।

উচ্চহাস্য করে উঠল ইয়ারেরা, বলে উঠল, ঠিক বলেছে মতিলাল, সত্যিই বর্বর দেখাচ্ছে আজ তোমাকে।

রূপনারায়ণ তা জানে। এবং জানে বলেই তার গোঁফের নীচে এই মিহি হাসি বিজলির মত চমকে-চমকে উঠছে মাঝে-মাঝে।

বড় বাঁধা পড়ে আছে আজ রূপনারায়ণ, এই চেলীর আর উড়ুনির জাঙাল ভেঙে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াবার জন্যে যেন লালায়িত হয়ে উঠেছে সে।

মাঝে-মাঝে কানে আসছে ঘুঙুরের শব্দ, অমনি ভ্রূ-দুটো কেঁপে উঠছে সেই তালে। সাহেব-লোকদের খানা হাতে নিয়েই ছুটে যাচ্ছে খানসামা, তার পিছনে-পিছনে পিনা হাতে নিয়ে ঐ চলেছে বুড়ো আবদারটা। প্রচুর

খানা-পিনা চলেছে ওধারে। এর মধ্যে প্রচুর ভোজে উদর পূর্তি করা সত্ত্বেও রূপনারায়ণের মনে হচ্ছে সে বুঝি ক্ষুধার্ত।

এদিকে ক্ষুধা, ওদিকে পিপাসা। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে বাহিরে ও অন্দরে বসে আছে দুটি প্রাণী।

কিন্তু রাধার কাছে সঙ্গী নেই বেশি। শুধু মাত্র লক্ষ্মী আর সরস্বতী যেন দুটি চেড়ীর মত তার পাহারায় নিযুক্ত।

দরজার চিক সরিয়ে উঁকি দিয়ে চলে গেল কে। ঝাড়-আলোর ঝকমকানিতে এক ঝলক দেখা গেল মাত্র একটা কালো মুখ— আর একটা নথ।

—কে ও?

ফিরে তাকাল লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ফিরে চেয়ে ওরা দেখতে পেল না কাউকে।

কিন্তু বহুক্ষণ একই মুখ দেখতে-দেখতে বুঝি অধীর হয়ে উঠেছে রাধা। পুনরায় তাই বলল, কে ও?

এটা যেন শুধুমাত্র একটি কৌতূহলী জিজ্ঞাসা নয়, এ একটা আদেশ।

লক্ষ্মী তাই এগিয়ে গিয়ে চিকের ওপারে চলে গেল। একটু পরেই ফিরল একজনকে নিয়ে।

পরিচয় দিয়ে দিল লক্ষ্মী, বলল, নাপিতানি-বউ।

রঙ্গ করে হেসে উঠল নাপিতানি, গা দুলিয়ে নথ নেড়ে মুচকি হেসে বলল, এত শিগগির ভুলে গেলে কি চলে? চিনতে পারলে না আমাকে? দেখ নি বুঝি এর আগে?

কথা শুনে আশ্চয হয়ে গেল রাধা। কিন্তু এ বিস্ময়ের মধ্যেও বুঝি একটু আনন্দ আছে। এ কি তবে তার চেনা লোক? এই অচিন রাজ্যে চেনামানুষের খোঁজ যেন পেয়ে গেল সে, এবার তাই জড়তা কাটিয়ে নিয়ে সহজভাবে বলল, চিনি নাকি তোমায়? কই, মনে পড়ছে না তো?

নাপিতানি যেন না এ, এ যেন এক রঙ্গিনী। ঠোঁটে পানের ঘন দাগ, মাঝ-কপালে টুকটুকে রাঙা সিঁদুরের মস্ত একটা ফোঁটা। চওড়া লালপেড়ে শাড়ি তার পরনে।

ঐ পাড় দিয়ে ঠোটের কিনার মুছে নিয়ে চোখ দুটো কিঞ্চিৎ পাক খাইয়ে সে বলল, তা, ভুলবে বই-কি বাছা। আমরা গরিব মানুষ, তুমি রাজরানী।

লক্ষ্মী আর সরস্বতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে নাপিতানির বাক্য। তাদের হাতের পাখাও থেমে গিয়েছে।

সারা গা শিরশির করে উঠল রাধার। রাজরানী হয়ে গেছে নাকি সে সত্যিই? আর, হয়ে যদি গিয়েই থাকে তবে চেনা লোককে ভুলতেও বুঝি শিখতে হবে তাকে?

রাধা একটু বিব্রত বোধ করতে লাগল, নাপিতানির মুখের দিকে চেয়ে তাকে মনে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

এবার নাপিতানি বলল, দেখ নি বুঝি মুখ তুলে এই মুখটা? আজ সকালে কে মেজে দিল পা, কে পরিয়ে দিল আলতা?

সকালে তার পদচর্চা করেছে বটে একটা বউ, মাথা নীচু করে বসে সে রাধার দুটি পায়ের পরিচর্যা করেছে বটে। সেই বউটিই কি এ? তখন তার মুখ দেখতে পায় নি রাধা। আনকোরা নতুন বউ হয়ে এখানে পৌঁছেছে কাল সন্ধ্যায়। রাতটা কেটেছে মাত্র মাঝে, ভোরবেলার নতুন আলোতে নিজেকে বড় বিব্রত ঠেকেছে তার। সেই সময়ে কি কারো মুখের দিকে চাইবার তার সময়? এখন সে বুঝতে পারছে বটে, হ্যাঁ, এই মানুষটাই সেই মানুষ হওয়া সম্ভব।

নাপিতানি আবার বলল, এখনো পা-দুটি টুকটুক করছে আলতায়। এরই মধ্যে ভুলে গেলে আমায়? দাদাবাবুর সোহাগ পাবে আদর পাবে, তার পর ঐ কোলে পাবে রাঙা টুকটুক খোকা, তখন নাহয় ভুলে যেয়ো এই দাসীকে, কিন্তু তার আগেই—

রাধা বাধা দিল, বলল, চুপ চুপ।

—কেন, কেউ আসছে নাকি, আসছে নাকি বর? ওরে আমার নতুন বউ উল্টে কাপড় পর।

নিজের ছড়ায় নিজেই হাসতে লাগল নাপিতানি-বউ।

সত্যি এত রঙ্গও জানে। এর সব কথা ভালো লাগছে না রাধার, কিন্তু এই নিঃসঙ্গ ঘরে এই সঙ্গীটি পেয়েছে বলে সে ধন্য। বলুক-না কথা আবোল-তাবোল, কি আসে-যায় তাতে? সময়টা তো কাটছে নেহাত মন্দ না।

ইতিউতি তাকাতে লাগল নাপিতানি। কিসে বুঝি বিরক্ত হয়ে গেল, ঠোঁট ওলটাল, বলল, কই লো তোদের ফুলের মালা ফুলের তোড়া? ফুলশয্যার সাজ কই রে।

লক্ষ্মী জানে না, সরস্বতীও না তারা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

নাপিতানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, তোমার অঙ্গের কোন্‌খান কার জন্তে জানিনে বাছা, পা-দুটি আমার। নিত্য এসে রাঙিয়ে যাব। আমায় যেন ভুলো না।

—ছি ছি। ভুলব কেন। ভুলব কেন।

—আমি নাপিতানি। কিন্তু আমায় ডেকো চাঁপা ব'লে। আমার নাম চম্পা।

চম্পা-নাপিতানির কথা থামে না। সে নানা কথা পেড়ে বসল। ফরাসগঞ্জের কথা, গরিটির কথা। সব খবর সে রাখে দেখা যাচ্ছে। ফিরিঙ্গি আন্টুনির কথাও বলে, নিরুদিকে তার বউ বলে না, বলে তার মেয়েমানুষ।

বলল, গঙ্গার এ কিনারটা, জানলে বউ, আস্ত একটা নরক। স্বামীর চিতাশয্যায় শুয়ে সতীগিরি ফলাচ্ছে, কিন্তু কে কত সতী জানতে কিছু বাকি নেই।

গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, সেবা করি পায়ের, কিন্তু খবর রাখি হাঁড়ি-হেঁশেলেরই শুধু না, শোবার ঘরের সব-কিছুরই।

ইশ। তবে তো সাবধান হতে হবে এই মেয়েমানুষটা সম্বন্ধে। ঘরে-ঘরে ঢুকে এ বুঝি ঘরসংসারের খবর খুঁটে বেড়ায়? রাধা ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল একটু বুঝি ভীত ভাবেই।

চাঁপা বলল, তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সব ঠাঁই। টনক নড়ে গেছে সারা চুঁচুড়ার। তোমার রূপের ডাক শুনে কত ঢাকের বাদ্যিই বুঝি গেল থেমে। নীলমণি হালদার খুব বাবু-মানুষ, তাঁর পুত্র নীলরত্ন— তার জন্তে বউ দেখা হচ্ছে তোমার মত রূপসী।

রাধা যেন গোগ্রাসে গিলছে এইসব কথা, কাউকে চিনছেও না, এর কোনো কথা বুঝছেও না, কিন্তু বড় মজার লাগছে শুনতে।

—কিন্তু পাবে কোথায় বলো এমন রূপ। আর, ঐ ছেলেও জানো তেমন সেয়ানা নয়, কেমন-ধারা যেন। অত বড় বাবুর পুত্র, কিন্তু বাবুআনি নাই— শুধু পুঁথি নিয়ে মত্ত।

হেসে উঠল চম্পা-নাপিতানি, বলল, বই নিয়ে যে ডুবে থাকে তার জন্তে আবার বউ খোঁজা কেন। তার চেয়ে আমাদের বাবুটি বেশ। চাল আছে

চটক আছে, ইয়ার নিয়ে ফুর্তি করতে জানে। পুরুষ হতে হলে এমনি পুরুষই হতে হয়।

রাধার শরীরে বুঝি শিহরন খেলে গেল একটু। যে তার স্বামী হয়েছে, যার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছে তার, এখন পর্যন্ত তার মুখও সে দেখেনি, তার সঙ্গে কথাও বলেনি একটাও। কিন্তু সে মানুষটা যে ভালো মানুষ, এ খবর শুনে তার ভালো লাগল। নাপিতানিকে বড় আপনার জন বলে মনে হল তার। সে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

চম্পা-নাপিতানি হাতের কৌটা খুলে মুখে পান ফেলে দিল, তার মধ্যে ফেলে দিল সুতির দানা। চিবতে লাগল সে পান। ঐ রসে রসিয়ে উঠল তার ঠোঁট। কালো রঙের উপর এই রাঙা ঠোঁট আগুনের মত জ্বলে উঠল যেন।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, তোমার দেশ কোথায় চাঁপা?

—আমার দেশ? মাহেশ। মাহেশের গায়েই বল্লভপুর— সেই গাঁয়ে। তোমার দেশের কাছেই গো। কী কাণ্ডই হয় সেখানে স্নানযাত্রার সময়। মেয়ে-পুরুষে সে কী ঢলাঢলি।

কিন্তু ওসব খবরে কোনো আগ্রহ নেই রাধার। সে যে কী জানতে চায় আর কী শুনতে চায় তা সে নিজেও জানে না। তবু নাপিতানির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার বড় ভালো লাগছে। মুখটাও বেশ দেখতে। বেশ লাবণ্য আছে চেহারায়, কালো পাথর কুঁদে যেন তৈরি হয়েছে ঐ শরীর।

চম্পারও বুঝি কোনো কথা নাই। নতুন মানুষ পেয়ে তার যা-খুশি গল্প বলে চলেছে পায়ের কাছের ঐ মেজেতে বসে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো বউ-ঝিদের আলতা পরিয়ে বেড়াও, তোমার বর করে কি?

চাঁপা রঙ্গ করে বলল, সে করে আমার পদ-সেবা। আমার পায়ে আলতা পরায়, আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেয়।

কথা শুনে লক্ষ্মী আর সরস্বতীও হেসে উঠল, ধমক দেওয়ার মত করে চাঁপাকে তারা বলল, দূর্ মাগী।

রাধাও হাসতে লাগল। ভারি মজা করে কথা বলে তো এই মেয়েমানুষটি। জিজ্ঞাসা করল, সে আবার কি।

—বুঝলে না? সাদা কথা। সে আছে বলেই-না পায়ে আলতা, সিঁথেয় সিঁদুর দিতে পারছি। সে না থাকলে কে দেবে?

আবার হাসল রাধা। মানুষটার প্রাণে এত রসও আছে? এই রস আছে ব'লেই এ এত হাসিখুশি।

—কিন্তু জানো? মিনসেকে ব'লে দিয়েছি—বেঁচে আছ সুখে আছ। মরলে কিন্তু সতী হতে পারব না। ঐ আগুনে পুড়তে আমার বড় ভয়।

একটু থেমে চাঁপা বলল, বুঝি না বাপু কিছু। চিতেয় উঠে সতী হতে হবে। চিতেয় ওঠার আগে পর্যন্ত বুঝি সব অসতী থাকে? কুলীন বামুনের ঘরের কথা জানি না। তারা বউছত্র খুলে বসে, সে ছত্রে কেউ এসে তেষ্টা মিটিয়ে যায় কি না কে জানতে গেছে, বলো। তাদের ঘরের কথা নিয়ে আমাদের কাজ কি, কি বল বউ।

কিন্তু রাধা কিছু বলে না। ঐ আগুনের কথা শুনে তার মাথায় আগুন উঠে গেছে। সত্যি, এ কি সম্ভব? এই মসলিনে ও অলংকারে সজ্জিত হয়েই তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে তাপে, মাথার উপর সোনালি ঝালরের হাওয়া ফুরফুর করছে, তবুও যেন জ্বালাটা নিবছে না কিছুতে। এতেই যদি এই তাপ, তাহলে ঐ অনলকুণ্ডের তাপ যে কি রকম হবে তা যে কল্পনাই করা যায় না।

মনে পড়ছে তার, পল্‌তে উস্‌কে দিতে গিয়ে শিখার মধ্যে আঙুল চলে গিয়েছিল তার, উঃ, সে কি জ্বালা তাতে, কত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তার কতক্ষণ ধরে, তারপর ফোস্কা উঠল।

রাধার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করতে লাগল, না না না। সেও পারবে না ঐ কষ্ট স্বীকার করতে। কিছুতে না, কিছুতে না, কিছুতে না। চাঁপার সঙ্গে এই ব্যাপারে তার মতের মিল আছে।

অকারণে এক আতঙ্ককর চিন্তা এসে ভর করল তার মাথায়। যে-মানুষকে এখন পর্যন্ত সে দেখে নি ভালো করে, যার সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি এখনো, তার কুশল কামনা করতে লাগল সে মনে-প্রাণে।

এই অগাধ সম্পত্তি, এই অতুল ঐশ্বর্য— এর জন্যে লালায়িত হতে সে রাজি না, কিন্তু এর উপরে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে আছে নিশ্চয় অনেক মানুষ। যদি এ গৃহে অঘটন কিছু ঘটে, তাহলে এই ঐশ্বর্য করায়ত্ত করার লোভে তাকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে গিয়ে ঝাঁপ দেবার জন্যে প্ররোচনা দেবে নিশ্চয় অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী।

ঐ হিতাকাঙ্ক্ষীদের হাত থেকে রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো।

এ কি, এই শুভদিনে এই অশুভচিন্তা এনে দিল কে তার মনের মধ্যে?

চোখ বন্ধ করে বসে ছিল রাধা, এবার সে চোখ খুলল। একটু বুঝি রূঢ় চোখেই তাকাল চাঁপার দিকে।

চাঁপা হাসছিল, বলল, খুব নাচগান চলেছে বাইরে। কত বাই এয়েছে গো, তায়েফা তায়েফা। কী তাদের জাঁক, কী তাদের ঠেকার, কি তাদের ঢঙ— চোখ জুড়িয়ে যায়। কলকাতা থেকে এয়েছে, কাশী থেকে এয়েছে— চটকদার সব বাই।

লক্ষ্মী আর সরস্বতী এখানে আটক পড়ে আছে। ঐ বাইয়ের গল্পে তারাও তাকাল নাপিতানির দিকে। দিব্য আছে ও, কারো চাকরি করতে হয় না, কারো গোলাম নয় ও— তাই যখন যেখানে ইচ্ছে ঘুরে-ঘুরে দেখতে পারে ছুনিয়া।

রাধা মৃদু মৃদু নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে জিজ্ঞাসা করল, সে আসরে কারা আছে, কাদের ওরা দেখাচ্ছে ঐ নাচ?

—সাহেবলোকদের, বিবিসাহেবদের। কলকাতা রিষড়া শ্রীরামপুর খড়দহ ঝাঁট দিয়ে এয়েছে অনেক বাঁদরমুখো।

—ইয়ে কোথায়? শ্বশুরমশায়?

—তিনি বৈঠকখানায়। আদর-আপ্যায়ন করছেন সকলকে।

আর-কোনো প্রশ্ন করতে পারল না রাধা, কিন্তু আরো কারো খবর জানার ইচ্ছে বুঝি তার ছিল।

বাড়ির মানুষরা সব কোথায়? তাদের কুলের বউ কেবলমাত্র ছুটি দাসী এবং একটি নাপিতানির জিম্মায় যে পড়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে— এ হুঁশ কি তাদের নেই। তারা এবার একে-একে আসুক। এই অস্বাভাবিক পরিবেশ থেকে রক্ষা করুক তাদের গৃহবধূকে।

এখান থেকে শব্দ শোনা যাচ্ছে নানা রকম। শব্দই শুধু। তার এক বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না। ওগুলো কথা, না, ওগুলো গান?

চাঁপা বলল, ভাঁড় নেমেছে বুঝি আসরে। এবার ভাঁড়ামি আরম্ভ হয়েছে। ঐ তার হল্লা।

চাঁপার অনুমান ঠিক। বাই-নাচ চলেছে অনেকক্ষণ এক নাগারে। এবার তারা বিশ্রাম নিচ্ছে, ঘাম শুকিয়ে নিচ্ছে বুঝি গায়ের।

এই অবসরে নকল ফুলের বাগিচায় বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে নেমেছে ভাঁড়। তারা ভীষণ ভাঁড়ামি দিয়ে দর্শকের মধ্যে হাসির খই বৃষ্টি করাচ্ছে

যেন। খুকি-খুকি বিবিসাহেবরা সাদা সাদা দাঁত বের করে খিলখিল শব্দে হেসে উঠছে।

পেটুক ব্রাহ্মণ সুবিপুল উদর নিয়ে উপস্থিত হয়ে হাতি-খাই ঘোড়া-খাই ভাব দেখিয়ে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে এল তন্বী বাইজি— তার নাচের বহর দেখে ও ঘাগড়া ঘোরাবার রকম দেখে এবং চোখমুখের ভাবভঙ্গি দেখে আসল-বাইরাও হেসে আকুল, তারা যখন নাচে তখন তাদেরও অমনি অপরূপ দেখায় কি না এই চিন্তায় বুঝি তারা এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। ভিখারি এল, বৈষ্ণব এল, সাধু এল। তাদের দেখে বুঝবার উপায় নেই যে তারা ভাঁড়— নকল ফলফুলের বাগিচা দেখে যেমন সেগুলি আসল বলে বোধ হচ্ছে, এদের সাজগোজও এমন নিখুঁত হয়েছে যে, এদেরও নকল বলে ধরার উপায় নেই। হঠাৎ কোথা থেকে ওখানে এসে উপস্থিত হল একটা গোরু— আসাবরদার সোটাবরদার পেয়াদা বরকন্দাজ সবাই তটস্থ হয়ে উঠল, বাগিচায় গোরু ঢুকেছে দেখে তারা তাদের আসা-সোটা নিয়ে তাড়া করার জন্যে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় গোরুটা ঘাস চিবতে আরম্ভ করল। হৈহৈ করে উঠল পেয়াদা-বরকন্দাজ আমলা-মুহুরি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসির হুল্লোড় আরম্ভ হয়ে গেল চারদিকে। ওটা আসল গোরু না— ওটাও একটা ভাঁড়। কিন্তু তারিফ করতে হবে তার এই সাজের ও এই আচরণের, এমন-কি, সে যে সত্যিই আসল একটি গোরু তা প্রমাণ করাব জন্যে সত্যিসত্যিই চিবিয়েছে আসল ঘাস।

এই ভাঁড়টা ভাঁড়ামির মস্ত কারিগরি দেখিয়েছে। সাহেবলোকেরা মোহর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওকে বকশিশ কবতে লাগলেন। চতুষ্পদ জীবটি তখন দুপায়ে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার করতে লাগল অভ্যাগতদের।

রূপচরণ বললেন, ও আমাদের চোরা-নবু, এ অঞ্চলে সঙ-এর রাজা। একবার ঘোড়া সেজে পিঠে সওয়ার নিয়ে দাবড়িয়েছিল সারা বাগানটা।

হ্যামিলটন সাহেব কি বুঝলেন জানিনে, বললেন, চিন্‌সুরা ইজ এ প্লেস ফর সঙস্‌।

রূপচরণ তৎক্ষণাৎ বললেন, ইয়েস সার্‌।

বিশাল বাড়িটার ঝরকাতে ঝরকাতে চিকের ওপারে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে কাতারে-কাতারে বউ-ঝিয়েরা। চাপা চাপা হাসি হাসছে তারা। তাদের হাসির শব্দ নীচ পর্যন্ত পৌঁছে বাইজিদেব হাসির সঙ্গে মিশে না যায়, এ বিষয়ে বড় সতর্ক হয়ে আছে তারা।

আজ সারা চু চুড়ার অন্দরমহল খালি। সব বাড়ির মেয়েরাই এসে জমা হয়েছে এই বিয়েবাড়িতে। এখানে বাইয়েদের নাচনা আছে, ভাঁড়েদের তাঁমাশা আছে, আতসবাজি আছে, আলোর ঝলমলানি আছে। সব মজা আজ এই বেনিয়ানবাবুর বাড়িতে জমা।

সব বাড়িরই ভিতর-মহল আজ দাসীদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে বউ-ঝি-গিন্নিরা এসে মজা লুটছেন চিকের ফাঁক দিয়ে।

সব বাড়িরই যদি রকম ওই, বিয়েবাড়িটার রকম তবে আলাদা হবে কেন? নতুন বউ এসেছে বটে বাড়িতে, কিন্তু নতুন-বউ নতুন-বউই। তাকে আজ এই মশকবা দেখাবাব জন্যে মেয়েমানুষদের এই হাটের মধ্যে এনে দাঁড় করানো যায় না।

সুতরাং রাধার আজ ঐ বরাত। তাব বরাদ্দে আজ শুধু লক্ষ্মী আর সরস্বতী। তবু তো অদৃষ্ট তাব একটু ভালোই। বরাদ্দেব বাইরের মানুষ পেয়ে গেছে সে, সে পেয়েছে চাঁপাকে— নাপিতানিকে।

নিজের জীবনের কাহিনী বলতে গিয়ে এক অস্বস্তির মধ্যে চাঁপা ফেলেছে রাধাকে। ছোঁয়াচে রোগের মত নাপিতানির গা থেকে আগুনের তাপটা যেন এসে পৌঁছে গেছে রাধার সর্বাঙ্গে।

রাধা হয়তো থাকত সেই আতঙ্ক নিয়েই আবো কিছুক্ষণ। কিন্তু এসে গেলেন কানাগিন্নি।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, ও রে, তোরা এখানে বসে আছিস কোন্ আঁধারে, ওদিকে সব রোশনাই যে লুটে নিল সকলে।

উঠে দাঁড়াল চাঁপা, বলল, তুমি বেঁচে গেলে কেমন করে গো। তোমাকে লুটে নিল না কেউ। এ রোশনাইটা ছেড়ে দিল কেন ওরা?

—আর সে বয়স কি আছে রে আমার, এখন পরতা চলেছে তোদের। তোদের সারা অঙ্গে রোশনচৌকি বাজছে, পান খেয়ে রোশনাই জ্বেলেছিস ঠোঁটে। এখন তোদের নিয়েই লুটোপুটি।

নাপিতানি হাসল, সেই হাসিতে সত্যিই যেন জ্বলে উঠল আসল রোশনাই, বলল, ঘরে স্বামী আছে গো, আমার। সিঁথেয় দেখছ না এই সিঁদুর।

এক চোখে শ্যেনদৃষ্টি হেনে কানাগিন্নি বলল, চোখ নেই-নেই করেও তো একটা আছে। তোদের রঙ্গ দেখার পক্ষে ঐ খুব। স্বামী আছে, ঘরে আছে।

ডাক দিয়ে সে তার বউকে পেলেই খুশি। কিন্তু একজনের ডাক শুনে জীবন কি কাটে রে, না কাটতে চায়?

চম্পা-নাপিতানির অত গর্ব নেই, কোনো অহংকারও তার নেই। সে তাই কানাগিন্নির কথায় বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হল না। বুঝি-বা তুষ্টই হল একটু। মুচকে-মুচকে হাসতে-হাসতে বলল, দূরের পাড়া থেকে নতুন মানুষ এসেছে, সে কি মনে করবে বলো তো। একটু রেখে-ঢেকে বলো।

কিন্তু রাখতেও না, ঢাকতেও না, কানাগিন্নির কাছে ঢাকাচাপা কিছু নেই। থান-কাপড়ে গা ঢেকে তিনি তাঁর বুড়ো মুখে কচি কথা বলছেন।

বয়স অনেক হয়েছে কানাগিন্নির। পঞ্চাশ পেরিয়েছে। বিধবা হয়েছেন সে-কোন্ কালে সে কথা তিনি জানেন না। বরকে দেখেনও নি কখনো।

বারুণীর স্নান করতে এই গঙ্গা ছেড়ে আদিগঙ্গায় গিয়েছিলেন, তখন বয়স তাঁর তিরিশ হবে। সধবা ব'লেই নিজেকে জানতেন। সেইরকম সাজেই সাজতেন। হুগলী-চুঁচড়ো-ব্যাণ্ডেলের অনেক যাত্রীর সঙ্গে নৌকো চেপে তিনি গিয়েছিলেন কালীঘাটে। বারুণীর স্নানও হবে, মা-কালীকে দেখাও হবে—এই ছিল বাসনা।

নানাস্থান থেকে নানা যাত্রী এসেছে কালীঘাটে। যাত্রীতে-যাত্রীতে কথাবার্তা যেমন হয় হচ্ছে। চব্বিশপরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, খুলনা— নানা জায়গা থেকে এসেছে নানা যাত্রী।

স্নানের ঘাটে দাঁড়িয়ে একদল যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন কানাগিন্নি, কে কোথা থেকে এসেছে, কার বিয়ে হয়েছে কোথায়, কোন্ বংশে কার শ্বশুরবাড়ি— ইত্যাকার নানাবিধ কথা।

হঠাৎ একটা বিধবাবুড়ি বলল, তাই নাকি গো! তুমি যে দেখছি আমার সতীন গো, আমিও তো বাঁড়ুজ্জেবাড়ির বউ। কিন্তু আমি বিধবা, আর তুমি সধবা— এ কেমন হল?

কানাগিন্নির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, বলল, তিনি তবে গত হয়েছেন না কি?

—সে কি আজ? দশ বছর আগে।

বৃত্তান্তটা আরো ভালো করে জেনে নিয়ে, পরিচয়টা আরো পরিষ্কার করে নিয়ে যখন দেখা গেল খবরটা ঠিক, অমনি আর কথা নেই— ভাঙ, ভাঙ, শাঁখা ভাঙ, সিঁদুর মোছ।

শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে কালীঘাট থেকে কানাগিন্নি ফিরে এল অন্য বেশ ধরে। যে গিয়েছিল সধবার সাজ পরে, সে ফিরে এল বিধবার সজ্জায়। কিন্তু তাতে দুঃখও নেই, বেদনাও নেই। শুধু একটা ক্ষোভ— মাছটা খাচ্ছিলাম, তাও সইল না?

বিধবা হয়েছেন তাহলে একটু বেশি বয়সে। স্বামী হারিয়েছেন তবু জ্ঞান হবার পর, কিন্তু একটা চোখ গিয়েছে কবে— কানাগিন্নির তা স্মরণ হয় না। বলেন, বারুণীতে কেন-যে গেলাম মরতে, নইলে সধবা সেজে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া যেত। বারুণীতে টানে নি আমাকে, আমাকে টেনেছিল আমার গেরো।

কোনো জীবিকা নেই কানাগিন্নির। নানা লোকে নানা কুকথা অবশ্য বলে, কিন্তু সে সবে তাঁর কোনো গ্রাহ্য নেই, গা-সওয়া হয়ে গেছে। এসব কথা তো আজ থেকে বলতে আরম্ভ করে নি কেউ, তাঁর যখন কাঁচা বয়স সেই সময় থেকে চলে আসছে ঐ কথা। আজ বয়স হয়েছে তাঁর, কিন্তু বয়সের সঙ্গে ওসব জিনিসের সম্পর্ক কি। যে সাথী করে নিতে জানে, ওসব তার সঙ্গের সাথী।

কোনো জীবিকা নেই কানাগিন্নির। কিন্তু অনাহারেও নেই তিনি, ভালোটা মন্দটা জুটে যাচ্ছে নিত্যই। বয়স পঞ্চাশ হলেও অত বয়স তাই তাঁর মনে হয় না।

বাড়ি-বাড়ির গিন্নিমহলে তাঁর গতিবিধি। এ বাড়ির কথা ও বাড়িতে পাচার করে বেড়ানোই তাঁর কাজ। কাজটা কঠিন, কিন্তু নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি নির্ঝঞ্ঝাটে করে চলেছেন ঐ কাজ। গিন্নিমহলে গতিবিধি— এই জন্যে তিনিও একজন গিন্নি। এই জন্যেই তাঁর ওই পরিচয়— সকলের কাছেই তিনি কানাগিন্নি।

নাপিতানির সঙ্গে অনেক রসের কথা ও অনেক রসিকতা চলল কানাগিন্নির। এতটা রস বুঝি সহ্য হচ্ছিল না রাধার। ফরাসগঞ্জেও সে শুনেছে অনেক রঙ্গরসিকতা— বাগদীপাড়া তিলিপাড়া থেকে এসেছে হাট-ফেরতা অনেক মেয়ে, তারা বলাবলি করেছে নানা কথা। আর, সেই পদ্ম-গয়লানিও মাঝে-মাঝে দু-একটা বেয়াড়া কথা ছাড়ত। কিন্তু চুঁচুড়ার এই বাড়িতে এসে সে দেখছে এ বাড়ির রকমই আলাদা। এখানে ঐ এক কথা ছাড়া অন্য কথা নেই।

কানাগিন্নি বলল, বাইজীদের গায়ের ঘাম শুকিয়েছে এর মধ্যে, এবার আবার শুরু হবে ওদের নাচ।

থুৎনিতে তর্জনি ঠেকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করে উঠল চম্পা নাপিতানি, বলল, সে কি গো! বাইজীরাও ঘামে?

—অতক্ষণ ধরে ধেই-ধেই নাচলে ঘামবে না?

—তবে আবার তাদের সঙ্গে আমাদের তফাত কোথায়?

—তফাত ঐ ঠাটে, ওই ঠমকে।

চাঁপা একটু বুঝি ভাবল, ভেবে বলল, পরের পায়ের চচ্চা না করে এবার নিজের পায়ের চচ্চাই করি তবে। এই পায়ে নাচ হয় না কানাগিন্নি?

—কি জানি বাছা। তোমার সবটা পা চোখে দেখি নি, যাদের সে ভাগ্যি হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করো-গে।

কানাগিন্নির কথা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল চাঁপা, যা-সব কথা বলে বসল হঠাৎ, রাধার ইচ্ছে হল কানে আঙুল দেয়। সরস্বতী আর লক্ষ্মী ঐ কথা শুনে হেসে বাঁচে না।

—ঘর সাজাবে কে? আজ না ফুলশয্যা?

নাপিতানি বলল, যারা সাজাবে তারা-সব ঐ দিকে দঙ্গল বেঁধে আছে। বাড়িতে বউ এসেছে সে-খেয়াল তাদের নেই, ওরা-সব বাই নিয়ে মশগুল।

তাই। পল্লীর মেয়েদের ভিড়ে মিশে গেছেন বাড়ির গিন্নিও— রূপচরণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও। রূপনারায়ণের মা বেঁচে থাকলে বউকে তিনি অন্তত আগলে থাকতেন।

এমন বিয়ে কেন তাকে দিলেন তার বাবা। খোঁজখবর ভালো করে নিয়ে তো দিতে হয়। বাবার কথা মনেও যেমন পড়ছে, বাবার উপর অভিমানও হচ্ছে ততই। কিন্তু রাধার এখন মুখ বন্ধ, সে এখন নববধূ। চোখে জল এখন আসতে দিতে নেই— আজ একটা শুভদিন।

এত বড় বাড়িতে থাকে তবে কে? রাধা তো গুনে দেখছে তিনটি মানুষ —তার শ্বশুর, তার শাশুড়ি, এবং তার—

নাপিতানি কাছে এসে বলল, কার কথা ভাবছ বসে একা-একা। যার কথাটি ভাবছ একা, তার দেখা কি এতই সোজা? শয্যা হবে ফুলের মালার, লাজলজ্জা সব একাকার।

বলতে-বলতে সত্যিই বুঝি সব একাকার হয়ে গেল। ঝাঁকে-ঝাঁকে ঘরে ঢুকে পড়ল মেয়েরা। নিমেষের মধ্যে পূর্ণ হয়ে গেল সেই প্রকাণ্ড ঘরটি।

—একি কাণ্ড, একি কাণ্ড, একি কাণ্ড।

রূপচরণের স্ত্রী এসে পৌঁছলেন এখন, বললেন, করেছিস কি, করেছিস কি, করেছিস কি! ওরে লক্ষ্মী, ওরে সরস্বতী— তোদের জিম্মায় রেখে গেলাম এই জন্মে? ওরে চাঁপা, তোর কি বুদ্ধি নেই সুদ্ধি নেই, কিছু নেই?

—কি হল মা, কি হল?

—বউকে সাজাস নি তোরা এখনো? বসাস নি গিয়ে হল-ঘরে। ওখানেও বুঝি সাজানোই হয়নি চৌকি? ছ্যাখ ছ্যাখ ছ্যাখ। বউ দেখতে এসে গেল পাড়ার যত বউ-ঝিয়েরা। আমার ঘরের বউ কিনা এখনো না সেজে না গুজে পালঙ্কে বসে আছে কাঠ হয়ে? একটু কাল গিয়েছি ওই নাচ দেখতে, শুনেছি ঐ নেকি-নাচিয়ে নাকি খাসা নাচে! নিত্যিদিন তো পড়বে না ওদের পায়ের ধুলো এই বাড়িতে। কিন্তু যার দৌলতে এই ভাগ্য, সেই ঘরের বউকে তোরা এখনো সাজালি নে? ওরে লক্ষ্মী, ওরে সরস্বতী, ওরে চাঁপা—

এক নিশ্বাসে তিনি বলে গেলেন কথাগুলো। তাঁর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়েছে। রায়বাড়ির ব্যাটার বউকে দেখতে আসবে কত মানুষ। এই বাড়ির মান-ইজ্জৎ তো আছে, সে মান আর সে ইজ্জৎ বুঝি লুটিয়ে যাচ্ছে ধূলায়। এই জন্যেই বুঝি তাঁর এ ব্যাকুলতা।

এই ব্যস্ততা ও এই চঞ্চলতা দেখে রাধার মন পুলকিত হয়ে উঠল। এতক্ষণ যাকে উপেক্ষিত বনফুলের মত ফেলে রাখা হয়েছিল, এখন তাকে যেন সোনার সাজিতে তুলে নেওয়া হয়েছে।

বাই দেখে যাদের চোখে ঘোর লেগে আছে, তারা সকলে রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক চোখে। তারা বলাবলি করতে লাগল, ঘরে বুঝি লক্ষ্মীই এল। নারায়ণের পাশে মানাবে বেশ। বধূবরণের সময় কিন্তু এত সুন্দর লাগে নি।

—অতখানি রাস্তা ধুলোকাদা ডিঙিয়ে রোদের ঝাঁজে আসতে আসতে হয়রান হয়ে পড়েছিল না তখন?

—তা তো বটেই। সত্যিই লক্ষ্মী।

পাশ থেকে কে-যেন বলল, ও কথা বোলো না। লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। কবে ঘরে থাকে কবে পালায় ঠিক নেই। বল, উর্বশী।

—আরে পোড়ারমুখী! উর্বশী বুঝি লক্ষ্মীর চেয়ে ভালো হল? বাইনাচ বুঝি এখনো লেগে আছে চোখে? তাই ঐ নাচনাউলির নামটা করলি? তার চেয়ে বল-না, ও হচ্ছে নিকি।

—দূর্। ঘরের বউকে কি বাইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

—বাদটা রাখলে কোথায়? উর্বশী বুঝি বাইজী না?

রায়গৃহিণী ভারিক্কে ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আবার এসে ঢুকলেন। ভঙ্গিটা তাঁর ভারিক্কে, কিন্তু পরিধেয় বড় হাল্কা। কাচস্বচ্ছ মসলিনে তিনি সাজিয়েছেন আজ নিজেকে। পরনে তাঁর রঙদার ঝিনা— এক খণ্ড বস্ত্র দুইবার বেষ্টন করেছে তাঁর অঙ্গ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দুইবার জলের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে তাঁর শরীরে। মিহি মসলিনে ভূষিত হয়েছেন রায়-গৃহিণী— কণ্ঠে হাতে কানে নাকে সিঁথিতে অপরূপ অলংকার।

শাশুড়ির দিকে আড়চোখে একবার তাকাল রাধা। এ বাড়ির সাজের ধরণ বুঝি এম্নি? রাধাকেও বুঝি সাজতে হবে ঐ সাজে?

রায়গৃহিণীর ব্যস্ততার ও তাঁর সাজের ঘটার দিকে চেয়ে আলগোছে চোখ ঠারাঠারি করল চম্পা ও কানাগিন্নি।

কিন্তু ব্যস্ততার কোনো কারণ নাকি নেই। মালাকরের বউয়েরা এসে সাজিয়ে ফেলেছে হল-ঘর। এখন, এই ঘরটা খালি হলে তারা এসে ফুলশয্যার জন্যে সাজাবে এই ঘর।

রাত্রি গভীর হয়ে আসছে ক্রমশ। নদীর ঘাটের নৌকাখণ্ড-যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। আজ রাত্রের মত নাচের আসরও স্তব্ধ হল। মধ্যরাত্রি কখন অতীত হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না।

অভ্যাগতেরা যান-আরোহণে এখন ব্যস্ত। বিবিলোকেরা সাহেবলোকদের হাত ধরে তাদের নিয়ে চলেছেন নদীর ঘাটে। বজরা অপেক্ষা করে আছে সেখানে। তাঁরা স্ব স্ব স্থানে যাবেন। ভাগীরথীর পশ্চিম পার থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জন্যে পালকি প্রস্তুত আছে। তাঁরা টলিত পদে অগ্রসর হয়ে পালকিতে উঠলেন। রিষড়ায় শ্রীরামপুরে ব্যাণ্ডেলে একে-একে চলল পালকি।

পুড়ে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে এসেছে মোমবাতি। নকল বাগিচার গেলাসী ঝাড়ে আলো নিভ-নিভ। ফলফুলের কৃত্রিম উদ্যান অকৃত্রিম অন্ধকারে আবৃত হয়ে আসছে।

ফুলশয্যার ঘরে শুধু উজ্জ্বল আলো বিস্তার করছে অগণিত জীয়ন্ত মোম। ঝাড় থেকে ঝরে-ঝরে পড়ছে আলোর ঝরনা।

এই আঁলোর মধ্যে ফুলসাজে সজ্জিত হয়ে বসে আছে রাধারানী।

হাসি-তামাশা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এয়োরা ও কুমারী কন্যারা। মেজের ফরাসে রাধারানীকে বসিয়ে তাকে ঘিরে আছে তারা। তাদের চোখও ঢুলু-ঢুলু। কেউ-কেউ বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। ঝিমন্ত সেই কুমারী কন্যার রক্তিম ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হয়ে কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে তার দন্তপাতির, মনে হচ্ছে দাঁত বুঝি না, যেন মুক্তো ও, ঝাড়ের আলোতে বুঝি ঝলসে যাচ্ছে চোখ।

রূপনারায়ণ এখনো আসে নি। সে আসবে, তার পর কিছুটা স্ত্রী-আচার-পালন আছে, তার পর তো আরম্ভ হবে ফুলশয্যা।

কিন্তু বর এখনো বহির্বাটীতে। তার চতুর্দিকে ইয়ারেরা তাকে মশগুল করে রেখেছে। সে আসর থেকে উঠে আসতে এখনো পারেনি সে। কৌতূহল তারও যে নেই একেবারে তা নয়, উঠি-উঠি ইচ্ছে তার আছে। কিন্তু ওঠার কথা বলার অবকাশ কই।

তন্দ্রার ঘোর থেকে কে যেন বলে উঠল, রাত কত?

—রাত আছে। পাখি ডাকে নি এখনো।

কানাগিন্নি ও নাপিতানি চৌকাঠের ওপারে জেগে বসে আছে। তাদের চোখে ঘুম নেই। তারা ঘুমিয়ে পড়লে বুঝি সর্বনাশ। ঘরের-ঘরের কথা এদিক-ওদিক চালাচালি হবে তবে কেমন করে।

সিঁড়িতে শব্দ পাওয়া গেল পায়ের। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল ওরা দুজন—দাদাবাবু এল বুঝি, দাদাবাবু বুঝি এল!

হ্যাঁ, দাদাবাবুই। রূপনারায়ণ আসছেন। মৃদু-মন্দ পদক্ষেপে ফুলশয্যার ঘরে আসছেন রাধার স্বামী।

নাপিতানি ও কানাগিন্নি ঘরে ঢুকে খবরটা চটপট জানিয়ে দিল সকলকে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল সকলে। কেবল মাথাটা আরও একটু নত করে বসল রাধা।

রাধা কেবল মনে-মনে বলতে লাগল বুঝি—এমন কি করে কখনো? এমন প্রথম-রাত্রিটা এভাবে কি কাটিয়ে দিতে হয় বাহিরবাটীতে? জীবনে তো আরও কত রাত্রি আসবে—সেসব রাত্রি নিয়ে কোনো অভিযোগ কিংবা

কোনো অনুযোগ সে করবে না কখনো, কিন্তু এই রাত্রিটা কেটে গেল ঐ আকাশে-আকাশে তারায়-তারায় আর তার ঘরের মধ্যে এই মোমবাতি পুড়িয়ে দিয়ে-দিয়ে !

এয়োরা মিলে বরকে বসালো ফরাসে। তার পাশে ঘন করে বসালো রাধাকে। বড জড়তা, বড সংকোচ, বড অস্বস্তি ঠেকতে লাগল রাধার। কাল এতটা রাস্তা এই লোকটার পাশে বসে বসেই সে এসেছে, কিন্তু এমন সংকোচ-বোধ তার হয় নি। আজ সন্ধ্যা থেকে এই মানুষটার প্রতীক্ষায় তার কেটেছে ব'লেই বুঝি তার শরীরে এখন এই শিহরন জেগেছে।

একে-একে যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। তার পর গান শুরু করল এয়োরা। সে গানের গলা আর তার ভাষা জীবনে কখনো ভুলবে না রাধারানী।

মেজের উপর নাচতে লাগল কানাগিন্নি, কোমর দুলিয়ে-দুলিয়ে বড় রঙ্গ করে নাচতে লাগল সে। চম্পা-নাপিতানি দু হাত বাজিয়ে-বাজিয়ে তাল দিতে লাগল।

এয়োরা হেসে আকুল। রূপনারায়ণও হাসতে লাগল ওদের সঙ্গে।

হেলে-দুলে নেচে-নেচে কানাগিন্নি গাইতে লাগল—

ছাখো দিকি নাচছে নিকি নাচছে সুপন্‌জান
বাই নাচাতে তাই নাচাতে আমরা সাহেবান।
নাচের আসর ক'নের বাসর
ক'নের বাসর খুশির সাগর
এই ছাখো-না নাচছে হিঙ্গুল নাচছে বেগমজান।

অট্টহাস্য উঠল ঘরে, খুশির সাগর হয়ে উঠল বাসর-ঘরটি। এয়োরা ও কুমারী কন্যারা মিশে একাকার হয়ে গেল।

তবু বুঝি নাচ থামে না কানাগিন্নির। বয়সে পাক ধরেছে, সেইসঙ্গে রসেও বুঝি ধরেছে পাক। পাক খেয়ে পাক খেয়ে তিনি নেচে-নেচে গাইতে লাগলেন—

এ ছাখো-না নাচছে সুপন্ নাচছে বেগম জান।
এই নাচাতে ওই নাচাতে ভাবনা কিসের প্রাণ।

আবার হাসি ফিনকি দিয়ে উঠল সকলের গলায়। কানাগিন্নির তামাশা দেখে সবাই বলতে লাগল, ওই সায়েবলোকদের সামনে দেখালে না কেন নাচ, মোহর ছুঁড়ে দিত তোমার পায়ে।

রূপনারাযণকে বড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আতরের গন্ধে তার সর্ব শরীর ভরা। ওই গন্ধ ভেদ করে আর কোনো গন্ধ পাওয়া এখন সম্ভব নয়।

উঁচু খাট। সকলে ওদের ধরাধরি করে মই বাইয়ে খাটে ওঠাল। পাশাপাশি বসাল ওদের। তারপর গোলাপজল ছিটাল গায়ে, তারপর করল পুষ্পবৃষ্টি। ফুলের সৌরভে আতরের গন্ধ বুঝি চাপা পড়ে গেল।

একে-একে নিভিয়ে দিতে লাগল ঘরের বাতি। ঝাড়-আলো থেকে শুধু ঝরে-ঝরে পড়তে লাগল আলোর ঝরনা।

সাটিনের পর্দা নামিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে সকলে আড়ি পেতে দাঁড়াল বাইরে। কোন্ অলক্ষ্যে বসে পাখা-ওয়ালা জোরে-জোরে টানতে লাগল পাখা। পাখার সোনালি পাড়ে ঝাড়ের আলো পড়ায় মনে হতে লাগল যেন বিদ্যুৎ উঠছে চমকে-চমকে।

জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে রাধা। প্রতি মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে জেগে উঠছে কিসের যেন প্রত্যাশা। তার নিশ্বাসে ভয় ও সংকোচ। তার শরীরে সুস্বাদু শিহরন।

তার পাশে শয়ন করে আছে, কে এ? ভাবতে বড় ভালো লাগল রাধার— এ তার স্বামী।

সেই স্বামীর কাছ থেকে একটু সম্বোধন বুঝি আশা করে সে। কিন্তু একি, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি মানুষটা? সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা দেখার কৌতূহল হল তার, কিন্তু বাইরে বুঝি আড়ি পেতে আছে ওরা। চুপ করে শুয়ে রইল রাধা।

রাত্রি কাটছে। রাত্রির বুঝি আর বাকিও নাই। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কিসের ডাক। গ্রাম্য কুকুরেরা বুঝি ধাওয়া করেছে শৃগালের পিছনে।

এয়োরা চলে গেছে ক্লান্ত হয়ে। কুমারী কন্যাদেরও টেনে নিয়ে গেছে তারা তাদের সঙ্গে।

—জাগা হ্যয়, জাগা হ্যয়, জাগা হ্যয়।

চৌকিদার ডাক পেড়ে-পেড়ে চলে যাচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে— এ-যেন রাধার সেই ফরাসগঞ্জ। সেখানেও এমনি গলাতেই তো হাঁক দেয় চৌকিদার। সেখান থেকে ডাকতে-ডাকতেই কি এতদূরে চলে এসেছে সে?

বাবা কি এখন জেগে আছেন, কিংবা মা? নবীন ও মুরলীর যা ঘুম, ওরা নিশ্চয় জেগে নেই এখন। এ বাড়িতেও বুঝি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে সকলে। কিন্তু রাধা জেগে আছে। ওই চৌকিদারটা নিশ্চয় তা জানে না।

কখনো ছাদের দিকে, কখনো ওই পাখাটার দোলের দিকে, কখনো ঝাড়-আলোর দিকে তাকাচ্ছে রাধা।

ব্যাণ্ডেলের গির্জায় আর কাছেই ওই আরমানি গির্জায় মাঝে-মাঝেই যুগপৎ ঘড়ি বেজে উঠছে।

পাশের দিকে চেয়ে ঐ মানুষটার মুখের দিকে তাকাচ্ছে রাধা। কালো কুচকুচে একটা প্রজাপতি যেন ঐ মুখটির উপর বসে।

এবার একটু ভালো করে দেখতে পেয়েছে সে ঐ মুখ। ভারি পছন্দ হচ্ছে রাধার। গায়ের রঙ ঠিক আনটুনি সায়েবের মত। মানুষটাও নিশ্চয় ভালো হবে ঐ আনটুনির মতই। নিরুদিকে কত সুখে রেখেছে সে, রাধাকেও নিশ্চয় তেমনি সুখে রাখবে এই মানুষটি। নিরুদি নাকি কত সুখ্যাতি করে বেড়ায় ঐ মানুষটার। রাধাও খুব সুখ্যাতি করতে চায় এই মানুষটার।

কিন্তু অমন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লে সে সুখ্যাতি করবে কার? মানুষটার কি কি গুণ আছে, তার গলার স্বরটা কেমন— এসব একটু জানতে হবে না রাধাকে?

—জাগা হ্যয়, জাগা হ্যয়, জাগা হ্যয়?

রব করতে করতে দূর দিয়ে চলে গেল চৌকিদারটা। রাধার মনেরও তো ঐ একই জিজ্ঞাসা, সেও জানতে চায়, জেগে আছ কিনা।

কিন্তু তার জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে? মড়ার মত অচেতন হয়ে পড়ে আছে রূপনারায়ণ।

কিসের শব্দ ওটা? কান পাতল রাধা। বুঝতে পারল না প্রথমে। একটু পরেই অবশ্য বোঝা গেল— প্রভাতফেরী। প্রভাতফেরী বেরিয়ে পড়ল এর মধ্যেই? তবে রাত কি শেষ হয়ে গেল? এত শিগগিরি শেষ হয়ে গেল কেন রাত্রিটা। কেন, আর দু দণ্ড থেকে গেলে হত না? আর দু দণ্ড রাধাকে প্রতীক্ষা করতে দিলে কী ক্ষতি ছিল।

হরিনাম করতে করতে চলেছে প্রভাতফেরী, ঐ নামকীর্তনের মধ্যে তার স্বামীর নাম অনবরত উচ্চারণ করছে তারা। রাধাও মনে-মনে উচ্চারণ করতে লাগল ঐ নাম।

ডেকে উঠেছে পাখিরা। ঐ বেজে উঠেছে তাদের কূজন।

উঠে পড়ল রাধা। মা বার-বার শিখিয়ে দিয়েছেন, পাখি ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে যেন শয্যাত্যাগ করে রাধা, নববধূদের আর শয্যায় থাকতে নেই।

উঠে বসে সে তার স্বামীর মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়েই হামাগুড়ি দিয়ে পায়ের দিকে চলে এসে মই বেয়ে নেমে পড়ল।

রাধার জীবনের একটি স্মরণীয় রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। চুঁচুড়ায় নেমে এল নতুন রোদ। ধীরে-ধীরে সেই রোদ উঠল তেতে, বেলা বাড়তে লাগল ক্রমশ। কিন্তু রূপনারায়ণের ঘুম এখনো ভাঙল না।

একটু বুঝি চিন্তিতই হল রাধা। এখনো ঘুম থেকে ওঠে না কেন ঐ মানুষটা? বেলা এত হয়ে গেল, তবু?

বাড়িতে মানুষ কম, কিন্তু দাসদাসীর সংখ্যা ঠিক করা কঠিন। রাধা বসে আছে যেন এক দাসী-হাটে।

প্রশস্ত বারান্দার থামের ছায়ায় বসে সলতে পাকাচ্ছে একদল দাসী। স্নানের জল তুলে এনে জড়ো করছে কেউ দোতলার স্নানঘরে। কেউ কোঁচাচ্ছে কাপড়। আলনা গুছাচ্ছে কেউ-বা। কেউ মুছছে দরজা-জানালা।

সারা বাড়ি উৎসবের হিড়িকে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। সব গোছগাছ করতে হবে, সব পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে হবে, তার জন্যে চারদিকে দাসীরা ব্যস্ত।

হল-ঘরটায় এসে বসেছে রাধা। পাঁচ-সাত জন দাসী নিযুক্ত হয়ে গিয়েছে তার পরিচর্যায়। তার চুল খুলে নিয়ে বিলি করছে আর আঁচড়াচ্ছে একজন, অন্যজন তার মুখের কাছে ধরে আছে ছোট একটা আরশি।

তেলের শিশি, আলতা, কুমকুম একটা রুপোর থালায় সাজিয়ে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একজন।

দাসী-হাটে বসে বসে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করছে রাধারানী। রাজরানী হয়েছে সে সত্যিই। কিন্তু এই সাম্রাজ্য তার ভাগ্যে টিকবে তো? এত সেবা, এত যত্ন, এত পরিচর্যা— সবই সে পাচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছেনা বুঝি একটা জিনিস—

—হৃদয়, ওরে হৃদয়।

কাকে যেন ডাকতে-ডাকতে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকল এক দাসী— ওরে, হৃদয় কই, হৃদয়বালা?

এক গোছা চুল হাতে ধরে মুখ তুলে তাকাল হৃদয়বালা, বলল, কেন, কেন।

—দাদাবাবু উঠেছেন।

—তার আমি কি করব?

—ঘরে জল আছে তো ?

—জলতুলুনিকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার বুঝি কোনো কাজ নাই, ভব। সবার উপর খবরদারী করে বেড়াবে আর কত কাল ?

ও কথার উত্তর দিল না ভবসুন্দরী। ব্যস্ত হয়ে সে চলে গেল আর কাকে যেন খবর দিতে।

সারা বাড়িতে হাট বসে গিয়েছে। নীচে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে এসে পড়েছে মাছ, সেই মাছ কোটার জন্যে মস্ত মস্ত ধারালো বঁটি আছে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণদুয়ারী বারান্দায় সার-সার বঁটির মিছিল, তরিতরকারি গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এসব আয়োজন শুধু পাড়াপ্রতিবেশীদের জন্যে। আরব মোগল আব হিন্দু ভাগ্যবান যাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসবেন তাঁদের জন্যে নকল বাগানের পিছনে নতুন রন্ধনশালায় বন্দোবস্ত।

বাড়িটা সরগরম বটে, কিন্তু বড়ই যেন ফাঁকা। বিয়েবাড়ি এমন ফাঁকা হতে পারে জানা ছিল না রাধার। জীবনে এর আগে বিয়ে তার না হোক, এর আগে বিয়েবাড়ি সে দেখেছে অনেক, কিন্তু এমন বাড়ির কথা তার ধারণার মধ্যেও ছিল না।

নাপিতানি এসে গেছে। পা মেজে পায়ে রাঙা আলতা পরিয়ে দেবে সে। তৈরি হয়েই এসেছে চাঁপা।

ভবসুন্দরী কেবল উপর-নীচ করে বেড়াচ্ছে, ঠিক কোন্ কাজটায় হাত দিলে গতরে ঝাঁকি লাগবে না, এই বুঝি তার খোঁজ। অবশেষে নীচে গিয়ে সে পানের ঘরে ঢুকল, পান সাজা হচ্ছে। লবঙ্গের থালার সামনে বসে সে লবঙ্গের মাথার ফুল ভাঙতে লাগল। বলল, হৃদয়টা হয়েছে এমন ঠেকারি আর গিদেরি যে, একটা কথা বললেই ফোঁস করে ওঠে— যেন কালকেউটে।

সুভাষিণীর মুখে দোক্তা পান, কথা বলতে অসুবিধে, মুখটা একটু তুলে নীচের ঠোঁট দিয়ে পানের পিক যেন আল দিয়ে নিল, বলল, উনি বুঝি হৃদয়েশ্বরী ?

—কার লা, কার ?

উত্তেজনায় পিকটা গিলে ফেলল সুভাষিণী, বলে ফেলল, কার নয়, তাই আগে বল্। আবদার আছে, খানসামা আছে, সোটাবরদার আছে। ওর দিনকাল খুব ভালো। তাই অত দেমাক।

কোন্ কোন্ দাসীর কি কি গলদ সেই কথা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল এর পর। কার টান বেশি কার দিকে তার হিসাব, কার সঙ্গে কে কোথায় গিয়ে মেলে— ইত্যাদি আলোচনার সঙ্গে পান-রচনার কাজ চলল।

ভবসুন্দরী বলল, ব্যথা হয়ে গেল আঙুলে, লবঙ্গর ফুল-ছাড়ানো বড় ঝঞ্ঝাটে কাজ।

মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ ধরে ওপাশে বসে কি যেন করছে নন্দা। সবাই ওর দিকে তাকাল, জিজ্ঞাসা করল, অত ডুবে আছিস কিসে লো নন্দরানী?

একটা পান সেজেছে সে অনেক যত্ন করে। বোঁটা ধ'রে তুলে দেখাল। একটা পান চিরে-চিরে বত্রিশ ভাগ করে বত্রিশটা পান সেজে ফেলেছে সে এক বোঁটায়।

নন্দা বলল, এটা দাদাবাবু খাবে আজ।

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল ভবসুন্দরী, গলাটা একটু নামিয়ে চারদিক চেয়ে সকলের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল, ওঃ, দাদাবাবু! সাতজন্মের দাদাবাবু! কাজে বহাল হলি তো এই সেদিন। এরি মধ্যে দাদাবাবুর জন্যে আলাদা করে পান তৈরির ঝোঁক জেগেছে বুঝি? দে, দে ওটা আমাকে।

নন্দা বলল, থাক্। বউদিকে দেব তবে।

—কেন কেন কেন। বউদি খেতে জানে আর আমরা কেউ মানুষ নই? বারো জন্মের বউদি।

অনেক যত্ন করে পানটা সেজেছে নন্দা, অনেক সময় খরচ করেছে, আঙুলের নিপুণ কাজও দরকার হয়েছে এতে, সেই পানটা নিয়ে গিয়ে সে দিতে চায়, নেহাত দাদাবাবুকে যদি নাই-ই হয়, দিতে চায় বউদিকে। পানটার উপরে তার বড় মায়া জন্মে গিয়েছে। নিজের হাতের কাজ দেখে সে নিজেই বুঝি মজে গিয়েছে।

ভব বলল, দে, দে শিগগির। দে তো সুভাষিণী পানটা এগিয়ে।

সুভাষিণী হাত বাড়াতেই নন্দা উঠে গিয়ে ভবর হাতে দিল পানটা।

ভব বোঁটা ধরে বত্রিশটা পানের তোড়াটা এক পলকের জন্যে দেখল মাত্র, তার পর জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, এই নে, কুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে আয় তোর দাদাবাবুকে।

বোঁটা থেকে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে পানগুলো, নন্দা একবার মাত্র সেই দিকে চেয়েই নিজের জায়গায় এসে বসল।

ভবসুন্দরী বলল, কাজের নামে নেই দেখা, যত-সব অকাজ। মস্ত জিনিস দেখাচ্ছিস! এক বোঁটাতে এক শ পানও দেখেছে তোদের এই ভব। খড়দহের পতিতপাবন শেঠের নাম শুনেছিস? তা শুনবি কেন? তার মত ধনী মানুষ গঙ্গার ওপারে নাই। ওয়ারেন হেস্‌টিনের নাম শুনেছিস? তা শুনবি কেন? ওর বাপ ছিল হেস্‌টিনের ডান হাত। সেই বাড়িতে কাজ করেছে এই ভব। আজ ভব এসেছে তোদের সঙ্গে কাজ করতে, তাই ভেবেছিস ভব বুঝি তোদেরই একজন। কিন্তু তা না রে, তা না। ভবকে যারা চেনে তারাই চেনে। পতিতপাবনের বাড়িতে নিত্য দু-বেলা পান সাজা হত ঐ রকম— এক বোঁটাতে এক শ।

রূপনারায়ণবাবুর প্রাতঃকৃত্যাদি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বেশ পরিবর্তন ও প্রসাধন শেষ করে তিনি গিয়ে বসেছেন বহির্বাটীতে।

ইয়ারেরা তাঁর প্রতীক্ষায় বসে ছিল। তাঁর গতরাত্রের অভিযানকাহিনী শোনার জন্যে তারা হয়তো কিছুটা ব্যগ্র।

বিরাট ফরাস, কোঁচার প্রান্তটি আলগোছে ধরে রূপনারায়ণ সেই ফরাসের এক প্রান্তে গিয়ে বসলেন তাকিয়ার ঠেসান দিয়ে।

প্রথম ইয়ার বলল, অনেক দেরি হয়ে গেল না আজ?

দ্বিতীয় ইয়ার বলল, তা আর হবে না? ফুলশয্যার রাত্রের পর মানুষে একটু হয়রান হয় না? জীবনে বিয়ে-সাদী তো হল না তোদের।

এরা কথা বলছে, ওদিকে হুঁকাবরদার হাজির, লম্বা নলের মুখটি এনে রূপনারায়ণের কাছে ধরে দাঁড়াল।

কোনো রকমে হাতটি নেড়ে তিনি নলটি গ্রহণ করে বললেন, ওরা-সব কি করছে এখন?

—কারা? কাদের কথা বলছ?

—নাচনাউলিরা?

দ্বিতীয় ইয়ার বলল, যাবে কোথায় তারা, আজ রাত্রে আবার নাচতে হবে না? আজকের নাচ শেষ হলেই তাদের ছুটি।

অনেকক্ষণ বসে কি-যেন চিন্তা করলেন রূপনারায়ণ রায়, গোঁফ-জোড়া নড়ে উঠল একটু, বললেন, বেনারসেরটা জিনিস কেমন?

—ওঃ ওঃ, তোফা।

—নামটা কি যেন।

—জীনত, জীনতবাই।

রূপনারায়ণবাবু এখন বর। এখন তিনি নিজেকে যথাসম্ভব সামাল রেখে চলেছেন। যত সব অতিথি-অভ্যাগত, তাদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে নিজেকে সস্তা করে দেবার ইচ্ছে তাঁর নয়। কিন্তু সব বিষয় জানার কৌতূহল তাঁর সামান্য নয়, সেই কৌতূহলের বশে এক-এক সময় এক-একটা কথা বুদ্বুদের মত জেগে ওঠে মাত্র। ইয়াররাও হাতের কাছে প্রস্তুত, তাঁর সব জ্ঞাতব্য বিষয়ের খবর দেবার জন্যে তারা সর্বদাই উৎসুক।

সব রকম নাচের ও নাচিয়েদের খবর তিনি নিলেন একে একে, আর চিন্তা করতে লাগলেন নানারকম। তাঁর মনে হয়তো অনেক রকমের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা জাগছে, কিন্তু হাজার উচ্ছৃঙ্খল হলেও সংযমেও তিনি যে কম সিদ্ধহস্ত নন তার প্রমাণ দেবার জন্যে ফরসির নলে মৃদু-মৃদু টান দিয়ে মুচকে-মুচকে হাসতে লাগলেন তিনি।

তৃতীয় ইয়ার এতক্ষণ কথা বলে নি, রূপনারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে তার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি দেখে সে বলল, মনে পড়ে যাচ্ছে বুঝি রাতের ঘটনা? নেহাত অন্দরমহলে বিছানা হয়েছিল, তাই আড়ি পাতা হল না।

একটু কাছে সরে গিয়ে রূপনারায়ণকে ঘিরে বসল সকলে, বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল নানা কথা। কিন্তু একটু সন্তর্পণেই বুঝি প্রশ্নগুলি করছিল তারা। বিয়ে-করা বউ নিয়ে আলোচনা— এ আলোচনায় রূপনারায়ণের কতটা সায় আছে বা না-আছে তাদের জানা নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম প্রশ্ন করাতেও রূপনারায়ণ কোনো রকম বিরক্ত হচ্ছে না দেখে তাদের সাহস বুঝি বেড়ে গেল।

চতুর্থ ইয়ার বলল, কি কথা হল শুনি?

— কথা? শরীরটা তাকিয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে রূপনারায়ণ বলল, কথা আবার কি হে। বিয়ে-করা বউ, তার সঙ্গে কথা আবার কি। কথা বলতে হয় প্রেম জানাবার জন্যে। বউয়ের সঙ্গে কি কখনো পিরীত হয়, না, পিরীত জমে।

—তবু, তবু! রূপের খবর ছড়িয়ে গেছে ব্যাণ্ডেল থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত, ওপারে খড়দহ থেকে ফোর্ট উইলিয়ম। সে রূপ কেমন দেখলে বলো।

রূপনারায়ণ রায় বড় শেয়ানা পুরুষ, বলল, এই বাড়ি এই ঘর ওই বাগান— এগুলি যেমন আমার, ওই রূপটাও তেমনি আমারি। পাঁচ জনের তারিফ শুনে খুশি হব।

কাল রাত্রের গেলাশী ঝাড়ের ও গেলাশী বাগিচার কথা তুলল রূপনারায়ণ রায়। ও সবই তো তার বাবার, বাবাই ওইসব রঙের বাহার তৈরি করিয়েছিলেন, সে সবই বাবার নিজের জিনিস। কিন্তু তিনি কি ওইসব দেখেছেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, না, তারিফ করেছেন ওগুলির? তানজামে চাপিয়ে সাহেবদের দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়িয়েছেন, তারিফ করেছে তারা। এইজন্যে—

—ঐ রূপ তোমার নিজের সম্পত্তি?

— হ্যাঁ। ও আমার ঘরে রাখার জিনিস। পাঁচজনের তারিফ শুনে খুশি হব।

— বাহবা বাহবা বাহবা।

হাততালি দিয়ে উঠল ইয়ারেরা। কথাগুলো বড় মজাদার লেগেছে তাদের। সেই মজায় তারা মশগুল, তবু কিছু অন্তত জানার ইচ্ছে তাদের আছে। তারা তাদের সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

রূপনারায়ণ বলল, কিছু না কিছু না। দেখলাম, একটা পুতুল জড়োসড়ো হয়ে শুলো আমার পাশে। মেয়েমানুষ যদি শুধু মাংসের একটা পিণ্ড হয়, তার মধ্যে প্রাণ না থাকে, চটক না থাকে, জেল্লা না থাকে, তবে তাকে দিয়ে কাজ কি রে'

কিন্তু প্রথম ইয়ার একটু নাছোড়বান্দা ধরণের। সে বলল, কিন্তু ঐ টানে গিয়েছিলে তো অন্দরমহল পর্যন্ত। কতদিন পরে ঐ অন্দরে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল, একবার হিসেব করে দেখ তো।

হিসাব করার মত সময়ও নেই, মাথা খাটাবার ইচ্ছেও নেই রূপনারায়ণের। তার হয়ে হিসেব করতে আরম্ভ করল তৃতীয় ইয়ার।

অনেকক্ষণ ধরে হিসেব করে বলল, রূপনারায়ণের মা যেবার মারা যান, আর ঐ মহম্মদ-মহসীন যেবার ফিরে এল হজ থেকে। চার বছরের উপর হয়ে গেল। তাই হল না?

ইয়ারেরা হিসেবে বসল, হিসেব করে মিলে গেল সকলের অঙ্ক, একই উত্তর পেয়ে গেল বুঝি তারা।

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, তাই তাই তাই। চার-পাঁচ বছর হয়েছে।

অতএব বোঝা গেল, রূপনারায়ণ রায় যতই বলুক, এতদিন বাদে সে গিয়ে ঢুকেছিল যে অন্দরে, সে কার টানে? মনে-মনে টান একটু না থাকলে বাহিরবাটীর আসর আর বাহিরবাটীর বিছানা ত্যাগ করে মাঝরাত্রে কেউ গিয়ে কি ঢোকে ওই মেয়ে-মহলে?

হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। আগা মোতাহারের মেয়ে মান্নুজান বিধবা হল, হুগলী থেকে শোকের সেই বান এসে চুঁচুড়ার ঘাটেও খেল ধাক্কা। সেই শোকের মিছিল শেষ হবার আগেই চুঁচুড়ায় এসে গেল নতুন শোক— রূপনারায়ণের মা মারা গেলেন। সে সময় পর্যন্ত অন্দরমহলে গতিবিধি ছিল তার। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সে একটু অন্যরকম হয়ে গেল। ভিতর-বাড়িতে যাবার আগ্রহ কমে আসতে লাগল ধীরে-ধীরে। তারপর অচিরেই সে আগ্রহ একেবারে শেষ হয়ে গেল। মহসীন যে দিন হজ থেকে ফিরে এলেন, হুগলীর ঘাটে এসে যখন লাগল তাঁর ভাউলে, মসজিদে-মসজিদে যখন আজান শুরু হয়ে গেল, রূপনারায়ণের মনে পড়ে, সে-রাত্রে সে এই বহির্বাটীতে।

এইসব ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই অন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক তার শেষ হয়েছে।

সম্পর্ক আবার নতুন করে গড়ে উঠত কিনা কে জানে। ইতিমধ্যে তার জীবনে গড়ে উঠল অন্য সম্পর্ক। ইয়ারবন্ধুরা এসে জুটে গেল তার জীবনে। এল মতিলাল, এল নরহরি, এল আরো অনেকে।

যে জীবন ছিল নীরস ও নির্জীব, সেই জীবনে নতুন চেতনা হল সঞ্চারিত। ভিতরবাড়ির দিকে আর পা-ই পড়ল না রূপনারায়ণ রায়ের।

দিনের পর দিন এইভাবে কেটে চলেছে নতুন আহ্লাদে এবং নিত্যনিত্য নতুন আমোদে-প্রমোদে, হঠাৎ সেই স্রোতের মুখে এসে পড়ল যেন একখণ্ড শিলা।

শান্তিপুর থেকে ফিরে এসে রূপচরণ জানালেন, রূপনারায়ণের বিয়ে।

বিয়ে? খবরটা প্রথম শুনেই বুঝি একটু চমক লেগেছিল, থমকে থেমে যেতে হয়েছিল, কিন্তু একটু ভেবে দেখে বোঝা গেল ব্যাপারটা এমন গুরুতর কিছু নয়।

এই বাড়িতে ঐ ব্যাপার তো হয়েছে এই কিছুকাল আগে। তার বাবাও বিয়ে করে ঘরে এনেছেন নতুন মাকে। তাতে বাবার তো বাধা পড়ে নি কোনো কাজে, পড়ছেও না। কাজ-কারবারের মানুষ কখনো কলকাতার ব্ল্যাক টাউনে কখনো-বা হোয়াইট টাউনে কতদিন কাটিয়ে ফিরে আসছেন চুঁচুড়ায়। বাবার নামে কত কেচ্ছাই তো তার কানে আসছে, কিন্তু তাতে বাবারই বা কি তারই-বা কি আর তার নতুন মায়েরই বা কি। যার

যার মতন সে সে আছে নিজের নিজের খুশি নিয়ে। মায়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কই বা কি!

সুতরাং, রূপনারায়ণ একটু আশ্বস্ত হল। ইয়ারেরাও বুঝিয়ে বলল, পুরুষ-মানুষদের বিয়ে একটা করতে হয়, ঘরে একটা বউ রাখতে হয়।

— কেন?

— নিয়ম।

সেই নিয়ম ইতিমধ্যে পালন করে ফেলেছে রূপনারায়ণ রায়। কিন্তু সেই জন্যে তার জীবন যে-নিয়মে বয়ে চলেছিল এতদিন সে-নিয়মগুলি বজায় যে থাকবেই এতে তার সন্দেহ নেই। ইয়ারেরাও তাই বলে।

কিন্তু কোথায় গেল সেই কথাটা, সেই টানের কথা? এতদিন পরে কিসের টানে রূপনারায়ণ গিয়ে ঢুকেছিল ঐ অন্দরে?

এবার উত্তর দিল সে, বলল, নিয়ম। যেতে হয় রে অন্তত একদিন— ঐ ফুলশয্যার রাত্তিরে। মেয়েদের জীবনে ও একটা মস্ত রাত। ঐ রাত্রিটা তাদের সঙ্গে কাটালে তারা ধন্য হয়ে যায়। যাকে আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না, তাকে ঐ দিনটা তো পাওয়া চাই।

ইয়ারেরা অট্টহাস্য করে সমস্বরে বলে উঠল, ব্যস ব্যস ব্যস। বুঝতে পারা গেল তাহলে। কাল তোমাকে সে পেয়েছে।

তাকেয়ায় কনুয়ের ভর দিয়ে একটু সোজা হয়ে বসে নলটা হাত থেকে নামিয়ে রূপনারায়ণ রায় বলল, পেয়েছে। প্রাণ ভরে।

উচ্চহাস্যের রোল উঠল বৈঠকে। ইয়ারেরা হল্লা করে উঠল, বলতে লাগল, জোরসে পাংখা টানো, আউর জোরসে। বোলাও আব্‌দারকো। কাঁহা হুইস্কি, কাঁহা ব্রাণ্ডি। লাও লাও।

হুকুম পাওয়ামাত্র জিনিসপত্র এসে জড়ো হল সামনে।

কালকের রাত্রের গল্প বলতে লাগল রূপনারায়ণ রায়। সবাই উৎসুক হয়ে ঘন হয়ে বসলে সে বলল কানাগিন্নির কথা।

তার নাচ তার ইয়ারেরা দেখল না এ তার বড় আক্ষেপ। কে বলে বয়স হয়েছে ওর—এখনো দিব্যি হেসে-খেলে দশ বছর কাটিয়ে দিতে পারবে। একটা চোখ নেই, তাতে অসুবিধে নেই কোনো; বাকি একটারই চাউনির যা ভঙ্গি তাতে বুকের রক্ত টগবগ করে, কানাচোখটার উপরের ভুরুও এমন নাচতে থাকে যে, ইচ্ছে করে উঠে গিয়ে ঝাপটে ধরে ঐ ভুরুটা উপড়ে নিয়ে চুরি করে

পালাই। সে কি গান কানাগিন্নির, কথাগুলো মনে পড়ছে না রূপনারায়ণের, কিন্তু সব বাইদের নাম করে-করে সে কী কোমর-দোলানি।

রূপনারায়ণ রায় বলল, মানুষটার মধ্যে মাল আছে, কিন্তু পাঁচ-দুয়োরের এঁটো খেয়ে-খেয়েই নিজের ইজ্জৎটা মারল। একটু দেরি হয়ে গেছে এখন, ওর মত মেয়েমানুষ পেলে যে-কোনো ভদ্দরলোক তা লুফে নিত। তা ছাড়া, কবিয়ালনিও হতে পারত খাসা।

উৎকর্ণ হয়ে সকলে শুনছে রূপনারায়ণের কথা। সে বলল, যজ্ঞেশ্বরীর গান শুনেছিস তো?

— কোন্ যজ্ঞেশ্বরী?

— কেন। ওই যে কবিয়াল রাম বসুর রক্ষিতা।

— হ্যাঁ। হ্যাঁ। শুনেছি। খাসা গায়।

রূপনারায়ণ বলল, কানাগিন্নির গান তার চেয়েও ভালো।

— বলো কি হে। আনটুনির কাছে পাঠিয়ে দাও, এক্ষুনি রক্ষিতা করে নেবে। বিধবা মাগীদের উপর ওর খুব টান। একটাকে তো রেখেছে। এমন গাইয়ে রক্ষিতা পেলে সে লুফে নেবে।

রূপনারায়ণ রায় মাথা নাড়তে লাগল, বলল, হুঁ। লোকটার চোখ আছে। খুব সাচ্চা চীজ জোগাড় করেছে। চোখে দেখি নি, তবে শুনেছি, দেখতে নাকি—

ইয়াররা বলে উঠল, রেখে দাও, রেখে দাও। যার রান্না খাইনি সে বড় রাঁধুনি, যাকে দেখিনি সেও বুঝি তেমনি সেরা সুন্দরী। ওসবে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরা চোখে দেখে বাজিয়ে নিয়ে বিচার করতে চাই। চেখে দেখতে নাহয় না-ই চাইলাম।

রূপনারায়ণ রায় আবার বলল, ফরাসডাঙার হলধর মিত্তিরদের চেন তো? তার পুত্র জটাধর ওর জন্যে এখনো পাগোল। আর তার সঙ্গে আছে মল্লিকদের মেজকর্তা শ্রীপতি। এই দু-জনে গরিটির বাগানে হামলা করে তাদের ফরাসডাঙার মেয়েকে উদ্ধার করতে চায়।

— উদ্ধার করতে চায়? মাকড়সার মুখ থেকে উদ্ধার ক'রে টিকটিকিরা পোকা নিয়ে যা করে তাই বুঝি করার ইচ্ছে?

— তা ছাড়া কি। কিন্তু আনটুনি হুঁশিয়ার। আর আছে তার ভাই কেলী, জাঁদরেল মানুষ সে।

কিন্তু কানাগিন্নি, তার কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে দেখে রূপনারায়ণ বলল, এও কিন্তু যেমন-তেমন ছিল না দেখতে। ঐ রূপ নিয়ে ঐ গলা নিয়ে ঐ ভাবে গান বেঁধে যদি নামত আসরে, কোনো যজ্ঞেশ্বরীর সাধ্য ছিল না কখনো কোথাও বায়না পায়।

ইয়ারদের চোখে ইতিমধ্যে একটু রঙ ধরেছে। রূপনারায়ণের চোখেও ধরেছে, সেই রঙিন চোখ নিয়ে রঙিন আলাপে রত হল সকলে।

অমন যে কানাগিন্নি, তার স্বামীটা অমন বোকা কেন? সে যাবার সময় ওটাকে ফেলে রেখে গেল কোন্ আক্কেলে। পাঁচজনের ফলারের জন্যে? কচিকাঁচা জিনিস ওভাবে ফেলে রেখে যেতে নেই। ফেলে না রেখে যাওয়াটাই নিয়ম। নিয়মই যদি না হবে তাহলে ঘাটে-ঘাটে চিতার আগুনের সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁশি আর সেইসঙ্গে কান্না বাজে কেন? যে জিনিস আমার তা আমারই, বেঁচে থাকলেও আমার, মরে গেলেও আমার। কিন্তু ঘরবাড়ি জোতজমি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না, তাই লিখে দাও কারো নামে। কিন্তু নিজের বউকে তো লিখে দেওয়া যায় না ওভাবে, অতএব—

ঠিক। জোতজমিও যদি লিখে না দিয়েই গত হলে, পাঁচ ভূতে তবে তা লুটে খাবে। যে-জিনিস লিখে দেওয়া চলে না, তা ঐ ভাবে বেওয়ারিশ ফেলে গেলে কি দশা হবে বোঝো—

রূপনারায়ণ বলল, আলবৎ। আমি ফেলে রেখে যাব না। এখানকার মানুষদের চিনি আমি— সব লম্পট, সব লুচ্চো। আজ যারা রূপ-রূপ ব'লে চ্যাচাচ্ছে, কাল তারা কি করবে, নরহরি?

দুই কান ছুঁয়ে নরহরি বলল, হরি হরি। সে কথা বলতে পারব না।

বেলা পড়ে আসছে ধীরে-ধীরে। আরমানি গির্জায় ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে ক্রমশ। তার সঙ্গেসঙ্গেই ব্যাণ্ডেলের দিক থেকেও ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি।

পথে কোলাহল আর পদশব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠছে। ঘোড়ার দড়বড়ি শোনা যাচ্ছে, সেইসঙ্গে পালকি-বেহারাদের হুশহাশ শব্দ।

আজ যাঁরা নিমন্ত্রিত তারা বুঝি এসে যাচ্ছেন একে-একে। নদীর ঘাট থেকেও মাঝিমাল্লাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে। আরব মোগল আর হিন্দু ভাগ্যবানেরা একে-একে আসছেন বুঝি রূপচরণের গৃহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

নকল বাগানে কারিগরেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ঝাড়-রচনায়, ফরাসেরা

ছুটে-ছুটে বেড়াচ্ছে বাতিদান হাতে নিয়ে। গেটে দাঁড়িয়ে আছে পেয়াদা-বরকন্দাজেরা।

বহুলোক আসবেন আজ। যাবতীয় হাকীমান, আপীল-আদালত, ফৌজদারী কালেক্টরী পারমিট ও কোম্পানির যাবতীয় আমলা, নেজামত-আদালতের যাবতীয় সাহেবান ও আলীশান।

এই গৃহের প্রাচীরবন্দী এই বিশাল চৌহদ্দি এতক্ষণ জনহীন ও নিষ্প্রাণ বলে বোধ হচ্ছিল, এখন আবার সে গৃহ মুখর ও প্রাণবান হয়ে ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ।

অন্দরেও এই ব্যস্ততা সংক্রামিত হয়েছে। নতুন বধূকে ঘিরে বসে আছে নবকুমারীর দল, সীমন্তে ও ললাটে সিন্দুরচর্চিত হয়ে এসে গেছে এয়োস্ত্রীরা। কানাগিন্নি নাপিতানি লক্ষ্মী সরস্বতী, সকলেই আছে রাধার কাছে। রাধার মন হুহু করে উঠছে বটে মাঝে-মাঝে, কিন্তু নানারকমের কথায় ও আলোচনায় কান পেতে সে মনের ক্লেদ কিছুটা মুছে নিতে পারছে হয়তো।

মন হুহু করছে তার। কিন্তু তারই মধ্যে একটু শান্তি ও একটু সান্ত্বনা বুঝি আছে। আজ তার বাবা আসবেন, আজ নাকি জ্যাঠামশাইও আসবেন শান্তিপুর থেকে।

আজ নাহয় তাঁরা আসবেন, কিন্তু এর পরে এই বিশাল পাষাণপুরীর মধ্যে একা-একা কী করে থাকবে সে?

নাপিতানি-বউ এগিয়ে গিয়ে বলল, ওকি ক'নে-বউ, চোখের কোণে জল দেখছি যে। কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট! তোমার সঙ্গের সাথী হয়ে রইলাম আমি। ভাবনা কি বউ, চিন্তা কি।

রূপচরণের স্ত্রী ঘরে ঢুকে চারদিকে নজর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর সাজ অনেকটা কালকের মতই, কাল পরেছিলেন রঙদার ঝিনা, আজ পরেছেন আনার-দানা। বেশ মানিয়েছে তাঁকে।

বাড়ির গিন্নিকে সকলে চোখ ফিরিয়ে দেখে নিল।

নীচে রান্নাঘর থেকে ঝিয়েদের ঝংকার এসে পৌছচ্ছে এখানে। সিঁড়িতে মলের শব্দ বাজছে— আরো কারা আসছে বুঝি নতুন বউয়ের ঘরে।

চারদিকেই ব্যস্ততা। কিন্তু রূপনারায়ণের বৈঠকে কোনো ব্যস্ততা নেই। এখন তারা প্রায় স্তব্ধ হয়ে বসেছে মাথা ঈষৎ নীচু করে।

ঝুঁকে পড়েছে বটে তারা, কথা বলার ঝোঁক কিন্তু তাতে কমেনি।

মাঝে-মাঝেই একটা-না-একটা কথা নিয়ে বেশ এক পশলা আলোচনা হয়ে যাচ্ছে।

কবে কোন্ বাবু কোন্ বাগানবাড়িতে কত বড় ভোজ দিতে পেরেছেন। দমদমা ভালো, না, পেরিন-সাহেবের বাগান ভালো। ফুর্তির জায়গা কোন্‌টা সরেস— এসব আলোচনা এইমাত্র থেমেছে। এখন বুঝি একটু জিরিয়ে নিচ্ছে তারা। নিধুবাবুর বয়স এখন অনেক, এখনো তিনি নিয়মিত তাঁর রক্ষিতার কাছে গিয়ে টপ্পার আসর জমাচ্ছেন কিনা—

নরহরি বলে উঠল, নিশ্চয়। আমি জানি নিত্য তিনি যান গড়ানহাটায় ঐ শ্রীমতী মেয়েটির কাছে।

—ওর নাম বুঝি শ্রীমতী ?

—কে জানে কি নাম। নিধুবাবু ওকে নাকি ঐ নামে ডাকেন।

রূপনারায়ণ বলে উঠল, জয় নিধুবাবুর। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োর পায়ে প্রণাম। তিনি আশীর্বাদ করুন, তাঁর বয়স পর্যন্ত ঐ মেজাজ যেন রাখতে পারি আমরাও।

অন্যান্য ইয়ারেরাও সমস্বরে বলে উঠল, আমরাও।

রূপনারায়ণও সায় দিল তাদের কথায়, বলল, নিশ্চয়। সকলেই। সকলে দল বেঁধে। কিন্তু অত আয়ু কি পাব রে ?

—তা নিশ্চয় পেতে হবে। নইলে চলবে কি করে বলো।

রূপনারায়ণ বলল, তা যদি পাই তাহলে বেঁচে যাবে একজন।

—কে, কে ?

—তোমাদের নতুন বউদি। অতদিন বেঁচে তারপর যদি মরি তাহলে আর সঙ্গে যেতে বলব না ওকে।

সকলে যেন হাহাকার করে উঠল একসঙ্গে, বলল, বলো কি, বলো কি। সতী হতে দেবে না তাকে ?

—না হল সতী। ক্ষতি কি। তখন ও-ও তো হয়ে যাবে শ্রীমতী।

মতিলাল ঝিমচ্ছিল, বলে উঠল, শ্রীমতীও কিন্তু ছুঁড়ি না। মেয়েমানুষদের কোনো বয়স নাই রে। ওরা সব বয়সেই সমান ইয়ে।

অতএব শেষ পর্যন্ত কি-যে সাব্যস্ত হল তা বোঝা গেল না। কিন্তু বোঝা না যাক, কেবল এই কথাটি জানা গেল যেন রাধা ভাগ্যবতী। ভাগ্য যদি প্রসন্নই তার না হবে তবে রূপনারায়ণের মত মানুষ তার কথা নিয়ে আলোচনা

কি কখনো করে? অন্দরে মেয়েদের হাটের মধ্যে বসে রাধা হয়তো ভাবছে তার স্বামী তার কথা এতটুকু মনে করছে না, কিন্তু, হায়, সে জানতে পারছে না-যে, তাকে নিয়েই কয় দফা আলোচনা এখানে হল। এবং হয়তো আরো হবে।

মিসলবন্দী হয়ে নৌকো আসছে কলকাতা থেকে। নদীটা নৌকোর শোভাযাত্রায় পরিপূর্ণ। খবর দিয়ে যাচ্ছে পেয়াদারা। কত বড়-বড় মানুষ আসছে আজ চুঁচুড়ার। আখেরের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন রূপচরণ। তাঁর কাজকারবারের সুবিধে এতে হবেই। রূপনারায়ণও তা জানে। জানে বলেই তারও আনন্দ। ঐশ্বর্যে ফেঁপে উঠবে এই সংসার আরো। ঐশ্বর্য যতই বাড়বে ততই কি তার ভালো না?

রূপনারায়ণের হঠাৎ মনে পড়ে গেল—ঠিক ঐ ভাবেই মিসলবন্দী হয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে নৌকো যায় মাহেশে।

—আর কত দেরি রে, নরহরি?

—কিসের কথা বলছ?

রূপনারায়ণ বলল, মাহেশের স্নানযাত্রার?

ফাল্গুনের এটা মাঝামাঝি। সেই উৎসব জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। এখনো কিছু সময় আছে। কিন্তু সময় থাকাটা তো অভিপ্রায় নয় কারো। ওদিকের ঘর থেকে ঘুঙুরের শব্দ যতই কানে এসে বাজছে স্নানযাত্রার কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে ততই। অমন মজা ডাঙায় হয় না রে কখনো। জলের মধ্যে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে গানে-নাচে ইয়ারে-পিয়ারে মাতামাতি করতে-করতে জগন্নাথের স্নানযাত্রা দেখতে মাহেশে যাওয়াটা যে বছরের একটা মস্ত দিন।

—সে দিনটার কত দেরি?

—দেরি আর কি। দু-তিনটে মাস দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

—কিন্তু তৈরি হতে হয় এখন থেকেই।

—এর আর তৈরির কী আছে?

নরহরির কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল রূপনারায়ণ রায়, তৈরির কি কিছুই নেই? গত বছর তার জীবন যেমন ছিল এবার তার জীবন কি আর তেমন আছে? তার জীবনে কত বড় পরিবর্তন এসে গিয়েছে, নরহরির বুঝি সে খেয়াল নেই। এত বড় বদলই যদি এসে গেল, তার জন্যে বাড়তি-রকমের উৎসব কি করতে হবে না?

—গাইতে পারে, নাচতে পারে, দেখতে খুপসুরত এমনি বাইজি চাই এবার।

নরহরি বুঝি ঠাট্টা করল, বলল, অন্যবার কি এসব চাওনি, না, এসব পাওনি?

—তারা-সব বাসী হয়ে গেছে, বাসী— পুরনো। আমার জীবন কেমন নতুন হয়ে উঠল না? তার জন্যে নতুন-কিছু নিতে হবে সঙ্গে।

অনেকক্ষণ ধরে নরহরি কি যেন ভাবল, তাকিয়া সমেত একটু গড়িয়ে নিল, তুড়ি মেরে পেয়াদাটাকে কি যেন আদেশ করল, তারপর উঠে বসে বলল, পেয়েছি।

—কি?

—নতুন-কিছু।

—কে সে?

নরহরি বলল, কানাগিন্নি।

অট্টহাস্য করে উঠল সকলে একসঙ্গে। ওই হাসির শব্দ শুনে আবদার পেয়াদা আর ফরাস দরজার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ব্যাপারটা। কিন্তু কিছু গুরুতর নয় দেখে তারা ফিরে গিয়ে আবার দাঁড়াল যে যার জায়গায়।

নরহরি বলল, হাসি না। হাসির কথা না। যা শুনলাম তাঁর নামে তাতে আমাদের স্নানযাত্রার সঙ্গী বুঝি ভালোই হবেন উনি।

নরহরিকে এবার বুঝি ধমকই দিল রূপনারায়ণ। এবার বুঝি শুধু ইয়ার না, একটু মনিবিয়ানার স্বর আনল সে গলায়, বলল, চুপ। ঘেন্না ধরে গেল। নেশা হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান হারাই নি, নরহরি। তুমি জান, কানাগিন্নি আমার গুরুজন?

আশ্চর্য হয়ে গেল নরহরি। হিতে বিপরীত হয়ে গেল দেখে সে হাত বাড়িয়ে গেলাশটি আবদারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, কসুর হয়েছে।

বড়লোকের মেজাজ বোঝাই ভার। যাকে নিয়ে এতক্ষণ এত আলোচনা করল, হঠাৎ সে কি করে যে গুরুজন হয়ে গেল কে জানে।

রূপনারায়ণ একটু কঠিন ভঙ্গিতে বসে ডাকল, খিদমতগার।

সম্মুখে হাজির হল পেয়াদা। মাথা নীচু করে সেলাম জানিয়ে দাঁড়াল।

—আবদারকো বোলাও।

সঙ্গেসঙ্গে হাজির হল আবদার। রূপনারায়ণ রায় স্বয়ং আদেশ করলেন নরহরির দিকে আঙুল দিয়ে, বাবুকে নিয়ে আউর হুইস্কি লাও।

নরহরির মুখে বুঝি হাসি ফুটল একটু। অন্যান্য ইয়ারও একটু সন্ত্রস্ত হয়েছিল, তারাও শরীরের জড়তা কাটিয়ে বসল। রূপনারায়ণ রায় বলল, ও-গিন্নি এ-পল্লীর গিন্নিদের ইয়ার। আমার মায়ের সঙ্গেও ওর ভাব ছিল।

রূপনারায়ণের কথা শুনে সবাই সংকোচে আর লজ্জায় যেন মরে যেতে লাগল। কিন্তু তাকে নিয়ে তাহলে সে নিজে এতক্ষণ এত মজা করল কেন, সে কথা জানতে চাইল না কেউ।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর রূপনারায়ণ চাপা-পড়া কথাটা তুলল আবার, বলল, কিন্তু মাহেশের কথা মনে রেখো সবাই। বেনারসের জীন্নত বাইকে নেওয়া চাই— যত খরচ লাগে।

নরহরি কথা বলল আবার, আবার আশ্বাস দিল সে, বলল, নিশ্চয়। সে-ভার নিলাম আমি।

একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে নরহরির পিঠে একটা হাত ছুঁইয়ে রূপনারায়ণ বলল, মাহেশের স্নানযাত্রা।

ভিতরে তখন দাসীরা নতুন বউকে ধরে স্নানের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। বিকালের সাজে সাজাতে হবে তাকে।



॥ ষষ্ঠ স্ফুলিঙ্গ ॥

দুই পাড়ে স্রোতের আঘাত দিতে-দিতে ও ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নৃত্য করতে-করতে জোয়ার-ভাটায় চলাচল করছে এই নদী। অন্তহীন কত কালের কাহিনী ঐ জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সে হিসাব লেখা নেই ওই স্রোতে। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভেঙে-ভেঙে মুছে-মুছে গিয়েছে সেসব ইতিহাস।

পাড় ভেঙেছে এক ধারে, নতুন ভূখণ্ড জেগে উঠেছে অন্য পাড়ে। এ ঘটনা ইতিহাস নয়, সম্ভবত এ হচ্ছে নদীর ভূগোল। কিন্তু ইতিহাসের দাগও চিহ্নিত হয়েছে দুই পারে।

বণিকের নৌবহরের স্ফীত পাল উদার দাক্ষিণ্য লাভ করে ভাগ্যবান হয়ে উঠেছে যে হাওয়ায়, সে-হাওয়াও এই নদীর। সৌভাগ্যের তিলকও ললাটে অঙ্কিত করতে হয়েছে এই গঙ্গামৃত্তিকায়।

এই জল ওই হাওয়া আর এই মৃত্তিকা— জীবনকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এর বেশি আর-কিছু হয়তো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বণিকের প্রয়োজন এর চেয়ে কিছু বেশিই। তারা শুধু মাটিই চায় না, চায় মাটির অধিকার।

সে অধিকারও ইতিমধ্যে পাকা হয়েছে অনেক। তাদের কামনা পূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু কামনার নাকি শেষ নেই।

সেই কামনার কাহিনী নগরে গঞ্জে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে দুই পারে।

ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এতক্ষণ অতিবাহিত করেছি আমরা। কিন্তু পূর্ব পার আমাদের অগোচরেই রয়ে গিয়েছে। জব চার্নক এক জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামের প্রান্তে অবতরণ করেছিলেন, সে অনেকদিন আগের কথা। তারপর ধীরে-ধীরে এই নদীর খাতে বয়ে গিয়েছে অনেক জল, এবং সেই স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিপুল সময়। সে জঙ্গল সাফ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, সে গ্রাম এখন আর গ্রাম নেই, এখন সে একটি জনপদ— সেখানে বাস করতে আরম্ভ করেছে দেশী ও বিদেশী লোকেরা ভাগ-ভাগ হয়ে। খড়ের ঘরের কিংবা হোগলার ছাউনির জায়গায় এখন উঠেছে বিস্তর পাকা দালান। গঙ্গার কিনার বরাবর গড়ে উঠেছে এই জনপদ— উত্তরে গঙ্গার ওপারের রবার্টসনের বাগান অর্থাৎ এপারের চিত্তপুর নালা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে কীড-সাহেবের বাগান পর্যন্ত। জনপদের পুব সীমা সার্কুলার রোড, পশ্চিম সীমা গঙ্গা।

সাহেবলোকেরা শহরের ঘিঞ্জি ত্যাগ করে একটু তফাতে গিয়ে বাগানবাড়ি রচনা করে বাস করতে আরম্ভ করেছেন কিছুদিন আগে থেকেই। তাঁদের সেই বাগান এখন শহরের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা দুইটি চিহ্নিত করছে। ইতিমধ্যে অবশ্য শহরটি দক্ষিণে আরো সরে গেছে আলিপুর পর্যন্ত, কিন্তু বসতি এখনও বসেনি ভালো করে।

কোম্পানির ব্যবসায় এখন চলেছে খুবই ভালো। ব্রিটিশ বণিকের সঙ্গে ব্রিটিশ কারিগরও এসে পৌছেছে ভাগ্য-অন্বেষণে— সায়েব-মুচি, সায়েব-দরজি, সায়েব-ছুতোরমিস্ত্রি, লালদিঘির চারপাশের এলাকায় বসে গেছে দলে-দলে। জুতোয় জামায় আসবাবপত্রে তারা তাদের রুচি বিতরণ করে চলেছে স্বচ্ছন্দে।

কলকাতা হয়ে উঠেছে লণ্ডনেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই নতুন রুচির ও নতুন আদবকায়দার আকর্ষণে গঙ্গার ওপার থেকেও লোকে এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। ওপার হচ্ছে সায়েবলোকদের ফুর্তি করার এক-একটা ঘাঁটি— গরিটি চুঁচুড়া চন্দননগর হুগলী। কিন্তু এপার হচ্ছে বাণিজ্যের একটি বন্দর।

সায়েবরা থাকেন মাঝখানে, আর দুই পাশে দেশী মানুষ। দক্ষিণে চাঁদপাল ঘাট থেকে কীড সায়েবের বাগান ও উত্তরে বড়বাজার থেকে রবার্টসনের বাগান পর্যন্ত বাঙালিদের বাস, বড়বাজার ও চাঁদপাল ঘাট নিয়ে এলাকা সায়েবলোকদের।

জীবনটাই একটা জুয়োখেলা। জীবনধারণের জন্যে আমরা যখন একত্র হয়ে কোনো-একটি জায়গায় মিলিত হই, তার নাম যা-ই দেওয়া যাক-না আসলে সে জায়গাটি একটি জুয়োর আড্ডা। হার হবে কিংবা জিত— এ কথা না জেনেই জীবনে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়, এবং অনেক অভিযানে যাত্রা করতে হয়। হার হবে কিংবা জিত— এ কথা আগে থেকেই জানা থাকলে খেলার রোমাঞ্চ থাকে না। একটি জীবনে কতবার উত্থান কতবার পতন, জীবনের পরমকামনাটি পূর্ণ হবে কি না, যে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন বহন করে চলা হচ্ছে সে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হবে কিনা, কত দিনের এ-জীবন— কত দিন পরমায়ু, এ সবই আগে থেকে জানা হয়ে গিয়ে থাকলে জীবনের সমস্ত রোমাঞ্চ নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবনেব চেতনা গেল, চঞ্চলতা গেল, আগ্রহ গেল, প্রয়াস গেল, একাগ্রতা গেল— এ সবই যদি গেল তাহলে জীবনের আর স্বাদ রইল কোথায়। আলুনি জীবনও যাদের কাছে সুস্বাদু তারাই নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ জানার জন্যে ব্যাকুল।

জীবন যার জীবন তার। অপরে এসে তার জীবনের ভবিষ্যৎ রচনা করে দিতে যেমন পারে না, গড়ে দিতে যেমন পারে না, বলে দিতেও তেমনি অক্ষম। জীবনকে নিজের করতলগত কবে পাশার দানের মত ছড়িয়ে-ছড়িয়ে চলতে যারা জানে, তারাই খেলোয়াড়।

ইংরেজরা এসেছে খেলোয়াড়ের বেশে। প্রথমে এসেছিল তারা শুধুমাত্র বণিক সেজে, এখন হতে চায় মনিব।

জুয়াড়ি মন নিয়ে তারা এসেছে, জুয়া খেলে-খেলে চলেছে। তাদের সেই খেলা দেখে-দেখে কলকাতার পুরো জীবনটাই হয়ে উঠেছে জুয়ো। প্রত্যেকে মেতেছে এই খেলায়। এ খেলার সঙ্গে অবশ্য জীবনের সম্পর্ক রাখে নি কেউ, যা-কিছু সম্পর্ক সমস্তটাই জীবিকার। হাওয়ায় ধুলোরেণুর মত ওড়াউড়ি করে টাকা। পরিশ্রম করে উপার্জনের পথ নেই, অর্থের হরির লুঠ হুড়োহুড়ি করে কুড়িয়ে নেবার জন্যে সকলে ব্যগ্র।

কলকাতা হয়ে উঠেছে হীরার আর হুরীর একটি উপত্যকা মাত্র— কাঞ্চন আর কামিনী চতুর্দিকে ছড়াছড়ি।

ঋণ পাওয়া ও ঋণ দেওয়া অতি সহজ কাজ। এর জন্যে দর-কষাকষি নেই। সে-ঋণ শোধ দিতে না পারলেও গর্দান যাবে না। উত্তমর্ণ ইচ্ছে করলে অধমর্ণকে জেলে পাঠাতে পারে, কিন্তু এতে কিছু খরচ আছে

পাওনাদারেরই। দেনদায়ের জেলে থাকা-খাওয়া বাবদ দৈনিক চার টাকা তাকে দিতে হবে।

যে দেশের উপর মোগল-বাদশারা শাসন পরিচালনা করে আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী রচনা করে গিয়েছেন, কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্যে যে দেশে লাখ টাকার ভেট পাঠানোর রীতি, সে দেশের মানুষ অল্প টাকার লেন-দেন করতে পারে না। হাজার টাকা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ লাখ টাকা ঋণ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়ে টাকা খাটছে— প্রত্যেকেই ঋণ দেবার জন্যে প্রস্তুত। এমন সুখের রাজ্যে সহজলভ্য এই ঋণ না নেবে কে, এবং কেই-বা দু-হাতে সেই টাকা খরচ না করবে। খরচ করার পথও যে অনেক।

হুরীরা আছেই, হীরার উপঢৌকন পেয়ে তারা মরদানাদের হৃদয় ধন্য করার জন্যে মসলিনে ও সাটিনে সজ্জিত হয়ে লাস্যলীলার জন্যে তৈয়ার।

সায়েবলোকেরা-সব টাকার কুমির। চালে-চটকে আদব-কায়দায়-বিলাসে-ব্যসনে তারা প্রত্যেকেই এখন নবাব। নবাবী আমল গত হয়েছে পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে, কিন্তু গত হয়েও হল না। এই নতুন নবাবেরা অভিষিক্ত হয়ে বসেছেন বুঝি তাঁদেরই তক্তে। নবীন নবাবীর ধারা বইতে শুরু হয়েছে।

মোগলাই শাসনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে দেশের যেসব মানুষ অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল, অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল ডুবে, তারা এই ফিরিঙ্গি নবাবদের জীবনধারণ-প্রণালী দেখে নতুন চেতনা লাভ করল, তাদের জীবন হয়ে উঠল সঞ্জীবিত। তারা বুঝি আশার আলো দেখতে পেয়েছে, এবং আশ্বাসের আলোকস্তম্ভ। তারাও তাই গা ভাসাল এই নতুন জীবনের স্রোতে।

এদিকে গা ভাসিয়ে চলেছে সকলে। এক হাতে কামিনী, এক হাতে কাঞ্চন-- দু হাতে এইভাবে জল কেটে কেটে সাঁতার দিচ্ছে তারা। ওদিকে বণিকেরা পাকা বনিয়াদ তৈরি করে নিচ্ছে তাদের সাম্রাজ্যের।

বাকি টাকা শোধ দিতে না পেরে জেলে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। হরিণবাড়ির আস্তানাও বেশ রমণীয়— সুরা আর সাকীর অভাব নেই সেখানেও। খাসা পাকা বাড়ি, ময়দানের গায়েই বসানো এই জেল। বছর-কয়েক হল বিস্তর টাকা ঢেলে মেরামত করে হরিণবাড়িটি ক'রে তোলা হয়েছে একটি আদর্শ নিকেতন।

নামেই জেল, কিন্তু জেলজীবনের কোনো কড়াকড়ি নেই এখানে।

কয়েদীদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, যেসব সেনানায়ককে এখানে এসে থাকতে হয় তাদের কোনোই অসুবিধে নেই। যেমন খুশি সেইভাবে তারা বাস করতে পারে এই হরিণবাড়িতে, তাদের নিজেদের চাকর-বাকর এসে তাদের তদারক করতে পারে, বাইরের হোটেল থেকে খাসা খানা আসতে পারে, ইচ্ছে করলে নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এখানেই দিতে পারে ভোজ— শহরের সেরা মদ ও সেরা মিউজিক পরিবেশিত হতে পারে সেই ভোজে। যাদের স্ত্রীপুত্রপরিবার আছে, তারা খুশি হলে এখানে তাদেরও এনে রাখতে পারে। কেউ ইচ্ছে করলে স্ত্রী-সহ বাস করতে পারে, কেউ ইচ্ছে করলে প্রণয়িনী-সহ ; কেউ যদি চায় তার প্রতিবেশীর কন্যাকেও এখানে এনে নিজের কাছে রাখতে পারে। এর মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই, কোনো ঢাকাঢাকি নেই— এ ব্যবস্থা একেবারে খোলসা ও সাধারণ।

হরিণবাড়ির গৌরব নিতান্ত কম নয়। সগর্বে সে ঘোষণা করতে পারে যে, তার এই চার দেয়ালের মধ্যে সে অতি-সাধারণ মানুষদেরই শুধু বন্দী করে রাখে নি। সে রকমের বন্দী হয়ে থাকার মধ্যে যদিও কোনো বন্ধন নেই, তবুও সে একটি জেল। এই জেলে এসেছেন দেশী ও বিদেশী বহু বিশিষ্ট নাগরিক। সেনাবাহিনীর কর্নেল, বড়-বড় বণিক, নামজাদা ডাক্তার, পাদ্রী সাহেব— সকলেই এই রমণীয় নিকেতনে বাস করছেন ও করেছেন। এর দ্বারা তাঁদের মর্যাদার হানি হয় নি কোনো রকমেই। বড়-বড় সেনানায়ক এখানে বাস করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজা যাঁরা উচ্চে তুলে ধরেছেন এমন অনেক দাম্ভিক সেনাকেও এখানে দেশী মানুষের সঙ্গে এক ছাদের নীচে বাস করার জন্যে লজ্জিত হতে হয় নি। কেননা, তাঁরই সঙ্গে হয়তো তখন এখানে আছেন টিপু সুলতানের পুত্র প্রিন্স মৌজুদ্দিন ও নবাব সামসুদ্দৌলা।

ইংরেজরা এই দেশকে ভ্যালি অব ডায়মণ্ডস অ্যাণ্ড ড্রিম্‌স্ ব'লে জেনেছে, এবং দেশী লোকে জেনেছে হীরা আর হুরীর রাজ্য ব'লে ; হারুনাল-রসীদের সাম্রাজ্যের মত এই দেশের মধ্যের এই জেলখানাটি তাদের কাছেও স্বর্গের তুল্য। উর্বশী মেনকা রম্ভা চাইলেই পাওয়া যায়, এবং সেইসঙ্গে অমৃতের মত মনোরম অপর্যাপ্ত সোমরস।

হরিণবাড়িতে ব্রাণ্ডির প্রবাহ বয়ে চলেছে হুগলী-নদীর অক্লান্ত স্রোতের মত। নিজের সাধ্যে ও সংগতিতে যতটা ব্রাণ্ডি গলাধঃকরণ করা সম্ভব, জেল-কর্তৃপক্ষ তার জোগান দেবেনই।

এই মাদকরসের উপর তাঁদের অনেক আস্থা ও অনেক বিশ্বাস। সভ্যতার অগ্রগতির ও বিস্তারের জন্যে এ দ্রব্যটি যে অপরিহার্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ তাঁদের নেই। সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করে দুর্গম পথ পরিক্রমা করে সুদূর পূর্বাঞ্চলের একটি নূতন দেশে এসে পৌঁছে ক্রমশই যে সেখানে সভ্যতার বিস্তার সাধন সম্ভব হচ্ছে— এর মুলে আছে অ্যালকহল। পশ্চিমাঞ্চলে নিউ ওয়ার্ল্ড আবিষ্কারে উৎসাহ দিয়েছিল ও নিত্যসঙ্গী হয়ে কাছে ছিল এই পরমপানীয়, তার দরুণই সেই দেশ আবিষ্কার করে সেখানকার অনাবাদী জমি চষে সেখানে রচনা করা সম্ভব হল নূতন উপনিবেশ। সেই উপনিবেশই এখন ভাগ্যনির্ধারণ করছে সারা পৃথিবীর। যেসব পোর্তুগিজ ও স্প্যানিশ জলদস্যু কলম্বাসের আগে পরে কিংবা সঙ্গে নিত্যনূতন দেশ আবিষ্কারের জন্যে সমুদ্রমন্থন করে চলেছে, তাদের সেই অভিযাত্রী-জীবনের পরমতম দুর্যোগের দিনেও এই জিনিসটি তাদের সহায় ছিল ব'লেই নিরুদ্দম হয় নি তারা, পরাস্ত হয় নি। জীবনের প্রত্যেকটি কাজে উদ্যোগী করে তোলার পক্ষে এর মত রসদ আর নাকি নেই। জীবন থেকে এই জিনিসটি বাদ দিলে মানুষ অনড় অচল নিরুদ্দম নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে, তখন সে হয়ে ওঠে শুধুমাত্র একটি উদ্ভিদ্। আরও পিছনে হটে গিয়ে ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজে তাঁরা শুধু দেখতে পান— যেসব জাতি জগৎসভায় একদা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল তারা সকলেই ছিল মদ্যপ। সেসব জাতি ধীরে-ধীর ক্ষয় হয়ে উহ্য হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এই ক্ষয় হবার কারণ মদ্য নয়। বর্তমান কালেও দেখা যাচ্ছে, এই যে সুদূর দেশ থেকে তাঁরা এখানে এসে সাম্রাজ্যের ভিত গেড়ে বসেছেন, ওই যে অদূরেই ময়দানের ওপারে গঙ্গার কিনারে ফোর্ট উইলিয়মের বুরুজ বসেছে সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসেবে, এর মুলেও আছে ঐ জিনিসটি— ব্রাণ্ডি।

কিন্তু হায়, জীবন শুধু স্বপ্ন দিয়ে রচিত নয়। সংগ্রাম সংঘর্ষ শ্রম চিন্তা ও চেষ্টা দিয়ে জীবন যেমন রচিত, জীবনের অপরিহার্য দ্রব্য তেমনিও অন্ন। জলের অপর নামই নাকি জীবন।

হরিণবাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক ব্রাণ্ডির বোতলে, ওখানকার ভাগ্যবান বাসিন্দেরা কেস্‌এ কেস্‌এ পূর্ণ করে রাখুন এই পরমপানীয় তাঁদের কামরায়। এদিকে শুকিয়ে উঠুক হুগলী-নদী, নিঃশেষ হয়ে যাক এর সব জল। এই ভ্যালি অব ডায়মণ্ডস অ্যাণ্ড ড্রিমস্ অচিরে কিসের ভ্যালি হয়ে উঠবে তাহলে— এ কথা চিন্তা করার অবকাশ হয়তো কারো নেই।

আমরাও ওকথা চিন্তা করে এখন ব্যাকুল হতে রাজি না।

এই কলকাতা— এ হচ্ছে কালিকাক্ষেত্র। কালীঘাটে জাগ্রত কালীর মন্দির আছে বটে, কিন্তু পুজা-উপচার নিয়ে নিত্য অতদূর যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়— পথও বড় দুর্গম। পল্লীতে-পল্লীতে তাই গড়ে উঠেছে ছোট বড় আর মাঝারি মন্দির। কিন্তু যাদের মনের বাসনা জাগ্রত কালীর আশীর্বাদ লাভ করা— পথের দুর্গমতা উপেক্ষা করে তারা সদলবলে ঢাক-ঢোল-বাদ্য সহকারে যাত্রা করে সুদূরের ঐ কালীঘাটেই।

বাঙালি আসলে কালীর উপাসক। এইজন্য এই পীঠস্থানে পূজা-উপাচার দেওয়ার জন্যে তাদের ব্যাকুলতা আছে। রোমে যখন আছ তখন রোমানদের মত আচরণ করার নীতিকথা অগ্রাহ্য করতে পারে নি ফিরিঙ্গিকুল। দোল দুর্গোৎসব চডক রাস— সব উৎসবেই আগ্রহের সঙ্গে যোগ দেয় ফিরিঙ্গিরাও। এমনকি, কালীসাধনার ঐকান্তিকতা দেখে তারাও দরকার-মত কালীমাতার কাছে সাডম্বরে ভেট পাঠায়।

অনেক বড় জনপদে পরিণত হয়েছে কলকাতা— বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হয়েছে। কারিগর মানুষেরাই আগে বাস করত এই সুতানটি গোবিন্দপুর আর কলিকাতায়। ভদ্রলোক বলতে যাদের বোঝা যায় তারা সবাই থাকত গঙ্গার পশ্চিম পারে। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়ের সূত্রে শেঠেরা ও বসাকেরা প্রথম গঙ্গাপাড়ি দিয়ে এপারে আসে, তার পর ক্রমশ আরো অনেকে। তিনটি গ্রাম এখন মিলে এক হয়ে গিয়েছে, একটি নামেই তার এখন পরিচয়। কিন্তু এখানকার আদি-অধিবাসীদের কথা কেউ ভুলে যায় নি। তাদের পেশাদারি পরিচয়ের সঙ্গে বিভিন্ন পল্লীর নামকরণ হয়ে গিয়েছে— কলুটোলা বেনেটোলা দরজিপাড়া কাঁশারিপাড়া ডোমটোলা মেছোবাজার, এ ছাড়া স্থানমাহাত্ম্য হিসেবে নাম হয়েছে— দরমাহাটা বাঁশতলা পটলডাঙা নারকেল-ডাঙা। বাজার বসেছে চতুর্দিকে— বাগবাজার শোভাবাজার হাটখোলাবাজার শ্যামবাজার ধোবাবাজার বড়বাজার লালবাজার বেগমবাজার। বিদেশীদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েও গড়ে উঠেছে বাজারবসতি, গড়ে উঠেছে চার্লসবাজার জানবাজার।

জমজমাটি অবস্থা কলকাতার। কাজেকর্মে চলেছে মুনশি কেরানি— মাথায় বাবরি চুল, গাল অবধি মোটা জুলফি, গায়ে জোব্বা, পায়ে চটি। কেউ নিমকমহলে কাজ করছে, কেউ হাসীলদপ্তরখানায়, কেউ-বা আফিমের থানায়।

সবচেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হচ্ছে বড়বাজারে। এই এলাকা ব্যবসাবাণিজ্যের যেমন একটি মস্ত কেন্দ্র, এই সাহেবপাড়াটি দক্ষিণের আর উত্তরের বাঙালি-পাড়ার তেমনি একটি যোজক।

কালীক্ষেত্র। রাঙাবাস-পরা, ঝাঁকরা চুল আর দাড়িগোঁফে ভরা মস্ত মুখ নিয়ে ত্রিশূল-হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালীসাধকেরা। এদের গতিবিধি সর্বত্র—পাড়ায়-পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়ায় এরা। এদের জীবিকা কালীর উপাসনা। এদের তাই খাতির খুব। নীলের ব্রত এবং চড়কের সময় এদের কাজ বেড়ে যায় বিস্তর। শ্মশানে-শ্মশানে এরা প্রয়োজন-মত হল্লা ও চিৎকার করে বেড়ায়, চিতার ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যায় গাঁজার ধোঁয়া। নদীর এপার আর ওপার—দুপারেই এদের সমান প্রভুত্ব।

কোথায় কে সতী হচ্ছে, কোন্ ঘাটে এসে নেমেছে শব— কাকের মুখে খবর পায় এরা। কাকের মত গতিতে দল বেঁধে গিয়ে জমা হয় সেখানে। ওদের কাছে এ একটা উৎসব, এ একটা আনন্দ, এ একটা ফুর্তি। প্রচুর নেশায় চুর হয়ে চূড়ান্ত চিৎকারে চারদিক উচ্চকিত ক'রে এরা শুভঅনুষ্ঠান সম্পাদনে সহায়তা করে।

বল্‌গা-ছাড়া হরিণের মত তীরবেগে ছুটে চলেছে হরিণবাড়ির সুখের জীবন; সে জেলের বাইরেও সুখের যে জীবন আছে সে জীবনের গতিও মন্থর নয়। জুয়ার আড্ডা যেমন এই কলকাতা, নেশারও এ তেমনি একটা শুঁড়িখানা।

উদ্দাম জীবন। ধর্মেকর্মে আচারে-অনুষ্ঠানে কোনো মাত্রা মেপে চলায় কোনো মর্জি নেই এই জীবনের।

ইংরেজরা এসেছে, বুঝি আশ্বাস নিয়ে এসেছে। মোগলের শাসনে কারো মাথা তোলা ছিল ভার, মাথা দেখা গেলেই মাথা কাটা যেত। নিরাপদ ছিল না ধনজনমান-ইজ্জৎ। আইনও ছিল না, কোনো কাজ বেআইনীও ছিল না সেইজন্যে। ভরসা ছিল না তাই কোনো-কিছুতে— মেয়েরা গহনা পর্যন্ত চাইত না। যে জিনিস গায়ে দিলেই সর্বাঙ্গ মহামুল্য হয়ে উঠবে, ইজ্জতের সঙ্গে যাবে প্রাণও, সে আপদ নিয়ে লাভ— হোক-না সে জিনিস গহনাই। ইহলোকে তাই কোনো টান ছিল না কারো, সব টান গিয়ে পড়েছিল পরলোকে— ভগবান-ভরসায়। বৈষ্ণবেরা নাম-সংকীর্তনে এবং শাক্তেরা চণ্ডীর গানে মনোনিবেশ করে নিজেদের চিত্ত-বিনোদন করত। অতঃপর এল ইংরেজ। শাসনদণ্ড নিয়ে এল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এল আইন। সব অপরাধেরই শাস্তির বিধান আছে সে আইনে,

হয়তো-বা প্রাপ্যের কিছু বেশি। তবু আইন আছে, এবং জীবনে বুঝি সেইসঙ্গে আছে ভরসাও। এই ভরসায় ভর করে জেগে উঠেছে সারা দেশ। এতদিনের আল দিয়ে বাঁধা মনের বাসনা সহসা হয়ে উঠেছে নির্বাধ। এখন আর নাম-সংকীর্তনে বা চণ্ডীর গানে মন ভরে না— বল্‌গা-ছাড়া হরিণের মত ছুটে যেতে চায় সেই বাসনা। মন এখন তাই চায় খেঁউড়, মন চায় কবিগান। বুলবুলির লড়াই, হাফ-আখড়াই, বাইনাচ না হলে আর চলে না।

সাহেবদের দেখাদেখি বাগানবাড়িও খোলা হয়ে গেছে চার দিকে— সিঁথিতে দমদমায় সুখচরে বেলগাছিয়ায়। সেখানে অগাধ আনন্দে কেটে যাচ্ছে রাত্রির পর রাত্রি। তামাম চিৎপুরে বসে গেছে রূপাজীবাদের বিপণি— সাটিন মলমল ঘুঙুর আর দোপাট্টার মনোহারী মিছিল। দোফের ক'রে কাপড় প'রে শরীরের সৌষ্ঠব বিজ্ঞাপিত করে হিন্দু ললনারা, অ-হিন্দুরা কুর্তি আস্তিন আঙিয়ার পরিধান ক'রে অঙ্গের ভঙ্গিমা ব্যক্ত করে। এদের ভিড়ে মিশে গিয়েছে কয়েকটি কুলকামিনীও— কক্ষভ্রষ্ট তারার মত পথভ্রষ্ট হয়ে কুলমান ত্যাগ করে কলঙ্কতিলক পরেছে তারা কপালে।

এই ভাবে বয়ে চলেছে এই শহরের জীবন। এর পাদদেশ ধৌত করে ঠিক এই ভাবেই বয়ে চলেছে ভাগীরথী।

শহরের এই জীবনের সঙ্গে ওপারের শৌখিন বাসিন্দারাও নিজেদের দিয়েছেন মিশিয়ে। এ জীবন থেকে বাদ পড়ে নি চুঁচুড়ার রূপনারায়ণও।

বহুদিন আগে শেঠ আর বসাকেরা যেমন বাণিজ্যের বহর দেখে নদী পাড়ি দিয়ে এপারে এসেছিল ভাগ্য-অন্বেষণে, অবিকল সেইভাবেই এখন ওপারের বিলাসীরা এপারে আসে বিলাসের সন্ধানে।

এপারে-ওপারে ব্যবধান আর কতটুকু? যে নদী অক্লেশে সাঁতার দিয়ে পার হতে পারে সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি সমৃদ্ধি, সে নদী পার হতে বিলাসীদের নৌকোর এমন-কিছু বেশি সময় লাগার কথা না। শ্রীরামপুর আর কলকাতা রেখেছে শিক্ষার আর সংস্কৃতির যোগ— ব্যাপটিস্ট মিশন আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নিজেদের একসূত্রে বেঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছে সমানে। কলকাতা আর গরিটির মধ্যেও এমনি যোগাযোগ রেখেছিল ফিলিপ ফ্র্যান্সিস আর তার সহযোগীরা, সে যোগের অঙ্ক গিয়ে পৌঁছেছিল চন্দননগর পর্যন্তও।

এ তো চেনা পথ চেনা রাস্তা। সেই রাজপথ ধরে যাতায়াতে কোনো অসুবিধেই নেই। রূপনারায়ণেরও কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা না।

রাধার বিবাহিত জীবন বয়ে চলেছে চুঁচুড়ায়। আমরাও স্বচ্ছন্দে ঐ জলপথ ধরে তার কাছে গিয়ে তার দাম্পত্য জীবন দেখে আসতে পারি বটে, কিন্তু থাক্, এখন না।

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে প্রসেশন বেরিয়েছে। জমকালো মিছিল। সম্মুখে ব্যাগপাইপ ও বিউগ্‌ল্। জোর কদমে চলেছে একদল পল্টন, মাঝখানে জনকয়েক দেশী পুরোহিত— তাদের হাতে রুপোর থালায় নানাবিধ জরি ও পট্টবস্ত্রাদি ও নৈবেদ্য, পিছনে দেশী বাদ্য ও বাদক, তার পর চার-পাঁচজন সাহেব, সব পিছে রক্তাম্বরধারী একদল কালীসাধক। আগে-পিছে বিবিধ বাদ্যের নিনাদ তুলে ধীরে-ধীরে প্রসেশনটি ময়দানের গা দিয়ে চৌরঙ্গী বরাবর চলে যাচ্ছে ভবানীপুরের দিকে।

পথের দু পাশে জমে-জমে দাঁড়িয়েছে জনতা। হঠাৎ আজ এমন কী শুভঘটনা ঘটেছে সাহেবদের ভাগ্যে, সকলে বুঝতে পারল না। নিজেদের মধ্যেই তারা আলোচনা করতে লাগল এবং জল্পনাকল্পনা করতে লাগল। নিশ্চয় সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। খুব বড়দরের একটা জয় কোথাও ঘটেছে ওই ফিরিঙ্গিদের, নইলে হঠাৎ এমন পুজার বহর কেন।

কালীঘাটে ভেট পাঠাচ্ছে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। একটা বড়রকমের জয় হয়েছে তাদের। বিশু-ডাকাত ধরা পড়েছে, শুধু ধরা-পড়া না, তার ফাঁসিও হয়ে গিয়েছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে কোম্পানি। এইজন্যে আজ সাড়ম্বরে চলেছে ঐ উপঢৌকন। কালীক্ষেত্রে কালীমাতাকে তুষ্ট না করলে উপায় নেই কারো।

এর আগেও অনেকে বার গিয়েছে এই রকমের ভেট। সিরাজের পতনের পর যে ভেট গিয়েছিল তার চেয়ে বড় ভেট অবশ্য এ পর্যন্ত আর যায় নি।

কিন্তু আজকের এ-আয়োজনও খুব সামান্য বলে মনে হচ্ছে না। ঐ পুরোহিতদের হাতের থালায় যেসব উপকরণ সাজানো তার মূল্য বড় কম নয় —টাকার অঙ্ক দিয়েই তো ভেটের গুরুত্ব।

ব্যাগপাইপে আর বিউগ্‌লে যে ধ্বনি বেজে উঠেছে, সে কেবল জয়ধ্বনি নয়, ওর সঙ্গে মিশে আছে আনন্দধ্বনিও। পিছনে ঢাকীরা কাঠি নাড়ছে

খরচ শুধু মজুরির জন্যে। রক্তাম্বরধারীরা রুক্ষচুলের মাথা নেড়ে হল্লা করছে কেবল ফুর্তির একটা মওকা পেয়েছে ব'লে।

ধরা পড়েছে বিশু-ডাকাত। ফাঁসিও হয়ে গিয়েছে তার। এ সংবাদ জেনে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল জনতার মুখ। একটা ভরসা বুঝি চুকে গেল তাদের।

কিন্তু বিশ্বনাথ তাদের কবে কি দিয়ে সাহায্য করেছে এ হিসাব তাদের কাছে অবান্তর। তারা জানত এ লোকটা শক্তের যম নরমের ভক্ত। লোকটার চরিত্র একটু বিপরীত ধরণের ছিল বলেই এ-সংবাদে তারা ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। সকলের উপর দাপট দেখিয়ে বেড়ায় যারা, তারাও যে একজনের কাছে জব্দ—এইটেই ছিল সকলের মনের শান্তি। সে শান্তিটা নষ্ট হয়ে গেল এই সংবাদে।

চৌরঙ্গীর দুই ধারে দাঁড়িয়ে যারা ঐ শোভাযাত্রা দেখছে তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল বটে, কিন্তু গাড়রাভাতছালায় বিশুর মা খবরটি পেয়ে কি করছে, আর ইট্‌লে-গ্রামের সেই মেয়েটি? তাদের জীবনের সব আলো নিবে গেছে নিশ্চয়; আর্তচিৎকারে পল্লী উচ্চকিত করে তুলেছে নিশ্চয়; নিশ্চয় ঘরের মাটির মেঝে ভিজে গেছে তাদের চোখের জলে।

আর, ফরাসগঞ্জের গাঙ্গুলি-বাড়ির পিসিমা? কালাপাহাড়ের প্রবল আক্রমণে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির, সেদিন সারা বারাণসী-ধাম অবশ্যই আর্তরোদনে আকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আজ কোন্ কালাপাহাড় এসে পিসিমার বাবা-বিশ্বনাথকে এভাবে চূর্ণ করে দিল, এ কথা তিনি জিজ্ঞাসা করবেন এমন কোনো মানুষ নেই। পিসিমা নিশ্চয় এখন ছুটতে-ছুটতে কেঁদে গিয়ে পড়েছেন হেমাঙ্গিনীদের উঠোনে। কিন্তু, কেন কান্না কিসের কান্না— এ কথার কোনো উত্তর দিতে তিনি পারছেন না।

কেবল ফরাসগঞ্জের পিসিমা কেন, বলাগড়ের উপকণ্ঠস্থ শ্রীপুর গ্রামের লোকনাথ মুদির মা, নদীয়ার আশানগরের আবালবৃদ্ধবনিতা, আরও কত মানুষ তার সংখ্যা নির্দেশ করে কে।

নদীপথ ছিল নিরাপদ। এ পথে কোনো সাধারণ মানুষকে কখনো বিপদে পড়তে হয় নি, কোনো স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করার স্পর্ধা কখনো হয় নি কোনো বোম্বেটের। বিশ্বনাথের দাপটে আর তার পাহারায় সকলেই ছিল ভীত।

কিন্তু আজ বিশু রইল না। দেশটাকে রেখে গেল বুঝি শুধু পাচু সরদারের

জিম্মায়। ওদিকে কালনা থেকে আরম্ভ করে এদিকের সালকে-ঘাট পর্যন্ত নদীর দু পাশের মাঝি-মাল্লারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে আজ। ঘরে-ঘরে বেজে উঠেছে চাপা রোদন।

লোহার খাঁচায় পুরে বিশ্বনাথের মৃতদেহ তখন রাখা আছে ঠগবগের খালের পাশের ঐ মাঠে— বটগাছে ঝুলিয়ে।

চারদিকেই আর্তস্বর। সেই স্বরের প্রতিনিধিরূপে ঐ বুঝি বেজে-বেজে উঠছে বিউগ্‌লের উৎকট শব্দধ্বনি।

সকলেই আর্ত, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসন্ন আর প্রফুল্ল বুঝি আজ ব্লাকুয়ার-সাহেব। ঐ মিছিলের পিছনে-পিছনে পদব্রজে তিনিও যেন গেলেন?

ব্লাকুয়ার একা না, ওঁর সঙ্গে আছেন নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট আর নীলকুঠির সাহেব স্যামুয়েল ফ্যাডি।

পাঁচু সরদার, বৈদ্যনাথ, আর নদীয়ার উপরগোষ্ঠীদের সঙ্গে দল পাকিয়ে অনেক চক্রান্ত ক'রে আর চতুর্দিকে জাল বিস্তার ক'রে অনেক কষ্টে ঐ সাহেব-লোকেরা পাকড়াও করেছিলেন বিশ্বনাথকে। তাঁরা তাই মহাখুশি। এইজন্যে ঢাকঢোল আর বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে ঐ তাঁদের যাত্রা।

চৌরঙ্গীর রাস্তা পার হয়ে বনবাদাড়ে-ভরা কাঁচা রাস্তা ধরে ক্রমশ এগিয়ে চলল ঐ জমকালো প্রসেশন।

ধরা পড়ত না বিশ্বনাথ, এতগুলি মানুষের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়েও সে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল নিজেকে, কিন্তু মা-কালী বিরূপ হলে নিজেকে রক্ষা করা নাকি বড় দায়। তার প্রমাণ বিশ্বনাথ পেয়েছে।

উপরগোষ্ঠীদের উপর তার কোনো রাগ নেই। তারা নদীয়ার অধিবাসী, ওখানকার পথ-ঘাট-বন-বাদাড় সবই তাদের চেনা। বিশ্বনাথের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে তারা-সব কোম্পানির চাকর। পাঁচুর উপরেও কোনো রাগ নেই তার। কিন্তু বৈদ্যনাথের কথা ভাবলেই দুনিয়ার সব-কিছু মিথ্যে বলে মনে হয় তার। যাকে সে নিজের ছেলের মত মানুষ করল, সর্বদা সঙ্গেসঙ্গে রেখে তার গোপন ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে নিয়ে ঘুরে বেড়াল, এখন সে-ই হল কোম্পানির চর। কিন্তু শেষ-বেশ সব ঘৃণা গিয়ে পড়েছে ফ্যাডি-সাহেবের উপর— এমন নিমকহারাম মানুষ বড়-একটা দেখা যায় না, ইংরেজ জাতের কলঙ্ক হয়ে গেল ঐ লোকটা। একটা মানুষের জন্যে একটা জাতের নাম কালো হয়ে গেল।

কলকাতা থেকে ফ্যাডির কুঠিতে বিস্তর টাকা ও মোহর এসেছে রায়তদের

খাজনা দেবার জন্তে। খবর পেয়েই দলবলে বিশ্বনাথ গিয়ে হামলা দিল সেখানে। সব লুঠ করে নিল। বেগতিক দেখে ফ্যাডি সাহেবের স্ত্রী কালো হাঁড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে কুঠির পুকুরে নেমে পড়লেন। ফ্যাডিকে ধরে নিয়ে চলল বিশুর দল। সাহেবটা লোক ভালো না, বিশুর নামেও হুলিয়া, দলটিকে চিনেও ফেলেছে ফ্যাডি। ঘাঁটিতে নিয়ে এসে কথাবার্তা চলল— একে নিয়ে কি করা যায়। স্থির হল কেটে ফেলা হবে। কিন্তু বাধা দিল বিশু। সরদারের বাধা পেয়ে থমকে গেল সকলে, কিন্তু ওরি মধ্যে একজন ভীষণ একরোখা, ফ্যাডিকে জ্যান্ত ছেড়ে দিতে সে চায় না, একটা তলোয়ার নিয়ে সে প্রায় কেটে ফেলেছিল— এমন সময় বিশু ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার হাত চেপে ধরে।

বিশুর সঙ্গে কথা হল ফ্যাডির। সাহেব শপথ করল, বাইবেলের নাম উচ্চারণ করল কয়েকবার। অবশেষে ঠিক হল, সাহেব কারো কাছে যখন কিছু প্রকাশ করবে না ব'লে যিশুর নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞাই করল তখন একে ছেড়ে দেওয়াই হবে।

নিবিড় অরণ্যের মধ্যে সশস্ত্র ডাকাতের কবলে পড়ে ভয়ার্ত ফ্যাডি বার-বার উচ্চারণ করতে লাগল ঐ শপথ। তার জীবন রক্ষা করা হলে এ জীবনে এই ডাকাতির কথা কখনোই প্রকাশ করবে না সে।

সর্বাঙ্গের বাঁধন খুলে মুক্ত করা হল ফ্যাডিকে। তার চোখদুটো মাত্র বেঁধে তিনজন সঙ্গীকে দিয়ে বন পার করে দিয়ে আসতে বলল বিশ্বনাথ।

বনের প্রান্তে এনে চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে বিশ্বনাথের লোকেরা অন্তর্ধান করল।

ঝাপসা দেখছে ফ্যাডি। চোখ রগড়ে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসা মাত্র ফ্যাডি দ্রুতপদে হাঁটা দিল। এবং সোজা এসে উপস্থিত হল ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়টের কাছে। শপথের কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত সে নিবেদন করল সেখানে।

চাঙ্গা হয়ে বসলেন এলিয়ট। পাঁচু বৈষ্ণনাথ আর উপরগোষ্ঠীরা মাঝে-মাঝেই তাঁকে খবর দিয়ে যাচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যেই এলিয়ট বুঝি কিছু পাকা খবর পেয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর জিম্মায় যে সেপাইবাহিনী আছে তার উপর পুরো নির্ভর করতে না পেরে পত্র পাঠালেন কলকাতায়। একদল তেলেঙ্গা আর গোরা সৈন্য নিয়ে নদীয়ায় এসে হাজির হলেন কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট ব্লাকুয়ার।

ব্যাপারটা যে অত্যন্তই বিরাট, এইটেই তার প্রমাণ। এর আগে কখনো কলকাতার কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এভাবে মফস্বলের কোনো ব্যাপারে স্বয়ং দলবল নিয়ে এসে হাজির হন নি— কোম্পানির ইতিহাসে এমন নজির আর নেই।

এদিকে যেসব কাণ্ড চলেছে বিশ্বনাথের কানে তা সবই পৌঁছচ্ছে। সে তখন ব্রাহ্মণীতলার নিবিড় অরণ্যের নীরন্ধ্র অন্ধকারে সঙ্গীসাথী নিয়ে নিজেকে গোপন রেখেছে। এই বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই হয়। তার পর সে তার মায়ের কথা রাখবে— সে ছেড়ে দেবে এসব কাজ, আর ইটুলে-গ্রামের সেই মেয়েটির কথাও সে ভুলে যাবে না। মনে-মনে এই শপথ সে করেছে, এ শপথ ফ্যাডি সাহেবের শপথ নয়, বিশু-বাগদীর শপথ।

ব্রাহ্মণীতলার বনে পাখির অন্ত নাই। দোয়েল শ্যামা ফিঙা বউকথাকও খোকাহোক টিয়া বুলবুলি। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এই নিবিড় বনের যোগ রেখেছে ওই পাখিরাই। ঘন পাতার আবরণ ভেদ ক'রে ঐ পাখিদের ডাক আসে কানে, এই নিবিড় নির্জনে ঐ ডাকগুলিকে মনে হয় জনতার কোলাহল। মনে পড়ে হুগলী-নদীর সেই জলকল্লোল, সুখসাগরের খাঁড়ির সেই বটবৃক্ষের শিকড়, সেই গরিটির ঘাট, সেই বলাগড়ের কুঠি, বলাগড়ের সেই পাগোলটার কথাও মনে পড়ে— মিরন শা, এখনো সে বুঝি হুঁশিয়ারি আওয়াজ করতে-করতে চলেছে পথে-পথে। লোকটা সত্যিই পাগোল, কত বিবিই তো রাণ্ডি হয়ে গেল, কিন্তু ওর মুখে একমাত্র গ্রাণ্ডিবিবির কথা।

এইখানে বসে কত কথাই মনে পড়ছে বিশ্বনাথের। কোলাহলের মধ্যে মানুষ নিজেকেও চিনতে পারে না। নিজের মনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় যদি কারো কাম্য হয় তাহলে তাকে নিবিড় নির্জনে বসতে হবে কিছুকাল। তপ-তপস্যা-প্রাণায়ামের প্রয়োজন নেই, নিজেকে জানার মত বড় কাজ আর কিছু নেই সংসারে। দশ জনের ভিড়ে মিশে থাকলে দশের প্রভাবে মানুষের মনের রঙ বদলে থাকে। নীলকাঁচের ভিতর দিয়ে লালপাথরে আলো ফেললে পাথরের আসল রঙ বদলে যায় না বটে, কিন্তু নকল রঙ জেগে ওঠে। ভিড়ের মধ্যের মানুষেরাও তেমনি নকল মানুষ।

অনেকের কথা মনে হচ্ছে বিশ্বনাথের। সে যদি সত্যিই কাটিয়ে উঠতে পারে এই বিপদ তাহলে ছেড়েই দেবে এই কাজ। তাতে তার কোনো ক্ষতি নাই, একরকম করে তার চলে যাবে, কিন্তু ওদের চলবে কী করে— ওইসব পিসিমাদের-মাসিমাদের, যারা আছে তার ভরসাতেই বেঁচে। বহু ক্ষুধার্ত

কোন যেন একসঙ্গে ঐ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তাকাল তার দিকে, তার কানে যেন ভেসে এল কন্যাদায়গ্রস্ত একদল বিপন্ন মানুষের কান্না।

প্যাঁচা ডেকে উঠেছে ব্রাহ্মণীতলার নিবিড় বনের অন্ধকারে।

এখনো বেলা আছে, তা বোঝা গেল শুধু পাতার ফাঁক দিয়ে দু-এক বিন্দু আলোর সংকেত দেখে।

কিন্তু বেলা আর বেশিক্ষণ টিকল না। দেখতে-দেখতে মুছে গেল ঐ আলোর সংকেত। অকৃত্রিম অন্ধকারে ভরে গেল ব্রাহ্মণীতলা।

কৃষ্ণসর্দার নলদাহা আর সন্ন্যাসী সব সময় বিশ্বনাথের কাছে-কাছে। একটা মশাল জ্বালল তারা, পাতাসমেত গাছের ডাল ভেঙে-ভেঙে আড়াল করে নিল ঐ আলো। বলা যায় না, ঐ আলোর রেশ দেখে কোনো উপরগোষ্ঠী গিয়ে এলিয়টকে খবর দিতে কতক্ষণ।

আত্মরক্ষার উপকরণ কাছেই মজুত রাখা আছে। মাটির নীচে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বনাথের অস্ত্রাগার। হঠাৎ কেউ আক্রমণ করে বসলে ঐ অস্ত্রাগারের শরণ নিতে হবে। কিন্তু যদি এক দঙ্গল লোক একসঙ্গে বন্দুক তলোয়ার পিস্তল নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে যা ঘটার ঘটবেই।

কিন্তু নলদাহা বলেছে, এখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন সন্দেহই কেউ করতে পারবে না।

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। চার দিকে বেজে উঠেছে নানারকম শব্দ। নিভৃত অরণ্যেব মধ্যে এ বকম শব্দের ঐকতান যে বাজে, বনে যে কখনো বাস করে নি তার পক্ষে তা জানা সম্ভব না। দিক্‌দিগন্ত যখন ঘুমে অচেতন, বনে বুঝি তখন বনকন্যাবা ঝিঁঝির নূপুর পায়ে দিয়ে নৃত্যরত হয়, সে-নৃত্যের সঙ্গে সংগতও বেজে ওঠে অরণ্যচারী পশুর কণ্ঠস্বরে।

বনের নীরবতায় মুগ্ধ হয়েছিল বিশ্বনাথ, অরণ্যের সংগীতেও সে বুঝি মোহিত হল।

এমন সময়ে একটা শব্দ এল তার কানে। কান পেতে রইল সে। আবার শুনল ঐ ডাক। তার ঠিক মাথার উপরে অনেক উর্ধ্বে বাজছে ঐ শব্দ।

বিশ্বনাথ ডাকল, সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী কাছে আসতেই তাকে বলল, শুনেছিস ঐ ডাক? টিটি পাখি ডাকছে।

বনের চূড়ায় বসে টিট্টিভ ডেকে-ডেকে উঠছে বার বার। অরণ্যের নৃত্য-

ধ্বনিতে আর মুগ্ধ হওয়া গেল না। বিশ্বনাথ মশালের স্তিমিত আলোয় সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, ভালো না সন্ন্যাসী। আমাদের অমঙ্গল ঘনিয়ে এসেছে।

সন্ন্যাসী কৃষ্ণসর্দার আর নলদাহা তিনটি বলিষ্ঠ ছায়ার মত বিশ্বনাথের পাশে বসল। তাদের সকলের কানেই টিটি পাখি বুঝি অকল্যাণের সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে।

এই বনেই-না সাড়ম্বরে কালীপুজো দিয়েছে বিশ্বনাথ। দু-বছর আগে। তবু বুঝি তুষ্ট করতে পারে নি তাঁকে, তাঁর প্রসন্নদৃষ্টি থেকে বুঝি বঞ্চিত হয়ে গেল সে!

আরও একটু সতর্ক হতে হল তাদের। চারদিকে গোপনীয়তার এমন ব্যূহ রচিত হল যে, সে আড়াল ভেদ করে বনের এই অন্তঃপুরে প্রবেশ করা কারো পক্ষেই বুঝি আর সম্ভব রইল না।

এলিয়ট সাহেবের চরেরা এই বনের চতুর্দিকে চোখ রেখে-রেখে চলা-ফেরা করছে। বিশাল বন। এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাধ্যও নেই, সাহসও হয় না। কিন্তু তাদের দৃঢ় ধারণা, এর ভিতরেই আছে বিশ্বনাথ। কয়েকদিন ধরেই তারা এই এলাকায় প্রহরায় রত। কিন্তু এতদিনেও কোনো রকম প্রমাণ না পেয়ে, এ অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে তারা খোঁজ করতে যাবে স্থির করেছে। বনের কি আর শেষ আছে, না, সংখ্যা আছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল বৈদ্যনাথের। এক পাল বুনো ডাইপিঁপড়ে সার বেঁধে একটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠছে। ঐ দিকে আবার চেয়েই তার কাছে সব যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ পিঁপড়েদের মুখে ভাতের কণা।

দলবল জমে গেল ঐ দৃশ্য দেখতে। এই নিবিড় বনে ভাত এল কোথা থেকে?

তেলেঙ্গা সেপাই আর গোরা সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ব্লাকুয়ার এলিয়ট আর ফ্যাডি ঐ পিঁপড়ের সার ধরে-ধরে ঢুকতে লাগলেন বনের গভীরে। পিছনে-পিছনে চলল পাঁচুসর্দার বৈদ্যনাথ আর উপরগোষ্ঠীরা।

অনেকটা এগিয়ে এসে একটু হদিশ বুঝি মিলল। সেইখান থেকে আরম্ভ ক'রে খানিকটা এলাকা ঘিরে ফেলা হল অবিলম্বে। তারপর সেই বাহিনীর বৃত্তটি ক্রমশ এগিয়ে-এগিয়ে আঁট হয়ে এল।

বিশ্বনাথরা তখন খেতে বসেছে। অকস্মাৎ পদশব্দ শুনে মুখ তুলে চেয়ে দেখে

তারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। অস্ত্রাগারটি একটু দূরে, হাতের কাছে শূলপি ছিল, এঁটো হাতেই সেটা একবার আঁকড়ে ধরল বিশ্বনাথ—কিন্তু সম্মুখে ভালো ক'রে চেয়েই শূলপিটা ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ক্যাভি সাহেব। তার মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বনাথই বুঝি লজ্জিত হল।

শান্ত গলায় বিশ্বনাথ বলল, আর কখনো কারো কাছে প্রতিজ্ঞা কোরো না সাহেব, প্রতিজ্ঞা তুমি রাখতে জান না।

বৈদ্যনাথের মুখের দিকেও একবারমাত্র তাকাল, কিন্তু তাকে কিছু বলল না।

ব্লাকুয়ার আর এলিয়ট সশব্দে এগিয়ে এল। ততক্ষণে সেপাইরা বেঁধে ফেলেছে বিশ্বনাথকে।

ব্লাকুয়ার-সাহেবেরা বিউগ্‌লে বীরত্বের সেই দাপট বাজাতে-বাজাতে চলে গেলেন কালীঘাটের দিকে। বিশ্বনাথের উপর যিনি অপ্রসন্ন হয়েছেন, তাঁদের উপর এবার যেন পড়ে তাঁর প্রসন্নদৃষ্টি— এই বুঝি তাঁদের অভিলাষ।

এ অভিলাষ পূর্ণ অবশ্যই তাঁদের হবে। তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, ক্রমশই তা হয়তো আরো পাকা হবে, আরো মজবুত হয়ে উঠবে।

নবাব বাদশাদের দ্বারে উপঢৌকন দিয়েই তাঁরা এই দেশের ভূমিতে দাঁড়াবার স্থান সংগ্রহ করেছেন, এখন সে নবাবেরা নেই, হালের কলকাতার নবীন নবাবেরা আজ তাই অন্য স্থান নির্বাচন করেছেন ঐ উপঢৌকন ঢেলে দেবার জন্যে। কিন্তু কেবল ভেটেই সব কাজ যে হয় না তা তাদের জানা, সেইজন্যে বাইরে-বাইরে চলে ভেট, ভিতরে-ভিতরে চক্রান্ত।

চৌরঙ্গীর দু-পারের জনতা ধীরে-ধীরে যে-যার কাজে চলে যায়। একটা ডাকাতের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে দেশের পক্ষে এ একটা ভালো বার্তা। কিন্তু একটা গিয়ে দশটা যে রয়ে গেল, আর যেটা গেল সেটা যে একটা সেরা মানুষ— এইটুকুই বুঝি দুঃখ।

ফিরিওলারা সওদা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবার তারা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে— কোনো বাড়ির সরকারবাবু তাদের ডাক দেয় কি না।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে রলিনসন-সাহেবের কুঠি। তার ফটকের কাছে এসে ঐ ডাকছে সরকারবাবু।

আতাফল জায়ফল পাতিলেবু শশা কমলালেবু মাথায় নিয়ে ফিরিওলা গিয়ে দাঁড়াল কাছে।

উঁকি দিয়ে দেখে নিল সরকার ওই ঝাঁকায় কি কি আছে, দেখে জিজ্ঞাসা করল, কত দস্তুরি দিবি ?

—যা সকলকে দিই।

—কত দিস ?

—টাকায় আনা।

ইঙ্গিতে তাকে সরে যেতে বলে অন্য ফিরিওলার খোঁজে রাস্তার ওপারে তাকাতে লাগল সরকার।

—কি বাবু, কত দিতে হবে ?

—দুই আনা।

ফিরিওলা রাজি হয়ে গেল। গেট খুলে ভিতরে নিয়ে এল তাকে সরকার।

কালো কস্তাপেড়ে মসলিনের ধুতি তার পরনে, গায়ে নিমাস্তিন মিহিন জামা, সর্বাঙ্গ তেলচুকচুকে, আপাদমস্তক ছিমছাম, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পরিশ্রমের কোনো দাগ পড়েনি শরীরের কোনোখানে।

সরকারের পিছন-পিছন ফিরিওলা ভিতরে চলে এল।

মিসেস রলিনসন মাঝবয়সী মেম, কিছুদিন হল হোম থেকে এসেছেন কলকাতায়। নীচু একটি মোড়ায় বসে তিনি সওদা করছেন ময়দা। পিছনে দু-জন দাসী দাঁড়িয়ে, সম্মুখে খিদমতগার ও খানসামা। সোনালি চুলের কার্ল্ চেয়ারের পিঠে লেগে চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িপাল্লায় ওজন হচ্ছে ময়দা, রলিনসন ভারি খুশি, বললেন, ভেরি ফাইন ফ্লাওয়ার।

সরকার এসে পৌঁছল, ঐ কথা তার কানে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করল, ফ্লাওয়ার ? কোন্ ফ্লাওয়ার—গোলাপ রজ্‌নীগন্ধা বেল বকুল মল্লিকা। সব কুছ মিলতা কলকাত্তামে।

মিসেস রলিনসন সরকারের মুখের দিকে তাকাবার জন্যে মুখ তুলেই দেখলেন ফিরিওলা।

যা দেখছেন তাই বড় চমৎকার লাগছে রলিনসনের— কমলালেবু আতাফল শশা লিম্বু। নামগুলোই-বা কী সুন্দর।

সওদার যাবতীয় তদারক-তদ্বির ক'রে সরকার ওদের বিদায় দিতে এল গেট পর্যন্ত, হিসাব করে গুনে-গুনে নিল তার দস্তুরি।

ভিতরে এসে সেলাম করে দাঁড়াল রলিনসনের সামনে। রলিনসন জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যা?

বিনীত ভঙ্গিতে সরকার বলল, দস্তুরি।

দস্তুরি? এ দেশে আসার পর থেকে প্রত্যহই তিনি শুনছেন এই আর্জি। এ দেশের সবই ভালো লাগছে রলিনসনের, কিন্তু এই জিনিসটি কেমন যেন বেআড়া আর বেকায়দা বোধ হচ্ছে তাঁর। অথচ এ কথা নিয়ে আপত্তি জানানো চলে না, প্রতিবাদ করাও ঠিক না। যে দেশের যা নিয়ম। নিয়ম বটে, কিন্তু এ নিয়মটা বড়ই অনিয়ম বলে মনে হয় তাঁর।

এক-একটা ট্র্যানজ্যাকশনে দু-পার্টির কাছ থেকেই যদি পাওনা হবে সরকারের, তাহলে ওর মাইনেটা নেওয়া কেন?

কিন্তু এ কেন নিয়ে কথা চলে না। মানুষটা বড় ভালো, সদাহাস্য প্রফুল্ল বিনয়ী নম্র।

রলিনসন হিসাব করে দস্তুরি দিয়ে দিতেই নত হয়ে সেলাম করে প্রস্থান করল সরকার।

ধীরে-ধীরে রলিনসন চৌরঙ্গীর দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কলকাতা দেখছেন তিনি, লণ্ডনে বসে শুনেছেন এই দেশের কথা— ভ্যালি অব ডায়মণ্ডস অ্যাণ্ড ড্রিমস। রাস্তায়-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে না বটে হীরা, পথে-প্রান্তরে ছড়াছড়ি হয়ে পড়ে নেই বটে স্বপ্ন, কিন্তু হীরা দিয়ে আর স্বপ্ন দিয়েই তৈরি বটে এই দেশ। ওই ভাবে দস্তুরি নিলে হীরা সংগ্রহে আর বিলম্ব কতটুকু, আর ওই সরকারের চোখও কি স্বপ্ন দিয়ে ভরা নয়? স্বপ্নের ফানুসে ভর দিয়ে না চললে লোকটা মেহনত করার চেষ্টা করত। কেবল সেলাম ঠুকে আর মোলায়েম করে হেসেই এমন মাশুল আদায় করে করে বেড়াত না।

রলিনসন চেয়ে আছেন রাস্তার দিকে। ও কি, ব্লাড! যেন চমকে উঠলেন তিনি।

কিন্তু চমকের আছে কী। কালীঘাট থেকে পাঁঠাবলি দিয়ে ফিরছে ওরা। বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ, কোমরে কাপড় বাঁধা, খালি গা, ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে মুণ্ডহীন পাঁঠা। দু হাত দিয়ে সামনের ও পিছনের জোড়া জোড়া পা ধ'রে— ঘাড়ের উপর ফেলে নিয়েছে ওই ছাগশিশু। মুণ্ডহীন ঘাড় থেকে রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে মানুষটার গায়ে।

শিউরে উঠলেন বুঝি মিসেস রলিনসন। এ একটা দেখার মত জিনিস

বটে, তাঁর বন্ধুর মেয়ে বেল্‌নস থাকে ধর্মতলায়, তাকে ডেকে দেখাতে হবে— সে নিশ্চয় এর ছবি এঁকে নেবে তার অ্যালবামে। গঙ্গায় বোট ভাসিয়ে-ভাসিয়ে দুপাশের দৃশ্য ও ঘটনার অনেক খসড়া স্কেচ সে এঁকেছে ইতিমধ্যে।

রলিনসন নিজের মনেই হাসলেন। ওই ছাগশিশুটির কাছ থেকে নিশ্চয় দস্তুরি আদায় করে নি ঘাতক, বেঁচে গেছে ছাগশিশুটা। আদায় করলে, ওর হেড কেটেছে, সেই সঙ্গে ওর টেল্‌ও নিশ্চয় কাটত।

পিছন থেকে সরকার সেলাম করে দাঁড়াল। বলল, মুর্গীওলাকে নিয়ে এসেছি।

—ক্যা।

—মুর্গীবালা।

রলিনসন অন্দরমহলের দিকে চললেন। খিড়কির দরজা দিয়ে সরকার নিয়ে এসেছে মুর্গী। তা না হলে এখানে দাঁড়িয়ে রাস্তার দৃশ্যাবলীও দেখা যেত সেইসঙ্গে মুর্গীর দরদস্তুরও করা যেত।

রলিনসন ভিতরে চলে গেলেন।

রাজপথ এই চৌরঙ্গী। রলিনসন অন্দরে চলে গেলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এই পথের চলাচল বন্ধ হয়ে গেল না।

বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়ে পথচারী চলেছে, বিশাল শুণ্ড আন্দোলন করতে-করতে হাতি। গবাদিপশুও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এই রাজপথে। পালকি-বেহারারা ধুঁকতে ধুঁকতে সওয়ারি নিয়ে চলেছে কাছারিতে। পথের দু ধারে গাছের ছায়ায়-ছায়ায় চড়ে বেডাচ্ছে ভেড়ার পাল— ওদের গায়ে রোদ পড়ে বোধ হচ্ছে যেন ঘুরে ঘুরে বেডাচ্ছে পেঁজাতুলোর এক-একটি বাণ্ডিল।

অনেক পরিচ্ছন্ন নিরাপদ ও জনবহুল হয়েছে এই অঞ্চল। সামনের ঐ মাঠটি— ঐ ময়দান— এখন বিস্তৃত একটি প্রান্তরে পরিণত করা হয়েছে, ওর এক প্রান্তে বসেছে ফোর্ট। চিত্তেশ্বরীর মন্দির থেকে কালীঘাটে পুজো দিতে যাবার সময়ে এই রকম জায়গায় কতজন প্রাণ হারিয়েছে বাঘের হাতে। বাঘের গর্জনে, শৃগালের হুক্কাধ্বনিতে আর সাপের হিসহিস শব্দে এই অঞ্চলটি ছিল ভয়াবহ। তার উপর ছিল ডাকাত। এ অবস্থা নাহয় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের। ইতিমধ্যে নাহয় অনেক জঙ্গল কাটা হয়েছে। কিন্তু দশ-পনেরো বছর আগেও এ জায়গার যা অবস্থা ছিল তার তুলনায় এখন তো এ একটা শহর।

সত্তর-আশিটা কোঠাবাড়ি উঠেছে সার্কুলার রোডের কিনার থেকে আঁচড় করে এই রাস্তাটির এক পাশে।

সুপ্রিম আদালতের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পে সায়েব এই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত যখন এই অঞ্চলে ছিলেন তখনও জায়গাটিকে ধরা হত শহরের বাইরে। শহর তখন ট্যাঙ্ক স্কোয়ার ঘিরে— সাহেব পল্লীতে; সেই লালদিঘিই তখন শহরের কেন্দ্র শুধু নয়, সেইটেই আসল শহর। ইম্পে-সাহেবের কুঠি ঘিরে সারারাত পাহারা দিত সেপাইরা, মধ্যরাত্রে মাঝে-মাঝে তাদের বন্দুকের শব্দ বেজে উঠত। এই কুঠির অদূরেই ছিল হরিণপালের বিচরণক্ষেত্র, ঐ শব্দে নিদ্রিত হরিণেরা সচকিতকর্ণ হয়ে অন্ধকারের মধ্যে এদিকে-ওদিকে তাকাত।

এরই কিছুটা উত্তরে চৌরঙ্গী থেকে একটি কাঁচা রাস্তা পুব দিকে গিয়েছে গোরস্থান পর্যন্ত, নাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড। রলিনসনেরা সে রাস্তার চেহারাও দেখছেন অনেক ঝরঝরে, তার নাম এখন বদল হয়েছে, ঐ হরিণ-পালের বিচরণভূমির অর্থাৎ ডিয়ার-পার্কের কথা স্মরণ করে এর নাম হয়েছে এখন পার্ক স্ট্রীট।

গোবিন্দপুর গ্রামটি আর নেই, তার সব অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে ওখান থেকে অনেক দিন আগে। কোর্ট বসানো হবে বলে গ্রামের লোকদের চলে যেতে বলা হয়েছিল। তারা চলে গেছে বিভিন্ন এলাকায়— সুতানটিতে কেউ, কেউ-বা তালতলায়, কেউ গড়িয়ায়। এখন সেই পুরাতন গ্রাম পরিণত হয়েছে নূতন ময়দানে। কিন্তু ঐ মৌজায় নাথসম্প্রদায়ভুক্ত একজন যোগী থাকত, তার একটি সাধনাশ্রমও ছিল ওখানে। সে যোগীর নাম চৌরঙ্গী। গোবিন্দপুরের তার সব শিষ্যেরা চলে গেছে চতুর্দিকে, গোবিন্দজীর মন্দিরটিও তুলে নিয়ে যেতে হয়েছে কালীঘাটে। সবই অদৃশ্য হয়েছে, কিন্তু যোগীর নামটা উহ্য হয়ে যায় নি, এই রাস্তায় এসে পড়ে আছে সেই নাম।

আরো হয়তো কত উন্নতি হবে এই শহরের। এখন যেখানে কোঠাবাড়ির সংখ্যা গুনে-গুনে বলা যায়, হয়তো এমন দিন আসবে যখন গণনা করা দুরূহ হয়ে উঠবে। কত পরিবর্তন হবে তখন, কত পরিবর্ধন। তখন এখনকার নাম-দেওয়া রাস্তার নামও হয়তো জনসাধারণের ইচ্ছায় বদল করা হবে। কিন্তু সেইসব চাহিদার জোগান দিতে গিয়ে কত ইতিহাস যে মুছে ফেলা হবে এই শিশু-শহরের অঙ্গ থেকে— তার কোনো হিসেব হয়তো পাওয়া যাবে না।

অক্ষর দিয়ে লিখে রাখলেও ছবি সব সময় পরিষ্কার হয় না। রেল্‌নসকে

পরামর্শ দিতে হবে, সে যেন তার পেন্সিল দিয়ে এঁকে-এঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করে এই ইতিহাস।

নতুন দেশে এসে এর মাটির উপর মিসেস রলিনসনের বুঝি মমতা জন্মে গেছে। আর কোনো কারণে না, তিনি বুঝি চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছেন তাঁর চোখের সামনে লেখা হচ্ছে ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস তো কেবল কতকগুলি ঘটনার মিছিল নয়, রাজা-বাদশা আর আমীর-ওমরাহের নামের তালিকাও নয়। ইতিহাসের মধ্যে সমাজ আছে সংস্কার আছে, আচার আছে আচরণ আছে, পোশাক আছে পরিচ্ছদ আছে। ইতিহাস হচ্ছে মানুষের মনের ও মতের পরিবর্তনের কাহিনীও।

শুধু দেশটির উপরে নয়, এখানকার মানুষের উপরেও তাঁর মমত্ব জন্মেছে। বড় অসহায় বলে এদের মনে হয় তাঁর, বড় সরল, বড় বিশ্বাসী, আর কেউ-কেউ যেন বড় লোভী।

নতুন ইতিহাসের উপর রলিনসনের টান আছে, কিন্তু সম্ভবত পুরনো ইতিহাস তাঁর জানা নেই। এ দেশের মানুষের উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা আর পীড়ন গিয়েছে তার বুঝি খোঁজ নেন নি তিনি, তবু এরা বেঁচে আছে এখনো। সেই সাত প্রকার পীড়নের মধ্যের একটা মাত্র সামান্য পীড়নে যদি পীড়িত হতে হত মিসেস রলিনসনের দেশবাসীকে, তা হলে তাঁদের মেরুদণ্ড চুরমার হয়েই যেত।

কিন্তু মিসেস রলিনসনের একটু খেদ আছে। এই কলকাতায় বেশি দিন তাঁর থাকা হবে না, পাটনার কুঠিতে কোম্পানি তাঁর স্বামীকে নিয়োগ করেছে। বহুদূর দেশ থেকে জাহাজে চেপে লটবহর নিয়ে তিনি এসেছেন এখানে, এখান থেকে আবার জলপথ ধরে তাঁদের যাত্রা করতে হবে সেই সুদূরের পাটনায়।

কিন্তু যাবার আগে ঐ জায়গাটা দেখে যাবার ইচ্ছে, বেলভেডিয়ারের সেই বৃক্ষকুঞ্জটি— হেস্টিংসের সঙ্গে ডুয়েল হয়েছিল যেখানে সার্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের।

কয়েকদিন কেটে গেল চৌরঙ্গীর কথা চিন্তা ক'রেই, এবং চৌরঙ্গীর রাস্তার লোকজন ও যানবাহন চলাচল দেখে। পাটনায় রওনা হওয়ার দিন ধার্য হয়েছে পরশু। রলিনসনের বাড়িতে আজ তাই বড় খানা।

অনেক জানাশুনা লোক আসছেন এবং কোম্পানির অনেক কর্তাব্যক্তি। হল-ঘরে খানার টেবিল সাজাতে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খানসামারা মাথায়

গোল-গোল টুপি প'রে কাপড় বিছাচ্ছে, দেয়ালে ব্র্যাকেটের সঙ্গে জোড়াজোড়া মোমদানি— কাঁচের গেলাশ, টেবিলের উপর রাখা কাঠের দণ্ডের উপর— কাঁচের গেলাশ নয়— যেন কাঁচের গামলা, আলো দেবার জন্তে ফরাস মোম বসিয়ে বসিয়ে সব তৈয়ার রাখছে। আর, আবদারেরা বুঝি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, রঙিন পানীয়ের বোতল সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে।

দশ-বারো জন অতিথি এল জোড়ায়-জোড়ায়, একজন মাত্র এল একা।

দুই হাতে গাউনের অংশ ধরে এগিয়ে গেলেন মিসেস রলিনসন, এস এস বেল্‌নস।

অল্পবয়সী কুমারী একটি মেয়ে, খুব নরম, খুব নিরীহ, আর খুবই বুদ্ধির দীপ্তি চোখে-মুখে।

রলিনসন জিজ্ঞাসা করলেন, একা কেন? বাবা কোথায়?

বেল্‌নস বলল, তিনি ক্যালকাটার বাইরে গেছেন।

—কোথায়?

—দমদমার ঝিলে, ডাক্‌-শুটিঙএ।

অতিথিরা বসে গেলেন টেবিলে। কাঁটায় চামচে প্লেটে আর ডিক্যাণ্টারে পুর্ণ হয়ে গেছে টেবিল। কত বিচিত্র সাজে সাজ্জিত হয়ে এসেছে সকলে, এবং কত বিচিত্র ভূষায়। গলায় হীরের হার, হাতে মোতি-বসানো ব্রেসলেট, গায়ে গাঢ লাল রঙের সাটিনের জামা, কারো অঙ্গে বা ফিনফিনে মসলিন।

বেল্‌নসও বসলেন। কিন্তু খাবার টেবিলের দিকে তার দৃষ্টি তত নয়, যতটা ঐ অতিথিদের দিকে। ওদেব বড খুঁটিনাটি করে লক্ষ্য করছে যেন বেল্‌নস।

ওরা-সব এসেছে আসল শহর থেকে— ট্যাঙ্ক স্কোয়ার এলাকা থেকে। ধর্মতলা বা চৌরঙ্গীর মত মফস্বলের মানুষ নয় ওরা। ওদের সাজপোশাকের ঘটা দেখলেই তা বোঝা যায়। এই অঞ্চলগুলো এখনো গাছে আর আগাছায় ভরা, এদিক-ওদিক জলায় ও জঙ্গলে পুর্ণ, কিন্তু ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে কেবল ইমারত আর ইমারত।

টেবিলে নানারকম আলোচনা চলেছে। এই ভ্যালি অব ডায়মণ্ডস অ্যাণ্ড ড্রিম্‌স্‌এ কে কি রকম লুটতে পারছে। মানুষের মত মানুষ ঐ সার্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিস, কিন্তু ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড একটা যাচ্ছেতাই মেয়ে— একটা হার্‌লট।

তার হাজব্যাণ্ডকে পার্টিতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রাচীর টপকিয়ে নিজের কামরার মধ্যে এনে ঢুকাল সে একটা পুরুষকে।

টেবিলের এই আলোচনা করছে পুরুষরা। টেবিলে তাদের স্ত্রীদের হাতের চামচ সুপ-সমেত মুখের কাছ অবধি এসে থেমে যাচ্ছে হঠাৎ। হয়তো ছল্‌কে পড়েও যাচ্ছে।

গ্র্যাণ্ডের নাম ক'রে কারো স্বামী কারো স্ত্রীকে তিরস্কার করছে কি না, হয়তো বুঝতে পারছে না কেউ। কিংবা কেউ হয়তো এ পর্যন্ত হাতে-নাতে ধরা পড়েনি, হঠাৎ এই কথা শুনে চমকে গিয়ে থাকবে।

এদেশী মানুষেরা যে মানুষ নয়, এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হল, এবং সকলে এ বিষয়ে একমত হল। কিন্তু এদেশী মেয়েরা— রিয়্যালি, প্রত্যেকে এক-একটা জিনিয়াস।

ঐ কথাটার মানে কেউ বুঝল না, ঐ জিনিয়াস কথাটার।

কানের কাছ থেকে মোটা জুলপি নেমে এসে গোঁফের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, চিবুকের কাছটা মাত্র কামানো, বলিষ্ঠ চেহারা, মূর্তিটা বড উগ্র— মিস্টাব রলিনসন। এতক্ষণ তিনি কথা বলেন নি, এবার বললেন, দি ওনলি পিওপ্‌ল্‌ হু হ্যাভ এনি রাইট টু ইণ্ডিয়া আর্‌ দি ব্রিটিশ, দি সো-কল্‌ড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌স্‌ হ্যাভ নো রাইট হোয়াটেভার।

কাঁটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে টেবিলে চাপড দিয়ে সকলে মিস্টাব রলিনসনের উক্তিতে সমর্থন জানাল।

মিসেস বলিনসন মিস বেল্‌নসের মুখের দিকে তাকাতেই বেল্‌নস মাথা নীচু করে সুপে সিপ দিতে লাগলেন।

এ একটা বড অদ্ভুত নিয়ম সংসারের। স্বামী আর স্ত্রী একটু বিপরীত ধরণের হয়েই থাকে। যে স্বামী মোটা তার স্ত্রী রোগা, আবার রোগা স্বামীর স্ত্রীরা হয় মোটা। স্ত্রীর বুদ্ধি ধারালো হলেই বুঝে নিতে হবে তার স্বামী অবশ্যই বুদ্ধিতে কিছু খাটো, বুদ্ধিমান স্বামীদের স্ত্রীও দেখা গিয়েছে, তারা বড সরল। কৃপণ স্বামীর স্ত্রী দাতা, তেজি স্ত্রীর স্বামী নিরীহ, লম্পট স্বামীর স্ত্রী পতিব্রতা, অলস স্ত্রীর স্বামী কর্মঠ। এইভাবে হিসাব করে লক্ষ্য করলে স্বামীর আর স্ত্রীর মধ্যে বৈপরীত্য চোখে পডে থাকে।

মিসেস রলিনসনের স্বামী মিস্টার রলিনসন। এতে সেইজন্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

রলিনসনেরা পাটনায় চলেছেন। তাঁদের যাত্রার আয়োজন পরদিন সকাল থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে হুগলী-নদীতে। তিনটি বজরা, সাতটি ভাউলে, পিনীশ দশটা। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী থাকবেন একটি শৌখিন বজরায়, ওঁদের মালপত্র যাবে ভাউলেগুলি বোঝাই হয়ে, সেই সঙ্গে থাকবে দাসবাহিনী—রসুইয়ে খানসামা খিদমতগার পাখাওলা। অন্য দুইটি বজরায় আসাবরদার সোটাবরদার বরকন্দাজ পেয়াদা। তাঁদের বজরাটি মাঝখানে রেখে দু-পাশ থেকে তাঁদের পাহারা দিতে-দিতে ও খানাপিনা দিতে-দিতে নিয়ে যাবে ঐ চোবদারেরা। তাছাড়া মাল-নৌকো থাকবে আগে-পিছে।

যাবার দিন সকালবেলা একটা চেয়ার-পালকি এসে নামল রলিনসনের বাড়ির সামনে।

বেল্‌নস এসেছে দেখা করতে। সরকারবাবু সসম্ভ্রমে গিয়ে দাঁড়াল সামনে, মাথা অনেকটা নীচু করে সেলাম জানিয়ে অভ্যর্থনা করল বেল্‌নসকে।

তাঁকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেই পালকিটার কাছে দাঁড়িয়ে বেহারাদের বলল, দস্তুরি।

কাঁধের গামছা নেড়ে হাওয়া দিয়ে দিয়ে ঘাম শুকাচ্ছিল ওড়িয়া বেহারারা। সরকারের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বুঝি তারা। কড়্‌মড়্‌ শব্দে বুঝি গালিগালাজই দিল সরকারকে। কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, হিহি করে হাসতে-হাসতে বুঝাতে চেষ্টা করল, এতে রাগ করার কিছুই নেই, এটা তার পাওনাই, এটাই দস্তুর।

কোমর থেকে বটুয়া খুলে পান সাজতে-সাজতে বুড়ো বেহারা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে, এ-পালকি ভাড়া-পালকি না, মেমসাহেবের নিজের পালকি, তারা মেমসাহেবের চাকর, দস্তুরি পেতে হলে মেমসাহেবের কাছেই চাইতে হবে।

অবস্থাটা সরকারের অনুকূল নয় বিবেচনা ক'রে সরকার হাত পাতল।

বেহারাটা জিজ্ঞাসা করল, কি?

সরকার বলল, একটা পান।

দোক্তা দিয়ে একটা পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে সরকার ভিতরে চলে গেল। তার গায়ের কামিজটা বেশ শৌখিন, মসলিনের ফাঁক দিয়ে সরকারের গায়ের চেকনাই দেখা গেল।

সরকারের রকম দেখে দাঁত বার করে হিহি করে হাসতে লাগল বেহারারা।

গলা উঁচু কবে করে উট হেঁটে চলেছে এই রাস্তা দিয়ে, লম্বা গলাটা এদিকে ওদিকে বাড়িয়ে কি যেন খুঁজছে। ওর কুঁজের উপর হাওদায় বসে দুলতে-দুলতে এসপ্ল্যানেডের দিকে চলে গেল আরমানি সওদাগর।

পালকি বেহারারা ঘাড় উঁচু করে ওই গলা-উঁচু উটের দিকে তাকাল। তাদের সঙ্গে ঐ উটের বুঝি তফাত নেই কিছু। এরাও তো অমনি সওয়ার বয়ে বেড়ায়।

দিন কেটে যায় ধীরে-ধীরে। বনবনান্তর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে শীত। বসন্তের বাতাস মবে গিয়ে আবস্ত হয়েছে খড়ানি। চৌরঙ্গীর রাস্তায় শুকনো পাতা নিয়ে খেলা কবে বেড়ায় হাওয়া। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চার দিক। সেই নিদারুণ চৈত্রে পথে-পথে চিৎকার করে বেড়ায় রাঙাবাস-পরা গাজনের সন্ন্যাসীরা। ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় তারা পথে-পথে। এই পথ দিয়ে দল বেঁধে তারা হাঁটা দেয় কালীঘাটেব দিকে। সেখানে মহা ধুমধাম।

কিন্তু ধুমধাম শুধুমাত্র একটা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, যেখানে-যেখানে জনবসতি ঘন, সেখানেই এদেব আবির্ভাব ঘটছে।— কদমতলা বেলতলা তালতলা নিমতলা কাঁটাপুকুর ঝামাপুকুর জেলেপাড়া মুচিপাড়া বড়বাজার শোভাবাজার দয়েহাটা দরমাহাটা হুকাপটি ডালপটি হাতিবাগান বাদুড়বাগান ফুলবাগান কলাবাগান গোয়াবাগান— সর্বত্র।

দেশী পাড়াতেও এদেব যেমন গতি, সাহেবপল্লীতেও তেমনি। এদেব রকম-সকম দেখে বিদেশীবা মজা পায়, এবং মজার মজুরি দিতেও তাদের কার্পণ্য নেই। সুতরাং দেশী-বিদেশী সব পল্লীতে তাদের সমান গতি।

হয়তো আনন্দেব ধ্বনি ক'রে বেড়াচ্ছে তাবা, কিন্তু ওই ধ্বনি আর্তস্বরেব মত শোনায়। চৈত্রের প্রচণ্ড রৌদ্রের সঙ্গে ওই রুদ্ররস মিশে অসহনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করে তোলে।

চড়কডাঙাতে তো উৎসবের বন্যা বাধাবন্ধহারা। কালীঘাটের কাছে ব'লে সেরা সেরা সন্ন্যাসী সেখানে জমায়েত হয়ে মহা উৎসবের সৃষ্টি করে, ঐ একটি পল্লীতেই অগুন্তি চড়কগাছ বসানো হয়, এবং পিঠে বাণ ফুঁড়ে নেশায় বেহুঁশ হয়ে সন্ন্যাসীরা ঐ গাছে ঘুরতে থাকে।

চৌরঙ্গীর সামনের ঐ ময়দানেও বসেছে চড়কগাছ। ওখানেও খেলা হবে। তা ছাড়া কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতেও বসেছে ঐ গাছ।

ময়দানের চড়কতলায় ভিড় জমে গিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতার। তারা তামাশা দেখার জন্যে ব্যাকুল। গলায় জবার মালা পরে রাঙা-রাঙা চোখে সকলের দিকে তাকাচ্ছে রক্তাম্বরধারীরা, তাদের সঙ্গে রক্তাম্বরধারিণী সন্ন্যাসিনীরাও আছে।

ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বেরিয়ে এল। হাতে ত্রিশূল, গলায় মালা, অসীম উদ্দীপনা চোখে— ও চোখের দিকে তাকালে বুঝি নেশা ছুটে যায়।

অদ্ভুত ভঙ্গি-সহকারে নাচতে-নাচতে এগিয়ে চলল তারা।

চৌরঙ্গীতে পড়ে সোজা এসপ্লানেডের দিকে গিয়ে ধর্মতলার রাস্তা ধরে চাঁদনির চক পার হয়ে তারা সোজা হাঁটা দিল। কোথায় চলেছে ওরা বোঝা গেল না।

মৌলালির মোড়ে হাজার-হাজার লোকের ভিড় জমেছে। সারকুলার রোডের উপরেই দরগা, তার একটু তফাতে খোলা মাঠে মস্ত একটা চড়ক-গাছ। বিরাট উৎসব এখানে।

কোনো কোনো সন্ন্যাসী বসে ঢুলছে, কেউ-বা ঢলাঢলি করছে মত্তা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। এমন সময়ে পিঠে বাণ ফুঁড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল দু-জন— একজন সন্ন্যাসী, একজন সন্ন্যাসিনী। লোহার বিরাট বড়শি পিঠে ফুঁড়ে নিয়েছে সন্ন্যাসীটির সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসিনীও। রক্ত ঝরছে। চোখ-দুটো ঢুলুঢুলু তার— কিন্তু মুখটি কী সুন্দর— যেন চাঁদপানা দেখতে। ওর পিঠে এই বঁড়শি দেখে হরু ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে যায়—

বঁড়শি বিঁধেছে যেন চাঁদে

কিন্তু এ চাঁদ এখন রাহুগ্রস্থ। এর সমস্ত সৌন্দর্য ও সুষমা ঐ রক্তাম্বরের আর জবাফুলের আড়ালেই শুধু অদৃশ্য হয়ে যায় নি, ওর চোখের নেশাতেও সে সৌন্দর্য চাপা পড়ে গিয়েছে।

হাজার-হাজার লোক উৎকট আগ্রহ নিয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে। ওই ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন কৌতুহলী টুপিওয়ালা সাহেবও দাঁড়িয়ে। এই হরিব্‌ল্ দৃশ্য দেখার জন্যে তাদের চোখের পাতা বুঝি মাঝে-মাঝেই থেমে যাচ্ছে।

চড়কগাছের উপরে দীর্ঘ বাঁশের দুপ্রান্তে তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীচ থেকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হল তাদের। উপর থেকে ওরা ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুল আর কিছু-কিছু খাদ্য— তা কুড়িয়ে নেবার জন্যে নীচে হুড়োহুড়ি।

সকলে আনন্দে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি করে উঠছে।

টুপিওলা সাহেবরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, বলছে, দে আর রাইট, 'টিস রিয়্যালি হরিব্‌ল্‌।

ভীষণ গতিতে ঘুরছে চড়কগাছ— চরকির মত। ওদের পরনের কাপড় বাতাসের ধাক্কায় অঙ্গ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। নিরাবরণ মূর্তি-দুটি তবুও পাক খাচ্ছে, নীচে বাজছে উল্লাসধ্বনি।

হরু ঠাকুরের কথা আবার মনে পড়ে যায়। চাঁদে তো বড়শি বিঁধেছেই, এই মনোহর দৃশ্যটি দেখলে ধুলায় পড়ে কাঁদা ছাড়া আর গতি কি শ্রীহরির।

এদিকের কোলাহল একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, অমনি অদূরে সত্যিই বেজে উঠল শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। যাদের কানে ঐ ধ্বনি গেল তারা দরগার ওদিকে একবার ফিরে তাকাল। শিশুকণ্ঠের কান্না যেন থামে না।

অত কাঁদে কে? বিশেষ কেউ না। ও পাশের ঐ বাড়িটায় থাকেন ডিরোজিও নামে এক সাহেব, তাঁর একটি বাচ্চা হল।

অনেক অঘটন ঘটে গিয়েছে কলকাতার চার ধারে।

নীলের উপবাস করে খালি পেটে নেশা করে সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলের গাজনে গিয়ে নানারকম বীভৎস আচরণ করেছে। পিঠের চামড়া ছিঁড়ে বাণ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ঐ উঁচু থেকে নীচে পড়ে চড়কডাঙায় দুজনের মৃত্যু ঘটেছে। এতেও নেশা তাদের ছোটে নি। সিমলার রামদুলাল দেবের বাড়ির গাজনে অনেক সন্ন্যাসীর ভিড় জমেছে। হঠাৎ কালীঘাট থেকে এসে দুজন ভণ্ড সাধু বাবুদের অনুমতি না নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে। অতি কদর্য সঙ সেজে তারা এসেছিল। ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গিয়েছে তাদের। পরদিনই বিচার হয় তাদের। দুই সপ্তাহের মেয়াদে তাদের পাঠানো হয়েছে হরিণবাড়িতে।

বেশি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের এ একটা দৃষ্টান্ত বটে।

কিন্তু বড়-বড় কাজের গাজনে সন্ন্যাসীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়া অনেক সময় দরকার হয়ে পড়ে।

কলকাতার শোভাবর্ধনের কাজ তার মধ্যে একটি। বিভিন্ন এলাকায় পুষ্করিণী খনন ও গৃহাদি নির্মাণ কোনো একজন ব্যক্তির উদ্যোগে বা অর্থে সম্ভব নয়।

এজন্যে জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টা দরকার। কিন্তু সর্বসাধারণের কাজের জন্যে সর্বসাধারণকে উৎসাহী করার উপায় কি। হীরা আর হরীর রাজ্যে জহুরী পাওয়া কষ্ট নয় হয়তো, কিন্তু কষ্টিপাথর পাওয়া বড় দুরূহ।

ব্যাজ মূলধনে অধিক মুনফার সম্ভাবনা দেখাতে পারলে সকলে উৎসাহী হবে। এই কথা চিন্তা করে লটারির সূত্রপাত হয়েছে অনেক দিন হল। কিন্তু হালে একটি জিনিসের বড়ই অভাববোধ হচ্ছে এই শহরে। এখানে এমন কোনো বড় বাড়ি নেই যেখানে দরকার-মত সকলে মিলিত হতে পারে।

এই অভাব দূর করার জন্যে টাউন-হল তৈরি হবে। তার জন্যে লটারির টিকিট ছাড়া হয়েছে— দুই লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

যাদের টাকা আছে এবং আরো টাকা পাওয়ার লোভ আছে তারা এক-একজনই এক শো টাকা দামের টিকিট কিনেছে অনেক। বিস্তর টিকিট বিক্রি হয়েছে। দু-চার দিনের মধ্যেই ভাগ্যবানের নাম জানা যাবে।

দু-চার দিন কাটতে দু-চার দিনের বেশি সময় নিল না। জানা গেল সে নাম, সে নাম জেনে দুঃখিত হল অনেকে— যারা টিকিট কিনেছিল তারা সকলেই। কিন্তু সুখী হল দুইজন।

হালশিবাগানের অপূর্বকৃষ্ণ তরফদার ও চুঁচুড়ার রূপচরণ রায়ের নাম উঠেছে লটারিতে। এক লাখ করে টাকা পাবে দুজন। অপূর্বকৃষ্ণের কাউকে আমরা চিনিনে, তারা কে কি করছে সে খবর আমরা তাই জানিনে। আমাদের চেনা-জানার মধ্যে খবরটা যে শুনে সুখী হল সবচেয়ে বেশি তার নাম রূপনারায়ণ। তার সুখ এত বেশি তীব্র হয়েছে যে, সে গিয়ে অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে নি সংবাদটা। বাহিরবাড়িতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে যখনই হুঁশ হচ্ছে তখনই বলছে— মাহেশ।

এত বাগানবাড়ি, এত বুলবুলির লড়াই— তবুও তাতে তৃপ্তি নেই রূপনারায়ণের। মাহেশের নৌকাবিলাসের মত ফুর্তি বুঝি আর কিছুতে জমে না। সারারাত নৌকোর উপর হাসি গান নাচ হুল্লোড় নেশা— ওর মত মজা আর কিসে?

বিয়ের পর ক'বছর কেটে গেল? প্রায় পাঁচ বছরই হবে। এই কয় বছরে পাঁচ বার সে গিয়েছে মাহেশে, কালেভদ্রে কখনো অন্দরে গিয়ে পৌঁছুলে রাধা জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় গিয়েছিলে আমোদ করতে? রূপনারায়ণ যেন চমকে উঠেছে, বলেছে, বলো-কি। আমোদ বলছ একে? তীর্থে

গিয়েছিলাম— মাহেশের স্নানযাত্রায়। রাধা বলেছে আমিও যাব। ঐ কথা শুনে জিভ কেটেছে রূপনারায়ণ, বলেছে, ছি।

কিন্তু ছি কেন, তীর্থে যেতে বাধা কোথায়, ঘেন্না কোথায়?

এসব কথার উত্তর দিতে পারে নি রূপনারায়ণ। উত্তর না দিক, রাধাও থাক্-না এই অন্তঃপুরে বন্দিনী, বিবাহিত জীবনে পালন ক'রে চলুক-না সে কুমারী ব্রত, তবু তার জানতে কিছু বাকি নেই।

চাঁপা তাকে সব খবর এনে দেয়। নাকের বদলে নরুন নয়, বকশিশের বদলে এনে দেয় খোসখবর। ঐ খবরে খুশি হয় না রাধা, তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় অপমানে। লম্পটের স্ত্রীরা নাকি হয়ে থাকে পতিব্রতা— এই নিয়ম পালন করে চলে সে, কিন্তু প্রতিহিংসা নেবার উৎসাহে নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্যে তার অন্তরাত্মা উন্মাদ হয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে; বাবার কথা মনে পড়ে যায়, মায়ের মুখ জেগে ওঠে চোখের সামনে। বাবার কথাই মনে হয় বেশি ক'রে, তাঁর মায়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন এক রকমের আঘাত, আবার তাঁর মেয়ের কাছ থেকে নতুন কোনো রকম আঘাত যেন তিনি না পান।

চাঁপা বলে, পুরুষের চরিত্র, বউদি, বেহ্মাবিষ্টুমহেশ্বরও জানতে পারে নি, মেয়েলোক তো কোন্ ছার।

চাঁপার কথার প্রতিবাদ করে না রাধা, কিন্তু চাঁপার চরিত্রটা জানার তার বড় ইচ্ছে। চাঁপা যে কি চায়, তা জানার বড় কৌতূহল রাধার।

চাঁপা বলে, কিছু না বউদি। আমি চাই তুমি সুখী হও, তোমার মনোবাসনা পুর্ণ হোক।

—কি আমার মনোবাসনা রে, চাঁপা।

চাঁপা তার মিশি-মাখা দাঁতে অতিসুন্দর হাসি হেসে বলে, দাদাবাবুকে বুকে পাওয়া।

কথাটা শোনামাত্র রাধার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে দুরদুর করে, তার বুকের চাপা কামনা কদর্য কৃমির মত যেন কিলবিল করে ওঠে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রাধারানী।

চাঁপা ঐ মুখের দিকে চেয়ে সহানুভূতি জানানোর মত ক'রে বলে, সতী হওয়া বড় ল্যাঠা বউদি, সতী হওয়া বড় ল্যাঠা। জ্বলে-পুড়ে মরতে হয়।

কথাটা শুনেই রাধা সোজা হয়ে বসল, জিজ্ঞাসা করল, কিসের কথা বলছ, চাঁপা।

—তোমার দশার কথাই বলছি বউদি, আর কিসের কথা বলব? ধিকি-ধিকি আগুনে জলে-পুড়ে মরছ। জলে ঝাঁপ দিলেও এ জ্বালার জুড়ন নাই। মর্মঘাতী আগুনে এ যে।

রাধা ঠিক বুঝতে পারছে না, এই কথা ব'লে চাঁপা অন্য কোনো ইঙ্গিত করছে কি না। তার ঠাকুরমার কথা তাকে শুনিয়ে দিচ্ছে কি না। সে কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে না বটে, কিন্তু না জানে কে? অনেক দিন আগের কথা ব'লে ও-কথা লোকে ভুলেই আছে যেন।

রাধা বলল, জলা-পোড়ার কথা না চাঁপা। কিন্তু এ জীবন রাখার ইচ্ছে আমার নেই। একদিন এসে দেখবি তোদের বউদি এই পালঙ্কে মরে পড়ে আছে।

হায়-হায় করে উঠল চম্পা, বলল, অমঙ্গলের কথা মুখে এনো না। ওতে অকল্যাণ হবে দাদাবাবুর।

যেন আপত্তি জানাল রাধা, বলল, আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ যে আমার কথায় তার অমঙ্গল হবে?

—কেন। সে তোমার স্বামী। এখন যতই রাগ-তাপ-অভিমান ক'রে থাকো, তেমন কোনো অঘটন ঘটলে সিঁথেয় পুরু ক'রে সিঁদুর মেখে ঐ চিতায় গিয়ে উঠতে তো হবেই। তোমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক বললে ছাড়ান পাবে সেদিন, না, কেউ তোমাকে রেহাই দেবে? এত টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি ঘরবাড়ি, এসবের লোভ কি নেই কারো?

দুই চোখ বড়-বড় করে আতঙ্কের সঙ্গে ঐ কথা শুনতে লাগল রাধা। শরীরের উপর অত অত্যাচার অত অনাচার—ও মানুষ বেশিদিন টিকতে পারে না। কিন্তু ঐ মানুষটির জীবনের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে এই জীবন? আগুনের কুণ্ডে গিয়ে নিজেকে ভস্ম করে ফেলতে হবে? না না, কিছুতেই সে পারবে না, কিছুতেই না—জীবন থাকতে না। তার আগেই বরং সে নিজেকে শেষ করে ফেলবে।

—ছি, বউদি। অত ভাবতে নেই। চিন্তা করে কি কূল পাবে?

প্রবোধ দিতে লাগল চাঁপা। কিন্তু ও-সান্ত্বনায় তার মনের খেদ চাপা পড়তে চায় না।

রাধা একটু বুঝি উত্তেজিতই হয়েছে, বলে উঠল, কুল আমি চাই নে রে, চাঁপা, কুল আমি চাই নে।

পালঙ্কের গায়ে ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল নাপিত-বউ, তার চোখে যেন আনন্দের আর অস্থিরতার ছাপ, ব্যাকুলভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, তবে চাও কি? কি চাও খুলে বলো।

—আমি চাই ডুবে মরতে।

একটু হাসল চম্পা, সে হাসিটার বুঝি মানে অন্য, রসিকতার ছল করে বলল, তবে দিই এনে দড়ি-কলসি?

চাঁপার চোখের দিকে চেয়ে রাধা বলল, ওই জিনিসই বুঝি একদিন চাইতে হবে তোর কাছে। পারবি তো দিতে?

রাধার হাঁটুর উপর হাত দিয়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে চাঁপা বলল, এই নাপিতানির উপর ভরসা রেখ, যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তুক একটা কথা —দাদাবাবুকে তোমার বুকে এনে তুলে দিতে যদি বল, সিটি পারব না। ও বাদে আর যা বলো।

কিন্তু ও বাদে আর কি বলবে রাধা, তার চিন্তায় তার কিছুই আসে না। অথচ তার চিন্তায় যেসব কথা ভিড় করে এসে দাঁড়ায় সে বড় দুরূহ আর দুর্বিষহ। এত ঐশ্বর্য আর এই আড়ম্বর দুঃসহ হয়েছে তার কাছে। তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে এই চক-মেলানো বাড়ির প্রাচীরের চাপে। ঐ যে অদূরেই নীলমণি হালদারের বাড়ি, ঐ যে ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে বাড়ির ছাদের কিনার, ও বাড়িও ঐশ্বর্যে ভরা— কলকাতার নামকরা বাবুদের মধ্যে উনি একজন। কিন্তু ওঁর অন্দরে নাকি অত জাঁক নেই; অত আড়ম্বর দিয়ে ভরা নয় ও বাড়ির উঠোন। ও বাড়ির বাবুর যা বাবুয়ানি সেসব কেবল তাঁর বন্ধুমহলে।

একদিন চাঁপা যেন বলেছিল? সত্যিই, এ বাড়ির না হয়ে ঐ বাড়ির বউ যদি সে হত। ও বাড়ির ছেলে নীলরত্ন নাকি ভদ্রমানুষ, ফষ্টি-নষ্টি ক'রে সে ঘুরে বেড়ায় না। বড়মানুষের ছেলে বলেই সে লোচ্চা হয়ে যায় নি, লেখাপড়ায় নাকি ভারি মন।

অমনি ভদ্র একটা স্বামী যদি পেত রাধা, হায়, তা হলে তার জীবন বুঝি এমন কষ্টকর হয়ে উঠত না। বই নিয়ে যে মানুষ মশগুল হতে জানে বউ নিয়ে মশগুল হতেও জানে সে। কিন্তু যাদের মাথায় বাইজীর বাই চাপে তাদের আর মনে পড়ে না নিজের বউএর কথা।

হঠাৎ যেন চমকে উঠল রাধা। নিজের ভাবনাতেই বিভোর ছিল, সেই চিন্তার কামড়েই বুঝি চেতনা এসে গেল তার।

এসব কী বিশ্রী কথা চিন্তা করছে রাধারানী। পরপুরুষকে স্বামীরূপে ভাবছে সে? এবং, আশ্চর্য, ভেবে যেন একটু শান্তিই পাচ্ছে, একটু সান্ত্বনাই পাচ্ছে যেন!

হঠাৎ সে ব'লে উঠল, আমার মৃত্যুই ঠিক রে, চাঁপা। এ ছাড়া আমার আর গতি নেই, আর কিছুতে শান্তি নেই।

—কিন্তু লটারির লাখ টাকা ফেলে রেখেই মরবে গো বউদি? টাকাটা সঙ্গে নেবে না?

—উঁহু। যাদের খুশি তারা সঙ্গে নিয়ে যাক ঐ টাকা। আমি গরিব-ঘরের মেয়ে, অত টাকা কখনো দেখিনি, টাকাও তাই চিনিনি, জীবনেও তাই সুখ ছিল।

—টাকায় মায়া নেই তোমার, জীবনে তুমি চাও সুখ? এ আর বেশি কথা কি। একটু চেষ্টা করলেই পাবে।

উঁচু খাটে পা ছড়িয়ে বসে ছিল রাধারানী। মইটুকু বেয়ে নেমে এল নীচে, জলচৌকির উপর বসে চাঁপার অনেক ঘনিষ্ঠ কাছে এল সে, বলল, কি চেষ্টা করা যায় বল্ তো চাঁপা।

রূপচরণের বাণিজ্যও চলেছে খুব ফলাও। লটারিতে লাখ টাকা পাওয়াটা তাঁর কাছে টাকার দিক থেকে তেমন বিশেষ কিছু না, কিন্তু সম্মানের দিক থেকে খুব বড়। পাঁচজনের মুখে চালাচালি হবে তাঁর নাম, আর ঐ টাউন-হলের ইতিহাসের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে থাকবে তাঁর নামটা— এইটেই তাঁর লাভ। নামে না হয় কী। সাহেব-মহলে এমন-একজন মানুষের নাম প্রচার হলে তাঁর বাণিজ্যেরও অনেক সুবিধে। কিন্তু বুড়ো হয়েছেন তিনি, তিনি আর কতদিন? তাঁর উত্তরাধিকারী তাঁর ঐ পুত্রটি সব ঐশ্বর্য ভোগদখল করবে। তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে যদি সহমরণে যেতে চান যাবেন, কোনো জোরজারি করবেন না রূপচরণ, তাঁর এই পুত্রটি যদি অনুগ্রহ ক'রে তাঁর এই বিমাতাকে ভরণ-পোষণ করে তো করবে, তা না হলে যা হবার হবে।

কিন্তু রাধার অবস্থা তাদের সংসারের এই বিমাতার মত নয়। সৎ বা অসৎ যাই বলো— রাধার এমন কোনো পুত্র নেই যে, তার ভরণপোষণে সে থাকবে। এমন-তেমন এ-সংসারে কিছু ঘটলে চারদিক থেকে তাদের

আত্মীয়স্বজন ভিড করে এসে তাকে সরিয়ে দেবারই চেষ্টা করবে। এবং চেষ্টা আরম্ভ করলে তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কে? কুমারীত্ব নিয়ে জীবন যার কেটে গেল, তাকে সেদিন ঘোষণা করা হবে— সতী।

শিউরে ওঠে যে গা। সতী হতে হলে এত-বড অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা দিয়েছে যে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রকারকে একবার বুঝি দেখতে ইচ্ছে করে রাধার।

রাধার জীবনের সুখ আর শান্তির জন্যে কি চেষ্টা যে করা যায় এতক্ষণ বসে বুঝি তাই ভাবছে চম্পা-নাপিতানি। কিন্তু ভাববার তার বুঝি বিশেষ কিছু নেই। সে ওই সোনার প্রতিমার মত মূর্তিটির দিকে চেয়ে থাকে। হতভাগা মনে হয় দাদাবাবুকে। আকাশের তারা ফেলে জোনাই-পোকা নিয়ে খেলা করে যে মানুষেরা তারা হতভাগা ছাড়া কি? এই বউদি যদি ঘরের বউ না হয়ে পরের বউ হত, তাহলে দাদাবাবুর মোসাহেবদের নিশ্চয় লেলিয়ে দিত ঐ দাদাবাবুই, যত টাকা লাগে তাকে চাইই ব'লে।

গরিটির নিরুর পিছনে যেমন লেগে আছে ফরাসডাঙার ঐ বাবুরা, নিরু মানুষটা একটু আস্কারা দিলেই এতদিনে ওদের মনের ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু চিতা-ফেরতা মানুষ ওই নিরুদি, মনে ওর বল কম না, সাহসও কম না।

কিন্তু তার এই বউদিটির মনের বল কতখানি, নাপিত-বউ তাই বুঝি পরীক্ষা করে চলেছে দিনেব পর দিন। কোনো তাডা নেই তার, কোনো তাগাদাও নেই। ধীরে-ধীরে এই পরীক্ষা যদি আরো অনেকদিন ধরে চলে তাতেও বুঝি আপত্তি নেই চম্পা-নাপিতানির।

রাধা বলল, ঐ শাস্ত্রকারদের আমি দেখতে চাই, চাঁপা। শাস্ত্র লেখার সময় তারা আমাদের দিকে তাকায় নি। অন্দরমহল না দেখে বাহিরমহলের পরামর্শেই ওই শাস্ত্র লেখা হয়েছে নিশ্চয়।

—ওরা-যে সব পুরুষ গো, পুরুষ। মেয়েমানুষ যদি লিখত তাহলে ঐ পুরুষগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করার বিধানই দিত নিশ্চয়।

তাই কি? তাহলে ঐ যে সেদিন কানাগিন্নি কার কথা বলছিল, খুব পণ্ডিত, কাশীতে নাকি বড়-বড পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করছে। সে তো মেয়েমানুষ, সে কেন এগিয়ে আসে না এখন।

কি-যেন নাম, ভুলে গেছে রাধা। কিন্তু এমন-একজন মেয়ে-পণ্ডিত যে আছে, এই যেন তার ভরসা। শাস্ত্রকে উল্টিয়ে দিয়ে এবার সবাই এসে দক্ষ

করুক ওদের— ওই যারা এতদিন পুড়িয়ে-পুড়িয়ে মেরেছে হাজার-হাজার মেয়েকে।

রূপনারায়ণের উপর শুধু ঘৃণা না, রাগও এসে গেছে রাধার। স্বামী বলে তাকে স্বীকার করতেও এখন তার বুঝি আপত্তি।

চাঁপা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, বলল, এই রকমের ঘেন্নায় কত বউ ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাকুল কৌতূহলের সঙ্গে রাধা জিজ্ঞাসা করল, এমনও হয়েছে নাকি?

—একটা না বউদি, একটা না। শত শত।

—পালিয়ে তারা গেল কোথায়?

কোথায় তারা গেল, সে কথা এত তাড়াতাড়ি বলতে বুঝি বাধল চাঁপার। বলল, ওসব কথা জিজ্ঞাসা কোরো না, বউদি। ঘরের বউয়ের এসব কথা জানতে নেই।

চাঁপার হাত চেপে ধরল রাধা, বলল, জানতে আছে। জানলে ক্ষতি কি? কাউকে বলব না আমি।

রাধার কানে-কানে কি-যেন বলল চম্পা-নাপিতানি।

শিউরে উঠে চাঁপার হাত ছেড়ে দিয়ে রাধারানী অঝোরে কাঁদতে লাগল। সে কান্না কিছুতে থামে না। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে এসে বুকের কাপড়ে পড়তে লাগল। মসৃণ মসলিন গেল ভিজে। অঙ্গের সোনালি বর্ণ আরো স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠল।

চাঁপাও স্ত্রীলোক। কিন্তু তাহলে হবে কি, এই দৃশ্য দেখে তার শরীরের রক্তও বুঝি ফুটে উঠেছে। রাধার আঁচলের প্রান্ত দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে চাঁপা বলল, মেয়েলোক হয়ে বড় ভুল করেছি বউদি। পুরুষমানুষ হলে তোমাকে বুকে চেপে সোহাগ করতাম। তোমার ঐ অঙ্গের সোনা মাখতাম আমার সর্বাঙ্গে। তোমার বুকের ননীর প্রলেপ দিয়ে জুড়িয়ে নিতাম আমার অঙ্গের সব জ্বালা।

অস্ফুট গলায় রাধা ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করল, তোর জীবনেও জ্বালা আছে নাকি রে চাঁপা?

—আছে বই-কি বউদি, আছে। জ্বালা কি একরকম? সুখের জ্বালা দুখের জ্বালা, কত রকমের জ্বালা আছে সংসারে। কিন্তু তোমার যে জ্বালা, এ জ্বালা আমার নেই।

ভবসুন্দরী ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েই চলে যাচ্ছিল, চাঁপা ডাকল তাকে, ও ভব ভব।

—কি গো নাপিতানি?

—অত ব্যস্তসমস্ত হয়ে চললে কোথায়?

ভবসুন্দরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কি নরুন আর আলতা নিয়ে কাজ যে বউদির পা জড়িয়ে বসে থাকলেই চলবে। ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে, সারতে হবে তো আমাকে একলাকেই।

—কেন, হৃদয় পদ্মা সুভাষিণী—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভবসুন্দরী বলল, সুভাষিণী তো সুভাষিণীই, মুখে মধুর-মধুর বচন ছাড়া একটা খড় ভেঙে দুখান করা নাই। আর, হৃদয় পদ্মা— নীচে গিয়ে দেখ গিয়ে ওদের কোঁদল।

ভবসুন্দরী আর দাঁড়াল না। গিন্নিমার নাকি মাথা ধরেছে, তাই আর সবুর করতে পারল না, প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

চাঁপা বলল, ও হকিম, না, কবরেজ? গিন্নিমার চিকিৎসা করতে দৌড়লো যে বড়!

রাধা একটু ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, শুনলাম যখন, যাই, দেখে আসি মাকে। আমাকে তো তিনি কোনো খবরই দেবেন না।

—শাশুড়ী হলে দিত গো, শাশুডী হলে দিত। ও তো শাশুড়ী নয় তোমার, ও তোমার শ্বশুরের বউ। দ্বিতীয় পক্ষের দেমাক একটু বেশিই হয়। চোখে ধুলো উড়ে পড়লে চোখ গেল ব'লে দাপায়।

রাধা তবু তার শাশুডীকে দেখার জন্যে দরজার দিকে অগ্রসর হল, অমনি, এ কে? কানাগিন্নি?

—এ কি, এতদিন পরে? এতদিন দেখি নি যে?

কানা চোখটার উপরের ভুরু কাঁপিয়ে কানাগিন্নি বললেন, প্রাণকিষ্ট লাহার বাড়িতে মস্ত ভোজ গেল, লালমোহন পালের বাড়িতে তাদের নাতির অন্নপ্রাশন গেল। তাদের গিন্নিরা ছাড়ে না— ওখানেই আটক পড়েছিলাম ক'দিন। কিন্তু মন, বাছা, এখানেই প'ড়ে। রোজই ভাবি ক'নে-বউকে দেখি নি কতদিন। তার উপর শুনলাম, লাখ টাকা ঘরে আসেছে। আহা, আসবে না কেন। ঘরে এমন সোনার লক্ষ্মী যার, তার ঘরে টাকা আসবে না তো কি আসবে—

চাপা গলায় কার যেন নাম করলেন কানাগিন্নি।

বেলা বাড়ছে ধীরে-ধীরে। নীচ থেকে দাসীদের কলরব ভেসে আসছে উপর-তলায়। এরও উপর-তলায় এ বাড়ির গিন্নিমা হয়তো মাথার যন্ত্রণায় এখন কাতর। ভবসুন্দরী তাঁর পরিচর্যা করছে হয়তো।

কানাগিন্নি ঐ খবর শুনে হাসলেন, বললেন, ওরকম হয়। বুড়ো মিনসের জোয়ান বউ হলে তার মাথা ধরবে না তো কি ধরবে বল? মাথার কি দোষ। ফিটের ব্যামোও আছে। অমন ফিট কাঁচাবয়সে আমাদেরও হয়েছে, কিন্তু যে ওষুধে সারে, গোপন ক'রে কি করব বাছা, সেই দাওয়াই খেয়েছি, সেরেও গেছে।

রাধা কিছু বুঝতে না পেরে কানাগিন্নির মুখের দিকে চেয়ে বলল, যদি জানোই ওষুধ তবে একটু দিয়ে এসো-না। কেন বেচারা অযথা কষ্ট পাবেন।

রাধার কথা শুনে চাঁপা ও কানাগিন্নি দুজন দুজনের গায়ে ঢলাঢলি করে হেসে খুন হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কেন তাদের এত হাসি আর এত ঢলাঢলি কিছুই বুঝতে পারল না রাধা।

জলচৌকির উপর বসে সে ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল, আর এই হাসির কারণ জানার জন্যে তাদের বার-বার ডাকতে লাগল, ও চাঁপা, ও কানাগিন্নি।

হাসি থামিয়ে দুজন এসে বসল রাধার পায়ের কাছে। শ্বেতপাথরের মেঝের উপর কানাগিন্নির পায়ের ধুলোর ছাপ পড়েছে আবছা ভাবে।

আঁচল দিয়ে সেই ধুলো মুছে দিয়ে ভালো হয়ে বসে কানাগিন্নি বলল, বড়-বড় ঘরের হাঁড়িহেঁশেলের কথা নিয়ে কাজ কি বাপু আমাদের। আমরা দাসীবাঁদী-জাতের মানুষ। এঁটো খেয়ে-খেয়ে বেড়াই। চুপি-চুপি পায়ে রাতদুপুরে এসে কে কার মুখ এঁটো করে দিয়ে যাচ্ছে, অত খবরে কাজ কি আমাদের।

—কি, কি কথা হল, বুঝতে পারছি নে। একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল রাধা।

—বুঝে দরকার নেই বাছা। তুমি সতীসাধ্বী বউ। ওসব কথা জানলে মনে পাপ ঢুকবে।

কিন্তু আধা জেনে আধা না জেনে থাকলে আধ-কপালি মাথা ধরে যায় যে তারই দাওয়াই দাবি করতে থাকে রাধা। কিন্তু বাড়ির বউয়ের

কাছে তার শাশুড়ীর নামে কেচ্ছা করতে বুঝি মুখে কথা আটকে যায় কানাগিন্নিরও।

মজা দেখে মিটিমিটি হাসে চাঁপা-নাপিতানি। যে কথা এতদিন সে ফাঁশ করেনি আজ বুঝি কানাগিন্নির বেফাঁশ কথায় তা জানা হয়ে যাবে রাধারানীর।

শেষ পর্যন্ত তাই হল। যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসল রাধা। তার আধ-কপালি সেরে গেল, পুরো-কপালি মাথা তার ধরল না, কিন্তু মাথা যেন ঘুরতে লাগল তার। মনে হল, এসব কথা না জানাই বুঝি ভালো ছিল। মন কেমন যেন তিক্ত হয়ে গেল, নিজের উপর থেকেও ভরসা বুঝি চলে যেতে লাগল তার।

কানাগিন্নি কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, দোষ দেব কাকে বল? দোষ তো পুরুষ-ব্যাটাদের। বিয়ে করা কেন? মাগ সামলাতে পারবি নে বেঁচে থেকেও, মরে গিয়ে তবে বলবি— চিতায় এসো, আমার পাশে শোও। কেন, জ্যান্তে শোয়াবার মুরোদ নেই, ম'রে গিয়ে তখন বুঝি সাধ জাগে মরদ হতে?

কর্তাবাবু বুড়ো হয়েছেন, তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙেছে, আব বেশি দিন তিনি টিকবেন না বলে ঘোষণা করল কানাগিন্নি। তখন গিন্নিমাও থাকবেন না এখানে, ছাঁদাবাঁধা তাঁর হয়েই গেছে, সব বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে তিনি উঠবেন গিয়ে বাপের বাড়ি। হীরে-চুনি-পান্না-মোহর সব তাঁর মজুত। ভবসুন্দরী নাকি সব জানে।

তাই, কানাগিন্নি গোপনে পরামর্শ দিল রাধাকে, বলল, ভবকে আস্কারা দিয়ো না ক'নে-বউ। ভবই তোমার শাশুড়ীর ভরসা।

চাঁপা ফোড়ন কাটল, বলল, মাথা ধরার খবর পেয়েই ওর তাই মাথাব্যথা। ছুটে গেছে উপরে।

কানাগিন্নি তাঁর জ্যান্ত চোখটা একটু ছোট ক'রে চাঁপার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দাওয়াই নিয়ে গেছে নাকি সঙ্গে?

চাঁপা বলল, বিশু-ডাকাত নেই, এখন ভব-ডাকাত আছে। তবু, দিনদুপুরে কি ডাকাতি হয় কানাগিন্নি? সে-ডাকাতি রাতের আঁধারে।

—গিন্নিমা তার হাতের মুঠোয়, তাই ওর অত দাপট, অত দেমাক। আরে, তুইও দাসী, বাড়ির আর পাঁচজন দাসীও দাসী। কিন্তু সবার উপরে কী তেজ, কী তোম্বি।

—জানো না? চাঁপা বলল, শুনতে পাই, লবঙ্গর ফুল ছাড়াতে নাকি আজকাল হাতে ফোস্কা উঠছে ওর।

—তা আর উঠবে না? কুটনির সর্বাঙ্গে ফোস্কা উঠবে একদিন।

কানাগিন্নির এই মন্তব্যটি শুনে চাঁপার মুখের ভাব এক মুহূর্তের জন্যে বদলে গেল। ভালো হয়ে ব'সে ডিবে খুলে মুখে একটা পান ফেলে দিয়ে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে সেটা মুখের মধ্যে চালান করে দিল।

শুধু এই একটি বাড়ির কথা না। অনেক বাড়ির হাঁড়ি-হেঁশেলের গল্প ফেঁদে বসল কানাগিন্নি। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ লাহার ও লালমোহন পালের বাড়ির কথা আজ আর কিছু বলল না। হয়তো সম্প্রতি সে-বাড়ির নিমক খেয়ে এসেছে বলেই। দু-দিন বাদে মুখ পানসে হয়ে উঠলেই হয়তো তাদের কথাও উঠবে।

—কি জানো ক'নে-বউ? কানাগিন্নি বলল, মরদের মত মরদ দরকার একজন। যে এসে এইসব বুজরুকি ধুইয়ে দেবে। পরশুও ফরেসডাঙার ঘাটে এক বুড়োর চিতেয় সাতজন মাগীকে পুড়ে মরতে হয়েছে। সে মিনসের মেগদার কি, না, সে কোন্ কুঠির নাকি মুৎসুদ্দি।

চোখ-দুটি বড়-বড় করে কানাগিন্নির চোখের দিকে তাকাল রাধা, ওই একটি চোখেই জ্বলছে বুঝি একটি উত্তপ্ত স্ফুলিঙ্গ।

নিজের জীবনটা কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে কানাগিন্নির। হেসে-খেলে-নেচে-গেয়ে জীবনটা কেটে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেই জীবনের নীচে আগ্নেয়গিরি বুঝি জ্বলছেই অহর্নিশি; মাঝে-মাঝে তার থেকে তাই এই উদ্‌গার।

এমন ভিখিরির জীবন নিয়ে জন্মায় নি সে, কিন্তু যে-বান্দার একটা উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালির জন্যে তার জীবন এমন শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলা-বিহীন হয়ে গেল, তার কথা মনে পড়ে তার। বেঁচে থেকেও একদিন একটা খবর সে নেয় নি, মরে গিয়েও একটা খবর দিতে পারে নি; এতখানি যাদের দায়িত্বের জ্ঞান তাদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ। জীয়ন্ত তাদের পেলে বুঝি তাদের সে জীয়ন্ত গোর দেয়। কিন্তু—

তার কানা চোখটা দিয়েও জল গড়াতে লাগল; এত হাসি-খুশি মানুষ সে, তার সমস্ত হাসি গেছে উহ্য হয়ে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে কানাগিন্নি বলল, আমি এখন একটা আপদ। সকলে ঘেন্না করে আমাকে। ভাবে বুঝি, বুড়ো মাগী এত ঠাটও

জানে! কিন্তু কী করি, শুধু নিশ্বাস নিয়ে আর এঁটো কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচলেই তো মানুষের মত বাঁচা হয় না, বিড়াল-কুকুরেও তো অমনি ভাবে বাঁচে।

চাঁপা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। কানাগিন্নির কান্না কখনো সে দেখেনি, এ মানুষটা কাঁদতে জানে ব'লে জানতও না সে। কতদিন ধরে তো দেখছে একে।

রাধাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। পাক খেয়ে-খেয়ে সেই নাচ ও সেই সঙ্গে গান মনে পড়ছে তার। ওই মানুষের মনের মধ্যেও এত দুঃখ আছে, এত কান্না আছে— কে জানত আগে, কে তা ধারণা করেছে?

—আমি নষ্ট মেয়েমানুষ। কিন্তু কেন নষ্ট হলাম, কারা নষ্ট করল আমাকে? যারা আমাকে ঘেন্না করে তাদের শুধাতে ইচ্ছে করে এই কথা। আরও জানতে ইচ্ছে করে, তারা কোন্ সৎ তারা কোন্ সতী।

আবার চোখের কোণ পরিষ্কার করল কানাগিন্নি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার পর বলল, আমাদের রক্ষা করে এমন কেউ নেই রে ক'নে-বউ। পুরুষদের বিশ্বাস করি নে, কোন্ শাস্ত্রে আছে এসব বিধান, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় ওই হটী বিদ্যেলঙ্কা'র কাছে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কি নাম বললে?

—হটী বিদ্যেলঙ্কা।

মনে-মনে নামটা আওড়াল রাধা। না, আর ভুল হবে না।

—কিন্তু তাকে পাচ্ছি কোথায়। সে-যে এখন কাশীতে। হতাশার স্বরে বলল কানাগিন্নি।

না, তাকে চায় না রাধা। শুধু একটা নাম জেনে রাখা মাত্র। অসহায় জীবনে তবু যে ভরসা একজন আছে, এই চিন্তাতেই বুঝি অনেক সান্ত্বনা।

কিন্তু অযথা সান্ত্বনা পেয়ে লাভ কি। এই বাংলাদেশের বর্ধমান জিলার একটি বিধবা মেয়ে নিজের চেষ্টায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এমন পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল যে, শাস্ত্র-আলোচনায় বড়-বড় পুরুষ-পণ্ডিতদেরও হটিয়ে দিয়েছে, কাশীতে গিয়ে চতুষ্পাঠী খুলেছে। এই খবরটুকুই জানে কানাগিন্নি। নীলমণি হালদারের বাড়িতে যাতায়াত আছে তার, তাঁর ছেলে নীলরত্ন লেখাপড়া নিয়ে থাকে, সেখানেই বুঝি কানাগিন্নি শুনেছে হটী বিদ্যালঙ্কারের কথা। কিন্তু শেষ খবরটি এখনো বুঝি শোনে নি কানাগিন্নি, মাস-কয়েক হল হটী মারা গিয়েছেন কাশীতে।

রাধারও তাই জানা হল না খবরটা, এইজন্যে কেবল ঐ নামটা নিয়ে সে একটা অলীক ভরসায় ভর করে রইল।

কানাগিন্নি আর-একটা কামনা জানিয়েছে, সে কথাটা হয়তো খেয়াল করে নি রাধা। মরদের মত একটা মরদের কথা বলছিল কানাগিন্নি। এ কথা ভালো করে তার কানে গেলে নিশ্চয় সে প্রার্থনা করত তেমনি একটা মরদের জন্যে। শুধু তার নিজের জন্যে না, তার মত আরো কত অসহায় রাধা কত অন্তঃপুরে বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, কত পাষাণপুরীর মধ্যে কতজন বন্দী হয়ে আছে তার কি ঠিক আছে কোনো ?

চাঁপা এতক্ষণ বলে নি কথাটা, এবার বলল, লক্ষ্মী বউ তুমি। লাখ টাকা লটারি পেয়ে গেল বাবু তোমারি বরাতের জোরে।

চাঁপা শুনেছে এই শুভসংবাদ। এর জন্যে বহির্বাটীতে উৎসবের ধুম যে পড়ে গেছে এ কথাও কানে এসেছে তার। লক্ষ্মী আর সরস্বতী কাল বলেছে তাকে খবরটা।

কানাগিন্নির মুখের দিকে চেয়ে চাঁপা বলল, খুশিতে ডগমগ হয়েছেন দাদাবাবু। মদের বন্যে বওয়াচ্ছেন। কিন্তু এ-টাকা কার জানো ?

কানাগিন্নি জানে না, জিজ্ঞাসা করল, কার ?

—গিন্নিমার। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস কর ভবসুন্দরীকে।

—আমার জিজ্ঞাসা করার দরকার কি বাপু। কত লাখ-লাখ কোটি কোটি টাকা চালাচালি হচ্ছে সংসারে, তাতে আমাদের মত ভিখিরিদের কী লাভ। হীরে-চুনি-পান্নার জোয়ার বয়ে চলেছে কলকাতায়, কিন্তু গঙ্গায় যে-জল সেই-জল ; তার জোয়ার-ভাটায় ঝিলিক বাড়ে নি।

কিন্তু চাঁপার বুঝি গায়ে লেগেছে, সব টাকা গিন্নিমা একা নেবে কেন ? অর্ধেকটা কি পাবে না তার বউদি ?

রাধা বলল, চুপ। টাকা আমি চাই নে রে।

টাকা চায় না রাধারানী। তার কামনা অন্য। নারীর জীবনের চরম কামনা যা হয়ে থাকে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। সেই কামনা বুকে লালন করে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে চলেছে সে। এ পাষাণপুরী— ঐশ্বর্যের এ এক খাজাঞ্চিখানা হয়ে আছে। এখানে লাখ টাকাই বা কি, কোটি টাকাই বা কি। ঘরে-ঘরে সিক্কা-টাকায় রুপালি আওয়াজ আর মোহরের সোনালি শব্দ বেজে চলেছে রাত্রিদিন। এক লাখ টাকায় কি যায়-আসে তার শ্বশুরের ?

তার বিবাহের উৎসবে কত লাখ টাকা গঁড়িয়ে গেছে চুঁচুড়ার পথে, কত লাখ ভেসে গেছে হুগলী-নদীর ঐ জলে— তার কি হিসাব আছে কোনো ?

কে কত টাকা করতে পেরেছে নদীর দুই পারে চলেছে বুঝি তারই পাল্লা। হায়, সে-রেষারেষিতে কে জিতল কে হারল খোঁজ নেওয়ার আগে সেইসব মানুষদের অন্দরে-অন্দরে উঁকি দিয়ে একবার বুঝি কারো দেখার ইচ্ছে হয় না— কাদের কতটা সর্বনাশ হয়ে গেল।

দিনের পর দিন কাটে চুঁচুড়ার আকাশে। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি নিয়মিত বেজে চলেছে নিয়ত। ধনীদের ধন স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে ক্রমশ।

প্রাণকৃষ্ণ লাহা, লালমোহন পাল, নীলমণি হালদার, মনোতোষ কাঞ্জিলাল, ভবতোষ মিত্র— কত নাম আর মুখস্থ করবে রাধা— এই চুঁচুড়ার নামকরা ধনী এঁরা। এঁদের সকলের বাড়িতেই কি অবিকল এই রকম হাহাকার বাজছে ? এত বড় নামজাদা বাবু ঐ নীলমণি হালদার, শুধু এই চুঁচুড়াতেই না, কলকাতার ধনী-মহলেও তাঁর খুব কদর— সেখানকার নামজাদা বাবুদের নামের সঙ্গে তাঁর নামও নাকি যুক্ত, কেবল বুঝি তাঁর বাড়িতে এ হাহাকার বাজছে না। তাঁর ছেলে নাকি আলাদা জাতের মানুষ— বাবুয়ানির দিকে না ঝুঁকে সে নাকি ঝুঁকেছে লেখাপড়ার দিকে। বিয়েও হয়েছে তার, রাধার বিয়ের কয়েক মাস আগে। কানাগিন্নি বলে, সে নাকি বই নিয়ে যেমন মত্ত, বউ নিয়েও অনেকটা তেমনি, বাইএর বাই নাকি নাই তার।

রূপনারায়ণ— মনে-মনে স্বামীর নাম করলে হয়তো দোষ হয় না, মুখে তো উচ্চারণ করছে না রাধা— রূপনারায়ণ আর ওই নীলরত্ন নাকি একবয়সী, এবং দুজন নাকি খুব বন্ধু। এমন বন্ধুত্বের দাম কি, রূপনারায়ণকে যদি ভালো পথে টেনে নিতে না-ই পারল, তবে বন্ধু হওয়া কেন ?

নীলরত্নের বউএর কথা ভেবে হিংসে হয় রাধার। হিংসে হয়, তবু আলাপ করার আগ্রহও হয় খুব। জানতে ইচ্ছে করে, তার স্বামী তাকে কি বলে, কেমন ক'রে বলে। উত্তরে ঐ বউটিই বা কেমন করে হাসে, কেমন করে মুখ ঢাকে মেকি লজ্জায়।

কিন্তু কি হবে ছাই পরের সুখের চিন্তা ক'রে নিজের দুঃখ চতুর্গুণ করায় ? পাঁচটা বছর অতীত হয়ে গিয়েছে তার বিয়ের পর, পাঁচটা বসন্তের কোকিল পঞ্চমস্বরে কুহুতান তুলেছে বনে-বনান্তরে। চুঁচুড়ার গাছে-গাছে তাদের কুহুরব ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যে হয়তো মোট পাঁচ বারই চোখের দেখা দিয়ে গিয়েছে রূপনারায়ণ। অন্দরমহলে তার আসক্তি নেই। এ-মহল নিতান্তই মেয়েমহল, এখানে পুরুষের পদার্পণ ঘটবে কেন। পুরুষের আস্তানা বাহিরমহলে, সুতরাং সেইখানেই নিরিবিলি কেটে চলেছে তার জীবন।

ফরাসগঞ্জের কথা মনে হয় তার। আবার কি ফিরে পাওয়া যায় না সেই জীবন? বিয়ের পর একবারও সে যেতে পারে নি। এ বাড়ির নাকি নিয়ম নেই, বউকে বাপের বাড়িতে যেতে দেওয়ার রীতি নেই এদের। রাধা বোঝে, সমানে-সমানে যদি এই বাড়ির ছেলের বিয়ে হত তাহলে নিয়মটা তৈরিই হত না, পালন করা তো দূরের কথা। নেহাত নগণ্য এক দীনদরিদ্রের ঘর থেকে কৃপা করে তাকে তুলে আনা হয়েছে বলেই এই নিয়মপালনের জন্যে এদের এত কড়াকড়ি।

বাবা এসে দেখা করে গিয়েছেন বার-কয়েক। অল্পদিনের মধ্যেই কেমন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন বাবা, দাড়িগোঁফে কেমন পাক ধরে গিয়েছে। বাবা এলে ভালো লাগে রাধার, কিন্তু সেই সঙ্গে বড় বিশ্রীও লাগে। বাবাকে আদরযত্ন করতে এদের হেলাফেলা লক্ষ্য করে সে। অমন দীন-হীন মানুষকে প্রাণ ঢেলে খাতির করতে এদের যেন বাধে কোথায়।

মার সঙ্গে আর বুঝি দেখা হবে না এ-জীবনে। মুরলী আর নবীন এখন দেখতে কত বড় হয়েছে? গাঙ্গুলিবাড়ির পিসিমা বেঁচে আছেন? পদ্ম-গয়লানিরা আসে তাদের বাড়িতে? আর, আর তাদের সেই কদমমাসি—তার কথা নিশ্চয় এর মধ্যে ভুলে গেছে তাদের ফরাসগঞ্জ?

দু-চোখ ছলছল করে ওঠে রাধার। মা না, বাবা না, ভাই না, বন্ধু না—কাউকে চায় না সে। সে চায় এই পাষাণপুরী থেকে মুক্তি। কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে রাধার—এমন কোনো জায়গা কি নেই যেখানে গেলে কেউ খোঁজ পাবে না কেউ খবর পাবে না, নিজেকে সম্পূর্ণ গোপনে রেখে সে নিজের জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে?

মাথার উপরে দুলছে টানা-পাখা। অদৃশ্য নেপথ্যে বসে দড়ি ধরে টানছে কোন্ এক অজানা পুরুষ। অমনি অজানা কোনো পুরুষ তাদের সকলের মাথার উপর বসে হয়তো টেনে চলেছেন তাদের জীবনের দড়ি, পুতুলনাচের মত নেচে-নেচে মরছে তারা। কে জানে, এই নৃত্যের শেষ কোথায়।

লক্ষ্মী পাখা হাতে নিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে রাধার মুখের দিকে অনেকক্ষণ

হল। রাধার মুখের ভাব লক্ষ্য করছে সে, কিন্তু বুঝতে পারছেনা কেন ঐ মুখে এই রকম ছায়া নেমে আসছে। ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, শরীর ভালো আছে তো বউদি ?

মুখ তুলল না রাধা, মাথা নীচু করে বসে থেকেই বলল, শরীর ভালোই আছে রে।

আর কোনো প্রশ্ন না করে জোরে-জোরে হাওয়া করতে লাগল লক্ষ্মী। ননীর মত নরম এই শরীরে গরম কি সয় কখনো? দাসীবাঁদির শরীর তাদের, তাদেরই কেমন আনচান করে ওঠে গা।

কান সজাগ করে ঘাড় একটু হেলিয়ে রাধা জিজ্ঞেস করল, কে আসছে রে? কার যেন পায়ের শব্দ।

লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় উঁকি দিয়ে ফিরে এসে বলল, ভব, ভবসুন্দরী। উপরে গিন্নিমার কাছে গেল।

— ও অত গিন্নিমার কাছে কেন যায় রে?

ফিক করে হেসে লক্ষ্মী বলল, কে জানে বউদি!

লক্ষ্মীর হাসির ধরণ দেখে রাধার মনে হল কানাগিন্নির সেদিনের কথা বুঝি ভুল না।

কিন্তু ভুল হলেই বুঝি ভালো হত। নিজের শাশুড়ী না হোক, শ্বশুরের স্ত্রী তো, তার সম্বন্ধে এইসব কদর্য ও কদাকার কথা শুনে রাধার শরীর শিউরে ওঠে। সেই শিহরনের সঙ্গে অন্য ধরণের আর-একটি শিহরনও খেলে যায় তার অঙ্গের উপর দিয়ে। কেঁপে ওঠে রাধা, ঘাম দেখা দেয় গায়ে।

এ-বাড়ির এই যদি রীতি, তাহলে সে-ই বা সে-রীতি পালন না করে কেন। ভবসুন্দরীকে সে না পাক, তার ভরসা তবু আছে, তার আছে চম্পা-নাপিতানি।

অনেক আশ্বাস সেদিন তাকে দিয়েছে চাঁপা। কান পেতেই শুনেছে রাধা, কিন্তু যেন কান করে নি এই রকম ভঙ্গিতে সে বসে ছিল। প্রতিহিংসা নিতে ইচ্ছে করে ঐ মানুষটার উপর, ঐ রূপনারায়ণের উপর; আর প্রতিহিংসা নিতে ইচ্ছে করে এই বাড়ির এই ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের উপর। নিজের মুখে চুনকালি মেখে সবার মুখে কলঙ্ক লেপে দিতে ইচ্ছে জাগে রাধারানীর।

নীচ থেকে দাসীদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে, সেই শব্দে রাধা হঠাৎ বুঝি উৎফুল্ল হয়ে উঠল একটু।

লক্ষ্মী আস্তে-আস্তে বলল, চাঁপা এসেছে।

চম্‌কে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাল রাধা। তাঁর মনের ভাবনাগুলো তার অজ্ঞাতেই শব্দ করে উঠেছিল নাকি? লক্ষ্মীর কানেও পৌঁছে গেছে নাকি সেই ভাবনাগুলো? সংকোচে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। ছি ছি, মানুষের উপর রাগ করে মানুষ হঠাৎ কত জঘন্য ভাবনাই ভেবে বসতে পারে তার ঠিক নেই।

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রাধা দেখল, পায়ের আলতার রং বুঝি সিঁথির সিঁদুরের মতই টকটকে রাঙা আছে, তবু আসুক নাপিতানি, মেজে দিক তার পা, আর, যদি পারে ঘষে দিয়ে মুছে দিয়ে যাক তার মনের ময়লাও।

ঝুমঝুম শব্দে পায়ের মল বাজিয়ে কোমর দোলাতে-দোলাতে ঘরে এসে ঢুকল চাঁপা, পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি হাসতে-হাসতে বলল, ওগো বউদি, ওগো বউদি, ওগো বউদি। বড সুখের সংবাদ গো, বড় সুখের সংবাদ।

কি এমন সুখ, কিসের এত আহ্লাদ, এত পুলকই-বা কিসের— জানার কৌতূহল নিয়ে রাধা ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে তাকাল চাঁপার মুখের দিকে।

চাঁপা বসল। বউদির পায়ের কাছে বসল। চন্দ্রহারটার উপরেই বুঝি চেপে বসে পড়েছিল, একটু উঁচু হয়ে পিছন থেকে সেটা কোমরের দিকে একটু তুলে দিয়ে বলল, জ্বালা! এও আবার কামড় দিচ্ছে গো!

রাধা জিজ্ঞেস করল, আহ্লাদে আজ বড়ই যে আটখানা দেখছি। ব্যাপারটা কি, চাঁপা।

ডিবে খুলে একটা পান মুখে ফেলল চাঁপা, একটু চিবিয়ে রস গিলে বলল, ভামিনীর ছেলে হবে।

— ভামিনী কে?

— ভামিনীকে চেন না? তোমাদেরই পড়শি গো। ওই যে তোমাদের বাড়ির পশ্চিমে প্রাচীরের ওপারে ছোট কোঠাবাড়িটা? উঠোনে নিমগাছ?

রাধা চুপ করে বসে আছে দেখে চাঁপা গালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলল, নিমগাছটাও চোখে পড়ে নি? কী চোখ গো? চুঁচড়োর এই বাড়ির দেয়ালগুলো সব দেখেছ তো?

রাধা বলল, কি হবে ওসব দেখে? তা, ছেলে হবে ভামিনীর, কিন্তু তোমার এত আহ্লাদ কেন?

চাঁপা তার মস্ত খোঁপা-সমেত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আহ্লাদ হবে না? ওর কখনো ছেলে হবে, এ কি কেউ ভেবেছিল, না, ও নিজেই ভেবেছিল?

— কেন, না হবার কি আছে চাঁপা?

চাঁপা বলে উঠল, ন্যাকা সেজো না বউদি। কিছুই বুঝি বোঝো না? তোমার তবে ছেলে হচ্ছে না কেন শুনি?

চাঁপার কথা শুনে শিউরে উঠল রাধার সারা গা। পুত্রকামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠল না সে, কিন্তু স্বামীকামনায় কাতর হয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ। জিজ্ঞেস করল, ভামিনীরও বুঝি ঐ দশা?

—দশা সবারই সমান, বউদি। তোমারা আছ রানীর হালে, পড়শির খবরও তাই রাখ না। কিন্তু ভামিনী তোমার কথা বলে, কত চোখের জল ফেলে।

—কি বলে রে?

অন্তত একজন প্রাণীও যে তার কথা বলে আর তার কথা ভাবে এ খবরটা সান্ত্বনার মত মনে হল তার। তাই সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কি বলে ও?

অনেক কথা বলে যায় চাঁপা। তার বউদি তবু বড মানুষেব বউ, স্বামীর অভাব তবু হয়তো সে ভুলে থাকতে পারে টাকার মোহরের দাসীর বাঁদীর আর এই নাপিতানির সঙ্গে এক হয়ে থেকে থেকে। কিন্তু ভামিনীর মত মানুষের দশা একবার ভাবো। একটা ছোট কোঠাবাড়ি তার সম্পত্তি, আর সম্পদ হচ্ছে তার স্বামী। হুগলীর চিনি-কলে কেরানিগিরি করে তার স্বামী, কত আর রুজি তার। কিন্তু হলে হবে কি, মোসাহেবি করে বেডায় ধনীবাবুদের নন্দনদের। ঘরের দাওয়ায় পা-ই পডে না। কত পুজো দিয়েছে ভামিনী, কত সুবচনীর ব্রত করেছে, কিন্তু স্বামীকে তবু পায় নি। কত কেঁদেছে, কত চোখের জল ফেলেছে, সব অযথা। কিন্তু আজ সে সুখী, আজ সে খুশি। তার সঙ্গে এই মাত্র কথা বলে এল চাঁপা। সেখানে একটু বসতে হল বলেই তো আজ এখানে আসতে একটু বেলা হয়ে গেল।

—দাও, পা দাও।

রাধা স্তব্ধ হয়ে বসে ঐ কথাগুলি যেন শুনছিল না, গিলছিল। ধীরে-ধীরে সে দুটি পা এগিয়ে দিল।

চরণপদ্ম-দুটো নরম পা-দুটি জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে। হাঁটুর কাছের কাপড টেনে রাধা পা-দুটো নগ্ন করে দিল, চরণপদ্ম-দুটো সন্তর্পণে উপরের দিকে তুলে পায়ের গোছার সঙ্গে এঁটে নিয়ে পদচর্চা আরম্ভ করল চাঁপা।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কি বলছে এখন ভামিনী ?

—কি আর বলবে ! বলছে, একদিন ধরা দিয়েছিল তার স্বামীটি, সেদিন সে তার জন্মের পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছে। তা যে মিটিয়েছে, ভামিনীর মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। তার ঠোঁটের কিনারে জেগেছে হাসি, আর সে প্রাণের আনন্দে বলছে, জানিস চাঁপা, ছেলে হবে আমার। যতক্ষণ ছিলাম, শুধু ঐ গল্প, ঐ আলাপ। প্রথমে ভেবেছিলাম, এ বুঝি মজার ঘটনা, কিন্তু ওকে জেরা ক'রে ক'রে বুঝে ছিলাম, মজার না, সুখের ঘটনা এটা।

—কিসের মজা ?

—ন্যাকা সেজো না, বউদি। দাও, ঐ পা দাও।

মজা যে না বোঝে, সে ন্যাকা ছাড়া কি। ঘরে-ঘরে আকছার এন্তার মজা লোটালুটি চলেছে, একটুও জানে না বুঝি বউদি ? সেদিন কানাগিন্নি কি বলে গেল, মনে নেই বউদির ? ভবসুন্দরীর সঙ্গে গিন্নিমার ভাব কেন এত ? এই বাড়িতেই চলেছে-না মজা ? এসব সত্ত্বেও বউদির ওই জিজ্ঞাসা শুনে গা জ্বলে নাপিতানির।

চাঁপার ঝংকার শুনেই রাধা বুঝে নিল, মজা বলতে কি বোঝায়। তাই আর সে ও-কথা জিজ্ঞাসা না করে বলল, ভামিনী মেয়েটা বুঝি বড় ঠাণ্ডা মেয়ে, বুঝি বড়—

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বড পতিব্রতা। ওইখানেই তো ওর মরণ। পতি ছাড়া আর পুরুষ নেই ওর কাছে।

কথাটা বলেই চাঁপা মাথা তুলে রাধার মুখের দিকে চাইল, বলল, তোমারই মত ঠাণ্ডা মেয়ে। মেয়েমানুষ যত ঠাণ্ডা হয় পুরুষরা ততই গরম হয়ে ওঠে, ততই মেজাজ বাড়ে তাদের। কেন, অত কিসের গা ? অমুক মেয়ে পতিব্রতা শুনে কত খুশি হই আমরা, কিন্তু অমুক পুরুষ পত্নীব্রত শুনলে গাল পেড়ে বলি, মানুষটা বড় স্ত্রৈণ। কী নিয়ম দেখ।

পায়ের আঙুলের ডগায়-ডগায় সূক্ষ্ম আলপনা আঁকার মত করে আলতা-ছোপা তুলী টানতে টানতে মাথা নীচু করে চাঁপা বলতে লাগল, স্ত্রীর উপর টান দেখালেই মানুষ স্ত্রৈণ হয়, কিন্তু দাসীবাঁদীর উপর টানের তো কামাই নাই, ঝিয়েদের নিয়ে ঢলাঢলি যে কত করছেন বাবুরা, তখন নিশ্চয় তাঁদের আমরা গাল পাড়ব, বলব, ঝৈন।

রাধা বুঝতে পারল না যেন, বলল, কি হল কথাটা ?

হেসে ফেলল চম্পা-নাপিতানি, বলল, এসব আমার কথা না বউদি, কানাগিন্নির বানানো।

—কিন্তু কথাটা কি?

—স্ত্রীর উপর টান হলে মানুষ যদি স্ত্রৈণ হয়, ঝির উপর টান হলে তবে—

পা চট করে টেনে নিয়ে রাধা জিজ্ঞাসা করল, কি বললি চাঁপা? এই বাড়িতে বুঝি ঘটছে এমনি ঘটনা? অ্যাঁ, বলছিস কি চাঁপা।

লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে রাধার সর্বশরীর জর্জরিত হয়ে উঠল নিমেষে। তার স্বামী না-আসছে তো না-আসছে, বাইরে-বাইরে তার যা-ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে সে, বেড়াক। কিন্তু এ কী অপমানের লজ্জার ঘৃণার কথা আজ শোনাল তাকে চাঁপা।

চাঁপা বুঝতে পারল রাধা তার কথার কি অর্থ করে নিয়েছে, কিন্তু এ অর্থ যে ভুল তা বোঝাবার জন্যে চাঁপা তার বউদির পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, কি কথার কি মানে করলে গো? এ কি এ বাড়ির কথা?

—তবে কোথাকার কথা এসব?

—যার মুখের কথা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। এসব কথা হচ্ছে গো কাঞ্চিলালবাবুর বাড়ি নিয়ে। তার গুণধর পুত্র গুণময়ের কাণ্ড। শুধিয়ে দেখো কানাগিন্নিকে।

আর শুধাবার ইচ্ছে নেই রাধার কাউকে। সে যেন সব বুঝতে পেরে গিয়েছে পরিষ্কার। স্ত্রী হওয়া ছাড়া আর যাই হোক মেয়েরা, অমনি কদর তাদের বেড়ে যায় অনেক। স্ত্রী হওয়াই বুঝি মস্ত বড় ভুল তাহলে? তাহলে, পৃথিবী-ময় মানুষের এত বিবাহের উৎসব কেন, কেন এত সমারোহ এত আড়ম্বর এত অনুষ্ঠান? পৃথিবী ঠিক কত বড় রাধা জানে না, এর যতটুকু অংশের খবর সে পেয়েছে ও পাচ্ছে তার সর্বাংশেই সে এই রকমের রীতিই দেখছে বেশি। কদমমাসির কথা আর-একবার মনে হল তার, বড় বোকা মেয়ে কদমমাসি, যা ঘটেছিল তা ঘটেছিলই, নিজেকে শেষ করে না ফেলে বেঁচে থেকে সকলের মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিলে তবেই প্রতিহিংসা নেওয়া হত।

কিন্তু সকলের স্ত্রীরই তো এই দশা না। তার মার কথা মনে হল তার, তিনিও তো তার বাবার স্ত্রী, নিরুপমাদিও তো আন্টুনি সাহেবের স্ত্রী, আর ইয়ে— তার ঠাকুরমা? বলাগড়ে নাকি আছেন তিনি, এবং স্ত্রী হয়েই নাকি আছেন, সুখেই নাকি আছেন?

ঠাকুরমার কথা মনে হওয়ায় বাবার কথা মনে হল তার। বড় দুঃখ হল বাবার জন্যে। অনেক বছর আগের কথা, রাধা তখন এতটুকু একটা মেয়ে, ভীষণ বান এসেছিল সেদিন গঙ্গায়, চানকে মামার বাড়ি যাওয়ার জন্যে গরিটি-ঘাটে গিয়েছিল সে বাবার সঙ্গে। একটা চিতা নিভে গিয়েছিল ঐ বানে, ঐ দৃশ্য দেখে বাবা সেদিন কেমন যেন করছিলেন। অমন কেন করছিলেন, সেদিন বুঝতে পারেনি রাধা। কিন্তু এখন বোঝে।

একটা চালতে-গাছের নীচে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল রাধারা। সেই গাছটা এখনো আছে?

কিন্তু কী আশ্চয! কলকাতার শোভাবর্ধন হবে, তার লটারির টাকা পাচ্ছে কে—এই কথা বলতে-বলতে কখন গঙ্গা পার হয়ে আমরা ওপারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, বুঝি খেয়ালই হয় নি। যে টাকা পেল তার পিছু ধাওয়া করে আমাদের লাভটা কি। লাভ বিশেষ কিছু হল না বটে, কিন্তু এই সুযোগে তার ঘরসংসারটা একটু দেখে আসা গেল, এতে লোকসানও হয়তো বিশেষ কিছু হল না।

সে চালতে-গাছটা এখনো আছে কি না সে হিসাব করুক চুচুড়ার রায়-পরিবারের গৃহবধূ, আমরা এবার দেখে নিই কলকাতায় এখন কি কি আছে।

আছে অনেক-কিছুই। অনেক ইমারত, অনেক পল্লী, অনেক বাবু, অনেক বিবি। অনেক কেচ্ছা, অনেক কেলেঙ্কারি।

কিন্তু এর মধ্যে নতুনত্ব আর আছে কি? কবে কোন্ দেশে এসব ব্যাপার অল্পবিস্তর না-ছিল বা না-থাকবে? শুধু ঐসব জিনিসকে মূলধন করে বাণিজ্য করতে গেলে চাঁদবেনের মত বণিককেও নিশ্চয় দেউলে হতে হত। তাই সে নিয়েছিল অন্যবিধ পথ। চাঁদবেনের কথা থাক্, সে অনেক কাল আগের ঘটনা। ঐ হুগলী-জিলার বালি গ্রামের সদাগর গৌরী সেন, সেও কি শুধু পণ্য করেছিল কতকগুলি কেচ্ছা আর ততোধিক কেলেঙ্কারি, তাহলে কি তার নৌকো-বোঝাই রাং একসঙ্গে রুপো হয়ে যেত? সে তো আর বহুকাল আগের ঘটনা নয়, বড়জোর শ দুই বছর, বালিতে তার ভিটে এখনো আছে।

থাক্। কলকাতার কেচ্ছাকাহিনীও থাক্।

কুমারটুলির বটতলায় ঘন ছায়া পড়েছে, সেই ছায়ার সঙ্গে এসে মিশেছে

গোবিন্দ মিত্তিরের নবরত্নমন্দির-চূড়ার ছায়া। এখানে নিয়মিত জড়ো হয় কবিয়ালেরা। আজো এসেছে তারা। বুড়ো হরু ঠাকুর, তার শিষ্য ভোলানাথ এবং নীলু পাটনি, রাম বসু, আন্টুনি ফিরিঙ্গি, নিতাই বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী, সাতু রায়, বলা বোষ্টম। তারা কবিয়ালিও করছে, কেচ্ছাও করছে।

তাদের এই হাসি-ঠাট্টা-মশকরা উপভোগ করার জন্যে কুমারটুলির রসিকেরা এসে থানা দিয়ে বসেছে, কারো হাতে থেলো হুঁকো, কারো সঙ্গে গড়গড়া। হাটখোলার নন্দরাম সেন অনেক কাল আগে একটা ইমারত গেঁথেছিলেন এই বটগাছের লাগোয়া। এখন সেখানে বসবাস কেউ করে না, কিন্তু কবিয়ালের আখড়া যখন বসে ঐ বটতলায় তখন তার উঁচু দাওয়ায় ফরাস বিছিয়ে তৈরি হয় শৌখিন আসর।

সে-আসর তৈরি হয়েছে আজও।

ছায়ায় ব'সে কবির দল নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে। আজকের এই শখের আসরে কে-কে লড়বে, এই বিষয়ে নানা আলোচনা চলেছে। যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে আন্টুনির, না, রাম বসুর সঙ্গে ভোলা-ময়রার, না, নিতাই বৈরাগীর সঙ্গে নীলু পাটনির। কথাই চলেছে, কিন্তু সাব্যস্ত হচ্ছে না কিছু।

বুড়ো হরুঠাকুর এখন আর লড়াইয়ে নামেন না। এখন তিনি বিচার করেন, লড়াইয়ে কে জিতল কে হারল। ভোলা-ময়রার তিনি সাক্ষাৎগুরু, কিন্তু অন্যান্য কবিয়ালরাও তাঁকে গুরুর সম্মান দেয়, গুরু ব'লে মানে।

এইজন্যে সতু রায় বলল, ঠাকুর-মশায়, ওদের ঝকড়া মিটবেনা, আপনি বলুন কে কে লড়বে আজ।

সকলে প্রায় সমস্বরেই সায় দিল সাতু রায়ের প্রস্তাবে। হরুঠাকুরও বুঝি সকলের মুখের দিকে চেয়ে ঠিক করতে লাগলেন কাকে-কাকে নামাবেন আজ।

একটু তফাতে বসে ছিল ঢোল নিয়ে ঢুলির দল। কার ডাক পড়বে কেউ জানে না। ঢুলিরাও তাই সোজা হয়ে বসল।

নন্দরাম সেনের বারান্দার গায়ে এসে নামল ঝালরদার পালকি।— কে এল, কে এল ?

হাটখোলার তনুবাবু এসে নামলেন। মসৃণ মসলিনের কালো কস্তা পেড়ে ধুতি পরনে, গায়ে মসলিনের নিমাস্তিন জামা। ধুতির কোঁচার পত্তন চেয়ে দেখার মত। তনুবাবু ফরাসে গিয়ে বসলেন।

কবি-মহলে উৎসাহের ঢেউ দেখা দিল।

এর পর এলেন দুই তরুণ বাবু— সিমুলিয়ার ছাতুবাবু ও লাটুবাবু। তার পর এলেন শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ, হরুঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন, এঁদের গৃহেই হরুঠাকুর এখন সভাকবি। কিছুক্ষণ পরেই চেয়ার-পালকিতে চেপে এলেন বাগবাজারের গোকুল মিত্র।

আসরে ব'সে সকলে হিসাবপত্র মিলাতে লাগলেন যেন। সবাই এল তো? কই, নীলমণি কই— নীলমণি হালদার? দর্পনারায়ণও নেই যে।

আসর যেন ঠিক জমল না। তবুও এরই মধ্যে যতটা জমে তার জন্তে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে জমাট হয়ে বসতে লাগলেন সকলে।

এসে গেছেন দুজন— দর্পনারায়ণ ও নীলমণি। রঙদার দুটো পালকি প্রায় একই সঙ্গে এসে নামল।

ভিড় জমে গেছে চার ধারে। পেয়াদা বরকন্দাজ চোবদার পাখাবরদার আর পালকিবেহারার ভিড় তো আছেই, তার উপর হাটখোলা গরানহাটা জোড়াসাঁকো থেকেও অনেক লোক এসে ভিড করে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গা নেয়ে ফিরছিল যারা ভিজাকাপড়ে কলসী কাঁখে তারাও একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ঢুলিরা ঢোলকের গায়ে কাঠি ঠুকছে। হরুঠাকুর কি বলেন, তার জন্তে কবিরা চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

ও কে এল? বটতলা থেকে ওরা গলা একটু উঁচু করে তাকাল। আসর থেকেও বাবুরা তাকেয়া থেকে পিঠ আলগা করে নিয়ে তাকালেন।

ভন্নুবাবু বলে উঠলেন, আসুন, নিধুবাবু আসুন।

বৃদ্ধ নিধুবাবু বলিষ্ঠ পদভরে দুটো সিঁড়ি ভেঙে আসরে এসে দাঁড়ালেন। বটবৃক্ষতল ভালো করে চেয়ে দেখলেন, মনে-মনে বুঝি গণনা করলেন, তার পর আসরের দিকে চেয়ে সকলের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হাসলেন, বললেন, বেশ। ন-জন কবিয়াল এসেচেন, এ যে দেখছি নবরত্নসভা। কিন্তু আসরের এ দশা কেন? অষ্টবসুর সমাবেশ নেই কেন আজ? রাজা সুখময়কে দেখছি নে কেন?

নীলমণি হালদার বললেন, তিনি অসুস্থ। আমরা পোস্তা হয়ে এলাম, তাঁকে দেখে এলাম। বিশেষ অসুস্থ।

কিন্তু আটবাবু ছাড়া কোনো আসর সচরাচর বসেনা এ-তল্লাটে, এই

জন্যেই নিধুবাবুর চোখে এটা অভাব বলে ঠেকেছে। কিন্তু এই অসুস্থতার সংবাদে সে-অভাববোধটা উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়ে গেল। আসরে গুঞ্জন আরম্ভ হল।

ওদিকে হরুঠাকুর ঠিক করে ফেলেছেন কে গাইবে আজ। কার গান দিয়ে আজ এই সমাগত জনগণকে পরিতৃপ্ত করা হবে।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সভার কবি হচ্ছেন হরুঠাকুর। মহারাজের পুত্র এই আসরে সমাসীন। হরুঠাকুরের কথার ওজন তাই আজ দ্বিগুণ বেশি।

আসরের সকলেও বটতলার দিকে তাকাল, হরুঠাকুর কি স্থির করেছেন জানার জন্যেই হয়তো।

উঠে দাঁড়ালেন হরুঠাকুর, বললেন, আজ আমাদের কবির দলের বাসনা—নিধুবাবু আজ গাইবেন।

প্রস্তাবটি শোনামাত্র যজ্ঞেশ্বরী খুশি হয়ে উঠল, দুই হাতে নিঃশব্দ তালি বাজিয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগল—

অনেক দিনের পরে, সখা,
তোমাকে দেখতে পেলাম চোখেতে।
ভাই, বল দেখি তোমার সখার সংবাদ—
ভাল তো আছেন প্রাণেতে?

অনেকদিন পরে তারা পেয়েছে নিধুবাবুকে, প্রাণের খুশি তাই ঐ গান হয়ে বেরিয়ে এসেছে যজ্ঞেশ্বরীর।

প্রস্তুত হয়ে আসেন নি নিধুবাবু, আচম্বিতে হরুঠাকুরের প্রস্তাব শুনে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আসরের বাবুরাও সায় দিয়ে উঠলেন হরুঠাকুরের প্রস্তাবে।

নিধুবাবু এখানে বসেই যজ্ঞেশ্বরীর ঠোঁট নাড়া দেখতে পাচ্ছেন, বললেন, ঐ তো গাইছে যজ্ঞেশ্বরী। গলাটা একটু তুলে গাইলেই তো শুনতে পারি আমরা।

গলা তুলে যজ্ঞেশ্বরী বলল, এটা কি গান বাবু গো? খ্যামটাও যেমন নাচ, আমাদের গানও তেমনি গান। কথা-কাটাকাটি থাকে, মুখেমুখে সাফ-সাফ জবাব থাকে, তাই যা আপনারা কদর দেন দয়া করে।

যজ্ঞেশ্বরীর কথা শুনে চুপে করে গেল সকলে। নিধুবাবুও আর কোনো কথা বললেন না, তাকিয়াটা কোলের উপর তুলে নিয়ে তিনি গলা ছাড়লেন—

কে বলে অবলা তোমায়, মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে— ঢেকেছ বসন দিয়ে।

যজ্ঞেশ্বরী বুঝি একটু লজ্জা পেয়ে গেল, গায়ের আঁচলটা টেনে একটু কাত্ হয়ে বসে রাম বসুর দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে একটু হাসল।

নিধুবাবু গাইতে লাগলেন—

স্মরহর শর সম কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নির্গুণ নর বধ নারী হয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে চলল গান। সমাগত নরনারী সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনছে ঐ গলা। এ-গানের পর আরো গান শোনার কৌতূহলও তাদের আছে। এবং, বলা যায় না, হয়তো তার পর কবির লড়াইও শুরু হবে।

যারা ভিজে কাপড়ে কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে ছিল, দ্রুত পায়ে বাড়ি গিয়ে তারা কাপড় বদলে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিধুবাবুর গলা বাজছে—

কে বলে অবলা তোমায়, মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে— ঢেকেছ বসন দিয়ে।

এমন সময়ে ঘোড়া দাবড়ে পেয়াদা এসে পৌছল পোস্তা থেকে। স্তব্ধ হয়ে গেল নিধুবাবুর গলা।

—কি সংবাদ ?

রাজা সুখময় গত হয়েছেন।



॥ সপ্তম স্ফুলিঙ্গ ॥

১৮১১ সাল।

ডাকচৌকীতে চেপে দ্রুতগতিতে রামমোহন আসছেন তাঁর দেশের বাড়িতে— রাধানগরে।

পালকি বদল করে নিতে হচ্ছে দশ-পনর মাইল অন্তর-অন্তর। পালকি বদলের সময়ে কোনো ঘাঁটিতে তিনি এতটুকু বিশ্রাম বা বিলম্ব করতে রাজি না। একটা ডাকচৌকীর নির্ধারিত পাল্লা শেষ হওয়া মাত্র তিনি সে পালকি থেকে নেমে অন্যটায় উঠেই বেহারাদের বললেন, জোর কদমে নিয়ে চল। সন্ধ্যার আগে আমাকে পৌছে দিতে হবে আত্রাই-নদীর ধারে। বকশিশ পাবে।

কে এই বিরাট মানুষটি, কিসের জন্যে এঁর এই ব্যস্ততা, তা বেহারারা জানে না, জানতেও চায় না, কেবল এইটুকু জানে যে, তাদের এই সওয়ার সাধারণ মানুষ না— নিশ্চয় কোম্পানির একজন বড়দরের চাকর।

তাঁর মনে খুব দুশ্চিন্তা এবং সেইসঙ্গে খুব তাগাদা। যত সত্বর সম্ভব তাঁকে পৌছতে হবেই।

আত্রাইয়ে পৌছতে দেরি হল না, সন্ধ্যার অনেক আগেই তাঁকে নদীর ধারে নামিয়ে দিল বেহারারা। নৌকো চেপে নদী পার হয়ে তিনি এপারে চলে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে। এখন আর এপার থেকে পালকি ছাড়বে না। রাস্তায় ডাকাতের বড় ডর।

সঙ্গের পেয়াদা-বরকন্দাজদেরও ঐ কথা। সংখ্যায় তারা অনেক বটে, কিন্তু ডাকাতদের দল যে এর চেয়েও বড়। চলনবিলের অঞ্চল এটাকে বলা যায়, চলনের ডাকাতদের চালচলনই আলাদা, তারা বড় কড়াধাতের মানুষ।

রামমোহনের ইচ্ছে ছিল, আজকের মধ্যে কোনো রকমে নাটোর পৌঁছে যাওয়া; পরদিন ভোরে রওনা হলে হয়তো সন্ধ্যার আগেই পদ্মা অতিক্রম করা যাবে।

কিন্তু বেহারারাও রাজি না, বরকন্দাজদেরও বিশেষ গরজ দেখা গেল না। অতএব ডাকচৌকীর গুমটি-ঘরে তিনি রাত্রিটা অতিবাহিত করবেন স্থির করলেন।

কিন্তু মন যেন স্থির হতে চায় না। জরুরি বার্তা পেয়ে তিনি রওনা হয়েছেন। সংবাদটা শুভ না। বেশি উত্তাপে লোহাও গলে, এই কঠিন মানুষটির মন যখন দ্রব হয়েছে, সংবাদটি তখন অবশ্যই সাধারণ নয়।

পোস্তার রাজা সুখময়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এ ব্যস্ততা নয়, এ প্রত্যাবর্তনও নয়। রাজা সুখময় গত হয়েছেন, সম্ভবত এ-সংবাদ এখনো তিনি শোনেন নি, শুনলেও এমন উদ্বিগ্ন হতেন কি না বলা যায় না।

তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহন বাড়াবাড়ি রকমের কাতর— এই জরুরি বার্তা পাওয়া মাত্র তিনি যাত্রা করেছেন। রংপুর থেকে আত্রাই— এই পথটুকু অতিক্রম করতেই চারদিন কেটে গেল। এখনো পথ অনেক বাকি। তাঁর উদ্বেগ এইজন্যে।

অনেক বছর তিনি দেশছাড়া। কাশী থেকে ফিরে পিতার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদে ছিলেন কিছুদিন। তার পর ডিগবি সাহেবের সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে ঢুকে রামগড় ভাগলপুর ঘুরে রংপুরে এসে স্থায়ী হয়ে বসেছেন। রংপুরেই এর মধ্যে দু বছর কেটে গেল। এই চাকুরি বুঝি আর ভালো লাগছে না রামমোহনের, মাঝে-মাঝেই মনে হয়— জীবনটা এইভাবে কাটিয়ে দিলে চলবে কি না। বয়স তো চল্লিশ হতে চলল। এইবার এসব কাজ ত্যাগ করে নিজের মনের মত কাজ করার জন্যে তাঁর মন বুঝি ব্যাকুলই হয়েছে একটু।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। তাঁর মনের অশান্তি আর উদ্বেগও গভীর হয়ে উঠছে সেইসঙ্গে। আত্রাই-নদীর তীরে খড়ে-ছাওয়া ছাউনির ভিতরে বসে তিনি ভাবছেন নানা কথা। তাঁর ভ্রাতাকে গিয়ে তিনি যেন দেখতে

পান— এইটেই এখন তার কাছে প্রধান ভাবনা হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে চিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তাও এসে যাচ্ছে তাঁর মনে।

বাইরে বসে পেয়াদা-বরকন্দাজেরা আলাপ করছে বেহারাদের সঙ্গে। তাদের গলার স্বরের সঙ্গে নদীর অস্ফুট কুলুকুলু ধ্বনিও ভেসে আসছে কানে। এই লম্বা রাতটা এখানে তাঁকে কাটাতে হবে।

মাথার পাগড়ি খুলে পাশে রেখে তিনি একটু আরাম করে বসলেন।

বাড়িতে চলেছেন বটে তিনি, কিন্তু বাড়ি তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবে এ শঙ্কা আছে তাঁর মনে। নিজের অভিমত প্রকাশ করে তিনি দেশের অনেক মানুষের সঙ্গে বাড়ির মানুষদেরও ক্ষিপ্ত করে রেখেছেন। পিতার সঙ্গে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে, পিতার সঙ্গে মনকষাকষি করে চলে যেতে হয়েছে কাশী। পিতার জীবিতাবস্থায় নিজের মনের ও মতের কথা প্রচার করে বৃদ্ধমানুষটির মনে আর ঘা দেন নি তিনি; ঘা দেন নি বটে, কিন্তু কেন-যে তাঁর পিতা সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত শুনে অতটা বিচলিত হয়ে উঠতেন— কে বলবে। পিতাই হোন, বা যে-ই হোন, কারো উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করার অভিপ্রায় তো তাঁর নয়!

যাই হোক, যতদিন রামকান্ত জীবিত ছিলেন রামমোহন তাঁর সংস্পর্শে আর আসেন নি। এসে লাভ কি, সংস্পর্শে এলেই যদি সংঘর্ষ বাধে, তাহলে তফাতেই থাকা ভালো। তফাতেই ছিলেন রামমোহন। তফাতে ছিলেন বটে, কিন্তু মনের কথাগুলো মন থেকে তফাত করে দিতে পারেন নি। এইজন্যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর অভিমত ভালো করে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন রামমোহন। পুতুলপূজা সম্বন্ধে তিনি ফারসি ভাষায় লিখলেন এক কেতাব, তার নাম দিলেন— তহ্‌ফাত-উল-মওয়াহিদ্দীন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জানালেন তাঁর কঠোর অভিমত। লিখলেন— ব্রাহ্মণেরা এই রকম একটি চলতি রীতি প্রস্তুত করে ফেলেছে যে, ঈশ্বরের যাবতীয় উপাসনা-উৎসব পরিচালনা করার কড়া আদেশ স্বয়ং ঈশ্বরই তাদের দিয়েছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজাঅর্চনার যাবতীয় ভার তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় এ-নির্দেশ লিখিত আছে। অন্যদিকে কোরানে উল্লিখিত আছে যে, যারা পুতুলপূজা করে তাদের হত্যা করো। একই ঈশ্বর দুই কেতাবে দুইটি বিভিন্ন মত কিভাবে প্রকাশ করতে পারেন, এ কথা বুদ্ধিমান লোকেরই বিবেচ্য। এ কি ঈশ্বরেরই নির্দেশ, না, বিভিন্ন ধর্মের যারা ধারক

তাদেরই নিজেদের অভিমত। একদিকে ঈশ্বর নিজের পুজার নির্দেশ দিচ্ছেন, অন্তদিকে তিনিই পুজারীকে হত্যা করতে বলছেন? এ কর্ম ঈশ্বরের দ্বারা কি সম্ভব? ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে যারা বাণিজ্য করে এ কাজ তাদেরই।

কত গর্হিত অন্তায় এবং কত লজ্জা যে জমে আছে সমাজের সংস্কারের মধ্যে, তার অন্ত খুঁজে পাওয়া দায়। রংপুরে এসব কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে হরিহরানন্দের সঙ্গে। এই তীর্থস্বামী মহাশয়ের মত ও পথ রামমোহনের থেকে ভিন্ন হলে কি হবে, উভয়ে উভয়ের সঙ্গে আলাপে-আলোচনায় কাল যাপন করতে পেরে হরিহরাত্মা হয়ে উঠেছেন।

রংপুরে চাকরির জীবন। কিন্তু রামমোহনের জীবনটা যেহেতু কেবল চাকরির জন্তে নয়, এইজন্তে তিনি তাঁর অভিমত নিয়ে আলোচনার এবং সে-অভিমত প্রকাশের উপযুক্ত অবসর যেমন চেয়েছেন, তেমনি চেয়েছেন একটি আসর। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁর এই উভয় আকাজ্ঞা অনেক পূরণ করেছেন। তিনি বামাচারী তান্ত্রিক আর রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মবাদী—তবু উভয়ের আলোচনায় সংঘর্ষ কখনো বাধেনি, সংঘাত ও না— কেউ কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেননি বটে, কারো মতে একমত হননি বটে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের হয়েছেন অন্তরঙ্গ।

রংপুরে এখন তিনি কোম্পানির দেওয়ান। পদটা যেমন বড়, দায়িত্বও সেই অনুপাতেই। কাজে অনেক বিঘ্ন, ও বিপদও অনেক। ডিগবি সাহেব হচ্ছেন কালেক্টর, তাঁর সঙ্গে রামমোহনের বন্ধুত্ব আছে ব'লেই তবু একটু নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যাচ্ছে। ডিগবির অধীনে কাজ করেন বটে, কিন্তু কাজ নেবার আগে চুক্তি করে নিয়েছেন রামমোহন, মৌখিক নয়— লিখিত চুক্তি। এদেশী লোকদের— তা সে তার পদ যত বড়ই হোক— চেয়ারে বসতে দেয় না সাহেবরা; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে, এই নিয়ম চালু। কিন্তু অধীনে চাকরি বলেই অতটা অধীনতা ও অসম্মান মেনে নিতে রাজি না রামমোহন। এইজন্তেই ওই চুক্তি। লিখিতভাবে ডিগবি জানিয়ে দিয়েছেন যে, রামমোহনকে সর্বদা বসবার অধিকার দেবেন, কেদারা দেবেন। এই অধিকার ও সম্মান পাবেন ভরসা পেয়েই চাকরি নিয়েছেন তিনি, এবং ডিগবির সঙ্গেই রামগড় ভাগলপুর ঘুরে এসে পৌঁছেছেন রংপুরে।

উত্তরবাংলার জমিদারির অবস্থা বড় জটিল। বড়-বড় জমিদারের সংখ্যা অনেক, তাদের যেমন শক্তি তেমনি সংগতি, এবং পরস্পরের মধ্যের কলহও

তেমনি অগণ্য।— মীমাংসা হয় নি এবং হয় না, এ ধরণের মামলাও অনেক। যে-কোনো একটা বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে নথিপত্র দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে গেলেই দেখা যায় সেসব কাগজপত্রের শেষ নেই। তা ছাড়া, দু-পক্ষ থেকে দাবি ও পালটা দাবি আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, জমির প্রকৃত মালিক যে কে তা কাগজপত্রে খুঁজে পাওয়াই যায় না। সেরেস্তাদারদের সাহায্য নিয়েও অনেক সময় বিরোধের মীমাংসা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

জমিদারির হিসাবপত্রে এবং জমি জরিপ করার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে নিতে হয়েছে রামমোহনকে, আমিন আর আমলারা কিভাবে মিথ্যা হিসাব দাখিল করে সে সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা এখন খুব পরিষ্কার। এইসব কারণে দেওয়ানিগিরি তিনি করে যেতে পারছেন।

কাজ করে যেতে পারছেন ব'লেই যে সে-কাজ তাঁর মনের মত কাজ, এমন কথা বলা যায় না; সারাদিন দলিল-দস্তাবেজ আমিন-আমলা-সেরেস্তাদার নিয়ে কাটান বটে, কিন্তু সে-সময়টা তাঁর কাছে সদ্ব্যয় বলে মনে হয় না।

এই নির্বান্ধব দেশে তিনি তাঁর মনের খোরাক ও প্রাণের আরামের সন্ধানে ছিলেন। ক্রমশ তিনি এখানে গড়ে তুলেছেন বন্ধুগোষ্ঠী। ধর্মবিষয়ে আলোচনার জন্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে মিলিত হতে লাগলেন সকলে। নিয়মিত আলোচনা হয়, আলোচনার প্রধান বিষয় হচ্ছে পৌত্তলিকতার অসারতা।

বেশ কেটে চলেছে রংপুরের জীবন। কর্মক্ষেত্রেই ছিল এ এতদিন, এবার ক্রমশ এ হয়ে উঠছে যেন একটি ধর্মক্ষেত্রও। এতে মনে শান্তি পাচ্ছেন, সান্ত্বনাও পাচ্ছেন।

কিন্তু বাধা আছে সর্বত্র। বাধা আছে বলেই বেগও আছে। পাহাড়ের গুহা থেকে যখন নদী যাত্রা শুরু করে, তখন মসৃণ পথ তার সম্মুখে প্রসারিত থাকে না। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অনেক প্রতিবন্ধক ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে চলতে হয় তাকে; যতই চলে, ততই তার পথ হয়ে ওঠে প্রশস্ত, গতি হয়ে ওঠে প্রবল। কে বলতে পারে, রামমোহনও একদিন বাধায়-বাধায় গতি সঞ্চয় করে বিশাল আর বিপুল হয়ে উঠতে পারবেন কিনা।

রংপুর জজ-আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের কথা ভাবছেন রামমোহন। মানুষটা পণ্ডিত অবশ্যই, পারস্য ভাষায়ও যেমন দখল সংস্কৃতেও তেমনি ব্যুৎপত্তি। রামমোহনের যুক্তির প্রতিবাদে একটা বই লিখছেন নাকি

তিনি। রামমোহন তাঁর মতে জ্ঞানহীন, সেইজন্যে রামমোহনকে জ্ঞানদান করার অভিপ্রায়ে তিনি সেই বইয়ের নামকরণ করেছেন জ্ঞানচন্দ্রিকা। তা করুন, ও-ভাবে জ্ঞান দেওয়ার অধিকার সকলের আছে; যে-মতে যে বিশ্বাসী সে-মত প্রকাশের ও প্রচারের অধিকার তার অবশ্যই থাকবে। কিন্তু, রামমোহন ভাবছেন অন্য কথা। ভট্টাচার্য-মহাশয়ের প্রতাপ আর প্রতিপত্তি রংপুর-অঞ্চলে অসাধারণ, তিনি তার অপব্যবহার করার জন্যে উদ্যত হয়েছেন বলে খবর পেয়েছেন রামমোহন। অনেক লোক একত্র করেছেন নাকি গৌরীকান্ত, বই লিখে কেবল জ্ঞানই দিতে চান না, ঐসব লোককে দিয়ে হামলা করিয়ে রামমোহনকে শিক্ষাও দিতে চান নাকি তিনি।

গভীর রাত্রে আত্রাই-নদীর তীরের পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে বসে গায়ে ঝাঁকি দিয়ে একা-একাই হেসে উঠলেন রামমোহন।— শিক্ষা! এইভাবে নিজের মত প্রতিষ্ঠা যারা করতে চায়, তাদের মতের উপরে তাদের নিজেদেরই যে আস্থা নেই, এ-ই তো তার প্রমাণ। মত যদি দৃঢ় হয়, বিশ্বাস যদি গভীর হয়, তাহলে তা প্রকাশ করো প্রচার করো— একদিন তোমার একার মত বহুর মত হয়ে উঠবেই। কিন্তু অন্যকে শিক্ষা-দানের পদ্ধতি যদি ওইরূপ হয়, তাহলে তাদের নিজেদের শিক্ষা সম্বন্ধে সহজেই যে সকলের সন্দেহের উদ্রেক হবে।

ঝমঝম শব্দে যেন বেজে চলেছে রাত্রি। কোনো অদৃশ্য ললনা বুঝি ওই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে নীলাম্বরীতে আবৃত ক'রে, পায়ে ঝিঁঝির নূপুর বেঁধে, মাথার এলোখোঁপায় জোনাকির ফুল গুঁজে নিয়ে, এই রাত্রির নেপথ্য দিয়ে নৃত্য করতে-করতে চলেছে। সেই মঞ্জীরধ্বনির সঙ্গে নদীর জলগুঞ্জন মিশে যে ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে, কোনো সুরকার থাকলে হয়তো সে তার বীণের তারে তুলে নিতে পারত এই সুর। কোনো কবি থাকলে ঐ অদৃশ্য সুন্দরীর পায়ের নূপুরধ্বনির তরঙ্গ থেকে সৃষ্টি করে নিতে পারত হয়তো কোনো নতুন ছন্দ।

কিন্তু রামমোহন কবি না, সুরকার না। তবু তাঁর মন সুরে আর ছন্দে পুলকিত বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই নিরেট অন্ধকারও বুঝি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ওই নিশীথিনীর কবরীতে বিকশিত আলোক-ফুলের দীপ্তিতে।

আত্রাইয়ে আটক করেছে তাঁকে এই রাত্রি। কোথায় সেই চলনবিল, আর কোথায় সেই ডাকাতের দল। ইচ্ছে করলে তারা কি হানা দিতে পারে না এখানে এসে? সহজেই পারে। তাহলে তাদের ভয়ে পথ-চলাটা বন্ধ রেখে কি লাভ হল— এ কথা নিয়ে পাইক-বরকন্দাজ আর বেহারাদের সঙ্গে

তর্ক করা যায় না। ওরা তো সকলে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নয় যে, যুক্তি দিয়ে কথা বলবে বা অন্যের যুক্তি বুঝবার চেষ্টা করবে। ওরা ওরাই। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের কথাও মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে।

কিন্তু তাঁদের কথা এখন আর অত মনে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখন মনে পড়ছে সেই মহিলার কথা— রানী ভবানী। এখানে থেমে থাকার ইচ্ছে ছিল না রামমোহনের, ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যার মধ্যে নাটোর পৌঁছবার। রানী ভবানীর ভূমিতে। খুব জবরদস্ত মহিলা ছিলেন। শ্রদ্ধায় রামমোহনের এই সুদীর্ঘ শরীরটাও নত হয়ে আসে। প্রায় অর্ধেক বাংলা শাসন করেছেন ঐ মহিলা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে শাঁখা আর শাড়ি ভেট পাঠিয়েছিলেন। নারীজাতি বলে একটা পৃথক্ জাতির কথা বলে থাকেন অনেকে, নর থেকে তারা যেন স্বতন্ত্র। তাদের কোনো অধিকার নেই, স্বাধীনতা নেই, কেননা তারা নাকি নরের সমতুল্য নয়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে গুণে তারা অনেক হীন, এইজন্যেই নাকি নরের কৃপার পাত্র। সত্যিই, কেবল করুণার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের, কিন্তু আশ্চর্য, তাদের উপর করুণার কণা মাত্র কারো নেই। কিন্তু সত্যিই এই নারী-জাতি অতটা খর্ব আর বুদ্ধিতে-বিবেচনায় দীনহীন কিনা, সে হিসাব করে দেখে না নিশ্চয় কেউ। সুযোগ আর সুবিধা পেলে তারাও যে তাদের সর্বপ্রকার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। আপাতত অনেক দূরে গিয়ে সে প্রমাণ কুড়িয়ে না-হয় না আনা হল, হাতের কাছ থেকেই এখন তুলে দেখা যেতে পারে। হটী বিদ্যালংকার নারী-জাতিরই একজন; কিন্তু কাশীতে চতুষ্পাঠী খুলে শাস্ত্রবিচারে নিজের জ্ঞানের পরিচয় কি দিতে পারেন নি তিনি? পুরুষদের থেকে তিনি যে কোনো দিক থেকেই হেয় নন, তার বিস্তর প্রমাণ দাখিল ক'রে তিনি লোকান্তরিত হলেন। কাশীতে থাকা-কালে এই হটীর চতুষ্পাঠীতে কয়েকবার গিয়েছেন রামমোহন। এই বাংলাদেশেরই সামান্য একজন মেয়ে তিনি, নিজের চেষ্টায় তিনি নিজেকে নির্মাণ করে তুলতে পেরেছেন, নিজেকে নিজে গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তারা কিছু নয় কেউ নয় ব'লে তাদের অপাংক্তেয় করে রেখে, সামাজিক নানাবিধ শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে রেখে, গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রেখে, তাদের কাছ থেকে কোনো-কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না। পুরুষের গার্হস্থ্য সুখ ও সাংসারিক সুবিধা পরিবেশনের একটি সজীব যন্ত্র রূপেই তো তাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সুখ এবং

এই সুবিধা থেকে পুরুষে যাতে বঞ্চিত না হয়, সেইজন্তেই এটা পুরুষদের চক্রান্ত ছাড়া কিছু না। আশ্চর্যই লাগে রামমোহনের, সেই পুরুষরাই আবার প্রচার করে— নারী-জাতি দুর্বল, নারী-জাতি হীন, নারী-জাতি ক্ষীণ! এটা পুরুষদের চরিত্রের হীনতার দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝি আর কিছু না। নারী-জাতি সম্বন্ধে পুরুষরা যে আরো কত-কী কথা বলে থাকে সেসবের কথা এখন আর ভাবা যায় না। সংসারের তুষানলে তাদের তো দগ্ধ করা হয়ই, শেষে আবার শ্মশানের চিতানলে তুলে তাদের স্বর্গের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। সে-স্বর্গ যদি এতই সুখের জায়গা, পুরুষরা তবে নিজেরাই কেন দল বেঁধে যায় না সে-স্বর্গে? পুরুষদের বুঝি এটা একটা ভীষণ উদারতা! কিন্তু সে-উদারতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন হটী, এইজন্তে তিনি প্রমাণ রেখে যেতে পেরেছেন যে, সুযোগ পেলে নারী-জাতি— পুরুষদের সমকক্ষই শুধু না—পুরুষদের থেকেও নিজেদের উন্নততর করতে পারে। কাশীর টোলে হটী বিদ্যালংকারকে দেখে রামমোহন তাঁর মনে যেন নূতন শক্তি লাভ করেছেন। বৃদ্ধা মহিলাটি আসনে জোড়াসন হয়ে বসে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের বিদ্যা বিতরণ করে চলেছেন, চোখমুখে বুদ্ধির আর জ্ঞানের চিহ্ন পরিস্ফুট। সেই চিত্রটি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন রামমোহন।

নাটোরের রানী ভবানী আর-একজন। জমিদারি পরিচালনা করা না. প্রজা পালন করা— তিনি এ-কাজে অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁকে তাই সকলে স্মরণ করছে। রানী ভবানীর প্রজাপালন-পদ্ধতি সকল পুরুষের অনুকরণ করা আবশ্যক। রংপুরে ছোট-বড়-মাঝারি জমিদারদের তিনি দেখছেন, তাদের প্রজাপীড়ন-পদ্ধতিই তিনি দেখছেন, প্রজাদের পালনের ভার যেন তাদের নয়। কিন্তু রানী ভবানী সেই নারী-জাতির একজন, পুরুষরা যাদের বলে ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র। বারাণসীতেও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রানী ভবানী, আর মুর্শিদাবাদের বড়নগরেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবমন্দির, যার ফলে বড়নগরকে এখন সকলে বলে বাংলার বারাণসী। কিন্তু এইসব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্তে নয়, এইসব দেবার্চনার জন্তে নয়, রামমোহনের কাছে রানী ভবানীর স্মরণীয় অন্য কারণে। অসীম সাহস, অসীম নিষ্ঠা, অসীম আত্মবল— অনেক পুরুষের কাছে যা দুর্লভ, রানী ভবানীর ছিল সেই ঐশ্বর্য। আর ছিল তাঁর আত্মমর্যাদার বোধ। মানুষকে তিরস্কারের পদ্ধতিটাও অভিনব, তিরস্কার মৃদু বটে, কিন্তু মর্মঘাতী। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি শাঁখা আর শাড়ি।

কে না জানে এ কথা? পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন ইংরেজরা এই দেশ অধিকারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন রানী ভবানী চিঠি লিখে কৃষ্ণচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তিনি যেন কোনোক্রমেই ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার না করেন। চিঠি পেয়ে মহারাজাও রানী ভবানীর অনুরোধ রক্ষার সংকল্প মনে-মনে করেছিলেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তাঁর মানসিক বলের পরিচয় দিতে পারলেন না। মির্জাফর যখন ইংরেজদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হল কৃষ্ণচন্দ্রও তখন গত্যন্তর না দেখে মির্জাফরের দলেই ভিড়ে গেলেন। সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন রানী ভবানী। কিছু বললেন না, আর কোনো চিঠি তখন লিখলেনও না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন কৃষ্ণচন্দ্র নিষ্ক্রিয়, তিনি পাঠালেন এক পত্র, লিখলেন, 'অর্ধেক বঙ্গের ভার আমার উপর ন্যস্ত। আমি কারও বশ্যতা স্বীকারে সম্মত নহি। আশা করিয়াছিলাম, আমার ন্যায় নারীর দ্বারা যাহা সম্ভব, আপনি পুরুষ, আপনার দ্বারা তাহার অধিক সম্ভব হইবে। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, আপনি পুরুষ হইবার যোগ্য নহেন। আপনার আচরণে প্রীত হইয়া এইসঙ্গে যে উপঢৌকন পাঠাইলাম অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন। মহারাজার আসন ত্যাগ পুবক এই শাড়ি ও শাঁখা পরিধান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে সুখী হইব।'

ভোর হয়ে আসছে। কুটীর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এখনো পাখি ডাকেনি; পুব-আকাশে চমকে ওঠেনি আলো। কিন্তু আলো হতে আর দেরি বিশেষ নেই। সকাল হলেই রওনা হতে হবে। আজই নাটোর অতিক্রম করে মালঞ্চী ঈশ্বরদি পার হয়ে পদ্মার কিনারে যদি বিকেলের আগে পৌছতে পারেন তার বিশেষ চেষ্টা দরকার।

অনেকদিন বাদে ফিরছেন দেশে। মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে অনেকদিন পরে। কিন্তু খানাকুল কৃষ্ণনগরের রায়বাড়ির ঐ ফুলঠাকুরানীর কথা ভাবলে একটু ভয়ও হয়। উনিও নারী-জাতির একজন, কিন্তু মনের জোরে পুরুষদেরও বুঝি পরাস্ত করতে পারেন। পুত্রের সঙ্গে মতের মিল নেই, সেইজন্যে পুত্রস্নেহের সঙ্গে আপোস করে নিজেকে পুত্রের কাছে নত করেননি, পুত্রের মতে মত দেননি। তাঁর নিজের মতে তিনি দৃঢ়, নিজের পথে অটল। তাঁর পুত্র রামমোহন সৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়ে এমন ঘোর অনাচারী ও নাস্তিক হয়ে উঠল কি করে এই তাঁর আক্ষেপ; ব্রাহ্মণের ছেলে, তার উন্নতির জন্যে তাকে পড়ানো হল আরবি ফারসি, কিন্তু পরিণাম দাঁড়াল অন্যরকম, ছেলেটা হয়ে উঠল

মুসলমানের অনুরক্ত, সাজপোশাকে পর্যন্ত তার ঐ রুচি। তার উপর হিন্দুধর্মের উপর প্রতি এই আক্রোশ।

অনেক বার রামমোহন বুঝিয়েছেন তাঁর মাকে, বলেছেন, 'আমি কখনো হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিনি, উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম প্রচলিত তাই আমার আক্রমণের বিষয়।'

বার বার ঐ কথা বুঝিয়েছেন তাঁর মাকে ; কিন্তু তিনি কিছুতেই ওকথা বুঝতে চান নি। পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ অবশ্যই আছে, এ কথা অস্বীকার করেন না রামমোহন ; কিন্তু সে স্নেহের কোনোরূপ প্রকাশ আর তিনি দেখতে পান না।

আজ এতদিন পরে সেই মাতার নিকট গমন করছেন রামমোহন। রাধানগরে চলেছেন তিনি। এবারের সাক্ষাৎ যেন সুখের হয়, এইমাত্র তাঁর কামনা। পৌঁছে যেন দেখেন যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এইমাত্র তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু, মানুষে যা প্রস্তাব করে ভগবান তা নাকি ভেস্তে দেন—এই রকম একটি ইংরেজি প্রবাদ আছে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা নিয়ে দেশে পৌঁছলেন রামমোহন, আত্রাই ঘাট থেকে রওনা হবার পর পথে তাঁর কেটে গেছে আরো সাত দিন। পথের ক্লান্তি আছেই, কিন্তু গৃহে ফিরে দেখেন প্রবল অশান্তিতে সারা রাধানগর পরিপূর্ণ। জগন্মোহন গত হয়েছেন ; গৃহসংলগ্ন শ্মশানে প্রকাণ্ড জনতা— সকলেই যেন উন্মত্ত, সকলেই যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা লোকান্তরিত। কিন্তু তাঁর এই পরলোকগমনের জন্যে কারো চোখেমুখে কোনো শোকের চিহ্ন যেন নেই, তাদের সকলের মধ্যেই বিষম ব্যস্ততার লক্ষণ।

—কি ব্যাপার? এত লোক কেন? এত কোলাহল কেন? এত কলরব কিসের? এত বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন কি কারণ?

অকারণেই বুঝি প্রশ্ন করতে লাগলেন রামমোহন। এতদিন পরে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেজন্যেও কারো কোনো ঔৎসুক্য নেই, আগ্রহ নেই। চাপকানে, পায়জামায়, শালের পাগড়ি-টুপীতে সজ্জিত এই বিরাট পুরুষটির আবির্ভাব যেন চোখেই পড়ছে না কারো। রামমোহনের সঙ্গে আগত পাইক-বরকন্দাজেরা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে থমকে।

কৌতূহল থামে না। রামমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের এ শব্দ, কেন এ হট্টগোল? কি, হয়েছে কি?

—জগন্মোহন গত হয়েছেন।

—তা তো জানি, তা তো শুনলাম। কিন্তু এত কলরব কেন?

—বউঠাকুরানী সতী হয়েছেন।

সতী হয়েছেন? সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে উঠল, সর্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হয়ে উঠল রামমোহনের। সতী হয়েছেন অলকমণি? অর্থাৎ এতদিন তিনি বুঝি তাহলে সতী ছিলেন না? স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের বুঝি সতী হতে হয়?

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রামমোহন। অদূরে জ্বলছে ঐ চিতা। এই কলরব-কোলাহল ঠেলে আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে, প্রবল উদ্যমে বেজে উঠছে বাদ্য, চিতা থেকে গাত্রোত্থান করার চেষ্টা করছে বউদি অলকমণি—এখনো তবে প্রাণ আছে। ঐ, চেপে ধরছে ওরা ঐ বাঁশ দিয়ে। দ্বিগুণ উৎসাহে বেজে উঠছে বাদ্য, শব্দ করে উঠছে কাঁসর ঝাঁঝর। থেমে গেছে আর্তনাদ।

অনড় ও অটল ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন রামমোহন। এই বিপুল জনসমুদ্রের মাঝে তিনি সামান্য একটি তৃণখণ্ড মাত্র। কিন্তু স্রোতের আলোড়নে তৃণখণ্ডটি যেমন ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফিয়ে বেড়ায়, তাঁর মনও অবিকল তেমনি আন্দোলিত হয়ে উঠেছে।

মনে-মনে কেবল বললেন, আমি কখনো হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নি, ঐ নামে যে অনাচার প্রচলিত তাই আমার আক্রমণের লক্ষ্য।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু স্থির হওয়া বড় কঠিন মনে হল। মনে হল, ঐ চিতানলের আগুনে তাঁর, সর্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, জ্বালা করে উঠছে সর্বশরীর।

চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকালেন তিনি। এখনো অন্দরে যান নি, এখনো দেখা হয়নি মায়ের সঙ্গে।

চিতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে তিনি যাত্রা করলেন অন্দরের উদ্দেশে। শরীর ক্লান্ত, কিন্তু পদক্ষেপ এখনো দৃঢ়। বহিরাঙ্গন পার হয়ে অন্দরে প্রবেশের দরজা অতিক্রম করে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের উঠোন ডিঙিয়ে প্রশস্ত বারান্দায় পদধ্বনি তুলে তিনি হাঁটতে লাগলেন, একে-একে প্রতিটি ঘরের দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করতে-করতে হেঁটে চলেছেন, আর মাঝে মাঝেই দৃপ্ত কণ্ঠে ডাকছেন—মা মা।

কিন্তু উত্তর নেই কারো। দাসীরা শুধু দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে।

দাসীরা সব নূতন। এই মানুষটিকে চেনে না কেউ। তারা অন্দরে এই অচেনা আগন্তুককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। হিন্দুগৃহের অন্তঃপুরে কে এল এই মুসলমান ?

—মা কোথায় ?

একটা বুড়ি দাসী সাহস করে এগিয়ে এসে বলল, মা কে ?

—ফুলঠাকুরানী।

দক্ষিণদুয়ারি ঘরে তখন তারিণী দেবী একা বসে চোখের জল ফেলছেন। সম্মুখে হঠাৎ পুত্রের আবির্ভাব দেখে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, খবব পেয়েছিস, রামমোহন, খবর পেয়েছিস ?

অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন রামমোহন, বললেন, এ কি সর্বনাশ করতে দিলে মা ? এ কী হয়ে গেল ?

—কি হয়েছে ?

—কি না হয়েছে বলো। দাদার মৃত্যুতে শোক নেই কারো ? শ্মশানে ঐ উল্লাস ? সতী হল বধূঠাকুরানী ? কেন, কেন, কেন। কেন তুমি বাধা দিলে না। কেন দিলে না বলো।

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন তারিণী দেবী। ঐ দুই চোখে যেন জ্বলে উঠেছে দুইটি চিতা— দু চোখে আগুন জ্বলছে। বললেন, আমি মুহ্যমান হয়ে বসে আছি শোকে, কি হচ্ছে কি ঘটছে, কেমন করে জানব বলো।

—তোমার বিনানুমতিতে কোন্ কাজ কবে হয়েছে, বলো। তোমার অনুমতি ওরা নেয়নি, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কর্। আচকানে ঢাকা রামমোহনের দুই হাত ধরে তারিণী দেবী বললেন, বিশ্বাস কর্, পুত্রশোকে আমি পাগল হয়ে আছি। আমার রাধাগোবিন্দ জানেন আমার কিংদশা।

এ কথা অবিশ্বাস করছেন না রামমোহন, কিন্তু তাঁর আদেশ ছাড়া ঐ অঘটন ঘটতে যে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাই তিনি সে কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তারিণী দেবী কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বোসো। বোসো।

রামমোহন শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, না। বসব না। যে-গৃহে এ ধরণের অনাচার চলে সে গৃহ আমার নয়।

রওনা হলেন রামমোহন, চলে এলেন বারান্দায়। তারিণী দেবীও এলেন বেরিয়ে, পিছন থেকে ডাকলেন, রামমোহন।

—বাধা দিয়ো না মা। আমি চললাম। প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি— এই প্রথা রদ করতে আমার জীবন সমর্পণ করলাম। যতদিন বন্ধ করতে না পারি ততদিন আমার বিশ্রাম নাই।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তারিণী দেবী। অদূরে ঐ মন্দিরে স্থাপিত তাঁর বিগ্রহের নাম মনে-মনে জপ করে তিনি মনে-মনেই তার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন।

পাইক-বরকন্দাজেরা ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। রামমোহনকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরতে দেখে তারা চমকিত হয়ে উঠল।

রামমোহন বললেন, পালকি উঠাও।

দেখতে-না-দেখতে উঠে পড়ল পালকি। কোন্ দিকে যেতে হবে? জানতে চাইল বেয়ারারা।

রামমোহন বললেন, ফিরে চল। যে পথে এসেছ, সেই পথে।

দপ্তরে সেই ডিগবি সাহেব, সান্ধ্য বৈঠকে সেই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী আর স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী। কয়েক সপ্তাহ বাদে ফিরে এসেছেন রামমোহন, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর মুখের ভাবে যেন পরিবর্তন এসে গেছে অনেকটা। চিবুকের উপর যেন দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

এ পরিবর্তনের কারণ জেনেছেন সকলেই। সকলের সহানুভূতি থাকলেও সমর্থন যেন নেই সকলের। সংস্কার ব'লে তো একটা কথা আছে। সে জিনিস গায়ের চামড়ার মতই অনেকটা—বর্জন করা কঠিন।

এইজন্তে রামমোহনের যুক্তি তাঁরা মানছেন, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায়কে স্বীকার করে নিতে যেন বাধছে।

হরিহরানন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। রাঙাবাস পরিহিত শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত ঐ মানুষটির মুখের দিকে তাকান রামমোহন।

এই মানুষ তান্ত্রিক বামাচারী। এই আসরে এরই পাশে বসে আছেন জন-কয়েক মারোয়াড়ী জৈন ব্যবসায়ী। এঁদের সঙ্গে জৈনধর্ম নিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে রামমোহন কল্পসূত্র অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

তা নিন। তবুও তাঁর মনে শান্তি নেই। শান্তি নেই নানাকারণে। মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যে-শপথ করে এসেছেন তা পালন করার জন্যে তাঁকে যদি প্রস্তুত হতে হয় তাহলে রংপুরে থাকলে তা হবে না। চাকুরিটার উপর মায়া কমে গিয়েছে আগে থেকেই, এখন ক্রমশই সে মায়া আরো শিথিল হয়ে আসছে। তার উপর, অশান্তির আরও কারণ ঘটাচ্ছেন দেওয়ান গৌরীকান্ত। তিনি নাকি রামমোহনের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করে তুলছেন কতকগুলো বদলোককে। ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবাদ প্রচারের অধিকার সকলেরই থাকা উচিত, গৌরীকান্ত কেন-যে তা ব্যক্তিগত আক্রোশ মনে করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, বোঝা কঠিন।

এইভাবে দিন কাটছে একে-একে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে চলেছে ক্রমশ। ক্রমশ বছরও কেটে গেল।

বছর তো অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রামমোহন অগ্রসর হতে পেরেছেন কতখানি? তাঁর শপথ রক্ষার জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছেন কতটা? মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। রংপুর পরিত্যাগ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তিনি। মনে হয়, প্রকৃত কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে বসে থাকলে প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্র যেন তিনি পাবেন না।

বিষয়কার্যেই তিনি এখানে লিপ্ত আছেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান কাজ তিনি বিস্মৃত হন নি। প্রত্যহই সন্ধ্যার অবসর কেটে যাচ্ছে ধর্মালোচনা করে ও শাস্ত্রীয় তর্ক করে। এর দ্বারা হয়তো প্রত্যহই তিনি তাঁর অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হতে পারছেন— এক এক সময় নিজের উপর বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে তিনি এইরকম ভাবেন।

ভাবেন, এ-বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ডিগবি-সাহেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় আবদ্ধ হয়ে আছেন বলেই হয়তো ছেড়ে আসতে পারেন না রংপুর।

কলকাতায় আসার জন্যে তিনি বিশেষ ব্যাকুল হয়েছেন। মনে-প্রাণে তিনি কলকাতাকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছেন। কিন্তু এই

শহরের অবস্থা কেমন? এখানকার যা আবহাওয়া তাতে এই স্থানটি তাঁর কর্মের জন্তে প্রশস্ত কি না, কে বলবে।

চারদিকে কেবল ক্লেদ আর গ্লানি। পথঘাটের অবস্থাও যেমন সমাজের অবস্থাও তেমনি। রাস্তার দু-পাশে খাড়া-খাড়া নালায় পচা জল নোংরা হয়ে জমে মশার বাসা তৈরি করেছে, জঞ্জালে-জঞ্জালে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছির ঝাঁক। দিনে মাছি, রাত্রে মশা। পরিচ্ছন্ন পথঘাট তৈরি হবে-হচ্ছে করেই সময় কেটে চলেছে। বউবাজারের বুকে লেবুতলা থেকে একটা রাস্তা পটলডাঙার গা দিয়ে পুর্বদিকে সোজা চলে এসে মিশেছে মানিকতলার কাছে, শিয়ালদার কাছে বৈঠকখানা থেকে সাকু্লার রোডকে টেনে মানিকতলা পর্যন্ত নিয়ে যাবার কথা হয়ে আছে কিছুকাল হল, কিন্তু এখনো জায়গাগুলো বনবাদাড়ে আর খানাখন্দেই ভরে আছে। পোস্তা থেকে চিৎপুর ভেদ করে যে-রাস্তাটা সিমলে পার হয়ে মানিকতলা পর্যন্ত সটান চলে গেছে তার অবস্থারও কোনো উন্নতি হয়নি। শুকনোর দিনে ধুলো, বর্ষার দিনে কাদা।

আর, পাড়ায়-পাড়ায় চলেছে আখড়াই ও হাফ-আখড়াই। নন্দোৎসবের কীর্তনে আর দোলযাত্রার আবিরে মগ্ন হয়ে আছে সকলে। বুলবুলির লড়াই আর ঘুড়ির খেলা ধনীনন্দনদের আনন্দের উপকরণ।

ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণদের মহোৎসব চলেছে বলা যায়। তাঁরা তাঁদের পাদোদক ও পদধূলি দিয়ে ধনোপার্জন করে চলেছেন। তাঁরা নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এমন নিপুণভাবে যে, তাঁদের উদ্দেশে নৈবেদ্য ও অর্থ উৎসর্গ করলেই ইহলোকের সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

যুবকেরা বীণ সেতার তবলা ও গণিকা নিয়ে মহা আনন্দে দিনপাত করে চলেছে। কৃষ্ণযাত্রা আর কবির লড়াইও তাদের কাছে বড়ই শখের আর সুখের জিনিস।

এইভাবে কাটছে কলকাতার দিন। এমনি একদিন সকাল বেলা ছাতু-বাবুর লোক ঘোড়া নিয়ে ছুটে চলেছে শোভাবাজারের দিকে। ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ছে পথের ধুলো।

রাজা রাজকৃষ্ণের গৃহের সিংহ-দরোজার সামনে দাঁড়াল এসে সেই অশ্বারোহী দূত।

ঘোড়া থেকে নেমে দারোয়ানকে সে বলল, রাজাবাহাদুরকে খবর দাও—হরুঠাকুর মারা গিয়েছেন।

কবির দলের পৃষ্ঠপোষক ব'লে তাঁর পিতা নবকৃষ্ণের মত রাজা রাজকৃষ্ণেরও খ্যাতি ও খাতির আছে ; তাই তাঁর কাছেই খবরটা এল প্রথম।

এখানে প্রথম খবর আসতেই, অবিলম্বে চরদিকে ছড়িয়ে গেল সে সংবাদ— চড়কডাঙা থেকে আরম্ভ করে কাঁটাপুকুর পর্যন্ত, বাদুড়বাগান নেবুতলা গোয়াবাগান হরিতকীবাগান ঠনঠনিয়া শাঁখারিপাড়া— সর্বত্র। নদীর স্রোত পার হয়ে ওপারেও— ভাগীরথীর পশ্চিম কিনারে।

চুঁচুডার কানাগিন্নি হালদারবাড়ির অন্দর থেকে ফটক পার হয়ে হনহন করে ছুটছে। কি-একটা দুঃসংবাদ বহন করে যেন সে চলেছে রায়বাড়ির দিকে। সংবাদটার গুরুত্ব হয়তো ততটা বোঝেনি, কিন্তু হালদার-মশাইয়ের পুত্র নীলরত্নবাবুব হালচাল দেখে তাব মনে হয়েছে খবরটা খুব বড। খুবই মর্মাহত হয়েছেন তিনি, কানাগিন্নি স্বচক্ষে দেখে এসেছে। যে খবর সে নিজে পেয়ে গেছে, সে খবরটা আর-পাঁচ জনকে না জানালে বুঝি শান্তি নেই তার।

রায়বাডির পাকা উঠোনে পা ফেলতে-ফেলতে সে উঠে এল রোয়াকে, সিঁডি ভাঙতে ভাঙতে বলতে লাগল, ও রে চাঁপা, ও বে চাঁপি, শুনেছিস খবর ?

কানাগিন্নির গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাধা। তার চলার ভঙ্গিতে তার দু-পায়ের চরণপদ্ম বেজে উঠল ঝুমঝুম করে। জিজ্ঞাসা করল, কি গো গিন্নি, কি খবর, চাঁপা তো আসে নি।

—না এল। তাকে দিয়ে আমার কোন্ কাজ ?

—কিন্তু কি খবর বলছিলে ?

কানাগিন্নি বলল, রামরাম বসু মরেছে, শুনে এলাম ও-বাডিতে।

রাধা বলল, সে আবার কে গো ?

—কে জানে কে। ফোর্ট উইলম কলেজে নাকি পণ্ডিতি করত, অনেক কেতাব নাকি লিখেছে।

রাধা তাকে বুঝি বাধা দিল, বলল, বুঝলাম বুঝলাম বুঝলাম। তা, এ খবর নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পডলে কেন।

কেন ব্যস্ততা, কি করে বোঝাবে কানাগিন্নি। নিজে থেকে আর কি সে ব্যস্ত হয়েছে, নীলরত্নবাবু ব্যস্ত হয়ে রওনা হচ্ছেন রামরামের মৃতদেহ দেখতে—তাতেই তার মনে হল বুঝি খুব বড খবর এটা।

কানাগিন্নি বলল, ও-বাড়ির কাণ্ডই আলাদা। এই তো, দিন-কতক

আগে ও-বাড়ির কর্তাবাবুর সে কী শোকের ঘটা। শোভাবাজার থেকে পেয়াদা এসে খবর দিল— হরুঠাকুর মরেছে। খবর শুনেই হুকুম হল, সাজাও বজরা, কলকাতা যাব। বলা মাত্র কাজ, ধড়াচুড়া চড়িয়ে বুড়োকর্তা রওনা হলেন কলকাতায়।

রাধা বুঝি চমকেই উঠল, বলল, সে কি গো গিন্নি? মরেছে নাকি হরুঠাকুর? আমার যে বড় সাধ ছিল গিন্নি, এ বাড়িতে একবার কবির আসর বসাই। তাদের লড়াই দেখার বড সাধ আমার। আমার কোনো সাধই কি পুর্ণ হবে না, গিন্নি?

কানাগিন্নির তাজা চোখের পাতা বুঝি নৃত্য করে উঠল, মাথা নীচু করে রাধার চরণপদ্মের দিকে চেয়ে বলল, হবে গো হবে। সব সাধ পুর্ণ হবে। চাঁপা আসবে না আজ? আলতা মুছে আছে দু পায়ে, রাঙা করে দেবে না সে?

রাধা হাসল, উত্তর দিল না এ কথার।

হুগলী-নদীতে স্ফীত হয়ে উঠছে জল, আবার সে জল নেমে যাচ্ছে ভাটার টানে। রাধার বুক-দুটিও আশায় অমনি স্ফীত হয়ে ওঠে, আবার কখন নেমে আসে নিরাশার ভাটা, স্তিমিত হয়ে আসে বুকের বাসনা।

এমনি ওঠা-নামা চলেছে নদীর জলে, আর রাধারানীর বুকের আশা-নিরাশাও অমনি ফুলে-ফুলে উঠে আবার দুলে-দুলে নেমে যাচ্ছে।

হুগলীতে হঠাৎ উঠল হাহাকার।

কি ব্যাপার? কি হল কার?

দেশের আর দশের সেবায় যাবতীয় ঐশ্বর্য উৎসর্গ করে বেহেস্তে নাকি চলে গেছেন হাজি মহম্মদ মহসীন।

দূর-দূরান্তের মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি নদীর জলতরঙ্গে কাঁপতে-কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। দরগায়-দরগায় উপাসনা আরম্ভ হয়েছে।

চাঁপা বলল, নদীতে লোক ধরে না। কলকাতার ধনীরা বজরা ভাসিয়ে-ভাসিয়ে এসে পৌঁছেছে নদীর ঘাটে। ধনীদের এত অস্থির হওয়ার দরকার কি বুঝি না। অধীর হবে গরিব-দুঃখীরা— তারাই উপকার পেত ওই মানুষটার দৌলত থেকে।

রাধা নিশ্বাস ফেলে বলল, ধনীদের বুঝি শখ থাকতে নেই? তারা শখ করে বিয়ে করতে পারে, শখ করে শোক করতে বুঝি পারে না?

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পর-পর তিনটে মৃত্যুর খবর শুনল রাধা। এতে বিচলিত সে হয়নি, কিন্তু হয়তো ভাবছে তার নিজের মৃত্যু হয় না কেন। এই দাসী-বাঁদীর অরণ্যে, প্রাসাদতুল্য এই বিরাট অট্টালিকার বন্দীশালায় এ-ভাবে উপেক্ষিত একটা অসহায় প্রাণীর মত বেঁচে থেকে লাভ কি।

মুরলী আর নবীন মাঝে-মাঝে আসে, অনেক বড হয়ে গিয়েছে তারা। তাদের মুখের দিকে চেয়ে রাধা ভাবে, কত সুখী ওরা, ওরা কত স্বাধীন। মেয়ে হয়ে না জন্মে যদি সেও ছেলে হয়ে জন্মাত তাহলে অমনি মনের আনন্দে সেও নিশ্চয় ঘুরে বেড়াতে পারত।

অমনি স্বাধীন একটা জীবন চায় রাধা— অমনি বাধাহীন, অমনি বন্ধনহীন, অমনি সহজ, আর অমনি সরল।

রূপনারায়ণের কথা মনে হতেই বুঝি বিতৃষ্ণায় আর ঘৃণায় ভরে উঠে মন, নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। নিজেকে বুঝি সংযত করার চেষ্টা করে রাধারানী। আশ্চর্য পুরুষমানুষ। নেশা নিয়ে আর বাগানবাড়ির ফুর্তি নিয়ে মেতে আছে লোকটা। তার বাড়ির এই অন্তঃপুরে তারই অপেক্ষায় বসে আছে যে একটা প্রাণী— এ কথা তার মনে পড়বে কবে?

নদীর এপারে এই দীর্ঘনিশ্বাস, কিন্তু ওপার বুঝি শুধু আনন্দের নিকেতন? কলকাতা দেখেনি আজও রাধা, দেখতে বড ইচ্ছে হয়। অনেকদিন আগে খেয়ানৌকায় পার হয়েছে নদী, চানকে মামার বাড়ি যেতে। তারপর নদীটাও পার হয়নি। পার হওয়া দূরের কথা একদিন নৌকাতেও চাপল না। তা না হয় না হল, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে হয়। সমাজ সংসার সব জলাঞ্জলি দিয়ে। ওপারে বোধ হয় অনন্ত সুখ।

কিন্তু সুখ হচ্ছে শুটকি মাছ, জিভকে ছোটলোক ক'রে না নিলে তার স্বাদ নাকি পাওয়া যায় না। রাধা তার চাহিদাকে অনেক ছোট করে নিয়েছে সম্ভবত, তা না হলে অত সহজে সুখের প্রত্যাশা সে করে কী করে। একটা নদী পাড়ি দিতে পারলেই যদি অনন্ত সুখের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত তাহলে সুখ বড় সুলভ হয়ে যেত সংসারে।

কলকাতার জন্যে লালায়িত হয়েছে রাধা। চাঁপা তার কানে কোনো মন্ত্র দিয়েছে নিশ্চয়।

কিন্তু রামমোহনকে মন্ত্র দেয়নি কেউ, তিনি নিজেই নিজের মন্ত্রের উদ্‌গাতা। নিজের উচ্চারিত সেই মন্ত্রে তিনি নিজেই মুগ্ধ। এ অনেকটা কস্তুরী মৃগের মত অবস্থা। নিজের মন্ত্রের সুগন্ধে তিনি তাই ব্যাকুল হয়েছেন। তিনি কর্মের ক্ষেত্র খুঁজছেন এখন।

আর মাত্র একটা বছর ঘুরেছে। সহসা সুযোগ এসে গেল তাঁর। ডিগবি সাহেব ইংলণ্ডে রওনা হলেন। রামমোহনের মনে হল, তিনিও যেন মুক্ত। নিশ্বাস ফেলে বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে তিনি পদার্পণ করলেন কলকাতায়।

মাতার সঙ্গে দেখা হবার পর বছর-তিনেক কেটে গেছে। ক্ষুন্ন মাতাকে তিনি ক্ষুব্ধ করেছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা কোনো সমাদর পেলেন না। রাধানগরের নিকটেই রঘুনাথপুরে কিছুদিন মাত্র বাস করে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। মানিকতলার বাগানবাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলেন।

এতদিন বুঝি কেবল প্রস্তুতিই চলেছিল, এইবার আরম্ভ হল তাঁর জীবনের কাজ, তাঁর শপথপালনের ব্রত। তিনি তাঁর মত প্রচারের জন্যে চারটি পন্থা অবলম্বন করবেন স্থির করলেন— পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, কথোপকথন ও আলোচনা, সভাস্থাপন, বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করে দিলেন অবিলম্বেই।

তাঁর কানে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর ভ্রাতৃবধূর সেই সকরুণ আর্তনাদ। এখনো মনে পড়ছে তাঁর মায়ের নিষ্ক্রিয় সেই মূর্তিটি। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে, আত্মীয়বন্ধুদের এতবড়ই স্পর্ধা যে, বাড়ির বধূকে নিয়ে গিয়ে তারা অনায়াসে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারে? বাড়ির যে-গৃহকর্ত্রীর অঙ্গুলির নির্দেশে আর চোখের ইশারায় চলাফেরা করে সকলে, যাঁর প্রতিটি কথার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের পদক্ষেপ মেলানো, সেই ফুলঠাকুরানীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, তাঁর নির্দেশ না নিয়ে অতবড় ঘটনা ঘটে গেল, এ কথা মেনে নিতে কিছুতেই পারেননি রামমোহন, কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

মানিকতলার বাগানবাড়িতে বসে তিনি তাঁর শপথপালনের জন্য তাই প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন নিজেকে।

শাস্ত্র মন্থন করে করে তিনি খুঁজেছেন ঐ নির্দেশ, কোথায় আছে সেই বিধানটি— স্বামীর জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করে আত্মবিসর্জন দিতে হবে নারীদের। বেদ-বেদান্তই যদি এ-বিষয়ে ভট্টাচার্যদের একান্ত নির্ভর, তা হলে সেসব পুঁথিতে নিশ্চয় পরিষ্কার করে এ বিষয়ে নির্দেশ থাকা সংগত।

ঋগ্বেদের সূক্তিটি তিনি দেখেছেন— আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্রে। এর অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তিরা করুন। এই সূক্তিটিকে বিকৃত করে না নিলে এর কোনো বিকৃত অর্থ হতে পারে না। এইজন্যেই নিশ্চয় ঘটানো হয়েছে সেই বিকৃতি, করা হয়েছে-- আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্নে।

এই বিকৃতির দরুন শ্মশানের পুরোহিতদের সুবিধা হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। অগ্নির নামগন্ধ নাই যে সূক্তিতে, সেখানে অগ্নিকে আনা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই। অগ্রে দেবীর দিকে অগ্রসর হও ব'লে নির্দেশ দেওয়া আছে ঋগ্বেদে, তাকেই সামান্য পরিবর্তন ক'রে করা হয়েছে— অগ্রসর হও অগ্নিতে।

সামান্য একটু পরিবর্তনে অর্থের তফাত হয়ে গিয়েছে কতটা। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের মনে পড়ে সেই ইংরেজি প্রবচনটি, যার অর্থ হচ্ছে— একটি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট গলে যেতে পারে কিন্তু অমুক কাজটি তার চেয়েও অসম্ভব। সূচের সঙ্গে উটের কোনো সম্পর্ক নাই, তবুও মূল গ্রীক প্রবচন থেকে ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে ঘটেছে ঐ বিকৃতি, এবং সে বিকৃতি সকলে নির্বিবাদে মেনে নিয়ে তাই ব্যবহার করে চলেছে। প্রকৃত পক্ষে মূলে আছে— একটি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে রজ্জু গলে যাওয়াও সম্ভব, কিন্তু ইত্যাদি। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা খোঁজ করে দেখতে পারেন, গ্রীক ভাষায় উট আর রজ্জু প্রায় একই ধরণের দুটি শব্দ। অনুবাদকের অজ্ঞতার জন্যে ঐ ভুল অনুবাদটি হয়ে গেছে, কিন্তু সকলে তা মেনেও নিয়েছে। এতে অবশ্য কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু বেদের উক্তিকে বিকৃত ক'রে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ব্যবসায়ের সুবিধা করে নিয়েছে নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিয়ে এসেছে কত বড় একটা সর্বনাশ। এক-একটা সতীযজ্ঞে তাদের প্রাপ্য কত হয় তার খোঁজ নিয়েছেন রামমোহন। সমাজের সর্বনাশই যাদের মূলধন তাদের সঙ্গে কোনো আপোস নেই।

গ্রীক প্রবচনের বিকৃতি মেনে নিয়েছে দুনিয়ার নিস্পৃহ মানুষ, বেদের সূক্তির বিকৃতিও তেমনি মেয়ে নিয়েছে এখানকার অজ্ঞ মানুষেরা। কিন্তু এই অনাচার আর কতদিন এখানে চলবে? এর কোনো প্রতিকার করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চান তিনি।

ভ্রাতৃজায়া অলকমণির মুখ ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সম্মুখে। সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর মন দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে; পিতার সঙ্গে

এ বিষয়ে নিয়েও তাঁর মতপার্থক্য ছিল, এ নিয়েও অনেক কথা হয়েছে তাঁর। সেই মনের উপর আপন ভ্রাতৃজায়ার নিদারুণ পরিণতির চিত্রটি যতই ভেসে ওঠে মন ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে থাকেন তিনি।

শহরের নিভৃত এই কোণে তিনি তাঁর বাসস্থল নির্বাচন করেছেন— এই মানিকতলায়। আম জাম লিচু কাঁঠাল ও নারিকেলের গাছ দিয়ে সাজানো এই বাগানের প্রায় মাঝখানে তাঁর বাসগৃহ। বিত্ত তাঁর পূর্ব থেকেই কিছু ছিল, কয়েক বছর কোম্পানির কাজ করে তিনি বিত্ত অর্জনও যেমন করেছেন, সঞ্চয়ও করেছেন তেমনি। এখন তাই তিনি বিশেষ সংগতিসম্পন্নই হয়েছেন। আসবাবে, আলোর ঝাড়ে, গালিচায়, পর্দায় সুসজ্জিত করে নিয়েছেন এই বাগানবাড়ির ঘরগুলি।

এখানে বসে তাঁর চারি দফা কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ চলেছে।

তখনও স্পষ্ট করে আলো হয় নি, সকাল হয় নি পুরোপুরি। আচকানে পাগড়িটুপিতে আপাদমস্তক আবৃত করে তিনি ফিরে এলেন প্রাতর্ভ্রমণ সেরে। হাঁটতে-হাঁটতে উন্মুক্ত মাঠ পার হয়ে শিয়ালদার দিকে চলে গিয়েছিলেন আজ পায়ে-হাঁটা পথ ধরে-ধরে। —গড়পার পার্শিবাগান রাজাবাজার পার হয়ে। এই পথ ধরে হাটুরেরা আশপাশের গ্রাম থেকে শাকসব্জি নিয়ে আসে বৈঠকখানায় কিংবা বউবাজারে।

গৃহে ফিরে প্রশস্ত ফরাসের উপর জোড়াসন হয়ে বসলেন, পাশের কামরা থেকে হরিহরানন্দ এসে বললেন, কি, বেড়ানো হল ?

—হল। শহরের এ দিকটায় কারো দৃষ্টি নেই তীর্থস্বামী। এখান থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত একটা টানা রাস্তা ক'রে সার্কুলার রোডের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বেশ হয়।

—হাঁটার সুবিধে হয় বুঝি ? তীর্থস্বামী এসে বসলেন পাশে, বললেন, ভালোই হয়, তাতে শহরের একটা সীমাও বাঁধা হয়ে যায়।

রামমোহন বললেন, হবে হয়তো যথাকালে। একটা বড় কাজ তো হয়ে গেল !

—কিসের কথা বলছেন ?

—টাউন হল। তৈরি তো হয়ে গেল। সৎকাজে টাকার অভাব হয় না তীর্থস্বামী। উদ্যোগ চাই। উদ্যোগ ক'রে লটারি করা হয়েছিল বলেই টাকাটা জুটে গেছে। এখন আরো লটারির দরকার।

খানসামা চা দিয়ে গেল। চা পান সমাপ্ত করে তিনি উঠে গিয়ে বসলেন পাশের ঘরে। সেখানে ধড়াচুড়া পরিত্যাগ করে কটিবাসে শরীর অবৃত করে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন নীচে। ধীরে-ধীরে হেঁটে চললেন অনেকটা। খুরপাই দিয়ে মাটি তুলে-তুলে গাছের গোড়া আলগা করে দিচ্ছিল মালী।

রামমোহন বললেন, কিছু লোক লাগাও, রামদাস। বাগানটা পরিষ্কার করে নাও। অনেক জঞ্জাল জমেছে আমবাগানে। পাতাকুড়ুনিরা বুঝি আর আসছে না?

রামদাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসে বাবু, কিন্তু আসতে দিই না। ডাল ভেঙে নেয়, গাছ জখম করে দেয়।

—তবে তুমি নিজেই ব্যবস্থা করো।

ব'লে তিনি লিচুগাছ দিয়ে ঘেরা নিভৃত স্থানটির দিকে গেলেন। ওখানেই তিনি প্রত্যহ ব্যায়াম করেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঘর্মাক্তকলেবরে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর ঘরে।

. বিশ্রাম করা হয়ে গেলে তিনি এসে বসলেন চিঠিপত্র নিয়ে। যেগুলির উত্তরে দেওয়া আবশ্যক, একে-একে তার উত্তর দিলেন।

চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া শেষ হলে তিনি গমন করলেন অন্দরে। বারান্দায় বসলেন জোডাশন হয়ে। ঘাড পযন্ত ঝুলে পডেছে লম্বা চুল। দুই জোয়ান ভৃত্য প্রস্তুতই ছিল, তারা তাঁর সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করতে আরম্ভ করল। তিনি বসে-বসে মুগ্ধবোধের সূত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ যেন তৈলমর্দন নয়, তৈলস্নান। এ-যেন তাঁর স্নানের প্রস্তুতি না, জ্ঞানার্জনের প্রস্তুতি। তাঁর সর্বাঙ্গে গড়াচ্ছে তেল, ভৃত্যেরা তাদের যথাশক্তি প্রয়োগ করে সে তেল বসিয়ে দিচ্ছে তাঁর শরীরে।

অনেকক্ষণ এই তৈলচর্চার পর রামমোহন তার পূর্ণদীর্ঘতায় উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সিঁডি ভেঙে একটু নেমেই বালকের মত লাফ দিয়ে পড়লেন বিশালাকৃতি জলের টবে।

ঘণ্টাখানেকের মত নিশ্চিন্ত। স্নানের সঙ্গেসঙ্গে আরবি ফারসি ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি চলবে। তার আগে তিনি উঠবেন না ঐ টব থেকে। ওখান থেকে উঠে এসে বসবেন আহারে। তার আয়োজন প্রায়-প্রস্তুত। কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি পেতে, তার পাশে খঞ্চপোষ দিয়ে গেলাশের জল ঢেকে রাখা হয়েছে। কাগজপত্র নিয়ে গোলোকদাস নাপিতও তৈরি হয়ে আছে, আহারের সময় তাঁকে পড়ে শোনাবে।

ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল, দুধ— সবই তৈরি আছে। তিনি এসে বসলেই তাঁকে দেওয়ার জন্তে খানসামারা অপেক্ষা করছে।

যথারীতি আহার সমাপ্ত করে, গোলোকদাসের কাছে যাবতীয় সংবাদ শুনে, তিনি ঘরে গিয়ে শরীর টান করে শুয়ে পড়লেন দীর্ঘ টেবিলটার উপর, একটা চাদরও বিছানো নেই টেবিলে, ঐ কাঠের উপর নিজেকে প্রসারিত করে দিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে বিশ্রাম করে তিনি উঠলেন। পড়ার ঘরে গিয়ে তিনি বসলেন। কাগজকলম নিয়ে তিনি বসেছেন মনোনিবেশ সহকারে। বেদান্ত-অনুবাদে।

শাস্ত্রের বিধান রূপে প্রচলিত সমাজের বিভিন্ন সংস্কার প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রেরই বিধান কিনা, সকলের তা জানা আবশ্যক। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদীরা নানারকম বিধানের প্রবর্তন করেছে, তারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে।

দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রের বিধানাবলী লিখিত। বঙ্গভাষায় সেইসকল অনুবাদ করে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করতে পারলে, অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া বন্ধ হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস। এইজন্তে তিনি প্রথমেই হাত দিয়েছেন বেদান্তে। সহজবোধ্য বঙ্গভাষায় তিনি এর অনুবাদ করবেন, এই তাঁর সংকল্প।

দেশটা ভরে আছে অশিক্ষায়। এই কলকাতা শহরটা যেমন চৌরঙ্গীর সাহেবপল্লী থেকে আরম্ভ ক'রে কলুটোলা-বাগবাজারের দেশী পল্লী পর্যন্ত কেবল নালায় ও নর্দমায় পরিপূর্ণ— যত-সব ব্যাধির বাসা রূপে বিরাজ করছে শহরের বুকের উপর, অশিক্ষাও তেমনি মানুষের মনের নালা-নর্দমা-বিশেষ, ওগুলি বন্ধ করতে না পারলে স্বাস্থ্যোন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে তাঁর বিশ্বাস।

শ্রীরামপুরে পাদরী কেরী স্ত্রীলোকদের শিক্ষাদানের বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, সে শিক্ষাটা অবশ্য বেশির ভাগই মিশনারি-শিক্ষা, তা হোক। অশিক্ষার থেকে কুশিক্ষাটা অবশ্য খারাপ জিনিস, কিন্তু মিশনারি-শিক্ষাটা রামমোহনের মনোমত না হলেও তিনি সেটা কুশিক্ষা বলে মনে করছেন না। কিন্তু আপত্তি আছে একটি জায়গায়। হিন্দুধর্মের আচার-আচরণের চাপে পড়ে দেশের মানুষ অস্থির হয়ে উঠেছে, পরিত্রাতা যিশুর নাম শুনে তারা নিজেদের উদ্ধার-সম্ভাবনায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। সকলে তো আর রামরাম বসু নয়,

অতদিন ধরে পাদরীদের মুনশিগিরি ক'রে, খ্রীষ্টবাণীর অনুবাদ ক'রে ক'রে কলম পাকিয়ে, কেরীর সহায়তায় কোম্পানির কলেজে পণ্ডিতগিরির কাজ পেয়ে, এবং সর্বদা পাদরীদের সঙ্গে বসবাস করেও নিজের ধর্মটি বিসর্জন দেয় নি। কত বার কত গুজব উঠেছে— রামরাম খ্রীষ্টান হয়ে গেল; কিন্তু সেসব জনরব মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিয়েছে রামরাম। রামরাম এখন আর ইহজগতে নেই, তাই তাঁর আত্মার উদ্দেশে বুঝি শ্রদ্ধাই নিবেদন করেন রামমোহন।

নিজের ধর্ম পরিহার করার অর্থ হয় না কোনো। নিজের ধর্মে যদি কোনো গ্লানি চোখে পড়ে থাকে, তাহলে সে গ্লানি দূর করে নিজের ধর্মকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পার।

লোকে তাঁকে বলে, মৌলভী রামমোহন। সত্যি, মানুষ কত সহজে নিজের মত তৈরি করে নিতে পারে। আশ্চর্যই লাগে রামমোহনের। হিন্দুধর্ম নামে যে বিকৃত ধর্মটা এখন চলছে, রামমোহন তার সংস্কারপ্রয়াসী, রামমোহন তার সমালোচক— এইজন্যেই বুঝি তিনি হিন্দু নন? তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলমানী, এই পোশাক তাঁর পছন্দ— এইজন্যেই বুঝি তিনি মুসলমান, তিনি মৌলভী? পোশাক পরিবর্তন করলেই যদি ধর্ম বদল হয়ে যায়, তাহলে যে দিশী মানুষরা কোট-পাৎলুন পরে— দু-একজন আজকাল পরছে— তারা বুঝি সকলেই পাদরী? আর, ফিরিঙ্গিরা ধুতি আর নিমাস্তিন জামা পরলেই নিশ্চয় হিন্দু? তা যদি হবে, তবে গরিটির ঐ ফিরিঙ্গি-কবিয়ালকে হিন্দু বলে গ্রহণ করছে না কেন সমাজ? সে তো ধুতি-জামা পরেই কবি গায়, তার উপর তার গৃহিণীটিও তো আসলে একজন ব্রাহ্মণী।— তাকে অ্যাণ্টনি ব্রাহ্মণ বল না কেন, কেন তাকে তবুও বল অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি?

যুক্তি নাই কারো কোনো উক্তিতে। যুক্তিই যদি থাকবে তাহলে মানুষের ধুলো-মাখা পা ধুইয়ে সেই জল পান করলেই মোক্ষলাভ হবে বলে ধারণাটা হয় কেন। মোক্ষলাভ? পরলোকপ্রাপ্তিই যদি মোক্ষলাভ তাহলে ধারণাটা কিছু সত্যি। পায়ের ঐ ধূলোতে কত রোগের বীজ থাকে তার কি ঠিক আছে? সেই ধুলো-গোলা জল গিললে পরলোকপ্রাপ্তি অবশ্য সহজেই হতে পারে। আর, আর, স্বামীর জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করলেই অনন্ত স্বর্গ— আশ্চর্য অন্ধ বিশ্বাস, আশ্চর্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা।

এই বিশ্বাস ও এই ব্যাখ্যা— এই দুইটি বিষয় থেকে যদি মুক্ত করা যায়

দেশের মানুষকে তাহলেই দেশের মুক্তি। নইলে এর ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই রামমোহনের।

যারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ক'রে সমাজে জঞ্জাল সৃষ্টি ক'রে নিজেদের জীবিকার সুবিধা করে নিয়েছে, সমাজের তারা পরগাছা। সমাজের গা থেকে এদের টেনে না নামালে সমাজের কোনো উন্নতি তো নেইই, বরঞ্চ মৃত্যু অনিবার্য। এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

বেদান্তের তরজমা করতে-করতে বিকেল হয়ে এল। পাথরের রেকাবিতে আঙুর পেঁপে আর কলা নিয়ে সামনে রেখে গেল খানসামা। ধীরে-ধীরে আহার সমাপ্ত করে রামমোহন উঠে গেলেন সাজঘরে।

সাজ-গোছে তাঁর সময় একটু বেশি লাগে। এজন্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন। এতে তুষ্টই হন রামমোহন। সর্বসাধারণের সম্মুখে যখন বের হতে হবে, তখন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন হওয়াই কর্তব্য। রাজদরবারে যাওয়ার সময়ই কি কেবল পোশাক হতে হবে রাজোচিত, কেন, রাজার পোশাকের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে? অমন ব্যর্থ প্রয়াস না করে এই রকম সার্থক সাজ পরলেই বুঝি ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে হবে?

কিন্তু তর্ক করেন না বামমোহন। কোনো যুক্তির কথাও তোলেন না। সাজে-পোশাকে পরিপাটি হতে না পারলে তাঁর মন যেন পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বোধ হয় না। মনকে উৎফুল্ল রাখতে না পারলে মনের চাহিদা অনুযায়ী মনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে কী ক'রে?

প্রকাণ্ড আরশির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর মাথার দীর্ঘ চুল জড়িয়ে নিয়ে তার উপর পাগড়িটা বসিয়ে নিতে-নিতে নিজের মনেই একটু হাসলেন— হ্যাঁ। মৌলভীই বটে। সাজটা তাঁর মনের মতই হয়েছে।

কেউ বলে তিনি মুসলমান, কেউ বলে তিনি খ্রীষ্টান। নবকিশোরের কথা মনে হচ্ছে তাঁর, তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র নবকিশোর। জগন্মোহনের ও রাম-মোহনের বিষয়কর্ম তত্ত্বাবধান করা নিয়ে নবকিশোর হাজির হয়েছেন রংপুরে। রংপুরে রামমোহনকে তখন বেশির ভাগ দিনই খেসারির ডাল খেতে হয়, তাতে ঘি পর্যন্ত দেওয়া হত না। এইভাবে আহার করতে-করতে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনি তখন এক হাকিমের পরামর্শ নিলেন। রামমোহনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হাকিম তাঁকে মাংস খেতে বিধান দিলেন। বৈষ্ণববংশে জন্ম তাঁর, এ-পর্যন্ত কখনো মাংস স্পর্শ করেন নি। কিন্তু এবার তিনি আরম্ভ

করলেন মাংস খেতে। রামমোহনকে মাংস আহার করতে দেখে নবকিশোর বিচলিত হয়ে উঠলেন, দেশে ফিরে গিয়ে ফুলঠাকুরানীকে বললেন, 'খুড়ি, রামমোহন গোল্লায় গিয়েছে, পাঁঠা খেতে আরম্ভ করেছে, খ্রীষ্টান হয়েছে।' মুসলমান চিকিৎসক পরামর্শ দিল মাংস খেতে, সেই মুসলমানদের নির্দেশে মাংস খেয়ে তিনি হয়ে গেলেন কি না খ্রীষ্টান।

কেউ হিন্দু বলে স্বীকার করতেই রাজি না তাঁকে। এ বড় মজার ব্যাপার। হিন্দুধর্মের ত্রুটির কথা উল্লেখ করলেই যদি হিন্দুত্ব যায়, তবে যাক সে ধর্ম। যে ধর্ম এতই ঠুনকো, তার তবে টিঁকে থেকে লাভ কি। কিন্তু দোষ তো ধর্মের না, দোষ ওই ওদের—ঐ ধর্মব্যবসায়ীদের, সমাজের যারা পরগাছা। ধর্মকে তারা এমন ভাবে আগলে রাখতে চায়, যেন ওটা তাদের নিজের সম্পত্তি, ওর বিষয়ে কেউ কোনো কথা বলে এও ওদের অভিপ্রেত নয়। ওরা ওদের ঘরের বউকেও বুঝি এমনভাবে আগলে রাখে না! কেননা, ওরা নিশ্চয় মুখস্থ করে রেখেছে— দেশে দেশে কলত্রাণি ; এক বউ গেলে অন্য বউ নিশ্চয় পাবে ; কিন্তু ধর্মটা যদি কোনো প্রকারে হাতছাড়া হয়ে গেল তবে যে ভাতে মারা যাবে ওরা।

মুষ্টিমেয় কয়জন লোক বাঁচল কি মরল, তা দেখে কোনো দরকার নেই ; জনসাধারণের কল্যাণ কিসে, সেইটেই কেবল দেখার বিষয়।

বেদান্তের পুঁথি ভাঁজ করে রামমোহন এবার ঘর থেকে বের হলেন।

পুরনো পালকিটায় চারটে চাকা লাগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পালকিটা এখন তাই আর পালকি নয়, পালকি-গাড়ি। ঘোড়া জুড়ে দিল সহিস।

তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, এমন সময়ে গড়পারের নিমাইচরণ মিত্র এসে উপস্থিত হলেন, রামমোহন পরিহাস করে বললেন, কি হে মিত্রদা ? ঘরে বুঝি মন বসে না ?

—মন বসে। কিন্তু আমি বসি না। আমি চলে এলাম, কিন্তু মন পড়ে রইল ঘরেই। কিন্তু, যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

রামমোহন বললেন, তোমরা তো সব ব্ল্যাক আদমি। তোমরা যাকে বল হোয়াইট টাউন, জোড়াসাঁকো হয়ে সেই দিকে যাব।

—কিন্তু। নিমাই মিত্র একটু কিন্তু হয়ে বললেন, কিন্তু একা-একা যাওয়া কি ঠিক হবে। সবাই যে ক্ষেপে আছে, খুব শাসাচ্ছে।

—বটে ? হাতের ছড়িটা দেখালেন রামমোহন, বললেন, আক্রমণের নয়, আত্মরক্ষার অস্ত্র রইল সঙ্গে।

—ওই লাঠি দিয়ে কি হবে ?

রামমোহন বললেন, মূর্খের তো এইই ওষুধ। কিন্তু এটা শুধু নিরামিষ লাঠি নয়, এর ভিতরে হাড় আছে।

হাতের গুপ্তিটা তিনি একটু নাড়লেন, নেহাত আবরণে আবৃত, তা না হলে বিকালের এই পড়ন্ত আলোতেও ওর অভ্যন্তরের শাণিত ইস্পাত নিশ্চয়ই ঝিলিক দিয়ে উঠত।

রামমোহন বললেন, রংপুরেও এ ধরণের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে মিত্রদা। জ্ঞানচন্দ্রিকার লেখক গৌরীকান্ত ভটচাজ আমাকে জ্ঞান দেবার জন্যে একদল মানুষকে ক্ষেপিয়েছিল। তারাও কিছু করতে যখন পারে নি তখন ভরসা করি, এখানেও নিজেকে রক্ষা করতে পারব।

— সহিস তো যাচ্ছে সঙ্গে ?

হেসে উঠলেন রামমোহন, বললেন, হ্যাঁ সেই তো সাহস।

ঐ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, পায়জামায় আচকানে আর পাগড়িটুপিতে বিশাল আর বিরাট দেখাচ্ছে। এই মানুষটিকে আক্রমণ করতে যদি কেউ আসে, তাহলে তাকেও সাবাস দিতে হবে। তার সাহসও নেহাত কম নয়।

—রাত্রে আসছ তো মিত্রদা ? আমি কিছুকালের মধ্যেই ফিরে আসব।

খ্রীষ্টান, না, মুসলমান এই মানুষটি ? এর মধ্যে খ্রীষ্টানত্ব কোথায়, মুসলমান এ কোন্ খানে ? নিমাই মিত্র দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগল।

চাকা-লাগানো পালকিটাকে টেনে নিয়ে রওনা হল ঘোড়া। কোনো লাগাম নাই, বকলস নাই ; মোটা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটা পালকির সঙ্গে বাঁধা। সহিসকে পাশে বসিয়ে ঘোড়ার মুখের দড়ি ধরে বসেছেন রামমোহন।

দুষ্টু লোকের কি অভাব আছে সংসারে ? নির্বোধ লোকের সংখ্যাও তো কম না। হঠাৎ যদি কেউ আক্রমণ করেই বসে তাহলে ঐ একটি গুপ্তি দিয়ে সে আক্রমণ রোধ করা সম্ভব কিনা হয়তো ভাবছিলেন গড়পারের নিমাইচরণ।

রামমোহন বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে এসেছেন রংপুর থেকে। বিত্ত অর্জন ও বিত্ত সঞ্চয়ও করেছেন। এখানে এসে তিনি চারি প্রকারের কর্মসূচী নিয়ে কার্যারম্ভ করেছেন। সবই ঠিক। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর আছে আরো একটি কর্ম— সেটা বিষয়কর্মের মধ্যেই অবশ্য পড়ে। যে-কোনো কাজ করতে গেলেই অর্থের দরকার। অর্থ উপার্জনের পথও যখন তাঁর কাছে অচেনা না, তখন সেই চেনা পথটি পরিত্যাগ করাও অর্থহীন। জোড়াসাঁকোয় তিনি ব্রজমোহন মজুমদার

আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে সাহেবপল্লীতে যাবেন। সাহেব-পল্লীতে যাবার কারণ বৈষয়িক— রামমোহন তাঁর অবসর-সময়ে বেনিয়ানের কাজ করছেন, সময়ের অপচয় বিশেষ নেই, কিন্তু সাহেবলোকদের জন্যে কেনাবেচার এই কাজে মুনফা আছে।

এককালে চিত্তেশ্বরীর মন্দির থেকে কালীঘাটে যেতে হলে নিবিড় বন ভেদ করে নানা হিংস্র পশুর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে হত যাত্রীদের, কিন্তু এখন সে পথ পরিষ্কার হয়েছে। লালবাজারের গা থেকে চিৎপুর থেকে কসাইটোলা হয়ে চৌরঙ্গী পর্যন্ত সোজা সড়ক তৈরি হয়েছে।

দুই পাশে বড়-বড় নালা, মাঝখানে পথ। ঘোড়ার মুখের দড়ি ধরে আছেন তিনি। সেই পথ-বরাবর চলেছে রামমোহনের গাড়ি। দু পাশ থেকে লোকে চেয়ে দেখছে গাড়িটা।

জোড়াসাঁকোয় তিনি গাড়ি থেকে নামেন নি। ব্রজমোহনের বাড়ির ফটকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাঁক দিয়েছেন— কই হে ব্রজবাবু, আছেন নাকি বৈদান্তিক-মশায় ?

রামমোহনের সঙ্গে বেদান্তচর্চায় তাঁর খুব উৎসাহ, এইজন্যে রামমোহন তাঁকে বৈদান্তিক বলেই পরিহাসচ্ছলে সম্বোধন করছেন আজকাল।

ব্রজমোহন অন্দরে আছেন জেনে তিনি আর দাঁড়ালেন না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলেন ঠাকুরবাড়ির দিকে। দ্বারকানাথের সঙ্গে সোজাসুজি পরিহাস চলে না, নেহাত বালক সে। রামমোহনের বয়সের অর্ধেকও বয়স তার হয় নি এখনো। কিন্তু বয়সে তরুণ হলে হবে কি, দ্বারকানাথ রামমোহনের একজন সহায় ও সহচর হয়ে যে উঠবেই— এ বিষয়ে রামমোহনের যেন অসীম বিশ্বাস।

ঠাকুরবাড়ির সম্মুখের খোলা চত্বরে সাদা জরির কাজ করা ঝালরদার পালকি রাখা। দ্বারকা কোথাও যাচ্ছে বুঝি ? কোথায় চলেছে ?

বরকন্দাজ এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে জানাল, মানিকতলায়, মানিকতলার বাগানবাড়িতে।

এই মানুষটিকে নিশ্চয়ই চিনতে পারেনি বরকন্দাজ। রামমোহন তা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন বলেই তিনিও আর অপেক্ষা করলেন না। সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে চিৎপুরে পড়ে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ির গা দিয়ে সোজা চললেন সাহেবপল্লীতে।

মানিকতলার বাগানবাড়িতে ইতিমধ্যে একে-একে সমাগত হয়েছেন অনেকে। গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, নন্দকিশোর বসু এসেছেন কিছু পূর্বে। একে-একে দুটি পালকি এল তার পর, এলেন ব্রজমোহন মজুমদার ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিছুক্ষণ পরে এলেন হলধর বসু ও নিমাইচরণ মিত্র।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে, সমস্ত কলকাতা নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য। কিন্তু আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে এই বাগানবাড়ির প্রশস্ত ঘরগুলি। সুউচ্চ ছাত থেকে ঝলমল করে ঝুলছে বেলোয়ারি ঝাড, দেয়ালগিরিতে কাঁচের গেলাশে জ্বলে উঠেছে সাদা মোম। আলোর ফুলঝুরি বুঝি ঝরে পড়ছে ছাত থেকে।

বিরাট ফরাসের উপর শুভ্র তাকিয়া। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গে আলাপ করছেন সমাগত অতিথিবৃন্দ— হিন্দুধর্মের আচার ও আচরণ নিয়ে, সমাজের হিতসাধনের উপায় সম্বন্ধে, কলকাতার নালা বন্ধের জন্যে উদ্যোগী হওয়া বিষয়ে।

শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে ফটক ভেদ করে ঢুকল রামমোহনের গাড়ি।

তিনি ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন আসরে, প্রবেশ করেই বললেন, আমি দেরি করি নি। সন্ধ্যাটা আগেই নেমে পড়েছে।

তাঁর পরিহাসে সকলেই হাস্য করে উঠল।

হাতের গুপ্তিটা সোটাবরদারের হাতে দিয়ে তিনি ফরাসের উপর উঠে এলেন, বললেন. নিমাইচরণের ভয় ছিল— আমার নাকি অনেক শত্রু, পথে কোনো বিপদ না হয়।

দ্বারকানাথ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন, বললেন, তা আছে বই-কি। পুতুলপুজোর বিরুদ্ধে আপনি যতটা রুষ্ট, এখানকার সকলে আপনার উপর তার চেয়েও বেশি রুষ্ট হয়ে আছে।

—সকলে ? রামমোহন বললেন, ভুল ভুল। সকলে না। এই শত্রুরাজ্যে অনাত্মীয়ের দেশে আমার আত্মীয় আছে অনেক।

হলধর বসু বুঝি বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, কারা সেই আত্মীয় ?

মৃদু হাস্য করে রামমোহন বললেন, এই আসরে যাঁরা সমাগত— এঁরাই আমার আত্মীয়।

হরিহরানন্দ সানন্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন, বললেন, ঠিক।

রামমোহন বললেন, ধর্মের নামে সমাজকে শোষণ করছে একদল, আর-এক দল ধর্মের দোহাই দিয়ে উৎকট আমোদে মত্ত। সঙ বের হচ্ছে পথে-পথে। এসব ঠিক কি না, আমরা সকলে তা চিন্তা করব, তার পর আমাদের অভিমত আমরা প্রকাশ করব অকপটে। এতে যদি কারো আপত্তি থাকে—

বাধা দিয়ে উঠলেন দ্বারকানাথ বললেন, আপত্তি থাকবে কার?

—থাকতেও পারে তো কারও-কারও। যদি থাকে, আমরা জেনে নেব তাঁদের অভিমতটাও।

এর পর আরম্ভ হল বেদান্ত নিয়ে আলোচনা, ব্রজমোহন এ বিষয়ে একটু বেশি উৎসাহী, তিনি এগিয়ে বসলেন।

ভিতর-ঘর থেকে অনুবাদটি আনিয়ে রামমোহন পড়তে লাগলেন সেই অনুবাদ। নীরস গদ্যে বেদান্তের বাংলা তরজমা।

জয়কৃষ্ণ সিংহ বলে উঠলেন, ভট্টাচার্যরা খুবই বিচলিত হয়েছেন। পৌত্তলিকতার পক্ষে তাঁদেরও নাকি কিছু বলার আছে।

—বাধা নেই। তাঁরাও বলুন। যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন, এ গৃহে পদধূলি দিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

একটু থেমে রামমোহন আবার বললেন, যদি পক্ষেই তাঁদের কিছু বলার না থাকে আহলে তাঁরা এর সমর্থক হবেন কেন।

অনেক রাত্রি অবধি এই আলোচনা চলল। কিছু তর্কবিতর্কও হল। যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁরা সকলেই যে রামমোহনের মতের সমর্থক নন, এই আলোচনার ফলেই তা সহজে বোঝা গেল।

রামমোহন বললেন, এইটেই ভালো হল। যাঁর যা মত তিনি তা পোষণ করবেনই। এতে তিক্ততাও নেই, রুষ্ট হবারও কারণ নেই। আলোচনার দ্বারাই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে।

এইভাবে নিয়মিত আলোচনা-সভা বসছে মানিকতলার বাগানবাড়িতে। এতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়তো হচ্ছে কারও, কিন্তু কেউ তার পরিমাপ করতে ইচ্ছুক নন। বেদান্তের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ ইতিমধ্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। এখন তার সারানুবাদে রত আছেন রামমোহন।

ইতিমধ্যে আত্মীয়দের নিয়ে যে-সভা তার নামকরণ হয়েছে। টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বৈকুণ্ঠনাথ রায় এই সভায় যোগ দিতে আরম্ভ করেছেন। ব্রজমোহন, দ্বারকানাথ, হলধর আর নন্দকিশোর বসু নিয়মিত যোগ দিচ্ছেনই। কিছুদিন হল রাজনারায়ণ সেনও আসছেন।

হৃষ্ট মনে এঁদের সঙ্গে শাস্ত্র-আলোচনায় দিনাতিপাত হচ্ছে তাঁর। রংপুরে থাকাকালে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল কলকাতার জন্যে। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, সে ব্যাকুলতা অকারণ নয়, এখন সত্যিই যেন তিনি পেয়ে গিয়েছেন তাঁর কর্মক্ষেত্র। কর্মের উদ্যমও তাই বেড়ে গিয়েছে তাঁর। তিনি উপনিষদ্-অনুবাদেও ব্রতী হয়েছেন।

আত্মীয়-সভার অধিবেশন নিয়মিত বসছে। এখন যাঁরা এই সভায় উপস্থিত হচ্ছেন তাঁরা কেবল আত্মীয় যেন নন, পরমাত্মীয়। বাইরে লোকে যা-খুশি মনে করুক—তিনি খ্রীষ্টান কিংবা তিনি মুসলমান— তাতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। আত্মীয়-সভার কাছে তিনি যে বিশেষভাবে আত্মপরিচয় দিতে পেরেছেন, এতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন তিনি। বীজ বপন করা মাত্রই তা মস্ত একটা গাছ হয়ে ওঠে না, তাঁর মালী রামদাস এই কথাটা প্রায়ই বলে, রামদাসের কথাটা মনে বড আশা দেয়, বাইরের লোক আজ তাঁকে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রচারিত এই মতের বীজ যদি কখনো মহীরুহ হয়ে ওঠে, সেদিন কেউ তাঁকে ভুল নিশ্চয় বুঝবে না।

শহর-কলকাতার জীবন এখনো চলেছে সনাতন প্রথায়। এখনো উৎসবের ঘট আছে, এখনো ঘটা আছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে নিয়মিত চলেছে উচ্ছৃঙ্খলতা। দোলের ফাগ ছোড়াছুড়ি, পিচকারী দিয়ে রঙ ছিটানো, হৈ হৈ উৎকট আনন্দ। জন্মাষ্টমীর উৎসব, নন্দোৎসবের সমারোহ।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, আমাদের বলাগড়ের পাশেই শ্রীপুর গ্রাম। সরস্বতী-পুজার খুব জাঁক হল। বাগ্‌দেবী নাকি বিদ্যার দেবী। কিন্তু উৎসাহটা বুঝুন। বিসর্জনের দিনে প্রতিমা-বিসর্জনের মিছিল চলেছে। শ্রীপুরের মনোরম ভট্টাচার্যের পুত্র মনোময় এক সঙ বের করে ঐ সঙ্গে। বিরাট মনুষ্যাকার একটি পুত্তলিকা নির্মাণ করে সেটা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় রেখে সম্মুখে রাখে এক জলপাত্র। পুলিস খবর পেয়ে সঙ-শুদ্ধ মনোময়কে ধরে নিয়ে যায়। দেবতার সম্মুখে এ প্রকার কদর্যাকার সঙ করায় অনেকে প্রতিবাদ জানায়; হয়তো শাস্তিও হত বড় রকমের; কিন্তু বলাগড় নীলকুঠির কুঠিয়াল বুড়ো কুর্টিস সায়েব তাকে খালাস করে নিয়ে আসে। কুর্টিস মানুষটা ভালো, তাই তার কৃপায় বেঁচে গেল মনোময়।

রামমোহন হাসতে লাগলেন, বললেন, মনোময় তো বেঁচে গেল, কিন্তু মেরে গেল বোধহয় ঐ গ্রামের মানুষদের। ঐ সঙ দেখে তারা কি শিখল? তারা নিশ্চয় বুঝল, সরস্বতী হচ্ছেন সঙের ঈশ্বরী। যাঁরা পুজার সমর্থক, তারা এ ব্যাপারে বাধা দিলেন না কেন।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, তাঁরা মজা দেখছিলেন। প্রথম বাধা দেন ঐ কুর্টিস। তাঁর কথা না শোনায় তিনিই খবরও দেন পুলিসকে। এবং তিনিই শেষপর্যন্ত ছোঁড়াটাকে বাঁচান।

—লোকটা কে হে অন্নদাপ্রসাদ?

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর সম্বন্ধে যতটা জানেন সব বললেন। একজন আর্ত মহিলাকে পরিত্রাণ করে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে চলেছেন। তিনটি পুত্র আছে তাঁর, এবং এক কন্যা।

স্তব্ধ হয়ে বসে শুনলেন রামমোহন সেই সমাচার। এই কথা শুনতে-শুনতে তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই দৃশ্যটা। সেই লেলিহান অগ্নিশিখা, ঘাতকের দলের মত সেই বলিষ্ঠ মানুষের মিছিল, কানের মধ্যে বেজে উঠল আর্তনারীর হাহাকার, আর ঢাক-ঢোল-কাঁসির শব্দ। সেদিন অলকমণিকে পরিত্রাণ করতে পারে নি কেউ।

ধরা-গলায় রামমোহন বললেন, খুব সাহস আছে।

—কার কথা বলছেন? ওই ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিসের নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, তারও সাহস আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সাহস ঐ মহিলার। সমাজের অত্যাচারকে তিনি অস্বীকার করতে পেরেছেন।

—জব চার্নকও এই রকম করেছিল।

—করেছিল। কিন্তু তা পুরনো হয়ে আপনাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে, তাই তার সাহস ততটা বুঝতে পারছি নে। কিন্তু এ যে একেবারে চোখের সামনে। আমার চোখের সামনে যতটা, আপনার তো তার চেয়েও বেশি। আপনি চাক্ষুষ দেখেছেন তাকে।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, চাক্ষুষ দেখেছি তো আরও একজনকে— অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গিকে।

রামমোহন বললেন, ঐ কবিয়ালকে পছন্দ করি নে আমি, কিন্তু ঐ মানুষটাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ ব'লে ওকে মনেই করে না কেউ; ওর পরিচয়, ও হচ্ছে একজন কবিয়াল। যদিও জানি, মুখে-মুখে কবিতা বাঁধা

সহজ কাজ নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে রুচি নিয়ে। ঐ রুচি যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে সরস্বতী-পুজার সঙও স্বীকার করতে হবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কি জিনিসেরই যে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন।

অন্নদাপ্রসাদ হয়তো এ বিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে পুরো একমত হতে পারলেন না, সেইজন্যে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, ওদের শক্তিও তারিফ করার মত, ওই শক্তির সঙ্গে যদি উপযুক্ত শিক্ষা ওদের থাকত তাহলে কবিয়াল নয়, কবি হয়ে উঠত ওরা। ভারতচন্দ্রের মত অন্নদামঙ্গল লিখতে পারত।

শিক্ষার কথা হচ্ছে। শিক্ষার ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে অনেক হয়েছে। সে শিক্ষার সুযোগ এখন দেশের মানুষ নিলেই হল।

চিৎপুরে শেরবোর্নের সেমিনারি খোলা হয়েছে পঁচিশ-ত্রিশ বছর হল— দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর এখানেই শিক্ষালাভ করেছেন। কলুটোলায় রামজয় দত্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার পর নিত্যানন্দ সেনও খুলেছেন একটা স্কুল; জোড়াবাগানে রামনারায়ণ মিত্র স্কুল বসিয়েছেন; হাটখোলায় বসেছে রীড সাহেবের স্কুল, ধর্মতলায় বসেছে ধর্মতলা অ্যাকাডেমি— চার-পাঁচ বছর হল ডেভিড ড্রামণ্ড নামে এক সাহেব এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা হয়েছে অনেকই। এখন সকলে শিক্ষার সুযোগ নিলেই হয়। গত বছর হাটারম্যান নামে এক সাহেব বৈঠকখানায় একটা নতুন ইস্কুল খুলেছেন। চারদিকেই কিছু-কিছু বিদ্যালয় বসেছে। সব নাম এখন মনেও পড়ছে না অন্নদাপ্রসাদের। এ ছাড়াও, প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্যে একটা স্কুল খুলেছেন মিসেস পিট, পিট বিবির স্কুল নামে তা পরিচিত হয়ে উঠেছে— মেয়েদের শিক্ষার জন্যে এ ধরণের স্কুল এর আগে আর হয় নি।

বেলা তখন বেশি হয় নি। অন্নদাপ্রসাদ আজ খুব সকাল-সকাল এসেছেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছেন, এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা এসে পড়বেন বলে অপেক্ষা করছেন। টাকী থেকে কালীনাথ রায় আর জোড়াসাঁকো থেকে দ্বারকানাথ এসে পৌঁছলেন এইমাত্র।

এঁরা কথা বলছেন এখানে এই ঘরে। আর বাইরে রাস্তায়-রাস্তায় ঐ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রেরা চলেছে তাদের স্কুলে।

মৌলালি থেকে বছর ছয়-সাতের ফুটফুটে একটি ছেলে ধর্মতলার রাস্তা

ধরে চলেছে, হাফ প্যাণ্ট ও গলাখোলা কোট তার পরনে, গলায় একটা চওড়া রঙিন মাফলার জড়ানো, হাতে বই। তার চোখ-তুটো জলজল করছে।

কয়েক বছর আগে মৌলালির দরগার লাগোয়া মাঠে চড়ক-উৎসবের দিনে একটি শিশুর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম আমরা, পৃথিবীতে তার পদার্পণের সংবাদ জানা গিয়েছিল সেই কণ্ঠস্বরে। এই ছেলেটি সেই— ডিরোজিও সাহেবের সেই বাচ্চা।

সেই বাচ্চাটি আজ কিশোর হয়ে উঠেছে। তার নাম হয়েছে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ওর শরীরের অনুপাতে নামটা যেন একটু বড়।

স্কুলে পৌঁছে দেবার জন্যে পিছনে-পিছনে চলেছে পেয়াদা। সঙ্গে কেউ আছে কি না-আছে সে খেয়ালই নেই তার। নিজের মনে সে দ্রুত পা ফেলে চলেছে আগে-আগে।

কুঁজো-সাহেবের পাঠশালায় চলেছে কিশোর ডিরোজিও। তার নামটা শরীরের তুলনায় বড় বলেই বুঝি বড-বড় পা ফেলে চলেছে ও। হয়তো তার নামের অনুপাতে বড হয়ে ওঠার জন্যে তার এই ব্যস্ততা।

ডেভিড ড্রামণ্ড মানুষটা কুঁজো। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলার অ্যাকাডেমিটা ঐ নামেই বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া স্কুলটার একটু বিশেষত্বও আছে, এখানেই প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং গ্লোবের ব্যবহার সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়, এইজন্যেই এর গুরুত্বও একটু বিশেষ ধরণের।

কিশোর বালকটি ঐ স্কুলে একজন সেরা ছাত্র রূপে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে। ছেলেটা এরই মধ্যে তু-এক ছত্র ইংরেজি ছড়া বলতে আরম্ভ করেছে নিজে বানিয়ে-বানিয়ে।

ড্রামণ্ড সাহেব তার সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর দাঁড়াবার এই ভঙ্গি দেখে কোনো-কোনো ছাত্র মজা পায়, কেউ-কেউ আবার ভয় পায় ; কিন্তু ডিরোজিওর মজাও নেই, ভয়ও নেই, সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ড্রামণ্ডের চোখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে সিকোয়েন্স অব্ টেন্স আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে চটপট করে।

ড্রামণ্ড তাঁর নিজের পিঠটা কুঁজো করে দাঁড়িয়ে ওর মসৃণ পিঠে ধীরে-ধীরে চাপড় দিয়ে বলেন, ভেরি গুড, নটি বয়।

এখানে পড়ানো হয় গ্রামার, কিন্তু অন্যান্য স্কুলে চলেছে ওয়ার্ড-মীনিং এবং খুব বেশি হলে স্পেলিং।

ধর্মতলায় ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের ছেলেরা শিখছে ইংরেজি ভাষা, আর অন্যান্য বেশির ভাগ স্কুলের ছেলেরা শিখছে ইংরেজি শব্দ।

বৈঠকখানার হাটারম্যান সাহেবের পাঠশালায় তখন সোরগোল পড়ে গিয়েছে। সর্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলে উঠছে— পম্‌কিন লাউকুমড়ো, অমনি অন্যান্য ছাত্রেরা সমস্বরে বলছে— পম্‌কিন্‌ লাউকুমড়ো।

হাটারম্যান সাহেব ঘরে-ঘরে ঘুরে-ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছেন। সর্দার পোড়ো এক-একটা শব্দ ঐ ভাবে বলে উঠছে, তা শুনে ছাত্রের দল একসঙ্গে বলে উঠছে ঐ শব্দ ও শব্দার্থ। অবশেষে একসঙ্গে তারা ছড়া কেটে চিৎকার করে মুখস্থ করছে পাঠ—

পম্‌কিন্‌ লাউকুমড়ো, কোকোম্বর শশা,
ব্রিন্‌জেল বার্তাকু, প্লোম্যান চাষা।

আবার বলছে—

নাই কাছে, নিয়র কাছে, নিয়রেস্ট অতি-কাছে,
কট্‌ কাট, কট্‌ থাট, ফলোয়িং পাছে।

বিভিন্ন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা চলেছে এইভাবে। কিন্তু ধর্মতলা অ্যাকাডেমির পঠনরীতি আলাদা। সেখানে এই ধরণের ঘোষানোর রীতি নেই।

কলুটোলায় রামজয় দত্তের স্কুলের ছেলেরাও পাঠ মুখস্থ করে চলেছে—

গাড্‌ ঈশ্বর, লাড্‌ ঈশ্বর, কাম্‌ মানে এসো
ফাদার বাপ, মাদার মা, সিট মানে বোসো।
ব্রাদার ভাই, সিস্টার বোন, ফাদার-সিস্টার পিসি
ফাদার-ইন-ল মানে শ্বশুর, মাদার-সিস্টার মাসি।
আই মানে আমি, আর ইউ মানে তুমি
আস্‌ মানে আমারদিগের, গ্রাউণ্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত
উইককে সপ্তাহ বলে, রাইস মানে ভাত।
ফিলজফার বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান চাষা,
পমকিন লাউকুমড়ো, কোকোম্বর শশা।

ইংরেজী-শিক্ষার দ্রুত প্রচলন চলেছে এই ভাবে। শব্দের অর্থ এই ভাবে কণ্ঠস্থ করাকেই রামমোহন শিক্ষার প্রচলন বলেছেন কি না ঠিক ধরা যায় নি। ধরা যায় নি বটে, কিন্তু এই শিক্ষাই তাঁর কাছে যে চরম শিক্ষা বলে স্বীকৃত,

এমন বোধ হয় না। বীজ বপন করার সঙ্গেসঙ্গে মহীরুহ হয়ে ওঠে না। এই ভাবে তারা যাই শিখুক-না কেন, এর দ্বারা ক্রমশ নিজেদের অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হবার পথ তারা অবশ্যই দেখতে পাবে একদিন।

আমাদের দেশে এসে বিদেশীরা অনেক কিছু নিয়ে যাচ্ছে। পণ্য নিয়ে যাচ্ছে তো বটেই, সেইসঙ্গে পুণ্যও নিয়ে যাচ্ছে বলা যায়। তাদের সংস্পর্শে এসে আমরাও নাহয় তাদের কিছু নিলাম, কারো কাছ থেকে নিলে ক্ষতিটা কোথায়। তাদের ভালোটুকু গ্রহণ করার মত মনের উদারতা থাকবে না কেন। কিন্তু কিছু নিতে হলে তাদের অনুকরণ নয়, কিছুটা তাদের অনুসরণ করতে হবে। আজ ফিলজফার বিজ্ঞলোক প্লোম্যান চাষা ব'লে চিৎকার নাহয় করা গেল, বিজ্ঞলোক হতে হলে এইভাবেই এগোতে হবে, নইলে চিরকাল যে থেকে যেতে হবে চাষা। —প্লোম্যানের মত চাষা নয়, চাষার মত চাষা।

কোন্ বিজ্ঞলোক পুরস্ত্রীকে নিক্ষেপ করতে রাজি হয় আগুনে? কোন্ বিজ্ঞেব বিধান এটা?

রামমোহন তাঁর পুঁথি প্রকাশ করে চলেছেন, আত্মীয়-সভার অধিবেশন চলেছে নিয়মিত। সেই সভায় নূতন এক আত্মীয়ের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল তাঁর।

যাকে বলা যায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল আলোড়িত করা, রামমোহন অনেকটা সেইভাবে সতীদাহ-প্রথা বন্ধের এবং পৌত্তলিকতা বর্জনের ও একেশ্বরবাদ প্রচারেব জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তাঁর এ ত্রিবিধ অভিযানে বিচলিত হয়ে উঠেছে চারিদিক, তাঁর বিরুদ্ধে শক্রর দল উঠেছে উত্তেজিত হয়ে।

এমনি একদিন বৈঠক বসেছে আত্মীয়-সভার। আমন্ত্রিতেরা সকলে বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন, তারই মধ্যে অচেনা ও অনামন্ত্রিত একটি মুখ দেখতে পেলেন রামমোহন।

সভা যতক্ষণ চলল ততক্ষণ রামমোহন কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন একে-একে— আমাদের দেশের মেয়েরা শারীরিক শক্তিতে পুরুষের চেয়ে হীন, এই সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের উপর নানাভাবে উপদ্রব করে থাকে। তারা হীন, এ কথা স্বীকার করে নিলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তাদের কি কোনোদিন সুযোগ দিয়ে দেখা হয়েছে যে, তাদের যোগ্যতা তারা প্রমাণ করতে পারে কিনা। আপনারা

সকলেই লীলাবতী ও ভানুমতীর কথা জানেন ; তাঁরা নারী, তবুও তাঁরা কি তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারেন নি ? যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে দুরূহতম শাস্ত্রতত্ত্ব শিক্ষা দেন, এবং মৈত্রেয়ী সম্যক্ রূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। এই যদি শাস্ত্রের উক্তি, এ উক্তি অস্বীকারের উপায় কি। স্ত্রীলোকেরা যে হীন তার প্রমাণ তবে কোথায়। আমরা আমাদের পুরস্ত্রীদের অন্তঃপুরের বন্দী-শালায় আবদ্ধ রেখে তাদের অজ্ঞান করে রাখব, এবং তাদেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করব যে, তারা হীন ? আমরা কি তাদের সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার মত শক্তির অধিকারী নই ?

অনেকক্ষণ কথা ব'লে রামমোহন বললেন, মুখে কিছুটা বললাম, সংকল্প আছে— প্রবর্তক আর নিবর্তকের কথোপকথন-ছলে এ বিষয়ের বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে রচনা করব।

এ সংকল্পের কথা শুনে আত্মীয়-সভায় কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঞ্চার হল। তেলিনীপাড়ার অন্নদাবাবু আর জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ দুজনে দুই তাকিয়ায় কনুইয়ের ভর রেখে কাছাকাছি হয়ে চাপা-গলায় কি যেন পরামর্শ করতে লাগলেন। তাঁদের পরামর্শের ধরণ দেখে বোঝা গেল, তাঁরা আজ রামমোহনের কথা শুনে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছেন।

সভা ভঙ্গ হলে একে একে সকলে গিয়ে নিজ নিজ পালকিতে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সোটাবরদার পেয়াদা বরকন্দাজ আর খানসামা পালকিবেহারার ভিড়ে গৃহের প্রাঙ্গণ প্রায় পরিপূর্ণ।

বেহারাদের নিশ্বাসপাতের হুশহাশ শব্দ সমেত এক-একটা পালকি যাত্রা করতে লাগল ক্রমশ।

সবটা মাথা ভরা বিরাট টাক, মসৃণ ভাবে কামানো দাড়ি আর গোঁফ, পরনে কোট আর পাৎলুন, কে এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি ?

রামমোহন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে ইংরেজিতে বললেন, মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে বিশেষ আনন্দিত হব।

আত্মীয়-সভার অনামন্ত্রিত আগন্তুক এই বিদেশী ভদ্রলোকটি স্মিত হেসে বললেন, আমার কোনো পরিচয় নেই। আয়্যাম এ ট্রেডার ইন ক্লক্স্ অ্যাণ্ড ওয়াচেস। আমার নাম ডেভিড হেয়ার।

তাঁর করমর্দন করে রামমোহন বললেন, আর, আমার নাম—

—আই নো ইউ। ইউ আর রামমোহন রায়। হু নোজ ইউ নট ইন ক্যালকাটা?

রামমোহন বললেন, আপনার নাম শুনেছি, আজ পরিচয় হল।

ডেভিড হেয়ার হেসে বললেন, আমিও আপনার নাম শুনে আসছি, আলাপ করার লোভ হল তাই আজ এসে পড়লাম আন্‌-ইনভাইটেড। ইউ গেভ এ ভেরি ফাইন স্পীচ টু-ডে।

একটু আশ্চর্য হলেন রামমোহন, তিনি তাঁর বক্তব্য তো জানালেন বাংলায়, এই বিদেশী ভদ্রলোকটি তা বুঝতে পারলেন কি করে, তাঁর ভালো লাগল কি করে। উনি কি শুধু ভদ্রতা করার জন্যেই ও-কথা বললেন?

—নো সার্, নো। আই কাণ্ট স্পীক বেঙ্গলি ওয়েল, বাট আই ক্যান ফলো ভেরি গুড।

—বাংলা আপনি বোঝেন?

—বুঝি। যে দেশে আছি, সে দেশের ভাষা না বুঝলে ব্যবসা চলবে কী করে?

দু-জনে হেসে উঠলেন একসঙ্গে। দু-জনে করমর্দন করতে লাগলেন।

হেয়ার এবার থেকে যেন নিয়মিত আসেন, এই অনুরোধ জানালেন রামমোহন। সানন্দে তিনি তাতে স্বীকৃত হলেন।

কোনো বাহন নিয়ে আসেন নি ডেভিড হেয়ার, না পালকি, না ঘোড়া। এসেছেন পদব্রজে।

—কোন্ দিকে থাকেন?

—লালদিঘির কাছে, বাঁকশালে।

এখান থেকে মাইল-তিন রাস্তা হবে বাঁকশাল। এ পথ নাকি বিশেষ কিছু না। এই বাগানবাড়ির পিছনেই যে রাস্তা, ওই রাস্তা ধরে লেবুতলায় পড়ে বউবাজার দিয়ে সোজা হাঁটা দিলেই তো লালদিঘি।

বিদায় নিয়ে রওনা হলেন ডেভিড হেয়ার।

চার দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন রামমোহন। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ তাঁর চলেছে। সেই কাজের সঙ্গে অর্থকরী কাজও করতে হচ্ছে তাঁকে। চার দফা কর্মসূচী কেবল আলাপ-আলোচনার আর কাগজে-কলমে জড়িয়ে রাখলেই কাজ হল না। তা প্রয়োগ করতে হবে কার্যক্ষেত্রে— তার জন্যে অর্থ দরকার। বেদান্তের অনুবাদ মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন,

এতেও প্রয়োজন হয়েছে অর্থ। সংগতিসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই তিনি, সঞ্চিত অর্থ ধীরে-ধীরে ব্যয় করে গেলে একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, এই জন্যে সঙ্গেসঙ্গে অর্জন করা দরকার।

বিকালের দিকে পালকিগাড়ি চেপে তিনি তাই চলে যান সাহেবপাড়ায়। প্রত্যহ নিজে না গেলেও হয়, তবু তিনি নিজেই যান একবার করে। এতে কাজের শৃঙ্খলা থাকে বলে তাঁর ধারণা।

দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা সময়। একটা দিনের পক্ষে এ সময় যথেষ্ট। যারা কাজ করে তাদের সময়ের অভাব হয় না। সময়ের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারলে সময় সর্বদাই সদয় ব্যবহার করে। কিন্তু তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও যদি তাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সময় বিরূপ না হবে কেন। প্রত্যহ প্রভাতে দরজা খোলামাত্র অনুগত ভৃত্যের মত দুয়ারে এসে হাজির হয় সে, সে চায় হুকুম। কখন কি করতে হবে, কোন্ কাজের পর কোন্‌টা, তার নির্দেশ জানতে চায়। একটা পল কিংবা বিপল ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু দুয়ারে দণ্ডায়মান সেই সময়ের মুখের দিকে না চেয়ে যদি তাকে অবজ্ঞা ও অবহেলা ক'রে তার পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া হয় অছিলায় আর আলস্যে, সময় তখন বক্রনেত্রে একবার মাত্র চেয়ে দেখবে সেই অবহেলার অপমানকে, তারপর তার যাত্রা আরম্ভ করবে দ্রুতগতিতে। বিফল হয়ে পার হয়ে যাবে প্রভাত, হঠাৎ দেখা দেবে পরিতাপের দ্বিপ্রহর। তখন অনুশোচনা করলেও ফিরে আসবে না সে সময়। নিজেদের সময়ের কাঙাল মনে করে যতই আক্ষেপ করা যাক-না কেন— ফিরে এসে সে আর ভরে দেবে না ভাণ্ডার। আত্মমর্যাদা-জ্ঞান তার অসাধারণ, একবার উপেক্ষিত হলে সে শত অনুনয় সত্ত্বেও আর আত্মসমর্পণ করতে চায় না। মানুষ সে চেনে, তাই মানুষের আর্তরবে তার বুক বেদনায় ব্যথিত হয়ে ওঠে না। যারা তাকে অবহেলা করে, সে জানে, তারাই দুর্বাক্য ব্যবহার করে তার উদ্দেশে। কিন্তু তার ত্রুটি কোথায়, তা কখনো সন্ধান করে দেখে না কেউ, এইটুকুই মাত্র তার আক্ষেপ। এ আক্ষেপ বহন করে চলেছে সে আবহমান কাল ধরে, কিন্তু তবু সে প্রত্যেকের দরজায় প্রতিটি প্রহরে এসে হাজিরা দিয়ে আছে। তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে যারা উৎসাহী তাদের কাজ করে দিতে উৎসাহ তার দ্বিগুণ। কাজের লোকদের কাছে সে তাই বড় প্রিয়, অমূল্য সম্পদের মত মূল্যবান। কিন্তু যারা বিপরীত

চরিত্রের লোক তারা সত্যিই বড় বিপরীত, তারাই বলে— সময় ফাঁকি দিল আমাকে, দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা বড় কম সময়।

সময়কে ভাগ-ভাগ করে নিয়ে যথারীতি কাজ চলেছে রামমোহনের। তাই সময় নিয়ে টানাটানি নেই তাঁর। সময়ের সম্মুখে ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি আছে কিনা তিনি জানেন না, থাক্ বা না-থাক্, তিনি যেন দৃঢ় মুঠিতে ধরে আছেন সেই ঝুঁটিটাই।

বেদান্ত, উপনিষদ্, আত্মীয়-সভা, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ, অন্নদাপ্রসাদ, ভট্টাচার্যগণ— সকলের সঙ্গে নিয়মিতভাবে আত্মীয়তা চলেছে তাঁর, আলাপ-আলোচনা চলেছে। হরিহরানন্দ আছেন নিত্যসঙ্গী। আর-একটি জিনিস আছে তাঁর আত্মার আত্মীয়-রূপে, সেটি হচ্ছে তাঁর সেই সংকল্পটি।

এতজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি ভুলে যাচ্ছেন না কারো কথাই, মার কথাও মনে পড়ছে, মনে পড়ছে বউদি অলকমণির কথা।

সময় চলেছে তাঁর কর্মের সঙ্গেসঙ্গে।

শিক্ষার বিস্তারের জন্যে নতুন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ভাবছেন কিছুদিন হল। এ বিষয় নিয়ে হেয়ার সাহেবের সঙ্গে কথাও হয়েছে। ঘড়ির ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন হেয়ার। তিনি নিজে লেখাপড়া বেশি করার সুযোগ পান নি, এইজন্যেই বুঝি লেখাপড়ার প্রতি তাঁর বিশেষ টান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত সময়, এবং সমস্ত অর্থ তিনি এ বিষয়ে নিয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত আছেন। এ কথা জেনে রামমোহন যেন পেয়ে গেলেন একজন অকৃত্রিম সহায় ও সঙ্গী।

সেদিন সকালবেলা হেয়ারের সঙ্গে রামমোহন বের হলেন কলকাতার বিভিন্ন পল্লীর স্কুলগুলি দেখতে। চিৎপুরের বয়েজ বোর্ডিং স্কুল ও শেরবোর্ন সেমিনারি, কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুল এবং পিট বিবির স্কুল ঘুরে তাঁরা ফিরে এলেন আবার কলুটোলায়— নিত্যানন্দ সেনের স্কুলে।

ছাত্রেরা তখন সমস্বর চিৎকারে শব্দার্থ মুখস্থ করছে।

এঁদের আবির্ভাবে শিক্ষক-মহাশয় তটস্থ হয়ে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঘোষাব ?

রামমোহন তাকালেন হেয়ারের মুখের দিকে, তার পর ফিরে তাকালেন শিক্ষক-মহাশয়ের দিকে।

শিক্ষক-মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি বোঝাবো? গার্ডেন, না, স্পাইস?

বাগান, না, মসলা— ছেলেরা এই বিষয়ে কতগুলো শব্দার্থ শিখেছে শিক্ষক-মহাশয় তা জানাবার জন্যে যেন ব্যগ্র।

রামমোহন বললেন, আচ্ছা, গার্ডেন বোঝান্।

শিক্ষকের নির্দেশে ছেলেরা যেন তাদের বিদ্যা ঘোষণা করতে লাগল—

পম্‌কিন্ লাউকুমড়ো, কোকোম্বর শশা,

ব্রিন্‌জেল বার্তাকু, প্লোম্যান চাষা।

—বেশ বেশ বেশ।

সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা এলেন ধর্মতলায়। ডেভিড ড্রামণ্ডের অ্যাকাডেমিতে।

কুঁজো সাহেব এগিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে তাঁদের নিয়ে গেলেন তাঁর স্কুলের ক্লাস দেখাতে।

ছোট-ছোট ছেলেরা ভাষাশিক্ষা করছে। পাঁচ-ছয় বছরের ফুটফুটে একটি ছেলে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে এই বিরাট পুরুষটির দিকে।

রামমোহন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট'স ইয়োর নেম প্লিজ।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, মাই নেম ইজ উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে।

ছেলেটার শরীরের অনুপাতে নামটা যেন অস্বাভাবিক বড়। রামমোহন তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, বললেন, গুড। টেক ইয়োর সীট।

পাশের ক্লাসে আর গেলেন না তাঁরা, তাঁদের জানা হল না যে, ঐ ক্লাসে এই রকম লম্বা নামের আর-একটি ক্ষুদে ছেলে বসে-বসে তার পাঠ প্রস্তুত করছে।

ড্রামণ্ড সাহেব বললেন, আই হ্যাভ টু ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্টস ইন মাই স্কুল নাউ। ওয়ান ইজ ভিভিয়ান ডিরোজিও, অ্যাণ্ড দি আদার ইজ দিস— মেকপিস থ্যাকারে।

প্রথম ছেলেটিকে দেখার জন্যে তাঁরা আর ফিরে গেলেন না। স্কুল সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেবার জন্যে তাঁরা বেরিয়েছেন, সে ধারণা হয়েছে তাঁদের।

হেয়ার সাহেব ফিরিঙ্গি মানুষ, এখানকার ফিরিঙ্গিদের খবরাখবর তিনি

রামমোহনের থেকে বেশি রাখেন। তিনি বলতে-বলতে চললেন যে, ডিরোজিওরা থাকে মৌলালিতে, ভদ্রলোক ইটালিয়ান, বিয়ে করেছেন এদেশী এক মহিলাকে— তাঁদেরই বাচ্চা নিশ্চয় ওই ভিভিয়ান। আর, থ্যাকারে? ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে থাকে ওরা। ওর গ্র্যাণ্ডফাদার লাস্ট সেঞ্চুরিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ নিয়ে এদেশে আসেন, ওর ফাদার এখন আলিপুরের কালেক্টর। ফিলিপ ফ্রান্সিস যে-বাড়িতে বাস করতেন থ্যাকারে-ফ্যামিলি সেখানে বাস করে। এখন তো ফিলিপ ফ্রান্সিস মিস্টার নন, সার্ হয়েছেন।

সেই পুরনো কাহিনী জড়িয়ে আছে যে-বাড়িটায়? সেই ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড? সেই স্ক্যাণ্ডাল?

—ইয়েস। স্থাট ম্যাডাম গ্র্যাণ্ড ইজ নাউ এ গ্র্যাণ্ড ওল্ড লেডি।

চন্দননগরের সেই মেয়ে, কোনো স্ক্যাণ্ডালকে ভ্রূক্ষেপ না করে ক্রমশ ধাপে-ধাপে সোসাইটির কোন্ উচ্চে উঠে গেল। ফরাসি-দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নজরে পড়ল, ফরাসি-দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তালের‍ঁর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রিন্সেস অব তালের‍ঁ নামে পরিচিত হল। এই নূতন প্রণয় ও নবীন পরিণয়ও ভেঙে গেছে। অগাধ অর্থের অধিকারী হয়ে এখন তিনি বাস করছেন য়ুরোপে। এখন তিনি গ্র্যাণ্ড ওল্ড লেডি, তবুও সোসাইটিকে এখনো উচ্চকিত রেখেছেন তাঁর রূপে। আর-কিছু চিহ্ন তাঁর নেই এদেশে, শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে একটি ছবি।

রামমোহন বললেন, আই নো দি স্টোরি।

রামমোহনের বয়স যখন ঐ মেকপিস থ্যাকারে কিংবা ঐ ভিভিয়ান ডিরোজিওর মত, সেই সময়ে ঘটেছিল এই ঘটনা। ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রাচীরে মই লাগিয়ে মিস্টার গ্র্যাণ্ডের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হাজির হয়েছিল মিসেস গ্র্যাণ্ডের কাছে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায় ফ্রান্সিস। হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী যে, চাঁদপাল ঘাটে যার জাহাজ-ভেড়ার সঙ্গে তোপধ্বনি হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়মের বুরুজ থেকে, দুটি তোপ কম পড়েছিল বলে হেস্টিংসের সঙ্গে যার শত্রুতা আরম্ভ, সেই ফ্রান্সিসকে হাতে-নাতে পাকড়াও করল মিস্টার গ্র্যাণ্ডের ভৃত্য। এলিজা ইম্পের আদালতে এই নিয়ে মামলা চলল কতদিন ধরে।

সেসব কথা মনে পড়ার কথা নয় রামমোহনের। তখন তাঁর সে বয়স নয়। কিন্তু পরে তিনি সবই শুনেছেন, সবই জানেন।

ফ্রান্সিস যে-বাড়িতে থাকত, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের সেই বাড়িতে থাকে ঐ থ্যাকারে।

ঐ বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে বেজে চলেছে ফ্রান্সিসের দীর্ঘনিশ্বাস। ম্যাডামের প্রতি তার প্রণয়ের ব্যাকুলতা ক্ষুধার্ত হয়ে নিশ্চয় দেয়ালে-দেয়ালে আঘাত হেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর, সেই সঙ্গে খোলা আদালতে সেই কুৎসাকাহিনী বিস্তৃত করে বর্ণিত হচ্ছিল যখন, তখন অপমানের দীর্ঘনিশ্বাস নিশ্চয় হাহাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওই বাড়ির সর্বত্র।

তিন-মহলা ঐ বাড়ি, বিরাট বটগাছ অপর্যাপ্ত ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে তার সর্বাঙ্গ। বাড়িটার সর্বাঙ্গ শীতল হয়েছে বটে, কিন্তু ফ্রান্সিসের বুকের তাপ তাতে নিশ্চয় কমে নি।

এখন ফ্রান্সিস হচ্ছেন সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনিও এখন গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান। কিন্তু শরীরের বয়স আর মনের বয়স কি এক? তাই যদি হবে, তবে চল্লিশ বছর বয়সে কি তিনি একটি পনেরো বছরের মেয়ের সান্নিধ্য পাবার জন্যে তাঁর সম্মান-মর্যাদা-পদগৌরবের কথা, এমন কি বয়সের কথাও, ভুলে গিয়ে নিতান্ত বালকের মত রাত্রির অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ঐ বালিকার কাছে?

সেই বাড়িতে বাস করছে ঐ বালক— ঐ মেকপিস থ্যাকারে। উত্তরকালে যদি ঐ বালক কবি হয় কিংবা হয় উপন্যাসিক, তাহলে এই গৃহটিকে কেন্দ্র করে অবশ্যই সে লিখবে এক পরমরমণীয় কাহিনী। কিন্তু হায়, যাঁরা আজ বেঁচে আছেন, তাঁরা হয়তো সেদিন থাকবেন না, যদি সে-কাহিনী লেখা হয়ও তাঁদের তা পাঠ করা হবে না। না হোক, তবু যেন লিখিত হয় সে কথা, ভাবীকালের মানুষেরা সে-কাহিনী পাঠ ক'রে, আর কিছু না হোক, প্রাক্তন কলকাতার নিশীথ রজনীর প্রেমগুঞ্জন শুনতে পারে নিশ্চয়। ওদের জীবনের স্ক্যাণ্ডালটি বাদ দিয়ে যদি কেবল প্রণয়-সংবাদটুকু তুলে আনা যায়, তাহলে তা অবশ্যই কলঙ্ককাহিনী হবে না, সে হবে প্রেমগাথাই।

বলাগড়ের প্রান্তরে এখনো বেজে চলেছে সেই পাগোলটার গলা— গ্রাণ্ডি বিবি রাণ্ডি হল। তা বাজুক। তবু সেই গ্রাণ্ডি-বিবিকে সামান্য মেয়ে ব'লে অবজ্ঞা করা চলে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

একটি দুর্বল মুহূর্তে দৈবাৎ ঘটে গিয়েছিল পদস্খলন। সে ঘটনা নিয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হল চার ধারে, স্বামী তাকে করল পরিত্যাগ, আশ্রয়

নিল না সে ফ্রান্সিসের কাছে। হুগলীর জলে তো ভেসে যাবার কথা ঐ মেয়েটার। কিন্তু মনে নিশ্চয় জোর ছিল তার, নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। তাই হুগলীর জলে না ভেসে, সে ভেসে চলল সাগরে। বঙ্গোপসাগর পার হয়ে, ভারতমহাসাগর মন্থন ক'রে, উত্তমাশা অন্তরীপের কিনার দিয়ে, অতলান্তিকে ভেসে-ভেসে উপস্থিত হল নূতন দেশে। সেখানে সে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে, ফরাসি রাজ্যের অধিপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কেউ আর অপবাদ দিতে পারবে না, বলতে পারবে না যে, সে কোনোদিন ঐ ফিলিপ ফ্রান্সিসের সাহায্য নিয়েছে, কিংবা নিবিড়সান্নিধ্যে এসেছে।

দিন কেটে চলেছে কলকাতায়। এখানেও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে নিত্য নব নব।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর নূতন প্রয়াস শুরু করেছেন। তিনি কম্পোজিটরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের জন্যে এসেছেন কলকাতায়।

ফেরিস অ্যাণ্ড কোম্পানির ছাপাখানার বসে তিনি কথা বলছেন রামচাঁদ রায়ের সঙ্গে। বললেন, উদ্যোগই আসল জিনিস হে রামচাঁদ। বইয়ের ব্যবসা এদেশে আগে কেউ করেনি ব'লেই কোনো কালে কেউ করতে পারবে না, এটা কি একটা কথা?

অন্নদামঙ্গল-পুঁথির পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে হাসতে লাগলেন গঙ্গাকিশোর, বললেন, এই বিদ্যাটা একেবারেই বাঙালি মেয়ে। সুন্দরের খপ্পরে পড়ে ভবিষ্যৎটা অন্ধকার করে ফেলল। তার হাত থেকে বাঁচার কোনো পথই রাখল না। কিন্তু জান তো সেই মেয়েটার কথা?

রামচাঁদ তাকাল গঙ্গাকিশোরের মুখের দিকে, গঙ্গাকিশোর বলল, মাদাম গ্র্যাণ্ড। আশ্চর্য মেয়ে, নেপোলিয়ন তৈরি হয়েছে ইংলণ্ড আক্রমণ করবে ব'লে, কামান দাগে-দাগে। শ্রীরামপুরে থাকা-কালে চন্দননগরের ফরাসি ফিরিঙ্গিদের তখন দেখেছি, এখানে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের কত ব্যস্ততা। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল সব। কি ব্যাপার হয়েছিল জান নিশ্চয়? মাদাম গ্র্যাণ্ডের বিস্তর টাকা তখন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে জমা, অত টাকা নষ্ট হয়ে যাবে ব'লে নেপোলিয়নকে গিয়ে সে বোঝাল। নেপোলিয়নের মত মানুষ, সেও বুঝে ফেলল, কামান-দাগা বন্ধ রাখল। মেয়েটার উদ্যোগ দেখ, বিক্রম দেখ তার।

রামচাঁদ বলল, কথাটা রটেছে, কিন্তু সত্যি কিনা কে যাচাই করছে।

—তা বটে। কিন্তু যা রটে তার কিছু তো বটে। সবটা সত্যি না হলেও ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বই ছাপার কাজে নেমেছেন গঙ্গাকিশোর। ছাপাখানা আছে মাত্র কয়টা। লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, লল্লুলালের সংস্কৃত প্রেস, বাঙ্গালা প্রেস, শ্রীরামপুর-মিশন ছাপাখানা, আর এই ফেরিস কোম্পানি। এখানে গঙ্গাকিশোর সচিত্র অন্নদামঙ্গল ছাপার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। ধাতু ও কাঠ খোদাই ক'রে রামচাঁদ চিত্র বানিয়েছেন কয়েকটা।

এদিকে এই সচিত্র বই ছাপার কাজ চলেছে, সেইসঙ্গে বই-বিক্রয়ের জন্য গঙ্গাকিশোর বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ও মফস্বলে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থাও করে রাখছেন। বই প্রকাশিত হলে তাঁদের মারফত বিক্রয় করবেন।

তাঁর এই উদ্যোগ আছে বলেই তিনি উদ্যোগীর হয়তো বিশেষ অনুরক্ত। এই জন্যেই হয়তো মাদাম গ্রাণ্ডের কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে।

গঙ্গাকিশোর বললেন, পঞ্চানন হচ্ছে অক্ষরের রাজা, আর তুমি হলে চিত্রের। সুন্দর ছবি হয়েছে রামচাঁদ, তোমার খোদাইয়ের হাত বেশ খুলেছে। পঞ্চাননও খুদে খুদে কত ছোট ছোট অক্ষর বানায় অনায়াসে। কিন্তু তোমাদের কেউ চিনল না, এইটে বড় দুঃখ রামচাঁদ।

রামচাঁদ হাসতে-হাসতে বলল, হাজার-হাজার লোকের চিনে কাজ কি। দু-একজন লোক ভালো করে চিনলেই হল। আর, চিনেই বা কি দরকার। যার যা কাজ, সে তা করবে। তার জন্যে দুনিয়া-সুদ্ধ লোক এসে তাকে চিনে যাবে, এ আবার কেমন কথা?

—চেনা মানে মুখ-চেনা নয় হে, কদর দেওয়া।

—তোমার কাছে কদর পেয়েছি, এই ঢের। তোমার ছাপা প্রথম বইয়ের আমি চিত্রকর।

ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানায় তখন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কম্পোজ করা হচ্ছে।

দিন-কয়েকের মধ্যেই প্রকাশিত হল সে বই। তারই এক খণ্ড হাতে নিয়ে অন্নদাপ্রসাদ এসে উপস্থিত হয়েছেন মানিতকলার বাগানবাড়িতে।

দ্বারকানাথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, হাতে ওটা কি বই নিয়ে এলেন অন্নদাবাবু।

—বাংলাদেশের প্রথম সচিত্র বই।

—কে বের করল।

অন্নদাপ্রসাদ প্রায় ঘোষণা করার মত করেই যেন বললেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এ দেশের প্রথম পুস্তকপ্রকাশক হল লোকটা।

রামমোহন ভিতরের ঘর থেকে এলেন, ফরাসের উপর উঠে বসে দেখলেন বইটা, বললেন, তারিফ করি। একটা কাজ আরম্ভ তো করেছে লোকটা।

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, বই ছাপা আরম্ভ হলেই আপনার ঐ কবিয়ালদের কদর কমবে। কবিয়ালদের তখন আর চাইবে না লোকে, চাইবে কবিদের।

—তাই। রামমোহন বললেন, দেশের মানুষের রুচির নিন্দা করি আমরা। বোধ'য় ভুল করি। তাদের আমরা আম না দিয়ে যদি আমড়া দিই, আর বলে বেড়াই, ওরা আমড়ার বড ভক্ত, আম ভালোবাসে না, সেটা অন্যায্য অভিযোগ করা হয়।

দেশের লোককে অজ্ঞ করে রেখে তাদের অজ্ঞানতার জন্যে তাদের প্রতি করুণা দেখানোও ঐ ধরণেরই অন্যায্য কাজ। সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যেই সর্বসাধারণের মধ্যে রামমোহন বিনামূল্যে বিতরণ করছেন শাস্ত্রের মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ। ভট্টাচার্যদের চক্রান্তের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে না পারলে, যে ধর্ম নিয়ে এত ষড়যন্ত্র, সে ধর্ম রক্ষা করবে কারা। মহাশ্মশানে কি কোনো ধর্ম বিরাজ করে?

অন্নদাপ্রসাদ পাতা উল্টে-উল্টে দেখছিলেন অন্নদামঙ্গলের। দেখতে-দেখতে স্মিত হেসে বললেন, ইনিও কিন্তু ভট্টাচার্য। যিনি প্রকাশ করেছেন এই বই। ইনি সৎকাজ করেছেন কিন্তু।

অট্টহাস্য করে উঠলেন রামমোহন, হাসি থামিয়ে বললেন, ভট্টাচার্য কি পদবী দিয়ে হয়, ওটা হল মনে। এখনও অনেকে আছেন যাঁরা পদবীতে ভট্টাচার্য নন, কিন্তু তাঁদের মনটা ঐ কোশাকুশি আর ঘণ্টাকে কেন্দ্র করে পড়ে আছে। তাঁরা হিন্দুধর্মকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন, আর যজমানবাড়ি থেকে খাজনা আদায় করে-করে ঘুরে বেড়ান। আপত্তিটা তাদের নিয়ে। এই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে নিয়ে নয়।

বৃদ্ধ হরিহরানন্দ স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিলেন সব, কোনো কথা নেই তাঁর মুখে। সব কথা শুনে তিনি ধীরে-ধীরে মাথা নেড়ে এই যুক্তিতে তাঁর সম্মতি জানালেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তারপর তিনি বললেন, কত অসহায় নারী কত কঠিন প্রাচীরের অন্তরালে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, সে খোঁজ আমরা ক'জন রাখি? কত জনের কত বাসনা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে তার হিসাব নেবারই-বা আমাদের সময় কোথায়। আমরা আছি আমাদের নিজেদের নিয়েই আত্মহারা। এর নাম অধর্ম।

একটু থেমে বললেন, অধর্মই এখন চলেছে ধর্ম নামে। পণ্যের বাজারে অসাধু ব্যবসায়ী ঢুকলে সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু সংসারের নিত্যগৃহকর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে অসাধুরা, তার জন্যে কেউ বিচলিত নয়।

হরিহরানন্দের কথা শুনে আত্মীয়-সভার সভ্যবৃন্দ যেন বিচলিত হয়ে উঠলেন এক সঙ্গে।

হরিহরানন্দ বললেন, এ আমার এ তোমার— এ আমাদের সকলের পাপ।

হেয়ার সাহেব তাঁর মাথা আন্দোলন কবতে লাগলেন।

ঠিক ঐ ভাবে মাথা আন্দোলন করছেন চুঁচুড়ার কানাগিন্নি। বলছেন, এ পাপ, এ পাপ। নিজের মনকে উপোসী রাখলে নিজের আত্মাই রুষ্ট হয়ে ওঠে।

বাসনা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে নাকি কত নারীর। কই, অপূর্ণ তো থাকছে না। পুরোপুরি না হলেও কিছুটা পূর্ণ হচ্ছে বই-কি।

রূপচরণ গত হয়েছেন গত বছর। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই তাঁর স্ত্রী তাঁর মাতার অসুস্থতার অজুহাতে চলে গেছেন পিত্রালয়ে। খুব বুদ্ধিমতী নারী। এখানে থাকলে তাঁর জীবনরক্ষা নিয়ে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়তে হত তাঁকে। রূপচরণের মৃত্যুর পরই তাঁকে তাঁর পিত্রালয় থেকে আনাবার জন্যে হরিনাথ ভট্টাচার্যের অসম্ভব পিড়াপিড়ি আরম্ভ হয়।

বার-বার তিনি বলেছেন, তাঁকে আনাবার জন্যে লোক পাঠাও, রূপনারায়ণ। যোগ্য পুত্র তুমি, তুমি বর্তমান থাকতে এত বড় অনাচার হয়ে যাবে এই রায়-বাড়িতে? সতী হবেন না তোমার মাতা?

স্তব্ধ-হয়ে বসে থাকে রূপনারায়ণ, কোনো প্রতিবাদও করে না, কোনো অভিমতও জানায় না।

তবু পিড়াপিড়ি করেন পুরোহিত হরিনাথ, বলেন, তুমি এখন এ গৃহের

মালিক, তুমি অভিভাবক ; এ গৃহের কল্যাণ-অকল্যাণ এখন তোমাকেই দেখতে হবে।

রূপনারায়ণ ধীরে-ধীরে মাথা তুলে বলল, কবে তিনি চলে গিয়েছেন, কেন তিনি চলে গিয়েছেন আমি কিছুই জানিনে। আজ তাঁকে আনতে পাঠালে তিনি কি আসবেন ?

—তবু চেষ্টা করতে হবে। তিনি বালিকাও নন, এবং আশা করি অন্তঃসত্ত্বাও নন, সুতরাং বাধা নেই কিছু।

কিন্তু রূপনারায়ণ নিষ্প্রাণ।

নিচের হল-ঘরে বসে কথা হচ্ছে।

হল-ঘরের ছাদের ঠিক মাঝখানে কিয়দংশ উন্মুক্ত, বুক সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে সেই উন্মুক্ত স্থানটি ঘেরা। উপরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে চাঁপা ও কানাগিন্নি।

চাঁপার কানে-কানে কানাগিন্নি বলল, মরণ। তোর মা পালাল কখন জানবি কী করে, তোর বাপ ম'লো কখন তারই কি খোঁজ রাখিস ? সে হুঁশ আছে ?

ঘাড় ফিরিয়ে তারা দেখল, রাধা আছে কিনা কাছে-ভিতে। নেই দেখে ওরা মনের আনন্দে ফিসফিস করে রূপনারায়ণের বাপান্ত করতে লাগল।

কাঁদবার কেউ নেই। কেবল ভবসুন্দরী থেকে-থেকে বার-কয়েক ডুকরে-ডুকরে উঠেছে। হালদারবাড়ির বউরা যখন পালকি চেপে এসেছিল তখন একবার, প্রাণকৃষ্ণ লাহার বাড়ির মেয়েরা যখন এসেছিল তখন একবার, তার পর লালমোহন পালের স্ত্রী যখন এসেছিলেন তখন একবার। ওর ঐ লোক-দেখানো কান্না দেখে শরীর জ্বলে যায় চাঁপার ও কানাগিন্নির।

মড়া পড়ে আছে তুলসীতলায়। দাহের ব্যবস্থা হতে পারছে না মৃতের স্ত্রীর অভাবে।

রাধা সব শুনছে ও মনে-মনে জ্বলে উঠছে। তার শাশুড়িটি খুব করিৎকর্মা আর বুদ্ধিমতী, তিনি নাহয় সময়-মত সতর্ক হতে পেরেছিলেন ব'লে বেঁচে গেলেন। কিন্তু রাধা যখন পড়বে এই অবস্থায় তখন তাকে বাঁচাবে কে। পিত্রালয়ে গিয়েও রক্ষা নেই তার, চুঁচুড়া থেকে পেয়াদা গিয়ে তাকে ধরে আনতে কতক্ষণ ? যে রকম অনাচার করে চলেছে রূপনারায়ণ, যে-কোনো মুহূর্তে ওর যেমন-তেমন হয়ে যাবার কথা। আজ কত বছর হল ? দশ বছরের

কথা। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দর্শন পাওয়া গেল না যে-মানুষটার তার জন্তে স্মরতেও যে লজ্জা করে।

লজ্জা করারই কথা। কিন্তু লজ্জার থেকে ভয় তার বেশি, ঐ জলন্ত আগুনে কি সমর্পণ করা যায় নিজেকে?

পুরুৎ হরিনাথ নাকি এখনো চাপ দিচ্ছেন রূপনারায়ণকে।

কিন্তু পাথরে চাপ দিলে কি পাথর টোল খায়? অটল হয়ে বসে আছে রূপনারায়ণ।

তাকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে পুরোহিত মশায় বিরক্ত হয়ে উঠলেন, উচ্চগলায় বললেন, আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে এ-খবর জানেন তো?

চমকে তাকাল রূপনারায়ণ, বলল, সাবধান।

হরিনাথ করজোড়ে বলল, মাপ করবেন। সে কথা বলি নি।

—খাজাঞ্চিবাবু। গুরুগম্ভীর গলায় ডাকল রূপনারায়ণ, এ-গলা যেন মনিবপুত্রের নয়, স্বয়ং মনিবের। এখন থেকে মনিব হয়েছে রূপনারায়ণ, অন্ত কোনো হুঁশ না থাকলেও এ হুঁশ তার আছে, বলল, খাজাঞ্চিবাবু, ইনি কি চাচ্ছেন দিয়ে দিন।

আর কোনো কথা নয়। রূপনারায়ণ উঠে চলে গেল তার আসরে—নরহরি ও মোতিলাল তটস্থ হয়ে উঠল তার আগমনে।

শেষকৃত্য শেষ হয়ে গিয়েছে রূপচরণের। সতী হতে পারল না তাঁর স্ত্রী, এ-আক্ষেপ এখনো বাজে হরিনাথের বুকে। নদীর কিনার বরাবর খবর চলতে থাকে এদিক-ওদিক। গরিটির শ্মশানে খোঁড়া মনোহর খবরটা শুনে চমকে উঠে ল্যাংচাতে থাকে।

একটি বছর গত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ভবসুন্দরী মাঝে-মাঝে এ-বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার কিছুদিন বাদেই ঘটে তার আবির্ভাব। তার ধারণা, কেউ বোঝে না তার গতিবিধি, কিন্তু কোথায় সে যায় কোথা থেকে ফিরে আসে আবার কানাগিন্নি আর চাঁপাও তা যেমন বোঝে, রাধাও বোঝে তেমনি।

রাধা ভাবে, এই ঠিক। এই ভাবে জব্দ করতেই হয় এই এ-বাড়ির মানুষকে। নইলে হুঁশ হবে না এদের, মানুষ হবে না এরা।

কিন্তু কি কথা যেন হচ্ছিল?—বাসনা পূর্ণ। রাধা তার বিবাহ-বার্ষিক-

উৎসব করছে আজ। নিজেই করছে নিজের উৎসব। সেই উৎসব উপলক্ষ্যে কবির গান হবে আজ সারা রাত। রূপনারায়ণের কাছে বার্তা পাঠিয়ে পাঠিয়ে সে তার মত নিয়েছে।

হরুঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ শুনে সে জানিয়েছিল তার মনের সাধ, এ বাড়িতে কবির আসর বসাই। সে সাধ তার পূর্ণ হয়েছে আজ।

কবিরা এসে পৌঁছে গেছে একে-একে। বাইরের বাগানে তাদের জন্যে ছাউনি ফেলে দেওয়া হয়েছে। রাত্রে গান হবে।

এসেছেন অনেক কবিয়াল। চন্দননগরের বুড়ো কবিয়াল নিতাই বৈরাগী, কলকাতার ভোলা ময়রা, রাম বসু ও তন্তু রক্ষিতা যজ্ঞেশ্বরী, আর গরিটির অ্যাণ্টনি-ফিরিঙ্গি। তাঁদের ছাউনিতে বসে তাঁরা গুলতানি করছেন ও গাঁজা টানছেন। মেজাজ তৈরি করার জন্যে তাঁরা সকলেই ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে ঢোলক নিয়ে এসেছে ঢুলিরা। তারাও নেশাটা-আশটা করছে ও ডুগডুগ-শব্দে চামড়ায় কাঠি ঠুকছে।

অন্দর থেকে অনেক তফাতে আছে তারা। তবু মাঝে-মাঝে সেই শব্দ এসে পৌঁছচ্ছে এখানেও। রাধার পুলক ধরে না।

যাবতীয় গহনায় আজ সে সজ্জিত করেছে নিজ অঙ্গ। পদতলে বসে চাঁপা তার দুইটি চরণ রঞ্জিত করে তুলেছে আলতায়।

চাঁপাও সেজেছে আজ। বাঙা চওড়া পেড়ে শাড়ি পরেছে সে, নাকে দিয়েছে ফাঁদি-নথ।

কানাগিন্নির অঙ্গে কোনো ভূষণ নেই। তার শরীরের লোল চামড়া বেষ্টন করে আছে দুধ-সাদা থান শাড়িটা। ভূষণ নেই, কিন্তু বড পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে কানাগিন্নিকে।

রাধার থুংনি ধরে আদর করে ছড়া কাটতে লাগলেন কানাগিন্নি, গানের গলা এখনো আছে কানাগিন্নির, ছড়া গাইতে লাগলেন তিনি—

ঢেঁড়ি চাঁপি মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল,
নাসার নিশ্বাসে কর্ণে দুলিছে দোদুল।
পরেছ গলায় এই তেনরী সোনার
নিতম্বে পরেছ কন্যা চারুচন্দ্রহার।
শঙ্খের সম্মুখে হাতে সুবর্ণ কঙ্কন
এ-বেড়িতে বাঁধা পড়ে কোন্ বাছাধন।

পরান বাঙ্গান লোহা সুকোমল হাতে
পতির আয়াতচিহ্ন সোহাগ ইহাতে।

হঠাৎ থেমে গেল কানাগিন্নি। দেখল, রাধার চোখে জল। পতির আয়াতচিহ্ন আর সোহাগ ধরা আছে কিনা হাতের এই লোহায়, এ পুরাতন প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করে কাজ নেই।

নিমন্ত্রিতেরাও এসে পৌছচ্ছেন একে-একে। নীচের হল-ঘরে কবির আসরের বন্দোবস্ত। ভারি চিক ফেলে প্রশস্ত হল-ঘর দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, মেয়েরা বসবেন এখানে।

আসরে এসেছেন কবিয়ালরা। ঐ যে ভোলা ময়রা, ঐ রাম বসু, তার পাশেই ঐ যজ্ঞেশ্বরী; আর ধুতি-পরা কাঁধে সাদা চাদর, ও হচ্ছে ফিরিঙ্গি অ্যান্টনি।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি? নিরুদ্দি বুঝি আসে নি সঙ্গে? এলে বেশ হত। দেশের মানুষকে দেখতে পেত রাধারানী।

ভোলাতে আর অ্যান্টনিতে প্রথম লড়াই। তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে দুই দল। ফরাশেরা আরো আলো বসিয়ে দিয়ে গেল দেয়ালে, উপর থেকে ঝরছে ঝাড়ের আলো।

সদলবলে এসে বসেছেন রূপনারায়ণ। চুঁচুড়ার নিমন্ত্রিত অতিথিরাও আসন নিয়েছেন।

অ্যান্টনি উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে সকলকে নমস্কার করে, গুনগুন শব্দে গান গেয়ে বুঝি প্রার্থনা করে নিল।

আমি সাধন-ভজন জানি না মা জেতেতে ফিরিঙ্গি
যদি দয়া করে কৃপা কর মোরে, হে শিবে মাতঙ্গী।

তার পর অ্যান্টনি বলল, বাবুগণ, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি আমার আজকের প্রতিপক্ষকে। বলি—

হে ভোলানাথ, তোমার নামে
মাথা নত হচ্ছে আমার।
কিন্তু পাচ্ছিনে তো মাথায় জটা
গলাতে নেই সাপের ঘটা
তবে কেন নাম এতটা
কর্‌লি লম্বা চৌড়া আবার?

উঠে দাঁড়াল ভোলানাথ। বেজে উঠল ঢোল। গেয়ে উঠল সে—

আমি সে ভোলানাথ নই রে আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা হরুর চেলা শ্যামবাজারে রই
যদি সেই সে-ভোলানাথ হই রে তবে বিল্বপত্রে পুজলি কই।

অ্যাণ্টনির কথার উত্তর দিয়েই গালিগালাজ আরম্ভ করল ভোলানাথ, গেয়ে উঠল—

ওরে সাহেবের পো আনটুনি
তোর কটা বাপ বল্ শুনি।
না বলতে পারলে দেখবি আজ ভোলার কেমন শক্ত ঘানি
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরি-বাবা
তোর মত হাবা-গোবা আমি তো আব দেখিনি।
পথে-ঘাটে দেখিস যারে, বলিস বাপ অমনি তারে,
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলি নি।
শোন বে গুণধর, তোর নাই বংশধব,
তোর বংশরক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বামনি।

বার-বাব ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল ভোলানাথ। ভোলানাথের এই কডা প্রশ্নের কি উত্তর দেয় ওই ফিরিঙ্গি,তা শোনার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠল সকলে।

অ্যাণ্টনি উঠে দাঁডাল। বলল, বাবুগণ, ভোলা বড শক্ত প্রশ্ন করেছে আমাকে, আমার ক'টা বাপ, আব আমার বংশরক্ষার কি হবে উপায়।

বেজে উঠল ঢোল, সেই তালে অ্যাণ্টনি বলে উঠল—

কি হবে উপায়।
আমার বংশরক্ষার জন্যে বলো দাঁডাব কাব দোর-গোড়ায়।
ওই ময়বা-ভোলার ভার্যা আছে
ভাবছি যাব তারই কাছে
ওই পুণ্যবতী চিন্তামণি শুনছি নাকি সব তরায়।

বার-কয়েক ওই কয়েকটি ছত্র গেয়ে হঠাৎ সে থামল। তারপর স্বর বদল করে বলল অ্যাণ্টনি—

ভালো কথা বলেছ দোস্তো
বংশরক্ষার বন্দোবস্ত
করবে নাকি ব্রাহ্মণী আমার।

এ কথা এতই সত্য
শুনলে জ্বলে ওঠে পিত্ত
সত্যকে কদর্য করা পেশা কি তোমার।

গান একটু থামিয়ে অ্যান্টনি বলল, বাবুগণ, আর-একটা কঠিন কথা বলেছেন আমাকে ভোলানাথ, আমার ক'টা বাপ। বাবুগণ, কবির আসরে খিস্তিখেউড় আছে, কিন্তু খিস্তিখেউড়েরও পরিমাণ আছে, বাবুগণ। ভোলানাথের প্রশ্নের উত্তর আমি দেব, কিন্তু কঠিন কথা বলতে পারব না, মাফ করবেন।

একটু থেমে নিল অ্যান্টনি, হাত প্রসারিত করে গেয়ে উঠল—

অত রকম বাপের খবর রাখে না তো এই অধম
ভোলানাথের যতটা বাপ (আমার) বাপের সংখ্যা এগারো কম।
এই তো আমার একটি বচন, আমার বাবা একবচনে,
যা বলেছ তেমন কথা এন না আব ঐ বদনে।
এমন গুণধরের যিনি গর্ভধারিণী জননী
তাঁকে দেব গালাগালি, বলুন বাবু, কি কারণে।
তবু যদি আমার কথায় কিছু বলা হয়েই থাকে—
তাঁকে কিছু বলি নি আজ, বলেছি তাঁব পুত্রটাকে।
ভোলানাথেব যতটা বাপ (আমার) বাপের সংখ্যা এগারো কম—
দিতে যখন বলল ভোলা, দিলেম গালাগালের চরম।

হাসাহাসি পড়ে গেল চারিদিকে। চিকের আড়াল থেকেও চাপাহাসির শব্দ শোনা যেতে লাগল।

অ্যান্টনি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর হাতজোড় করে দুই চোখ বন্ধ করে স্তোত্র পাঠ করার মত করে গাইল—

আমি হালুইকরের দোকান খুলিনি তো শ্যামবাজারে
আমার বুকে খুলেছি হাট, বসায়েছি শ্যাম-রাজারে।
তাঁরই পাদপদ্ম-তলে
আমার কেনাবেচা চলে
নাই লোকসানের অঙ্ক, মুনফা রোজ পাই হাজারে।

আসন গ্রহণ করল অ্যান্টনি। করতালি দিয়ে উঠল সমবেত শ্রোতাগণ। চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বসে সে ভোলানাথের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। প্রত্যুত্তরে ভোলানাথ হেসে বলল, সাবাস।

অনেকক্ষণ ধরে চলেছে গান। রাত্রিও গভীর হয়ে আসছে ক্রমশ। মনে হচ্ছে আলোগুলো যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আলো না, চোখের দৃষ্টি বুঝি ঝাপসা হয়ে আসছে সকলের।

এবার মজার লড়াই হবে, যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে ভোলানাথের। এবার কেমন খিস্তি হয়, কেমন খেউড় হয় শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে চিকের এপার আর ওপার।

যজ্ঞেশ্বরী ঘাঁটাতে চাইল না ভোলানাথকে, তাই তার মুখ বন্ধ করার জন্যে প্রথমেই বলল—

ভোলানাথ আমার পুত্র
আমি ভোলানাথের মাতা।

কিন্তু এতে তার মুখ বন্ধ করা বুঝি গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে করজোড় নমস্কার জানিয়ে ভোলানাথ বলল, মহাশয়গণ, যজ্ঞেশ্বরী আজ এ আসরে আমার মাতা সেজেছেন। তাহলে প্রথমেই মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি গাই—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী, সর্বকাযে শুভকরী
তোমার ঐ পুবনো এঁড়ে রাম বসু বাপ।
যেমন পিতা তেমনি মাতা, ভোলানাথের অভয়দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিল থাপ।
এখন মা, শুধাই তোবে কেন এসে এ আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছ জোবে ডাক।
বুঝি তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক।
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধব সকল কাজেই অগ্রসর
তোমার মত মাতাব দুঃখ দেখিতে না চাই।
পঞ্চপিতা সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভী-মাতা, চল, তোমায় ধরাতে যাই।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল হল-ঘরে। চমৎকার, চমৎকার পাল্টা-জবাব দিয়েছে ভোলানাথ।

ভোলানাথ বলল, বাবুগণ, শাস্ত্রে বলে, পঞ্চপিতা সপ্তমাতা। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা শ্বশুর উপনয়ন-কর্তা ও জন্মদাতা— এই পাঁচজন পিতা। আর,

গুরুপত্নী ব্রাহ্মণপত্নী রাজপত্নী গর্ভধারিণী পৃথিবী ধাত্রী আর গবী— এই সাতজন মাতা। যজ্ঞেশ্বরী নিজেকে আমার মাতা বলে ঘোষণা করেছে, কিন্তু সে আমার গুরুপত্নী নয়, সে ব্রাহ্মণপত্নী নয়, সে রাজপত্নী নয়, সে আমার গর্ভধারিণী নয়, সে পৃথিবী নয়, সে আমার ধাত্রীও নয়, সুতরাং সে ঐ সপ্তম শ্রেণীর মাতা। সে আমার গাভী-মাতা।

এই কথা ব'লে ভোলানাথ চারদিকে চাইল, তারপর আবার সুর ধরল, আবার গেয়ে উঠল—

পঞ্চপিতা সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই
তুমি আমার গাভী-মাতা, চল, তোমায় ধরাতে যাই!

যজ্ঞেশ্বরী বসে রইল মাথা নীচু করে। রাম বসুর দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল, শক্ত হয়ে বসল রাম বসু। এর উত্তর সে দেবে সুযোগ পেলে। যজ্ঞেশ্বরীও যে দিতে পারবে না, এমন নয়। কিন্তু এ-আসরে যজ্ঞেশ্বরী এসেছে গান গাইতে, খিস্তি করতে নয়; খিস্তির মুখ সে একবার ছাড়লে ভেসে যাবে ভোলানাথ, এ কথা সকলেই জানে। ভোলানাথও জানে।

রাত দ্বিপ্রহর বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ। আরমানি গির্জার ঘড়ি থেকে এখন আর একসঙ্গে বেশি ঘণ্টা বাজছে না। কিছুক্ষণ আগে যে শব্দ হল, সে বুঝি রাত দুটোর।

যতই রাত ভোর হতে থাকবে ততই খেউড় আরম্ভ হবে, এই আশায় আসন ছেড়ে উঠছে না কেউ। ভোলানাথ যে ঘা দিয়েছে যজ্ঞেশ্বরীকে, এবার যজ্ঞেশ্বরী তার উত্তর দেবে— এই বুঝি সকলের আশা।

নাকে নথ পরে নিচ্ছে যজ্ঞেশ্বরী, তার এই অলংকার-ধারণের বহর দেখে প্রত্যেকেই উৎসুক হয়ে উঠল, ভোররাত্রে এই মোহিনী-বেশ ধারণ করছে কেন যজ্ঞেশ্বরী। এখন কি সে মাতার বেশ পরিত্যাগ করে রঙ্গিনী সেজে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে?

রূপনারায়ণ চিকের দিকে তাকাচ্ছে না। লাল মখমলে আবৃত মোলায়েম তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আলবোলার নল মুখে দিয়ে ধীরে-ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছে।

চিকের ওপারে বসে তার চেহারাটা বুঝি ভালো করে দেখে নিচ্ছে কেউ এই অবসরে। সত্যি, আশ্চর্যই লাগে। এতটুকু কৌতূহলও থাকতে নেই, অন্দরমহলের বধূটির ব্যবহার কেমন জানতে ইচ্ছে হয়

না একদিন ? কেমন সে কথা বলে, কেমন সে হাসে, কেমন সে তাকায়, কেমন সে—

—কেমন লাগছে গান ?

কানাগিন্নির কথার উত্তরে রাধা সংক্ষেপে বলল, ভালো।

আরও অনেক সময় কাটার পর যজ্ঞেশ্বরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবুমশায়গণ, আর চিকের আড়ালে আছেন যে বিবিসাহেবরা, আপনাদের আসরে আদর করে ডেকে এনেছেন, আজ এ আসরে গান গাইব। থিস্তিথেউড অনেক হয়েছে, একটু গান গাই আজ— বিরহের গান। যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে দেখা নেই অনেক কাল, হঠাৎ তার সখার সঙ্গে দেখা , তখন তার কাছ থেকে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করি একটু এই গান গেয়ে।—

ক্যানক্যান শব্দে বেজে উঠল সারেঙ্গী। যজ্ঞেশ্বরী গান ধরল, নথ নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল—

অনেক দিনের পরে সখা
তোমারে দেখতে পেলাম চোখেতে,
ভাই, বল দেখি তোমার সখার সংবাদ
ভালো তো আছেন প্রাণেতে।
তার মনে তো নাই অধিনীরে
তার মনে তো নাই অধিনীরে
নবীনার প্রাণধন হয়ে তিনি এখন
ভেসেছেন সুখ-সাগরে।
ভালো সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাঁখের করাতে।

চিকের দিয়ে চেয়ে-চেয়ে গাইছিল যজ্ঞেশ্বরী, এবার ঘুরে দাঁড়াল বাবুদের দিকে মুখ ক'রে, গাইতে লাগল—

বলো বলো প্রাণনাথেরে
বিচ্ছেদকে তার ডেকে নে' যেতে
যদি থাকে ধার না হয় শুধেই আসব তার
কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে
আমার হল উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে।

তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।
দেখি পাপদেশের পাপবিচার
দোহাই আর দিব কার
সদাই প্রাণে দহে কোকিলের স্বরেতে।
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না—

চিকের আড়ালে অস্ফুট শব্দে গুঞ্জন-ধ্বনি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে গান করছে যজ্ঞেশ্বরী—

তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর
মদন তা বুঝে না, বল্লে শুনে না
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

গান থামাল যজ্ঞেশ্বরী। থেমে, একটু তাকাল চারদিকে। চিকের ওপার থেকে অস্ফুট গুঞ্জনের শব্দ তার কানেও এসে পৌছেছে, সেদিকে একবার তাকাল, বলল, বাবুগণ, এই আমাদের কষ্ট। পিঞ্জরের পাখি আমরা, পরের অধীনে আছি ; আমাদের দুঃখ কেউ বুঝে না। আমার কথা বলছি না বাবু-মশায়গণ, আমার প্রাণের মানুষ এ-আসরে আছে, সে স্বতন্তর হয় নি। কিন্তু আমার কথা ভেবে এ গান বাঁধি নি। যাঁদের কথা ভেবে গেঁথেছি, ঐ চিকের আড়ালে হয়তো আছেন তাঁদের কেউ-কেউ। এ গান যদি তাঁদের ভালো লেগে থাকে তাহলেই সে হল আমার গান-বাঁধার দক্ষিণা।

রূপনারায়ণ নড়ে বসল, কোনো দিকে তাকাল না সে, মসৃণ মসলিনের বেনিয়ান তার গায়ে। আলবোলার রুপালি নল তার বাহুকে বেষ্টন করে আছে, মাঝে-মাঝে নলটি মুখে দিচ্ছে সে।

ভোর হয়ে এসেছে। ফাল্গুনের হাওয়া লেগেছে ঝাউ আর পাকুড় গাছের মাথায়। সেই বাতাসের উদ্বৃত্ত এসে পৌছচ্ছে এখানে। পাঙ্খাবরদার টেনে চলেছে পাখা।

আর-একটা গান গাইবার জন্যে অনুরোধ উঠল চারধার থেকে। চিকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দাসীরা। গিন্নিমা ও দিদি-বউদিদের হয়ে তারা অনুরোধ জানাল যজ্ঞেশ্বরীকে।

রাম বসুর পাশে বসে যজ্ঞেশ্বরী জিজ্ঞাসা করল, কি গাইব বলো। এখন তো মনে পড়ছে না আর-কিছু।

—এঁদের যা পছন্দ সেই রকম গাও একটা। এতক্ষণ বিরহের গান গাইলে, এবার একটা মিলনের গাও।

তাই। ঠিকই বলেছে রাম বসু। গুনগুন করতে লাগল যজ্ঞেশ্বরী। গুনগুন করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে, বলল, বিরহের গান গেয়ে আপনাদের অনেকের মনে দুঃখ দিয়েছি হয়তো। আমার যিনি প্রাণসখা তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন—

যজ্ঞেশ্বরীর কথা চাপা দিয়ে উচ্চহাস্য করে উঠল হল-ঘরের প্রত্যেকে একসঙ্গে, যজ্ঞেশ্বরী হেসে বলল, তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন একটা মিলনের গান গাইতে। তাঁর কথা-মত আমি গাইছি। সখার সঙ্গে দেখা নেই, সখী তাই কাতর। হঠাৎ একদিন এক শুভক্ষণে সখীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন সখা। সখী তাই দুঃখ জানিয়ে বলছেন— হঠাৎ যদি এখানে এসেছ সখা, তাহলে দুটো প্রাণের কথা শুনে যাও।

কোমরে কাপড় ভালো করে জড়িয়ে নিল যজ্ঞেশ্বরী, নথটা ঠিক করে নিল, তাকাল চারদিকে, আসরের মানুষদের চোখমুখের ভাব বুঝি দেখে নিল একটু, তারপর সুর ধরল, গুনগুন করতে-করতে গাইতে আরম্ভ করল—

কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ গেল দুখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।
আমায় বন্দী করে প্রেমে
এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে-ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ-আশ্রমে।

তারযন্ত্র বেজে যেতে লাগল করুণ কান্নার মত ধ্বনি তুলে, যজ্ঞেশ্বরী পুনরায় আরম্ভ করল—

আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানি নে
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ পরের ধন আগুলে বেড়াও।

চিকের আড়ালে লালবাড়া রাধা চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করল, কি, কি বলল যেন কথাটা?

চাঁপা বলল, ওই শোনো।

যজ্ঞেশ্বরী গাইতে লাগল—

নাহি চেনো ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে ক'রে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও
রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি কার্যে না ভুলাও।
তোমার মন হল বা'র-বাগে
গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ-যোগে,
কথা কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে
প্রাণ-মনে কর, সখা, পাখা মেলে উড়ে যাও।

রাধা বলল, আশ্চর্য। এ কার কথা বলে-বলে গাইছে ঐ কবিয়ালনি। ও এত খবর জানল কি করে চাঁপা ?

যজ্ঞেশ্বরীর গান থামে নি, সে গেয়ে চলেছে—

নাহি চেনো ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।

খুব জমে উঠেছে আসর। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলে এক মনে কান পেতে শুনছে ঐ গান—

সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।

স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছে রাধারানী। তার মনে হচ্ছে তার জবানিতে যজ্ঞেশ্বরী এ আসরে বলে যাচ্ছে এত কথা। ঐ একটা কথা মনে বড় গেঁথে বসেছে রাধার— অসতীর আশা পুরাও।

চুঁচুড়ার আকাশে ডেকে উঠেছে ভোরের পাখি। মুক্তপক্ষে তারা উড়ে বেড়াচ্ছে ডাল থেকে ডালে। তাদের পাখায় নূতন আলোর উল্লাস এসে ছড়িয়ে পড়েছে, এইজন্যেই তাদের গলায় এমন অনাবিল কূজন উঠেছে মুখর হয়েছে।

পিঞ্জরের পাখি যারা তাদের পাখায় কোনো বন্ধন নেই বটে, কিন্তু মুক্তপক্ষ-বিচরণে তাদের বাধা অলঙ্ঘ্য। ঐ বাধা লঙ্ঘন ক'রে পিঁজরার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়ে উদার দিগন্তে পাখা মেলে দেবার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কে বেঁধেছে ও-গান ?

চাঁপা বলল, কে জানে। ওর নিজেরই বাঁধা নিশ্চয়।

গান থেমেছে যজ্ঞেশ্বরীর, গান থামিয়ে সে বলল, একটাও মিথ্যে কথা নেই বাবু এ-গানে। অনেক দেখে অনেক জেনে তবেই বেঁধেছি এ-গান।

চাঁপা বলল, ঐ শোনো। ও নিজেই বেঁধেছে এ-গান।

গলায় তেনরী খুলে রাধা বলল, এটা রাখো চাঁপা, সকালে ওরা যখন নৌকোয় উঠবে ওকে দিয়ে এসো। কে দিয়েছে বলার দরকার নেই। বোলো, একজন তাকে ভালোবেসে দিয়েছে এটা।

তেনরীটা চাঁপা তার হাত থেকে নিয়ে বলল, আচ্ছা।

আসর ভাঙতে শুরু করেছে। রূপনারায়ণ বসেই আছে, আলবোলার নল ঠোঁটের সঙ্গে স্পর্শ করানো। কিছু চিন্তা করছে নাকি ও?

রাধা নিজের ঘরে চলল, একটা সাধ পূর্ণ হল তার, কবির আসর সে দেখল। কিন্তু তার জীবনে সাধ একটাই না।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে-উঠতে মনে-মনে সে গাইতে লাগল—

নাহি চেনো ঘর বাসা কি বসন্ত কি বরষা
সতীবে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।
রাজ্যে থেকে ভাযের প্রতি কার্যে না কুলাও।

চাঁপা জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ বউদি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাধা বলল, অদৃষ্টের কথা।



॥ অষ্টম স্ফুলিঙ্গ ॥

নূতন ঢেউ উঠছে হুগলীতে। নূতন উল্লাস, নূতন আনন্দ, কখনো-বা নূতন বেদনা। আবার সে-ঢেউ প্রবল বাতাসের আলিঙ্গনে ভেঙে-ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়। নূতন জোয়ারের প্রতীক্ষায় বসে থাকে উভয় কূল।

কোন্ সুদূরে আছে সেই বঙ্গসাগর, কোন্ গ্রহের বিপুল আকর্ষণে স্ফীত হয়ে ওঠে সে? তার সেই আনন্দ একা উপভোগ করতে বুঝি সাধ হয় না তার তাই আনন্দকে সে ছড়িয়ে দেয় জোয়ারের রূপে। সাগরসংগমের দেশ থেকে সেই আনন্দ ক্রমে-ক্রমে এসে ছড়িয়ে পড়ে চুঁচুড়ার এই কিনারে। ছলছল করে ওঠে জল।

আনন্দকে বিতরণ করে দেওয়া যায়, কিন্তু দুঃখ বড় বেআড়া জিনিস. একে বিলি করে দেওয়া যায় না পাঁচজনের মধ্যে। বুকের মধ্যে চেপে বসে থেকে কেবলই এ যেন জানায়— এমন দুঃখ আর কারো নেই, এমন দুঃখী আর কেউ নেই ত্রিসংসারে। দুঃখটা তাই আপনজন, কিন্তু সুখ যেন সর্বজনীন। জিজ্ঞাসা করো কোনো সুখী লোককে, সে বলবে পৃথিবীর সকলেই তার মত সুখী; জিজ্ঞাসা করো কোনো দুঃখী লোককে, সে বলবে পৃথিবীতে তার মত দুঃখ কারো নেই।

রাধারও এইরকম ধারণা। তার বিশ্বাস, তার মত দুঃখী আর নেই কেউ। রাজরানীর মত ঐশ্বর্যের মধ্যে বসেও সে কাঙালিনী।

রাধার দুঃখকে ক্ষুদ্র করে দেখার ইচ্ছে আমাদেরও নেই, তাই যদি থাকবে তাহলে রাধারানীর কাহিনী নিয়ে আমরা এতটা বিব্রত হয়ে আছি কেন।

মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধ চুঁচুড়াকে উচ্চকিত করে ভেসে আসে হাহারব। প্রায়ই আসে, কিন্তু আজ ঐ আর্তনাদ একটু বেশি যেন প্রবল বলে বোধ হল রাধার।

উঠে বসল সে বিছানায়, ডাকল, ও রে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী রে!

সাড়া না পেয়ে ডাকল, এত অকাতরে ঘুমাচ্ছিস তোরা? ও রে ও সরস্বতী। ঐ যে কেঁদে-কেঁদে গলা ফাটাচ্ছে, কি হল রে ওর?

সুউচ্চ প্রাচীরের আড়ালে সুরম্য প্রাসাদের অন্তরালে সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে দিনযাপন করলে সকলের খবর রাখা যে দায়।

লক্ষ্মী জেগেছে, বিরাট ঘরের এক প্রান্তে অনুচ্চ চৌকিতে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল সে, বলল, কি বউদিমণি? কি হল?

—কিছু না। শুনছিস ঐ কান্না? কে কাঁদে রে?

অনেকক্ষণ যেন কান পেতে বসে রইল লক্ষ্মী, বলল, কি জানি বউদিমণি। ঠিক তো বুঝতে পারছি নে।

বুঝতে পারছে না, বোঝার কোনো চেষ্টাও বুঝি নেই। কিন্তু ও-কান্না বেশি দূর থেকে আসছে না, এই রায়বাড়ির প্রাচীরের ওপাশের ঐ যে ক্ষুদ্র গৃহটি, এ কান্না আসছে সেখান থেকে।

ভামিনী কাঁদছে।

পরদিন চাঁপার মুখ থেকে শুনেছে রাধা। সব বৃত্তান্ত শুনেছে মনোযোগ দিয়ে, শুনে বলেছে, বেকুব। নির্বোধ।

চাঁপা বলল, বুদ্ধি সব সময় ঠিক থাকে না বউদি। হয়তো মানৎ করেছিল মনে-মনে। সে-মানৎ রক্ষা করেছে, কিন্তু দেবতারা যে এমন বেইমান হবে কে জানবে বল।

জলচৌকির উপর বসে দু পা ছড়িয়ে দিয়ে আলতা পরছে রাধা, বলল, ওকে ডেকে আনা যায় না রাধা? ওকে একবার দেখব।

—তা আর আনা যাবে না কেন। দুঃখী মানুষ ওরা, কোথাও একটু সান্ত্বনা পাবে শুনলেই ছুটে আসবে।

সেদিন বিকালেই ছুটে এল ভামিনী। মোটাসোটা শরীর, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে বড়জোর। পরনে আধময়লা শাড়ি, রুক্ষ চুল গড়িয়ে পড়েছে চোখে-মুখে।

নীচের বারান্দায় বসে মাছ কুটছিল দাসীরা। এই অসময়ে মেয়েকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেখে যেন চমকে উঠল, নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতে লাগল, এই পুতখাগী ভাতারভাড়ানি মাগীটা আবার এ-বাড়িতে ঢুকেছে কেন রে, হৃদয় ?

হৃদয় পিক গিলে নিয়ে বলল, আমাদের বউদির বুঝি হৃদয়েশ্বরী হতে এসেছে। ব্যাটাছেলে তো পেল না বউদি, এখন বুঝি দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চায়। বেশ গোলগাল গড়ন আছে মাগীটার, বউদির পছন্দ হবে নিশ্চয়।

ভবসুন্দরী কোথায় যেন গিয়েছিল, ফিরে এসেছে পরশু। সে কোনো কথা বলল না, আড়চোখে চেয়ে রইল শুধু। কিছুক্ষণ বাদে মুখ খুলল, বলল, আবাগী মাগী, স্বামীর সোহাগ পাওয়ার লোভে পুত্র বিসর্জন দিলি ? ঠিক শিক্ষাই হয়েছে। স্বামী এখন ঠ্যাঙা নিয়ে—

রাধার ঘরে ঢুকে মেঝের উপর বসে পড়ল ভামিনী। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শুধু, বলল, কি উপায় হবে, কি করলাম আমি। কেন করলাম।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে চরাচর। কলকল্লোলের শব্দে জোয়ার এসেছে জাহ্নবীতে। সেই রাত্রির কথা বলতে লাগল ভামিনী। তার এক মাত্র পুত্র কোলে নিয়ে সে বেরিয়েছে পথে।

বলল, স্বামীকে পাই না, তাই স্বামীকে চাই, এ কি পাপ? হ্যাঁ, পাপ পাপ পাপ। আমি পাতক করেছি মা-ঠাকুরুন।

অনেক ছোটবয়সে বিয়ে হয়েছে ভামিনীর। বয়স তখন তার হয়তো দশ, কিংবা এগারো। তার বাড়ি বল্লভপুরে, মাহেশের গায়েই। সেখানে বেশ সুখে ছিল সে, ঘুরে-ঘুরে বেড়াত মাঠে-ঘাটে। তখন কখনো বুঝতে পারে নি যে, তার জীবনে এমন কষ্ট আসবে কোনোদিন। হঠাৎ একদিন সে শুনল— তার বিয়ে। চুঁচুড়ায় বিয়ে হবে তার। শুনে খুশি লাগল খুব। নতুন মানুষটার কথা ভেবে খুশি হল না, খুশি হল নতুন দেশটার কথা ভেবে। ভাবল, ইংরেজদের দেশ থেকে ওলন্দাজদের দেশে যাবে, কত মজা হবে। মনে হল, ওখানকার মানুষ বুঝি আলাদা রকমের; ওখানকরে আদবকায়দাও বুঝি অন্য ধরণের।

মাঝখান থেকে চাঁপা বলল, এখনো তো সেই ওলন্দাজদেরই দখলে আছে এ জায়গা, আদবকায়দা কি আর আলাদা হয়েছে ? ইংরেজদের কলকাতাতেও যেমন, ফরাসিদের চন্দননগরেও যেমন, ওলন্দাজদের এ চুঁচুড়াতেও তেমনি।

তাই। সব জেমনি। সব জায়গায় মানুষ ওই একই ধাঁচের। কোনো তফাত নেই কারো চরিত্রে। সকলের স্বভাব একই রকম।

বিয়ে হল ভামিনীর। বিয়ে হল, কিন্তু বরটা যেন কেমন ছন্নছাড়া। ভামিনীর দিকে ফিরেও চায় না। পাঁচজনে বলাবলি করল, ওর আছে কি যে ওর দিকে ফিরে চাইবে। অত কচি মেয়ে নিয়ে করবে কি সে, পুতুলখেলা খেলবে?

কিন্তু পুতুল না, বুঝি প্রতিমাই হয়ে উঠল ভামিনী। ডাগর হয়ে উঠল সে। তার দিকে ফিরে তাকাবার মত গতরই হয়ে উঠল তার। পাঁচজনে ফিরে ফিরে তাকাতে আরম্ভ করল, কিন্তু যার ভালো করে তাকাবার কথা তার মন পড়ে রইল বাহির-বাগে।

রাধা যেন বিচলিত হয়ে উঠল। যজ্ঞেশ্বরীর গানের কলি যেন বেজে উঠল তার মনের মধ্যে তারস্বরে। বলল, তারপর?

বছর কাটে। বছরের পর বছর। মনে কত লালসা কত বাসনা কত কামনা জাগে। কত মানৎ, কত পূজা, কত তপস্যা করে সে। কিন্তু ফল হয় না।

—কিন্তু ফল হল মা ঠাকুরন। হঠাৎ একদিন দর্শন পেয়ে গেলাম তাঁর। অভাগীকে তিনি বুকে তুলে নিলেন।

তপস্যায় কি না হয়। ভামিনীর গর্ভে এল সন্তান। সে-রোমাঞ্চ সে-আনন্দ সে-সুখ আর সেই শান্তি চিরদিন মনে রাখার মতন।

চিরদিন মনে রাখার মতন বটে, কিন্তু সুখের স্বাদ মনের মধ্যে পুঁজি করে রাখলেই সুখলাভের সাধ দূর হবে কেন।

দূর হল না বলেই তার কষ্ট। দূর করতে সে চায় নি বলেই তার আজ এই অনুতাপ। এ অনুতাপ সহ্য করতে পারছে না ভামিনী।

পুত্রলাভ করল ভামিনী। কিন্তু ওইটুকুই তার জীবনের লাভ হয়ে রইল। স্বামীকে আর কোনোদিন সে পেল না।

রক্তের স্বাদ একবার পেয়েছে যে বাঘ, তাকে রক্তের জোগান না দিলে আর রক্ষে থাকে না। ভামিনীর বুঝি সেই দশা হল। তাই সে মানত করল তার পুত্রকে। এক পুত্র বিসর্জন দিয়ে শত পুত্রের জননী হবার জন্যে লালসা এল তার মনের মধ্যে।

—একি পাপ? বলুন মা-ঠাকরুন। এ কি পাপ?

এ কথার কোনো উত্তর দিল না রাধা। ভামিনীর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। আলুথালু বেশ, চোখ-দুটো ফুলে উঠেছে কেঁদে-কেঁদে, পিঠে কতক-গুলো কালো-কালো রেখা আঁকা হয়ে আছে।

তার পর এল এক পূর্ণিমার রাত্রি। জলকল্লোল বেজে উঠল গঙ্গায়। জোয়ারের জলে থইথই করছে জাহ্নবী। শিশুপুত্র কোলে নিয়ে যাত্রা করেছে ভামিনী। পথের ধুলোর উপর ছায়া চলেছে তার সম্মুখে হেঁটে-হেঁটে। আদর করে মুখচুম্বন করতে লাগল সে তার পুত্রের। ঘুমন্ত শিশুটি দুটি ক্ষুদ্র হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল তার মাকে।

পীতাম্বর বসাকের বাঁধাঘাটে এসে দাঁড়াল ভামিনী। ধীরে-ধীরে নেমে গেল সোপান ভেঙে, নেমে গেল গলা-জলে। চন্দ্র সাক্ষী রেখে মকরবাহিনীর পায়ে সমর্পণ করল সে তার পুত্রকে।

একমনে ভামিনীর কাহিনী শুনছিল রাধা, এই কথা শোনা মাত্র চিৎকার করে উঠল রাধা, বলল, এ কি করলে ভামিনী, এ কি করলে?

পাথরের মত অটল হয়ে বসে ভামিনী বলল, বিসর্জন করলাম তাকে ঐ জোয়ারের জলে।

—কিন্তু, কিন্তু, কোনো ফল পেলে তুমি?

—না। ফল পাই নি। ফলের আর আশাও নেই। তার বদলে যা পাচ্ছি তার দাগ আছে এই পিঠে। বাড়ি থাকে না, হঠাৎ যখন একদিন আসে, তখন সে—

ফুঁপিয়ে উঠল ভামিনী।

দাগগুলির দিকে তাকাল রাধা, তাকাল চাঁপা; লক্ষ্মী আর সরস্বতী তফাতে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে একটু উঁকি দিল মাত্র।

রাধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আশ্চর্য।

কি আশ্চর্য? ওই দাগগুলি, ওই পুরুষটা, না, এই মেয়েটা?

আশ্চর্য সবই। কিন্তু কিছুই বুঝি বিচিত্র নয়। ভামিনী ভুল নিশ্চয় করেছে, কিন্তু কে তাকে এমন ভুল করার প্রলোভন দিয়েছে; কে তাকে শিখিয়েছে যে, এমন মানত করলে প্রসন্ন হয়ে প্রার্থনা পূরণ করেন দেবতারা?

—এমন কেন করলে ভামিনী।

ভামিনীর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, আঁচল দিয়ে জল মুছতে-মুছতে বলল, মাদুলি নিয়েছিলাম। বামুন-ঠাকুর বললেন, মাদুলির কাজ না হে ভামী;

তোকে অন্য পথ নিতে হবে। তাঁকে দক্ষিণা দিলাম, পুজো দিলাম। মন্ত্রপাঠ করে দিলেন হরিনাথ ভটচাজ, আমি মানত করলাম।

চাঁপা বলল, সে কি গো, তাঁর বিধান তো কখনো নিষ্ফল হয় না। নিশ্চয় তোর ত্রুটি আছে কোথাও।

ভামিনী বলল, ত্রুটি তো আছেই চাঁপি-দি। তুমি জান না? নষ্টমেয়ে না হলে টান হয় না ওদের?

চাঁপা রাধার মুখের দিকে তাকাল।

নিত্যরাত্রে কান্না বেজে ওঠে ভামিনীর ঘরে। শুয়ে শুয়ে সে হয়তো স্বপ্ন দেখে যে, মকরবাহিনী তার শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন ভামিনীর কোলে। জেগে উঠেই তাই চিৎকার করে ওঠে সে। ভামিনীর ঘুম তো নেইই, রাধার ঘুমেরও বিঘ্ন করতে আরম্ভ করেছে সে।

দিন-কয়েক পরে চুঁচুড়ার গঙ্গাকিনারে কোলাহল বেজে উঠল হঠাৎ, মাঝিমাল্লারা চিৎকার করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চ্যাচামেচি শুনে লক্ষ্মীকে ডাক দিল রাধা।

কিন্তু লক্ষ্মী কিছু জানে না। যে জানে, সে এসে পড়ল একটু বাদেই, হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে হাজির হল চম্পা-নাপিতানি।

—কি হয়েছে রে চাঁপা? এত গণ্ডগোল কেন?

চাঁপা বলল, ডুবে মরেছে ভামিনী। লাস খুঁজছে মাঝিমাল্লারা।

শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রাধা বলল, বেঁচেছে। এবার বুঝি নিজেকেই মানৎ করেছিল। এবার ফল পাবে, এবার শান্তি পাবে ও।

রাধার বুঝি বিশ্বাস, গঙ্গার পশ্চিমকূলই দুঃখের নিকেতন। ওপারে অনন্ত সুখ। কিন্তু রাধা কি সব জানে? ওপারের পাথুরেঘাটার নন্দরাম শেঠের পুত্র মুকুন্দরামের ঘরের কথা তার জানা নেই। অথচ, মুকুন্দরাম তার পতিরই পরম বন্ধু।

এখানে রাধার জীবন যেমন চলছে ওপারে মুকুন্দরামের স্ত্রী বাসন্তীবালার জীবনও তেমনি চলছে কি না, এ খবর জানার কৌতূহল হয়তো কারো নেই। না থাকারই কথা। কত বাসন্তীবালার কথা আর জানা যেতে পারে?

আর, তাদের কথা জানার সুযোগই বা কোথায়? তারাও তো অন্তঃপুরের নিভৃতে অন্তঃপুরিকা মাত্র।

কিন্তু মুকুন্দরামের দেখা পাওয়া কঠিন নয়। কলকাতার একজন সেরা বাবু ব'লে নিজেকে সে মনে করে। মনিয়া বুলবুল আর আখড়াই-গান নিয়ে সময় কাটছে তার; পোশাকের বাহার তার কম না— চাপকান পাজামা পাগড়ি পরিহিত হয়ে সে যায় টালার নীলাম-ঘরে, কখনো বসে পাশা নিয়ে, কখনো ওড়ায় পায়রা। সদাসর্বদা সঙ্গে খলিপা আছেই। রূপনারায়ণের ইয়ার সে, রূপনারায়ণ মস্ত ধনী। মুকুন্দরামও কম ধনী নয়। কিন্তু ইদানীং ধনের কিঞ্চিৎ টানাটানি পড়েছে।

খলিপা বলল, দমদমার বাগানে কাল মস্ত মজার হাট বসাব। এক হাজার টাকা চাই।

কিন্তু হাজার টাকা এখনি এত সহজে দিতে পারছে না মুকুন্দরাম।

খলিপা এতে নিরুদ্যম হল না, বলল, বাবুজী, এই বান্দা যতদিন আপনার নিকটে আছে ততদিন টাকার জন্য মজা নষ্ট হবে না। আপনি শুধু একটি দস্তখৎ দিবেন, ব্যস।

এত সহজেই টাকার জোগাড় হবে জেনে মুকুন্দরামের আহ্লাদ ধরে না। বেশি বিদ্যে তার না থাক্, নিজের নাম সই করার বিদ্যে তার আছে। সম্মত হল মুকুন্দরাম— বাগানবাড়ির মজার কথা ভেবে খুশিতে ভরে উঠল তার প্রাণ।

খলিপা সংবাদ দিয়েছে, সংবাদ পেয়ে দালাল এসে উপস্থিত হল। মুকুন্দরামের কি পরিমাণ টাকার দরকার যাবতীয় বৃত্তান্ত জেনে তারা চলল মহাজনের কাছে।

মুকুন্দর পিতা নন্দরামের খুব বড় সদাগরী কারবার— বেলেঘাটায় চুনের গোলা আছে, হাটখোলায় ধানের গোলা, চুনাগলিতে বস্ত্রের দোকান।

মহাজন এসব বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে টাকা দিতে সম্মত হল, বলল, হাজার টাকা দেব, কিন্তু খৎ সই করতে হবে পাঁচ হাজারের। বাবুর সঙ্গে রফা করো। তোমরা দালালি নেবে ঐ বাবুর কাছে।

দালালের কাছ থেকে শর্ত জেনে নিরুৎসাহ হল না মুকুন্দ। বাগানবাড়ির মজার কথা তখন তার মগজের মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

পাঁচ হাজারের খৎ লিখে দিয়ে মুকুন্দরাম হাতে পেল আট শ টাকা, দু শ টাকা গেল দালালি দিতে।

কিন্তু তাতে দুঃখ নেই কোনো। দমদমায় স্ফূর্তি সেদিন হয়েছিল মনের মতই। অনেক বন্ধু আর এয়ারও এসেছিল। ফরাসডাঙা থেকে হলধর মিত্রের পুত্র জটাধর আর মল্লিকদের মেজকর্তা শ্রীপতি এসেছিল। আর এসেছিল চুঁচড়ো থেকে রূপনারায়ণ রায়! জমজমাট হয়েছিল আসর। মুকুন্দ ভুলবে না।

মজার নেশায় চুর হয়ে থাকে অন্তরাত্মা। মাঝে-মাঝেই মজার খবর বয়ে নিয়ে আসে খলিপা মনসুর।

মুকুন্দ বলে, কিন্তু মনসুর, দস্তখৎ দিলে কি এখন আর টাকা আনা যাবে? অনেক দস্তখৎ তো দিয়ে ফেলেছি। এখনো কোনো টাকাই শোধ দিতে আরম্ভ করলাম না।

অর্থাৎ, মুকুন্দ না বুঝুক, মনসুর নিশ্চয় বুঝছে— চার-পাঁচ গুণ টাকার খতে সই করে-করে সদাগরী কারবার এবার নীলামে যাবার জোগাড় হয়েছে।

সে বলল, কিন্তু বাবুজী, মজা তবে কি বন্ধ হয়ে যাবে?

মনসুরের এ কথা তো বড় চিন্তার কথা হল। ভাবতে বসল মুকুন্দরাম শেঠ। অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল। ভেবে ভেবে কোনো পথই সে খুঁজে পেল না। দস্তখৎ করে দিতে এখনো সে রাজি, কিন্তু দস্তখতের দাম যেন একটু কমেছে, খলিপা মনসুরও এখন আর তাকে অমন পরামর্শ দিচ্ছে না, লক্ষ্য করছে মুকুন্দরাম।

রূপনারায়ণের কাছে লোক পাঠাবে কি না, সে ভাবল একবার। রূপনারায়ণও তো লুচ্চা বলে নিজের নাম করেছে খুব। গরানহাটায় রামবাগানে আর হাড়কাটায় তার তো খুব খাতির। সে যদি মজার খবর পায় তাহলে নিশ্চয় টাকার কোনো অভাব রাখবে না।

দিন-দুই ভাবল মুকুন্দরাম। চিন্তা না করলে কি মাথা খোলে? ভাবতে-ভাবতে বুদ্ধি খুলে গেল মুকুন্দরামের।

মুকুন্দরামও তো রূপনারায়ণদেরই একজন। একই খোপের লক্কা তারা, ওড়ার ভঙ্গি আলাদা হবে কেন। মুকুন্দরামের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই তার গৃহের অন্তঃপুরের। এর আগে কবে সে শেষ পদার্পণ করেছে তার অন্দরে, ঠিক মনে করতে পারছেনা মুকুন্দ।

তাতে কি আছে। তার গৃহ, তার ভার্যা, তারই অন্তঃপুর। প্রয়োজন হলেই যেতে হবে সেখানে, এতে আর বাধার আছে কি। মুকুন্দরাম ভিতরে গেলে ধন্য হয়ে যাবে নিশ্চয় বাসন্তীবালা।

দুধে-আলতায় রঙ বাসন্তীর। দেখতে ভালো, কিন্তু খুঁতের মধ্যের মুখে কয়েকটা বসন্তের দাগ। সে দাগের জন্যে তার সৌন্দর্য বুঝি খোলতাইই হয়েছে।

সর্বাঙ্গে তার অলংকারে পূর্ণ। গলায় সাতনরী হার, হাতে রোয়াদানি, পায়ে পাঁজোড়; উপর-হাত অনন্ত, আর নীচ-হাত অন্তহীন গয়নায় ভরা। নিতম্বে হীরে-বসানো রূপালি চন্দ্রহার। রক্তিম আভা মাখানো নিতম্বে এই চন্দ্রহার দেখে মনে হচ্ছে রক্তসন্ধ্যার বুকের উপর ছড়িয়ে পড়েছে যেন সাদা মেঘের মালা।

জলের মত স্বচ্ছ মসলিনে অঙ্গ জড়ানো, কিন্তু বস্ত্রের আভাস পর্যন্ত দেখা যায় না; কেবল সোনালি পাড় পা আর কোমর বেষ্টন করে কাঁধে উঠে গিয়েছে। আবরণে অঙ্গ ঢেকেও যেন অনাবৃত মূর্তি নিয়ে অন্দরে পরিক্রমা করে বেড়ায় বাসন্তীবালা।

কোনও আক্ষেপও নেই, অনুযোগও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই; সে যেন পেয়ে গিয়েছে জীবনের যা-কিছু চাহিদা সবই। সে পেয়ে গিয়েছে ঐশ্বর্য। সারা অঙ্গের হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা নিয়ে সে বিচ্ছুরিত করে বেড়াচ্ছে তার সৌন্দর্যের ছটা।

কিসের অভাব তার? মুকুন্দরাম তার কাছে আসে না, না আসুক। তবু তার অভাব নেই কোনো। এইজন্যে মুখ তার কখনো ম্লান না, চোখ কখনো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে না।

হয়তো এমনিই চলত। কিন্তু দুর্ঘটনা জীবনে কম নয়। বাসন্তীবালা কিছুদিন থেকে তাই একটু ম্লান হয়ে আছে। খবর পাঠিয়েছে বহির্বাটীতে, খবরও পেয়েছে মুকুন্দরাম, কিন্তু সময় করতে পারে নি।

বাসন্তীবালা ঐশ্বর্যের আনন্দে ডুবে আছে, কিন্তু তার এখন যে উদ্বেগ তার কারণ আলাদা।

ঐশ্বর্যের আনন্দে ডুবে আছে বটে, কিন্তু তারই অবস্থা ক্রমশ কি দাঁড়াচ্ছে, সে সংবাদ এতগুলি প্রাচীর আর এত পুরু পর্দা ভেদ করে অন্তঃপুরে পৌঁছবার কথা না।

যে কিছু জানে না, তার কথা আলাদা; কিন্তু কিছু জানে যে, সেই মুকুন্দ-রামও ওসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি না। যতদিন তার হাতে জোর আছে, এবং যতদিন মহাজনদের সিন্দুকে টাকা আছে, সে দস্তখৎ করে যেতে রাজি আছে ততদিন।

কিন্তু মনসুর আর দস্তখতের কথা তুলছে না দেখে অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হয়েছে মুকুন্দরামকে।

তাই আজ অন্তঃপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে মুকুন্দরাম।

ম্লান হয়েছিল যার মুখ, অতর্কিত আনন্দে সেই বাসন্তীবালার মুখ স্বস্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মিষ্টি করে হেসে ঘাড় ঈষৎ বাঁকিয়ে সে বলল, এলে ?

—এলাম বাসন্তী। তোমার জন্যে মন কেমন করল।

খিলখিল করে হেসে উঠল বাসন্তী, ঝলমল করে উঠল কানের দুল, সোনালি আওয়াজে বেজে উঠল হাতের চুড়ি, কাঁধের উপর থেকে পিছলে নেমে গেল সোনালি পাড়। পাশে ঘন হয়ে বসে বাসন্তী বলল, মন তবে আছে ? ভেবেছিলাম, তোমাদের মন ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু বাগানবাড়ি আর আছে শুধু ফুর্তি।

—কি যে বল ! বাসন্তীর কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দিয়ে অন্য হাতে বাসন্তীর দুহাত একসঙ্গে ধরে মুকুন্দরাম বলল, বিশ্বাস হয় না বুঝি মন আছে ব'লে ?

মুকুন্দর গায়ের উপর গলে পড়ে বাসন্তী বলল, উহুঁ, একটুও না। খবর পাঠিয়েছি, তবু আস নি।

—বড় ব্যস্ত ছিলাম বাসন্তী। আজ হঠাৎ যেই মনে পড়ল অমনি ছুটে এলাম তোমার কাছে।

মুকুন্দ মাথাটা একটু তফাতে সরিয়ে বাসন্তীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, বাঃ, কি মেখেছ গায়ে, বেশ গন্ধ তো।

—আতর। বাসন্তী হেসে বলল, আদর তো পাই নে, তাই আতর মাখি অঙ্গে !

—কেন। এটা কি পাচ্ছ ?

—ছাড়ো ! দাসীরা আছে কাছেই।

কিন্তু মুকুন্দ এসেছে আজ প্রয়োজনে, সেইজন্যে অত সহজেই সে ছেড়ে দিতে চায় না। বাসন্তীর বাধা মানতেই চায় না সে।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল, কি খেয়েছ ? তোমার মুখে তো বেশ গন্ধ।

—ও একটা জিনিস।

—তা জানি। জিজ্ঞাসা করছি— ব্রাণ্ডি, না, হুইস্কি।

মুকুন্দ বলল, হবে ওরই মধ্যে একটা। কিন্তু ও কথা এখন কেন।

—এখন না হলে কখন হবে বলো। তোমাকে আজ হঠাৎ পেয়ে গেলাম, আবার কবে পাব কে জানে!

মিথ্যা আশ্বাস দিতে লাগল মুকুন্দরাম, বলতে লাগল, পাবে, পাবে। আমি যে তোমার স্বামী তা কি ভুলে গেছি ভাবো।

—না না না। কিছুই ভাবি নে। আমাদের কিছু ভাবতে নেই জানো না? আমরা যে বন্দী পাখি গো।

অনেক কথা জানবার কৌতূহল হতে লাগল বাসন্তীর। যাদের নিয়ে ফুর্তি করে বজরায়, যাদের নিয়ে মজা করে বাগানবাড়িতে, তাদের সঙ্গে ঠিক এই ভাবেই কথা বলে কি না মুকুন্দ। বাসন্তী যে ভাবে কথা বলছে তারাও অবিকল এই ভাবেই কথা বলে কিনা মুকুন্দদের সঙ্গে। কিন্তু ওসব কথা কী করে জিজ্ঞাসা করা যায়? ওদের সঙ্গে তাহলে যে নিজের তুলনা করে ফেলা হয়। ওরা সৌভাগ্যবতী, কিন্তু তবু ওদের সঙ্গে নিজেকে এক করতে পারবে না কিছুতে বাসন্তীবালা। তার জীবনে যে ঘটনাই ঘটে থাক্, তবু সে আর-কেউ নয়, সে বাসন্তীবালাই।

এতক্ষণে কথা পাড়ল মুকুন্দরাম, বলল, জান তো স্বামী ছাড়া গতি নেই স্ত্রীদের?

—নতুন কথা কি গো!

—স্বামীর বিপদ, স্ত্রীরও বিপদ।

বাসন্তী বলল, জানি গো। তাই, হয়েছে কি।

কিন্তু বাসন্তী জিজ্ঞাসা করতে পারল না, স্ত্রীর বিপদও স্বামীর বিপদ কিনা। এ কথা কি এমন খোলসা করে জিজ্ঞাসা করা যায়? কেবল সে চেয়ে রইল তার স্বামীর মুখের দিকে।

মুকুন্দরাম মুখ যথাসম্ভব করুণ করে বলল, বিপদে পড়েছি, তুমিই রক্ষা করতে পার আমাকে।

—কি আবার করে এলে কোথায়?

—কোথাও কিছু করি নি। টাকার অভাবে পড়েছি।

—তা, আমি বুঝি টাকা দেব? আমি পাব কোথায় গো?

—টাকা নয়। মুকুন্দরাম বলল, তোমার গলার ঐ সাতনরীটা দাও। ওতেই আমার হয়ে যাবে।

মুচকি হাসল বাসন্তীবালা, বলল, গলায় হার কেন গো, চন্দ্রহারটা নাও-না, ওতে হীরে বসানো আছে, ওতেই চলবে কাজ।

একটা বিশ্রী রসিকতা করল মুকুন্দরাম, বলল, থাক্-না ওটা ওখানে, নইলে ইয়ে দেখাবে না?

ঘাড়টা এগিয়ে বাসন্তীবালা বলল, দেখাক-না ইয়ে, এই অন্দরে কে আসছে গো দেখতে?

এ কথার কোনো উত্তর দিল না মুকুন্দ। এখন সে তার স্ত্রীকে রাজি করানোর জন্যে ব্যস্ত। মনে হচ্ছে করানো যাবে রাজি। এই জন্যে আর বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট করতে সে চায় না।

শক্ত হয়ে বসেছে বাসন্তীবালা, তার মনেও বুঝি এসেছে কোনো অভিপ্রায়। সে বলল, না গো। না নিলে।

কথাটা শুনেই মুকুন্দরামের মুখ বুঝি আর্ত হয়ে উঠল, বলল, সে কি কথা? আমার বিপদ—

—বিপদটা কী তা আগে বল। ফুর্তির টাকায় টান পড়েছে, এই তো? বউয়ের গয়না বেচে মজা লুটবার মতলব। তা, ঢের বুঝেছি।

এ কথা শুনেও হাসতে লাগল মুকুন্দরাম, বলতে লাগল, রাগ কোরো না। দাও ওটা খুলে।

উঠে দাঁড়াল বাসন্তী, সহসা প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল মুকুন্দরামের দিকে, বলল, দিতে পারি। একটা কড়ারে।

বিপন্ন মুকুন্দরাম ব্যগ্র হয়ে বলল, কি, বলো। কি সেই কড়ার?

—কথা রাখবে?

—রাখব।

গলার হার খুলতে-খুলতে বাসন্তী বলল, সবাইকে বলতে হবে— এর মধ্যে রোজ রাত্রে তুমি আমার ঘরে আসতে, আমার কাছে থাকতে।'

এ আর বেশি কথা কি। এর জন্যে বাসন্তীর এত শপথ করিয়ে নেবার কি দরকার। নিজের স্ত্রীর কাছে রোজ এসেছে, এতে আবার অন্যায়টা কোথায়?

মুকুন্দরাম বলল, বলব। সব্বাইকে বলব।

বাসন্তীর হাত থেকে হার নিয়ে মুকুন্দরাম রওনা হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর উঠে বসে বাসন্তী ডাকল, ও রে রাজু, রাজুবালা।

রাজুবালা ছুটে এল, বলল, কি মা।

—চামর আন। হাওয়া কর্।

—শরীর খারাপ নাকি, মা।

—না রে না, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার।

পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে চামর বীজন করতে লাগল রাজুবলা। সেই হাওয়ায় শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল বাসন্তী। চোখ বুজে পড়ে রইল সে।

অনেকক্ষণ ধরে হাওয়া করতে-করতে বাসন্তীর কপালে হাত দিয়ে রাজু বলল, গা তো গরম নেই।

বাসন্তী বলল, বললাম যে, জ্বর ছেড়েছে।

এর চেয়ে আর পরিষ্কার করে কিছু বলতে চায় না বাসন্তী। তার অশান্তির আর তার উদ্বেগ কিছুটা দূর করে দিয়ে গিয়েছে মুকুন্দরাম!

মুকুন্দরাম খুশি। তার প্রয়োজনের জিনিস পেয়ে গিয়েছে সে—এই তার আনন্দ। এ আনন্দের মধ্যেও, আশ্চর্য, ভুলে যায় নি সে তার শপথ।

তার বৈঠকে বসে আছে তার ইয়ার ও শাগরেদরা, বসে আছে মোসায়েব আর খলিপা।

মুকুন্দ বলল, কিছুদিন হল অন্দরমহলে রাত কাটাচ্ছি। বেশ লাগছে হে। এ জীবনটাও মন্দ না।

টাকার তাগাদায় এসেছে দালাল, তাকে দেখেই মুকুন্দ বলল, টাকা হবে। আছি বেশ আনন্দে। অন্দরমহলে কাটালাম কয়েকটা রাত। তারপর খবরাখবর শুনি। ওলন্দাজরা নাকি চুঁচড়ো ছেড়ে দেবে ইংরেজদের হাতে?

—শুনছি তো তাই। কিন্তু দেবো-দিচ্ছি করেও নিশ্চয় সময় নেবে কিছু। মেয়েমানুষেরও যেমন নেশা, জমির নেশাও তেমনি, বাবুজী। ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় না। ছাড়ি-ছাড়ি করেও সময় কেটে যায় অনেক।

—তা বটে।

দালাল বলল, কিন্তু মহাজন বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বলছে—

তেতে উঠল মুকুন্দরাম, বলল, তারা টাকা পাবে তারা যা বলার বলুক, কিন্তু তুমি এত কথা বলতে এসেছ কেন। তোমার দালালি তুমি তো পেয়ে গিয়েছ কবে!

একটু শান্ত হয়ে মুকুন্দরাম বলতে লাগল, তোমাদের জ্বালায় এ বৈঠকখানা ছাড়তে হবে দেখছি। দেখছি, অন্দরই ভালো। কয়েকটা রাত্তির ওখানে কাটিয়ে দেখলাম ওখানে অনেক শান্তি।

দালালের মুখের দিকে চেয়ে মনছুর তাকে ইশারা করল চলে যাবার জন্যে। সেলাম জানিয়ে চলে গেল দালাল।

যাকে পাচ্ছে তারই কাছে ঐ একই কথা বলছে মুকুন্দরাম। অন্দরে কয়েকটা রাত কাটিয়ে কত শান্তি পেয়েছে সে। এ কথা প্রকাশে তার যেন কত আনন্দ।

মুকুন্দরামের এ-ঘোষণার কথা পৌঁছে গেছে অন্দরে। বাসন্তীর কানেও পৌঁছেছে। খবর শুনে বাসন্তীর শান্তির সীমা নেই, কিন্তু দাসী-বাঁদীরা পড়ল আকাশ থেকে। দাদাবাবু অন্দরে এসে রাত কাটিয়ে গেল, তারা জানতে পারল না ঘুণাক্ষরে—এ কেমন কথা হল।

পুরনো দাসী কান্তমণি ধমক দিল সকলকে, বলল, চুপ। রাত-বিরেতে কোথায় কি ঘটছে, সবই বুঝি জানতে পারবি তোরা? তোরা না দাসী, তোরা না বাঁদী?

অতএব চুপ করে গেছে সকলে।

চামর বীজন করছিল রাজুবালা, বাসন্তী শুয়ে আছে গা এলিয়ে। আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল রাজু, শরীরে কি হয়েছে মা?

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরে গেল বাসন্তীর, বলল, জানিস নে? কান্তমণিকে জিজ্ঞেস কর্।

চামর ফেলে তখনই ছুটে গেল না রাজু। কিছুক্ষণ পরে সে নীচে নেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ও কান্তমাসি, মায়ের কি হয়েছে গো?

কান্তমণি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, বলল, নেকি আমার। যেন কিছুই জানেন না।

—সত্যি বলছি জানিনে।

—জেনে কাজ নেই।

রাজু জিজ্ঞাসা করল, জ্বর, না, জারি, না, পেটের পীড়া?

ফিক করে হেসে কান্তমণি বলল, পেটের পীড়া।

রাধার বিশ্বাস ভাঙতে চাই নে আমরা। তার যা ধারণা, সেই ধারণা নিয়েই সে থাক্। তার মত দুঃখী আরো যে কেউ আছে, এ কথা তাকে জানালেও তার দুঃখের কোনো লাঘব হবে না। আর, সকলের কথা কি আমরাই জানি?

চারদিকে কত অগণ্য অন্তঃপুর আছে, সব অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকারই-বা আমাদের কোথায়, সময়ই-বা কই।

মনস্থির করে ফেলেছে রাধা। যা থাকে অদৃষ্টে, সে মুক্তি চায় এই পাষাণপুরীর বন্দীশালা থেকে।

বাসন্তীর কথা সে জানে না। কিন্তু সে জানে তার কদম মাসির কথা, অনেক দিন পরে তার কথা মনে পড়ছে আজ। আর মনে পড়ছে ভামিনীর কথা।

চৈত্রের খড়ানি উঠেছে। শুকনো পাতা নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে উত্তপ্ত বাতাস। এলোমেলো ভাবে হাওয়া বয়ে চলেছে, গাছের ডাল থেকে পা পিছলে যাচ্ছে কাকেদের।

চৈত্রের এটা শেষাশেষি। জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার আর দেরি কত? এবার সে রাজি করাবেই রূপনারায়ণকে, যেমন করে হোক। এবার সে যাবে মাহেশের স্নানযাত্রায়। এ ভাবে না হলে তার আর মুক্তি নেই।

রূপচরণের মৃত্যুর পর একেবারে স্বাধীন হয়ে গিয়েছে রূপনারায়ণ। এখন শুধু সেই যাচ্ছে না ফুর্তির কাছে, ফুর্তিরা এসে এখন হাজির হচ্ছে তার দুয়ারেই।

তার বিবাহের সময় গেলাশী ঝাড় দিয়ে তার শ্বশুর সাজিয়েছেন বাইরের বাগান, এখন সেখানে নিত্য উৎসব লেগে আছে। কখনো কাশীর বাই, কখনো কাশ্মীরী নর্তকী— প্রত্যহ মহোৎসব হচ্ছে সেখানে। রোজ রাত্রে নতুন-নতুন বিয়ে হচ্ছে বুঝি রূপনারায়ণের। এ কি সহ্য করা যায়, না, সহ্য করতে আছে?

পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছেন তার শাশুড়ি, পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায় রাধারানীও।

নর্তকীদের নূপুরের ধ্বনি এসে পৌঁছয় কানে। আরমানি গির্জায় বেজে যায় রাত-দুটো। তবুও থামে না নূপুর-নিক্বণ। বড় মধুর বোলেই বাজে ও নূপুর, কিন্তু রাধার কানে কি তা মধুর লাগার কথা? সুউচ্চ পালঙ্কে শুয়ে সে এ-পাশ ও-পাশ করে, ঘুম আসে না দু চোখে।

তিলে-তিলে দগ্ধ হচ্ছে, এতেও আশা মিটছে না বুঝি কারো, আবার একদিন ডাক পড়বে বুঝি তার। হরিনাথ পুরোহিত এসে আদেশ দেবে—

শিউরে ওঠে সারা গা। জ্বালা করে ওঠে সর্বাঙ্গ। মনে হয়, তার বুকে বাঁশ দিয়ে কারা বুঝি চেপে ধরছে তাকে।

দম বন্ধ হয়ে আসে রাধারানীর।

পরদিন সকাল না হতেই কানাগিন্নি এসে উপস্থিত হল। কেমন যেন শুকনো মুখ তার, কেমন যেন দুঃখের বেশ।

—কি গো গিন্নি, দেখা পাই নে কেন। এমন সাজ কেন।

কানাগিন্নি নিশ্বাস ফেলে বলল, আর এ-নামে ডেকো না, বউ। আর গিন্নি না। এখন দাসী।

তাজা চোখটি সজল হয়ে উঠল তার, কানা চোখটির কিনার দিয়েও জল গড়াল। বলল, দুঃখী মানুষ আমরা। তা বলে কি এমন তাচ্ছিল্যি করতে আছে ?

—কেন, হল কি। কিছু করেছি নাকি আমি ?

—না গো, তুমি করবে কেন। কত নতুন বউ আসছে চুঁচড়োয়। তারা ভাবে, আমি বুঝি ভদ্দরঘরের মেয়ে না। এঁটো কুড়িয়ে খাই খিদের জ্বালায়, তারা তা বোঝে না।

—কি হয়েছে বলো।

কিছু বলতে চায় না কানাগিন্নি। কিন্তু কষ্টের কারণ তার আছে। পালেদের বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, তারা চেনে না কানাগিন্নিকে—ভেবেছে বুঝি সে ভিখিরি। তেমনি ব্যবহারই করেছে তার সঙ্গে।

সন্ধ্যা হয়েছে, দক্ষিণদুয়ারি ঘরের রোয়াকে বসে ছিল কানাগিন্নি। পালেদের ছোটবউ তর্‌তর্‌ করে উপর থেকে নেমে এসে মেজ-জাকে ডেকে বলে উঠল, ও মেজদি, কাঙালিটাকে বিদায় কর। কানাটা ওখানে বসে আছে কেন, এ কী অলুক্ষুণে কাণ্ড!

কথা শুনেই উঠে দাঁড়াল কানাগিন্নি, বলল, কাঙালি আমি নই গো নতুন-বউ। অমন কথা বোলো না।

নথ-সুদ্ধ ঝাপটা দিয়ে উঠে প্রায় তেড়ে এল সেই ছোটবউ, বলল, আমরা বাগবাজারের মেয়ে, কে কাঙালি কে ভিখারি, কে চোর— সব চিনি।

—কি বললে ?

উপর থেকে শাশুড়ি বললেন, কাকে কি বলছ ছোটবউ ?

ছোটবউ গলাটা মিহি করে নিয়ে বলল, চোর কে চোর বলছি, মা।

আর দাঁড়ায় নি কানাগিন্নি। বুঝতে পেরেছে, এখানে নতুন মানুষেরা আসছে এখন, এই পুরনো লোকটাকে তারা চিনতে পারবে না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, রাতটা হালদারদের আঙিনায় কাটিয়ে, ভোর হতেই ছুটে এসেছে এই রায়বাড়িতে।

কানাগিন্নির মনের অবস্থা ভালো না। বুঝতে পারল রাধা। তাই তাকে বলল, ও গিন্নি, অমন মুখ করে বসে থাকলে ভালো লাগছে না। সেই যে তুমি নেচেছিলে একবার, অমনি নাচ দেখার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। কত দিনের কথা হয়ে গেল। এ বাড়িতে এখন কাশীর বাই এসেছে, কাশ্মীরের নাচিয়ে এসেছে, জান না ? নাচতে যদি সাধ না থাকে, তবে গাও। যজ্ঞেশ্বরীর সেই গানটা, গানের কলিগুলো জানো তো ?

—জানি। কিন্তু নাচ-গান আর আসছে না বউ। এ-রাজ্যি এখন আর আমাকে চায় না।

আর কোনো কথা বলেনি, চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ উঠে সেই-যে সেদিন চলে গিয়েছে কানাগিন্নি, আর আসে নি এ বাড়িতে। হালদারবাড়িতেও নাকি আর যায় নি। তবে গেল কোথায়।

কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। চুঁচুড়ার ত্রিসীমানায় তাকে আর দেখে নি কেউ, হয়তো আর কোনো দিন দেখতেও পাবে না। চুঁচুড়াকে কানা করে দিয়ে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে কানাগিন্নি।

কিন্তু চাঁপা আসে। নিত্যই আগমন ঘটছে তার নিয়মিত। চাঁপার মনে এখন বেশ আনন্দ। এতদিনে তার বউদির সুমতি হয়েছে, এতদিনে মনস্থির করতে পেরেছে সে।

চাঁপা বলল, হ্যাঁ বউদি। তাই জানাও দাদাবাবুকে। মাহেশের স্নানযাত্রায় চলো। তার পর তো আমি আছি।

কে আছে, কে না-আছে—অত হিসাব দিয়ে কোনো কাজ নেই রাধারানীর। চম্পা-নাপিতানি যার নেই, তার জীবনে কি মুক্তি আসতে নেই ? এই নরকযন্ত্রণার থেকে আসল নরকে ঝাঁপ দেওয়া অনেক ভালো—এ বিষয়ে রাধার আর কোনো ভুল নেই।

চাঁপা চেয়ে দেখে লক্ষ্মীরা ঘরে আছে কি না। নেই তারা। চাপা-গলায় বলে, অনেক সুখে থাকতে পারবে বউদি। মাথার মুকুট করে রাখবে, চোখের মণি করে রাখবে। যা চাইবে তাই পাবে। বুঝেছ ?

রাধা চাঁপার মুখের দিকে চেয়ে একটু অধৈর্য গলাতেই যেন বলল, তবে আবার স্নানযাত্রার জন্যে অপেক্ষা করা কেন, একদিন পালিয়ে গেলেই হল।

—তা হল বটে। কিন্তু সেটা যে হল পালানো। তাতে কত কেচ্ছা কত কেলেঙ্কারি, খুঁজে বের করার জন্যে কত পুলিস কত দারোগা কত চৌকিদার কত লেঠেল লেগে যাবে। অমন ঝক্কি নিতে রাজিও হবে না গো কেউ।

—তার নামটা বল্ চাঁপা। তার পরিচয়টা শুনি।

—সে কথা এখন না বউদি। ঠিক জায়গায় তাকে পাবে, ঠিক সময় তার পরিচয় জানবে।

চাঁপার চটক যেন বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ কয়েকদিনের মধ্যেই। রায়বাড়ির বউকে নিয়ে এখন কারবার তার, এ কাজে পাওনাগণ্ডাও মোটা। এ তো যেমন-তেমন বউ না, রূপে চন্দননগরের সেই গাঁদি-বিবিকেও হার মানিয়েছে নাকি ; গাঁদিকে কারা কারা দেখেছে কে-জানে, কিন্তু সবার মুখে ঐ কথা। কচি বউ সেজে যখন এসেছিল তখন রূপ ছিল এক রকম, গাঁদার কুঁড়ির মত ; এখন রূপ যেন ফুটন্ত গাঁদা— ওরই পাপড়ির মত অঙ্গের রঙ, মুক্তোর মত দাঁতের পাঁতি, হরিণের মত টানা দুটি চোখ। আর কিসের মত কি ভাবতে পারে না চম্পা-নাপিতানি। এর দাম যে অনেক, সোনা দিয়ে এই সোনার অঙ্গ ওজন করে দাম দিতে হবে এর। তেমনি দামই আদায় করবে চম্পা। চটক তাই বেড়ে গিয়েছে তার।

লেগে থাকলে মেগে খায় না— কথাটা খুবই সত্যি তাহলে। দশ বছর ধরে সে লেগে আছে যার সঙ্গে, তাকে সে বুঝি হাত করতে পেরেছে এতদিনে। এতদিনে সুমতি হয়েছে রাধা-বউদির।

চৈত্রের সংক্রান্তি এসে গেছে প্রায়। গাজনের সন্ন্যাসীরা দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা মেগে বেড়াচ্ছে। বাবা-তারকনাথের জয়ধ্বনি উঠছে চারদিকে।

ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখের চত্বরে বসেছে চড়কের গাছ ; সেখানে লোক জমে উঠছে ক্রমশ, হোগলার ছাউনি পড়ছে— মেলা বসবে।

এখান থেকেই শোনা যায় কলরব। দিন যতই ঘনিয়ে আসছে সন্ন্যাসীদের আর্তস্বর বাড়ছে ততই। কাতারে-কাতারে লোক আসছে মেলায়। ষণ্ডেশ্বরের মন্দির বুঝি ঢেকে যাবে লোকের ভিড়ে।

চাঁপা এল ছুটে, তুলসীর মালা কিনেছে মেলা থেকে। সে-মালা গলায় জড়িয়ে সে এসে দাঁড়াল রাধার সামনে।

হেসে ফেলল রাধা, বলল, এ কি সাজ আজ, চাঁপা?

—না বউদি। সংসারটা বিষম জায়গা। এখানে শুধু শঠের আর লম্পটের রাজ্য। বৈষ্ণবী হয়ে যাব ঠিক করেছি।

কান পেতে শুনতে লাগল রাধা, যেন নতুন কথা শুনছে সে, বলল, হঠাৎ টের পেলি কেমন করে?

—ঐ যে গো ঐ মেলায়। দলে-দলে মানুষ এসেছে। তারা তীর্থ করতে এসেছে ভেবেছ? মাগীগুলোর কি ছেনালিপনা, দেখলে ঘেন্না লাগে। আর ব্যাটাছেলের কী হ্যাংলামো। মেলায় এসেছে সব এক মতলবে— মদ মাদুর আর মেয়েমানুষ।

রাধা যেন বদলে গেছে অনেক, খিলখিল করে হেসে উঠল গা দুলিয়ে, বলল, তাহলে সত্যিই তুই বৈষ্ণবী হয়ে যাবি?

—চেষ্টা তো করি। তুলসীর মালা পরলাম, এর পর তেলক আঁকতে আরম্ভ করব। তখন আমাকে পায় কে!

যেন অমনি বৈষ্ণবী হয়ে যাবে চম্পা-নাপিতানি। রঙ্গ করে-করে সে বলতে লাগল রাধাকে। বলতে লাগল, রাধারও জীবনের বদল আসছে, চাঁপারই-বা আসবে না কেন। বদলাতে হয় সকলকেই। বদল না হলে কি জীবনে আস্বাদ পাওয়া যায়?

চড়কের মেলার প্রাঙ্গণ থেকে হল্লার শব্দ ভেসে আসে, তার সঙ্গে শব্দ আসে হুগলী-নদীর জলকল্লোলের, এবং আরমানি গির্জার ঘণ্টাধ্বনির। ষণ্ডেশ্বরের চোখের ঘুম বুঝি পালিয়েছে, এত হৈচৈএর শব্দে দেবতার চোখেই কি ঘুম আসে? আর, এখানেও ঘুম আসে না রাধার চোখে, বাইরের ঐ বাগান থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছে।

রাধার বুকের ভিতরটা কাঁপে বুঝি থরথর করে— চৈত্রের থড়ানিতে নিমগাছের ঐ কচিপাতাগুলো যেমন কেঁপে-কেঁপে উঠছে, অবিকল তেমনি।

কলঙ্কের কালি লেপে দিতে সাধ হয় রূপনারায়ণের মুখে, তার অহংকার চূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে হিংস্র হয়ে ওঠে রাধারানী মনে-মনে। কিন্তু হিংস্রতা প্রকাশ করে না সে। চুপ করে থাকে।

দিন কেটে চলেছে একে-একে। দশমীর রাত্রি আজ, জ্যৈষ্ঠের দশমী রাত্রি, পূর্ণিমার আর ক'টা দিন বাকি? আঙুলের কড় গোনে রাধা।

চাঁপা বলল, ওকি বউদি, নাম জপছ কার? সন্ধ্যা করছ, না, আহ্নিক করছ? তুমিও কি বৈষ্ণবী হয়ে যাবে নাকি বউদি?

চোখ-দুটো একটু বড় করে তাকাল রাধা, বলল, না রে। আমি হব ভৈরবী। শক্তির সাধনা করছি আমি।

তা বটে। মনে-মনে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে রাধা। দয়া ক'রে রূপনারায়ণ যদি একবার পদার্পণ করে এই কক্ষে, তা হলে সে তার আবেদনটি পেশ করবে।

হৃদয়বালার হাত দিয়ে রাধা লিপি পাঠাল রূপনারায়ণের কাছে। প্রশস্ত ফরাসের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সে তখন পানদানি থেকে আলগোছে পান তুলে নিয়ে মুখে ফেলছে। ফরাসের অপর প্রান্তে এক চাপ মাংসের মত জড়ো হয়ে পড়ে আছে কি ওটা? কাশীর বাইটা বুঝি?

পেয়াদা বরকন্দাজ ফরাশ আবদার তটস্থ হয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে।

ঘোমটা দিয়ে নাক ঢেকে হৃদয়বালা লিপিটা দিল পেয়াদার কাছে, যথাসম্ভব নম্র আর নত হয়ে পেয়াদা সে-লিপি দিল রূপনারায়ণের হাতে।

একটু বুঝি বিস্মিতই হল রূপনারায়ণ। বেশি-কিছু পড়তে না জানলেও সে পিঠের নীচে তাকিয়া চেপে নিয়ে পড়তে লাগল—

প্রাণেশ্বর, তোমার দেখা না পেয়ে এ অভাগী কাতর।
পায়ের ধুলা দিয়ে দাসীকে রক্ষা করো। সময় করে একবার
এলে চিরদাসী হয়ে থাকবে তোমার দাসী রাধারানী।

চোখের কোণে কালি পড়েছে রূপনারায়ণের, সেই কালির কিনার দিয়ে ঝলক দিয়ে উঠল বুঝি খুশি। তখনি আবার ব্যঙ্গে ভেঙে পড়ল সে তাকিয়ার উপর। ডাকল, আবদার। লে আও।

বাইরে দাঁড়িয়ে ভীত হয়ে উঠল হৃদয়বালা। কা'কে ধরে আনতে আদেশ দিচ্ছেন বাবু? তাকে না তো?

দাঁড়াল না হৃদয়বালা। সেখান থেকে সে প্রায় ছুটে পালাল। হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে হাজির হল সে রাধার কাছে।

—কি রে হৃদয়, কি হল?

হৃদয় বলল, দাদাবাবু চিঠিটা পড়েই বলে উঠল— লে আও। ভাবলাম আমাকেই বুঝি, পালিয়ে এলাম তাই।

একটু দম নিয়ে হৃদয় বলল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বুঝি তোমাকেই নিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দিলেন দাদাবাবু।

—আমাকে ? বলিস কি রে হৃদয়বালা। তেমন ভাগ্য করে কি এসেছি! নাচ জানি না, গান জানি না, ঢঙ জানিনা— কিছুই যে জানা নেই আমার।

ছু-চোখ ছলছল করে উঠল রাধার। ঢোক গিলে বলল, শিখে নেব, শিখে নেব, শিখে নেব। সব শিখে নেব হৃদয়বালা।

হৃদয় বলল, ছি, জল আনতে নেই চোখে। পুরুষমানুষরা অমন একটু করবেই। তাতে কি রাগতে আছে ?

রাগ নয়, দুঃখ নয়, অনুতাপ নয়। এ শুধু তার নিজের উপর নিজের অভিযোগ। এতদিন কেটে গেল অযথা, এতদিন সে বৃথাই ক্ষয় করল সময়! অমনি রঙ অমনি ঢঙ অমনি নাচ অমনি গান শিখে নিতে ক'দিন লাগে ? এতদিনে শিখে নিতে পারলে আজ মিনতি করে ডেকে পাঠাতে হত না। নিজে থেকেই এসে ঝাঁপ দিত ঐ পতঙ্গটি এই আগুনের শিখায়।

রাধা বলল, শিখে নেব সব! সব শিখতে হবে আমাকে।

কিছুক্ষণ বুঝি প্রতীক্ষাতেই কাটল সময়। যে-বার্তা নিয়ে এল হৃদয় সেই বার্তা অনুযায়ী, কই, কাজ তো হচ্ছে না! নিতে তো আসছে না তাকে কেউ। যদি আসে কোনো আরদালি বা কোনো পেয়াদা, সব লজ্জা ভয় জড়তা দূরে নিক্ষেপ করে সে রওনা হবে তার সঙ্গে। ঐ কাশ্মীরের নর্তকী কিংবা কাশীর বাইয়ের পাশে বসে সে এক হয়ে যাবে তাদের সঙ্গে। তখন রূপনারায়ণ কি করে তাই দেখবে।

কিন্তু পেয়াদা-বরকন্দাজরা কেউ এল না। দিন ছুই বাদে, কী আশ্চর্য, দিনের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল নাকি ? চন্দ্রের দীপ্তির মত শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত করতে-করতে স্বয়ং রূপনারায়ণ এসে উপস্থিত।

গলবস্ত্র হয়ে রাধা প্রণাম করল রূপনারায়ণকে।

উঠে দাঁড়িয়ে মখমলে-মোড়া কেদারা দেখিয়ে বলল, বোসো।

রূপনারায়ণ বসল, তার পাশে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে রাধা জিজ্ঞাসা করল, শরীর ভালো আছে তো ?

বাবড়ি চুল কালো পশমের মত ঝুলে আছে কাঁধ পর্যন্ত, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ভেদ করে চোখের কোণের কালি ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। রূপনারায়ণ গদগদ গলায় বলল, ভালো আছি। আমার কথা তুমি বুঝি সত্যি ভাব ?

—ভাবি। কিন্তু তাদের মত ভাবতে বোধ হয় পারি না। অত ভালো করে ভাবতে বুঝি শিখি নি।

ঘাড় উঁচু করে রাধার মুখের দিকে তাকাল রূপনারায়ণ, জিজ্ঞাসা করল, কাদের কথা বলছ?

নিশ্বাস বন্ধ করে বলার মত করে রাধা বলল, কাশ্মীর থেকে আর কাশী থেকে যাদের আনিয়েছ।

একটু চুপ করে রইল রূপনারায়ণ, তার পর বলল, এবার তাদের বিদায় দেব। অনেক দিন হয়ে গেল।

রাধা সায় দিয়ে উঠল, তাই বেশ। নতুন কাউকে আনাও। নাহলে কেমন একঘেয়ে লাগে। সেই একই নাচ, একই গান, একই রূপ, একই রঙ।

—দেখলে কি করে?

—দেখি নি। এত দূরে পড়ে আছি বটে, কিন্তু শব্দ তো আসে কানে। আমারি কেমন পুরনো ঠেকে, তোমার তো লাগবেই।

রূপনারায়ণের ধারণা তবে ভুল। নরহরি আর মোতিলালও তবে বাজে ভয় দেখিয়েছে। কই, রাধা তো কোনো জুলুম করছে না, নাকীকান্না কেঁদে-কেঁদে দুঃখ জানাচ্ছে না তো। এ তো বেশ সুন্দর ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন ব্যবহার আশা করে ব্যাটাছেলেরা অবিকল তেমনি ব্যবহার।

রাধা বলল, বসে থেকে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই। চল, শোবে চল।

হেসে উঠল রূপনারায়ণ, বলল, দিনের বেলা স্ত্রী-সহবাস করছি জানতে পারলে লোকে কি বলবে বল?

রাধাও হাসল, বলল, লোকের ভয় তবে আছে তোমারও? ভেবেছিলাম, তুমি ভয় কর না কাউকে। কিন্তু দেখছি, তুমি আমারই মত ভীতু। চল, শোবে চল।

চাঁপা এসে পড়েছে কখন যেন। দরজার বাইরে একজোড়া লপেটা দেখেই সে থমকে থেমে গিয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে সরে গিয়েছে তফাতে।

নীচে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ঝিয়েদের ঝংকার। বাড়িতে এমন-একটা অঘটন ঘটনা ঘটেছে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে তারা। বাইরে অমন বাইদের ফেলে ভিতরে ঢুকে কি নিয়ে খেলা করছে তাদের দাদাবাবু?

ভবসুন্দরী চাপা গলায় বলল, মিষ্টি খেয়ে জিভ জড়িয়ে এলে একটু তেঁতুল

চেটে নিতে হয় রে, বিন্দে। অল্পেই অত চমকালে চলবে কেন। মাহেশ যাবার দিন এসে গেছে, বজরা ভাউলে পিনিস থকথক করছে গঙ্গায়, গাঁদি লেগে গিয়েছে নৌকার। সেখানে যাবার আগে একবার দেখা করে যাবে না?

ভবসুন্দরীকে ভয় পায় বিন্দুবাসিনী। তবু বলল, দেখা করতে এতই সময় লাগে বুঝি?

অকথ্য ইঙ্গিত করে ভবসুন্দরী বলল, ক দণ্ড সময় লাগে জানো না! সব জেনে-শুনে ঠ্যাকার করা হচ্ছে।

শুয়ে আছে রূপনারায়ণ। সুউচ্চ পালঙ্কে দেড় হাত পুরু বিছানার উপর শুয়ে একটু আরামই লাগছে বুঝি তার।

মাথার কাছে বসে চুলে হাত বুলাতে-বুলাতে রাধা বলল, আমি যাব। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

—এইজন্যে বুঝি ডেকে পাঠিয়েছ আমাকে?

—না গো না। এজন্যে নয়। স্ত্রী ডাকবে স্বামীকে, তার মধ্যে কি কোনো জন্যে আছে নাকি? তুমি এসেছ, কত ভালো লাগছে আমার। আমার কথা শুনেছ, কত গর্ব হচ্ছে আমার।

একটু থেমে রাধা বলল, কিন্তু আর-একটি কথা শুনতে হবে তোমাকে। আমি যাব। আমাকে নিয়ে চল।

বালিশের উপর মাথা দোলাতে লাগল রূপনারায়ণ, বলল, না। তা হয় না।

—না নিয়ে গেলে ফিরে এসে দেখবে আমি নেই, ওই ভামিনীর মত ডুবে মরেছি ঐ গঙ্গায়।

অনেকক্ষণ যেন ভাবল রূপনারায়ণ। কি করে সে বোঝাবে তার স্ত্রীকে যে, ওসব জায়গায় যেতে হয় না ঘরের বউকে। কখনো যায় না তারা। যারা যায় তারা-সব অন্য রকমের মেয়ে।

রাধা আজ বড় অন্তরঙ্গ ভাবে পেয়েছে রূপনারায়ণকে। জীবনে তার এই প্রথম এমন করে পাওয়া। তার সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্যে সে সংকল্প করে ফেলেছে। রাজি না করিয়ে সে আজ ছাড়বে না কিছুতে।

প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল রূপনারায়ণ, রাধার হাত ধরে বলল, তোমাকে আজ ঠিক পরস্ত্রীর মত লাগছে।

—তা লাগবে বই-কি। পর করেই তো তুমি রেখেছ আমাকে। কোনোদিন কি ভাবতে পেরেছ আপনজন ব'লে।

একটা নিশ্বাস ফেলে রাধা বলল, তোমাকেও আজ পরপুরুষ বলে মনে হচ্ছে আমার।

উঠে বসার চেষ্টা করেই শুয়ে পড়ল রূপনারায়ণ, বলল, কি রকম?

রাধা ধরতে পেরেছে, রূপনারায়ণের লেগেছে কোথায় তা ধরতে পেরেছে রাধা। তক্ষুনি সে তাই বলল, দেখছ-না, কেমন তফাত-তফাত আছি। গায়ের সঙ্গে ঘন হয়ে লেগে বসতে কেমন সংকোচ ঠেকছে।

রূপনারায়ণ বলল, সংকোচের কি আছে, সরে এসো।

কিন্তু সরে গেল না রাধা, যেমন ভাবে বসে ছিল ঠিক তেমন ভাবেই সে বসে রইল অটল হয়ে। আর বেশি সরে বসতে তার যেন ঘৃণা হচ্ছে। সত্যিকারের পরপুরুষকে সত্যি এমন ঘৃণা বুঝি করে না রাধা।

কিন্তু ঘৃণার কথা বলার বা ঘৃণা-প্রকাশের সময় এ নয়। আজ রূপনারায়ণের কাছ থেকে কথা নেবে সে, তার সম্মতি নেবে আজ।

মাথার কাছে বসে আছে সে, রূপনারায়ণ তাই তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে মুখের উপর বেদনার বিদ্বেষের আর বিতৃষ্ণার চিহ্ন ফুটে উঠছে অনবরতই!

রূপনারায়ণ বলল, এলে না। সরে এলে না?

—এই তো এসেছি। একটু ঝুঁকে পড়ে বলল রাধা।

—সামনে এস। তোমাকে দেখতেই পাচ্ছি নে।

আ, বড় আক্ষেপ রূপনারায়ণের। যাকে দেখতে পাচ্ছে না তাকে দেখার জন্যে যেন কতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে সে। তাই আজ তার এই ব্যাকুলতা।

দুপুর ঝাঁঝা করছে বাইরে। কোন্ অলক্ষ্যে বসে ছাদ-পাখা টেনে চলেছে পাঙ্খাবরদাব। কিন্তু ও হাওয়ায় ঠাণ্ডা হচ্ছে না শরীর।

এদিক-ওদিক তাকাল রাধা। কোথায় হাতপাখা, কোথায় চামর! দাদাবাবুকে দেখে কোথায় পালিয়েছে দাসীরা। কারো পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

অগত্যা উঠতে হল রাধাকেই। চরণপদ্ম বেজে উঠল ঝুমঝুম করে। চমকে তাকাল রূপনারায়ণ, কাদের পায়ের ঘুঙুরের শব্দ বলে হঠাৎ মনে হল তার। বিছার উপর হামাগুড়ি দিয়ে রাধা চলে গেল পায়ের দিকে।

—কোথায় চললে?

—যাই নি, আসছি।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঁচু খাট থেকে সে মেঝের উপর নামল। নিয়ে এল চামর, নিয়ে এল পাখা।

আবার সে বসল নিজের জায়গায়, বলল, বাতাস করি। তুমি ঘেমে উঠছ। যা গরম পড়েছে।

হাওয়া করতে লাগল রাধারানী। চোখ আধো বুজে এই পরিচর্যা উপ-ভোগ করতে লাগল রূপনারায়ণ। বলল, বা, বেশ।

—কি বেশ? রাধা বুঝি ব্যঙ্গ করেই জিজ্ঞাসা করল, এই হাওয়া, না, এই গরম? কোন্‌টা বেশ?

কি কি বেশ সে ফিরিস্তি পেশ করল না রূপনারায়ণ। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, এই সবই বেশ। এই বিছানা, এই বালিশ, এই হাওয়া, এই দুপুর। আর, তার সঙ্গে আরও যেন একটা কি। নানা জায়গায় অনেক ফুর্তি পায়, অনেক আমোদ পায়, কিন্তু এমন আরাম বুঝি পায় না। চোখ বুজে অনেকক্ষণ চিন্তা করে রূপনারায়ণ বলল, তুমি বড ভালো!

রাধাও চোখ বুজল, আনন্দে না বিদ্বেষে বোঝা গেলনা, বলল, তুমি তার চেয়েও ভালো।

উভয়ে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে উভয়ের সঙ্গে, এই ভাবে কথা বলতে লাগল দুজন। কখনো সে কথার মানে হচ্ছে, কখনো-বা হচ্ছে না। কিন্তু তাদের সে-খেয়াল নেই।

রাধা এবার অন্য কথা তুলে বলল, ওদের বিদায় করে দিচ্ছ, তাহলে তোমার সঙ্গে যাবে কারা?

হাসতে লাগল রূপনারায়ণ, হাসতে-হাসতে বলল, মেয়েমানুষের কি অভাব? টাকা ফেললেই জুটে যাবে। মেয়েমানুষরা আর-কিছু চেনে না, চেনে শুধু টাকা।

বুকের মধ্যে বিষম ঘা লাগল রাধার। মেয়েমানুষরা আর-কিছু চায় না নাকি? রাধাকেও বুঝি অমনি একজন মেয়েমানুষ বলেই মনে করে রূপনারায়ণ? তাই টাকার হরিলুঠ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঐশ্বর্যের আর আড়ম্বরের মধ্যে ফেলে রেখেছে তাকে!

রূপনারায়ণ বলল, ঐজন্যেই তোমার কথা রাখতে বাধছে। ওখানে সঙ্গে যাবে সব বাইজীরা-নর্তকীরা, তার মধ্যে কি তোমার যাওয়া ঠিক?

—ঠিক। কিচ্ছু বেঠিক না। আমি যদি ঠিক থাকি, তবে কিছুই

খারাপ না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরা নরকে যেতে পারে, কিন্তু এ তো মাহেশের স্নানযাত্রা।

উঠে বসল রূপনারায়ণ, মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, আচ্ছা। ঠিক আছে। যাবে।

উল্লাসে উতরোল হয়ে উঠল রাধা, বলতে লাগল, মত দিলে তো? সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আমায়, আমার কী আনন্দ, আমার কী গর্ব। এতদিন তুমি আমাকে এমন ভাবে উপেক্ষা করেছ, সব শোধ হয়ে গেল আজ। আমি তবে তৈরি হই।

—হও। সময়ও আছে। আমাদের নৌকো ছাড়বে পরশু।

মাহেশের স্নানযাত্রায় যাবে রাধারানী। পা কাঁপতে লাগল তার। সে তার সংকল্প পালন করতে পেরেছে, এ যেমন একটা আনন্দ, সমাজের নিয়ম সে লঙ্ঘন করবে, এও তেমনি একটা উল্লাস।

পালঙ্ক থেকে নেমে এসেছে রাধা। চরণপদ্ম বেজে উঠছে ঝুমঝুম শব্দে, সেই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে বলতে লাগল, আমাদের বিয়ের সেই মিছিলের কথা মনে পড়ছে, অমনি মিসলবন্দী হয়ে রওনা হবে আমাদের ময়ূরপঙ্খী।

নেমে দাঁড়াল রূপনারায়ণ, বলল, হবে হবে। কত নৌকো চাও বলো। নৌকোর কোনো অভাব হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকে কি বলবে তাই ভাবছি।

—ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দাও। লোকেদের অত ভয় করে চললে লোকেদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়, আরো ভয় দেখাতে আরম্ভ করে তারা। তোমার সঙ্গে আমি যাব, এ শুধু তোমার আমার কথা, এর মধ্যে বাইরের লোক আসছে কী করে।

রূপনারায়ণ বুঝে ফেলল যুক্তিটা, বলল, তা ঠিক।

চলে যাচ্ছিল সে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, সেজেগুজে নিয়ো ভালো করে। বেনিয়ান রূপচরণ রায়ের পুত্রবধূ তুমি, মনে রেখো। এ বাড়ির কোনো অমর্যাদা না হয় দেখো। বিয়ের সময় দেখেছ তো কারা-সব এসেছিল নিমন্ত্রিত হয়ে?

—দেখি নি। শুনেছি। আমীর-ওমরাও, সাহেব-সাহেবান, মোগল-পাঠান।

—আর, তোমার সঙ্গে দাসী যাবে কে ?

রাধা বলল, বেশি কাউকে নেব না। সঙ্গে যাবে চাঁপা।

উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্নানযাত্রার মহোৎসব আছেই, তার উপর এর দিন-পনের পরেই রথযাত্রা। মাহেশ তাই এখন লোকে লোকারণ্য। এত লোকের সমাগমে মাহেশের নদীকিনার জনসমুদ্রের মত দেখাচ্ছে এরই মধ্যে। জগন্নাথদেবের স্নান তো পরশু; কিন্তু আগে থেকে না এলে ঠাঁই মিলবে না ব'লে আগে থেকেই এসে পৌঁছে গিয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতার দল। কেউ গো-গাড়িতে, কেউ পালকিতে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ-বা নৌকো চেপে— পানসিতে ডিঙিতে পালোয়ারে আর বজরায় এরই মধ্যে ভরে উঠেছে মাহেশের কিনার।

ডাঙায় লোক ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর অবধি— নোয়াপাড়া থেকে আরম্ভ করে রিসিড়া চাতরা বল্লভপুর আকনা পার হয়ে শ্রীরামপুর পর্যন্ত অনেক গ্রাম পূর্ণ হয়ে গিয়েছে মানুষের ভিড়ে। এখনো লোকের আগমনের বিরাম নাই। এখনো দুদিন বাকি স্নানযাত্রার।

স্নানযাত্রা তো একদিনের ঘটা। এর পরই রথযাত্রা—সে হচ্ছে নবরাত্রির মেলা। মেলা বসতে আরম্ভ করেছে বল্লভপুর থেকে মাহেশ পর্যন্ত। বাঁশের খুঁটি পুঁতে হোগলার চাল ফেলা হচ্ছে রাস্তার এ-পারে আর ও-পারে। যারা স্নানযাত্রায় এসেছে, এই দোকান-সাজানোর ঘটা দেখতেই তাদের কত আনন্দ, দল বেঁধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তারা, আর মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখছে বাঁশের খুঁটি পোঁতার ব্যস্ততা।

দূর-দূর জায়গা থেকে আসছে ব্যাপারীরা। পাকাকলা কাঁচাকলা আনারস ডাব স্তূপ হয়ে পড়েছে এক ধারে। অন্য দিকে কাপড়ের আর পিরানের দোকান বসছে; আরশি কাঁকুই বাক্স টুপি মাদুর হুঁকা খেলনা— দোকানের অন্ত নেই।

পাশেই ছোট তাঁবু। তাঁবুর বাইরে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে সাদা কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে ছবি আঁকছেন এক শ্বেতাঙ্গিনী। মেলার ছবি বুঝি। দূর থেকে মহিলাটিকে চেনা যাচ্ছিল না। এবার চেনা গেল। ইনি সেই মহিলা, কয়েক বছর আগে কলকাতার চৌরঙ্গীতে এঁকে আমরা দেখেছি। কয়েকটা বছর কেটেছে বটে, কিন্তু ইনি দেখতে ঠিক তেমনই আছেন।

এক মনে ছবি এঁকে চলেছেন শ্রীমতী বেলনস।

কলকাতার কালীঘাট থেকে পটুয়ারা এসেছে পট নিয়ে। ছু-ছু পয়সায় মজাদার-মজাদার পট বিক্রি হবে এখানে। তাদের জন্যেও ঘর বাঁধা হচ্ছে।

পানউলিরা পানের দোকান খুলে বসেছে— পয়সায় চারটে করে গোলাপি খিলি; সেই খিলির সঙ্গে উপরি পাওনাও আছে, মুচকি হাসি আছে দিলখোলা।

ওপাশের মাতুরের দোকানের ছোকরাটা খোঁটার উপর বসে পা ছুলিয়ে-ছুলিয়ে এদিকে চেয়ে হাসছে আর গান গাইছে—

বিমলি বসেছে দোকানে
ও সে কিসের দোকান কে জানে

কাঁচা-মিনসের গানের ওই কলি শুনে এ পারে হাসির ফোয়ারা উঠছে বুকের মধ্যে। কিন্তু তা আড়াল করে বসে নিজের মনে গোলাপি খিলি তৈরি হয়ে চলেছে। চোখের পাতা-ছুটো যেন বেজায় ভারি, চোখ তুলে চাইতে কষ্ট হয়, তাই ভুরুটা টেনে তুলে একটু তাকায় মাত্র ওদিকে। ওদিক থেকে গান ভেসে আসেই

ঝুমকো ছুলেছে ছু কানে
ও সে কিসের দোলন কে জানে!
বিমলি বসেছে দোকানে
ও সে কিসের বেসাত কে জানে।

কোদাল কুপিয়ে রাস্তা চওড়া করে দিচ্ছে সাঁওতালি মজুর। মজুরনিরা চাঙারি ভর্তি করে মাথায় করে মাটি নিয়ে ফেলছে ও-পাশে।

চারদিকে হট্টগোল। এরই মধ্যে এসে গিয়েছেন পাদরি-সাহেবরাও। হাতে একটি পুঁথি, রাস্তার এক পাশে ছুটি দেশী খ্রীষ্টান লোককে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা বাংলায় বলে চলেছেন—

বেতলেহামে ঘটল যিশু-চন্দ্রের উদয়
পৃথিবীর মনুষ্যরা গায় জয়-জয়।

কিন্তু ও চন্দ্রের দিকে মনোযোগ নেই কারো। তারা তাকায় আকাশের দিকে। শিশু-চন্দ্রের জন্যে নয়, জৈষ্ঠপূর্ণিমার পরিপূর্ণ চন্দ্রের উদয়ের জন্যে তারা লালায়িত।

পূর্ণচন্দ্রের বিভায় শৌখিন পিনিসের সুসজ্জিত কামরা আলোকিত করে

চতুর্দশীর দুপুরে চুঁচুড়ার কিনার থেকে যাত্রা করেছে রাধা। রূপসী সে, কিন্তু আজ তাকে চতুর্গুণ রূপবতী দেখাচ্ছে। এতদিন ছিল বন্দিনী, কিন্তু আজ বুঝি সে বন্দনীয়া। স্বামীর সঙ্গে তীর্থযাত্রায় চলেছে রাধারানী।

অনেকদিন পিছনে চলে যায় তার মন। গৌরহাটির ঘাট থেকে যেদিন সে যাত্রা করেছিল শান্তিপুরে। রাইরাজা হতে চলেছিল সে সেদিন। আজকের এই সমারোহের সঙ্গে সেদিনকার সেই দীন আয়োজনের কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু তবুও তুলনা এসে যাচ্ছে তার মনে। সেবারের সেই নৌকোযাত্রার পর তার জীবনে এসে গিয়েছিল পরিবর্তন, কুমারী রাধা হয়েছিল বিবাহিত বধূ; আজকের এই নৌযাত্রাও তার জীবনে পরিবর্তন আনবে ব'লে সে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে এইজন্যে যে, এবারকার পরিবর্তন সে নিজের ইচ্ছায় ঘটাবে বলে সংকল্প করেছে। এবং এইজন্যেই তার যাত্রা। সেদিন তার ইচ্ছা বা বাসনা বা কামনা বা আকাঙ্ক্ষা ব'লে কিছু ছিল না, সেদিন সে ছিল বালিকা। কিন্তু সে রাধা এখন আর নেই সে, এখন সে বুঝতে শিখেছে, জানতে শিখেছে। সেদিন তার কোনো বেদনা ছিল না, কিন্তু আজ সে বেদনায় দীর্ণ। বালিকা-বধূ হয়ে সে প্রবেশ করেছিল যে গৃহে সেই গৃহ তার প্রাচীরের উত্তাপ দিয়ে আজ তাকে করে তুলেছে—

তাদের পিনিসের পাশ দিয়ে তর্‌তর্‌ করে তীরবেগে বেরিয়ে গেল একটা ডিঙি, মাঝির পো গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে চলেছে—

ঐ যায় বুঝি যৈবনের তরী অকূল তুফানে।

এ গান তার কানে যাওয়া মাত্র রাধারানী চমকে তাকাল ঐ দিকে, জানলা দিয়ে উঁকি দিল রাধা, শুনতে পেল গান—

মদনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারিনে।

চাঁপার মুখের দিকে তাকাল সে। চাঁপার কানেও গিয়েছে ঐ গান, কিন্তু তার তো বিচলিত হবার কিছু নেই। চুপ করে সে বসে রইল।

শান্তিপুরে তার সেই যাত্রার কথাটা বার-বারই তার মনে পড়ে। ছোট একটা পানসিতে চেপে সেবার গিয়েছিল গরিবের মেয়ে। কিন্তু এবার চলেছে রাজেন্দ্রাণীর মত এই শৌখিন পিনিসে। দক্ষিণের বাতাস উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে পাল, বারো-চোদ্দ জন মাঝিমাল্লা নৌকোটা নিয়ে তবু যেন কত ব্যস্ত।

পরিচ্ছন্ন কারুকাজে মণ্ডিত নৌকোটির ছুটি ঘর। এ ঘরে আছে চাঁপা আর রাধা, অন্য ঘরটিতে রূপনারায়ণ।

রূপনারায়ণ ও ঘরে বসে একা-একাই চুমুক দিচ্ছে গেলাশে। আ, মজাটা মাটি করে দিল ঐ মেয়ে। কিন্তু মাটি করে কে, রূপনারায়ণও যেমন-তেমন মানুষ না, খুশি হলেই চলে যাবে ঐ বজরায়।

একটা বহরই বলা চলে, রূপনারায়ণের এই স্নানযাত্রায় চলেছে তার এক নৌবহর। এই পিনিসে আছে তারা স্বামীস্ত্রী ও চাঁপা। আগে-পিছে আর পাশে-পাশে চলেছে তার বজরা ভাউলে আর পালোয়ার। বজরায় বাইজীদের নিয়ে আছে মোতিলাল নরহরি আর অন্যান্য ইয়ারেরা। ওখানে নাচ শুরু এখনো হয় নি। ওরা কি করছে ওখানে জানবার একটু কৌতূহল যে না হচ্ছে এমন নয়! কিন্তু হবে এখন, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসুক, এদিকে চোখেও রঙ ধরুক ভালো করে।

পালোয়ারে চলেছে ভৃত্যেরা— আবদার আছে, ফরাশ আছে, খানসামারা আছে। রান্নাবাড়ির ব্যবস্থাও ওখানে। পেয়াদা-বরকন্দাজেরা কেউ কেউ পালোয়ারে, কেউ-বা ভাউলেতে।

খুব সেজে চলেছে রূপনারায়ণ। দু ভুরুর পাশে আর চোখের কোণে কালো রেখা পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার রূপ যেন একটু খোলতাইই হয়েছে; কোঁকড়া চুল বাউড়িকাটা; পরনে কালোপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি; গায়ে মসলিনের সূক্ষ্ম নিমাস্তিন জামা, চুনট-করা উড়ুনি গলায়, পায়ে বকলস-বাঁধা চীনের বাড়ির জুতো।

শৌখিন লক্কার মত দেখাচ্ছে রূপনারায়ণকে।

বাতাসের সুপ্রসন্ন দাক্ষিণ্য পেয়েছে তাদের নৌকো। হাওয়ায় ফুলে উঠেছে পাল। মসৃণ দ্রুততায় ভেসে চলেছে রূপনারায়ণের নৌবহর।

ছলছল শব্দ হচ্ছে জলে, তার মধ্যে থেকেই বজরা থেকে ভেসে আসছে বীণ আর সেতারের ধ্বনি। হাতের গেলাশ নামিয়ে রেখে জানলার পর্দা সরিয়ে একবার ঐ দিকে তাকাল রূপনারায়ণ।

তার কানেও গিয়েছিল ঐ গানটা, এখন গুনগুন করে সে তা গাইতে লাগল—

মদনের ঢেউ লেগেছে রাখতে পারিনে
ঐ যায় বুঝি যৈবনের তরী অকুল তুফানে।

মনটা চন্‌মন্‌ করে উঠল রূপনারায়ণের। নতুন একটা খাসা বাইজী জোগাড় করেছে এবার মোতিলাল। বেগমজানের, হিঙ্গুলের, এমনকি নিকির নাচ সে দেখেছে আগে, কিন্তু এটির— এই ফৈজ বক্‌সের— নাচ আগে দেখে নি। এটা একেবারে টাটকা আমদানি। তারিফ করতেই হবে মোতিলালকে।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ তাঁর কাশীপুরের বাগানবাড়িতে নাচের উৎসবে এনেছিলেন এই নর্তকীকে। নতুন বাইজী এসেছে শুনেই মোতিলাল খোঁজ করে। আর মোতিলালের তো উদ্যোগ, শেষপর্যন্ত তাকে সংগ্রহ করে এনে তুলেছে ঐ নৌকোয়।

নর্তকীর নামটা শুনে প্রথমে হেসেছিল রূপনারায়ণ, বলেছিল, তোমার এ নাচিয়ে ব্যাটাছেলে, না, মেয়েমানুষ হে মোতিলাল। নাম শুনে তো মেয়েলোক বলে মনে হচ্ছে না।

মোতিলাল বলল, আসুক। পরীক্ষা করে দেখলেই হবে।

—তুমি তো দেখেছ ?

—দেখেছি। নাম ফৈজ বক্‌স্‌। কিন্তু একেবারে ফৈজী বেগমের মত। অবিকল, অবিকল। তারই বংশের কেউ কি না কে বলবে '

রূপনারায়ণ জিজ্ঞাসা করল, সে আবার কে।

মোতিলাল বলেছে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সেই বেগমের কথা। নর্তকীর ব্যবসায় করে যে জীবন অতিবাহিত করত দিল্লিতে। তার অসামান্য সৌন্দর্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। সারা ভারতে তার মত সুন্দরী নারী নাকি আর নেই। উত্তপ্ত কাঞ্চনের মত তার বর্ণ, অঙ্গ অতি কৃশ, গমন এমন স্বচ্ছন্দমন্থর যে, দৃষ্টিমাত্র তা মোহিত করে মানুষকে। সেই অনুপম রূপরাশির কথা শুনে সিরাজ অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে ও লক্ষ মুদ্রা সমর্পণ ক'রে তাকে নিয়ে আসে মুর্শিদাবাদে।

মোতিলাল বলল, এখানে অনুনয়-বিনয়ও দরকার হল না, লক্ষ টাকাও লাগল না। মাত্র দশটি হাজার টাকায় পাওয়া গেল এই ফৈজকে।

শুনে আহ্লাদিত হয়ে উঠল রূপনারায়ণ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যা পেয়েছে, রূপনারায়ণকে দিয়ে তাহলে সম্ভব হল অনুরূপ একটা অবিশ্বাস্য কাজ ?

মোতিলাল বলল, হল। আগাম পাঁচ হাজার দেওয়া হয়েছে, বাকিটা দিতে হবে বিদায় দেবার সময়।

লক্ষ মুদ্রার জীবন পেয়েছিল সিরাজ— ফৈজীর জীবন। রূপে যে ভূভারতে শ্রেষ্ঠা বলে স্বীকৃত হয়েছিল, যার সূক্ষ্ম ত্বক ভেদ করে প্রতিটি শিরা দেখা যেত স্পষ্ট, নৃত্যে যে ছিল পরমপটিয়সী, সৌন্দর্যে যে ছিল অলোকসামান্য, তার প্রেমে ব্যর্থ সিরাজ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে জীয়ন্ত ফৈজীকে চারিটি প্রাচীর বেষ্টিত ঘরে বন্ধ করে, প্রাচীরের প্রতিটি দরজা-জানালা ইটে গেঁথে দিয়ে জীবন্ত কবর দিয়েছে তাকে। লক্ষ টাকার বিনিময়ে এইভাবে একটা জীবন পেয়ে গিয়েছিল সিরাজ।

কিন্তু দশ হাজার টাকায় রূপনারায়ণ তো পাচ্ছে মাত্র একটা রাত— একটি রাত্রির সঙ্গী। মোতিলালের এতে খুব উল্লসিত হওয়া হয়তো বেহিসেবী কাজ হচ্ছে।

তাহলে কি হবে, ধনীর মোসায়ের হতে গেলে এভাবে প্রলুব্ধ করে যেতেই হয়। এ নিয়ম বুঝি জানে মোতিলাল।

কাশীপুরের গুরুপ্রসাদ বসু যেমন-তেমন লোক না। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পুত্র ব'লেই না, পাঁচজনে তাঁকে খাতির-যত্ন করে, পাঁচটা বড় কাজের মধ্যে তিনি আছেন সর্বদা। চুঁচুড়ার নীলরত্ন যেমন, কাশীপুরের তিনিও তেমনি। নীলমণি হালদারের পুত্র বলে নীলরত্নের খাতির নয়, নীলরত্ন বলেই তার আদর— লেখাপড়া করে, পাঁচজন মান্যগণ্য মানুষের সঙ্গে সঙ্গ করে। গুরুপ্রসাদও অমনি-ধারা একজন মানুষ। তিনি যখন পাঁচজন সাহেব-সুবাকে নেমন্তন্ন করে এনে নাচ দেখিয়েছেন এই নাচিয়ের, মোতিলাল যতই ফৈজী বেগমের কথা বলুক, এ বাইজী তবে যেমন-তেমন বাই কখনোই নয়। দশ লেগেছে, পনেরো হাজার লাগলেও রূপনারায়ণ নিশ্চয় রাজি হয়ে যেত একে পাবার জন্যে।

ঘটনাটা যেমন-তেমন সত্যিই না। কাশীপুরের বাগানবাড়ির এই নাচের খবর এশিয়াটিক জার্নালে ছাপাও রয়েছে।

রামমোহনের বাড়িতে বসে অন্নদাপ্রসাদ পড়ছিলেন—

> **Report speaks highly of a young damsel, named Fyz Boksh, who performs at the house of Goroo Persad Bhos.**

নামটা নতুন দেখলেন অন্নদাপ্রসাদ। তাঁরা একজনের নাম জানেন— সে হচ্ছে নিকি। বাচ্চা-বয়স থেকে সে নাচছে এই শহরে; এখন বয়স একটু

হয়েছে, কিন্তু এতে ভালোই হয়েছে নাকি ; এখন একেবারে পোক্ত নর্তকী হয়েছে সে।

মানিকতলার রাস্তা দিয়ে কলরব বয়ে চলেছে। সিমলার দিকে হেঁটে চলেছে দল বেঁধে লোকজন খানা ডোবা পচাপুকুর পার হয়ে। পোস্তার ঘাটের দিকে চলেছে তারা। বুঝতে পারা গেল— ওরা চলেছে মাহেশের স্নানযাত্রায়।

যাত্রীরা যেমন চলেছে, তেমনি চলেছে ব্যাপারীরাও। গোরুর গাড়িতে মাল বোঝাই ক'রে নিয়ে চাকায় করুণ আর্তনাদ তুলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে গো-গাড়ি।

দ্বারকানাথ এঁদের মধ্যে বয়সে তরুণ, তাই সকলকে একটু সম্ভ্রম করে চলেন। চুপ করে বসে ছিলেন তিনি, এবার বললেন, কলকাতা আজ ফাঁকা হয়ে যাবে। পড়ে থাকব বুঝি আমরাই জনকয়েক।

হলধর বসুও সায় দিলেন ঐ কথায়, বললেন, বাবুদের আজ পোয়াবারো। স্নান করবেন জগন্নাথ, তার জন্যে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে গিয়েছেন বাবুসাহেবরা। শহরের সব ফুর্তি কুড়িয়ে-কাচিয়ে নিয়ে তাঁরা অর্পণ করছেন ঐ মাহেশের জলে।

হাতের জার্নালটি ফরাসের উপর বিছিয়ে ধরে অন্নদাপ্রসাদ বললেন, একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে এখানে— ফৈজ বক্স্।

হলধর বসু রসিকতা করে বললেন, কে ঐ মহামান্য ব্যক্তিটি ?

হাসতে লাগলেন দ্বারকানাথ, হাসতে লাগলেন অন্নদাপ্রসাদ।

রামমোহন ভিতরে ছিলেন, ধড়াচূড়া প'রে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। এ ঘরে ঢুকেই বললেন, এত হাসি কি নিয়ে ?

উত্তর দিলেন হলধর বসু, বললেন, আমরা হাসছিলাম একটা নর্তকীকে নিয়ে।

অট্টহাস্য করে রামমোহন বললেন, তাকে এখানে পাওয়া গেল কোথায় ?

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর হাতের জার্নালটি এগিয়ে দিতেই, তাতে চোখ বুলিয়ে রামমোহন বললেন, গুরুপ্রসাদের বাগানবাড়ির কথা লিখেছে বুঝি ? আমিও তো সেদিন নিমন্ত্রিত ছিলাম। দেখেছি তোমাদের এই নর্তকীকে। কিন্তু, হাসির মত তো সেদিন কিছু দেখি নি। দেখে খুশিই হয়েছি। নেচে-নেচে পদ্ম ফোটাচ্ছিল ফরাসে।

রামমোহনের গাড়ি তৈরি। প্রত্যহের মত এখন তিনি বের হচ্ছেন নিজের

বৈষয়িক কাজে। বেশি সময় লাগবে না এতে। টেরিটিবাজার আর চীনাবাজার ঘুরে এখনি ফিরে আসবেন।

তাঁর আত্মীয়-সভার সভ্যবৃন্দ ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যেই আলাপ-আলোচনা করবেন, তারপর সন্ধ্যার সময় বসবে আসল বৈঠক।

রামমোহন একসঙ্গে সকলকে সম্বোধন করে বললেন, বেরাদর, তোমরা একটু আছ নিশ্চয়। আমি ঘুরে আসি?

—আসুন। আমরা আছি।

রামমোহন রওনা হয়ে যাবার কিছু পরেই এলেন চুঁচুড়ার নীলরত্ন হালদার। লেখক-হিসাবে এর মধ্যেই নীলরত্নের কিঞ্চিৎ খ্যাতি হয়েছে। অনেক গীতও তিনি রচনা করেছেন।

আসরে বসে তিনি বললেন, আজ এসে পৌছতে পেরেছি এখানে, যথেষ্ট ভাগ্য বলতে হবে। গঙ্গা আজ ভেসে যাচ্ছে।

অন্নদাপ্রসাদ এগিয়ে বসে বললেন, কি রকম?

—নৌকোয়। কী গানবাজনা, কী মহোৎসব।

কোলের মধ্যে তাকিয়া টেনে নিয়ে নীলরত্ন হাসতে-হাসতে বললেন, ঐসব দেখে মনে পড়ে গেল কয়েকটা কথা, মনে-মনে বেঁধেছি তাই এই গান—

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন,
নিবাসে নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ—

গান থামিয়ে নীলরত্ন বসলেন চুপ করে। তার পর বললেন, ঘরে শান্তি নেই বুঝি ওদের, ওরা তাই বেরিয়ে পড়েছে সকলে একসঙ্গে।

এটা বৈদান্তিকদের সভা, বেদ-বেদান্ত নিয়েই আলোচনা এখানে বেশি। তার মধ্যে দু-একটি ঘরোয়া কথা, একটু রঙ্গতামাসা, একটু হাস্যপরিহাস আছেই। কলকাতার হালচাল নিয়েও আলোচনা আছে। এখন সেইসব কথাই হচ্ছে এখানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রামমোহন ফিরে এলেন। সহিসের হাতে ঘোড়ার দড়ি ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর মজবুত শরীরের শক্ত পদক্ষেপ ফেলতে-ফেলতে এলেন ঘরে। বললেন, আজ কলকাতাতেও বুঝি মহোৎসব, মাহেশের ঢেউ এসে পৌছেছে এখানেও। চারদিকে বিষম ব্যস্ততা। কেবল পালকি আর পালকি। শাস্ত্রে নির্দেশ আছে নাকি হে এইসব উদ্দামতার আর উচ্ছৃঙ্খলতার?

তিনি বসলেন আসরে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল একের পর। উপনিষদের তরজমা কতটা এগিয়েছে, এবার এগুলি মুদ্রিত করে কি-ভাবে বিতরণ করা যেতে পারে জনসাধারণের মধ্যে। কিন্তু বিতরণ করলেই যে সকলে পড়বে, তার কোনো স্থিরতা কি। তাদের পড়াতে হবে ; পড়াতে হলেই দরকার বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার।

আত্মীয়-সভায় অন্তরঙ্গ ভাবে আলোচনা চলেছে। সন্ধ্যা ধীরে-ধীরে নেমে আসছে এই বাগানবাড়ির উপর।

অন্নদাপ্রসাদ একটা কথা জানার জন্যে একটু অধীর হয়েই আছেন বুঝি। তিনি তাই এবার জিজ্ঞাসা করলেন কথাটা, বললেন, চরণপদ্মের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু পা দিয়ে পদ্ম ফোটানো বড আশ্চর্য ঠেকছে।

রামমোহন তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, গুরুপ্রসাদের বাডির নাচের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ। গুরুপ্রসাদের বাডির কথাই জিজ্ঞাসা করছেন অন্নদাপ্রসাদ।

কিন্তু এ কোনো আজগুবি কথা নয়, একটু আশ্চয কথা বটে। তেমন আয়োজন থাকলে, এবং নৃত্যের তেমন পা থাকলে সম্ভব বটেই।

দিল্লী থেকে এসেছে এই নাচিয়ে। তনুবাবুই প্রথমে এর খোঁজ পান। দিল্লীর বাদশাহ এই নর্তকীকে তাব হারেমে নেবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হারেমের জীবন সম্বন্ধে নর্তকীটি সবই জানত। সে একজন সামান্য নাচিয়ে, স্বাধীনভাবে সে তাব জীবিকার্জন করে চলেছে। কেন সে চাইবে হারেমের বন্দীবিহঙ্গিনী হতে। বাদশাহের নজর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে সে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সার্ চার্লস মেটকাফের আশ্রয় নিল। এবং তাঁরই সাহায্যে পালিয়ে এল কলকাতায়।

আগেই শোনা ছিল রামমোহনেব, এই নর্তকী নৃত্যের সঙ্গেসঙ্গে দুপায়ে ফুল ফোটায়। আগেও তার পরীক্ষা নাকি হয়েছে, গুরুপ্রসাদের বাগানবাড়িতে সেদিন তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে এসেছেন রামমোহন।

খুব হাল্কা শরীর ফৈজ বক্‌সের—ত্রিশ সের ওজনও বুঝি হবে না। ছোট একটি বৃত্তের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে সে অপূর্ব নৃত্যকৌশল দেখাল।

মলমলের ফরাস বিছানো হয়েছে কাশীপুরের বাগানবাডিতে। বহু গণ্যমান্য বাবু ও সাহেবলোক এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে।

দুপায়ে ঘন করে আলতা পরে নিয়েছে ফৈজ। শুরু হল তার নাচ। পাক

খেয়ে-খেয়ে সে নেচে চলেছে, আর ঐ মলমলের ফরাসের উপর অনবরত ছিটানো হচ্ছে গোলাবপাশ আর গোলাবজল। ফরাস ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঐ ভাবে। সেই সিক্ত ফরাসের উপর আলতা-মাখা পা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নেচে চলেছে ফৈজ।

নাচ যখন তার থামল, দেখা গেল, ঐ ক্ষুদ্র বৃত্তটি ফুটে উঠেছে ফুল হয়ে। পায়ের আলতার ছোপ পড়ে ওখানে অঙ্কিত হয়েছে সুন্দর একটি পদ্ম।

যা দেখেছেন রামমোহন 'তার বিবরণ দিচ্ছিলেন, সকলে শুনছিল উৎকর্ণ হয়ে। দ্বারকানাথ বললেন, এ-দক্ষতার জন্যে ওর পুরস্কার পাওয়া উচিত।

—পেয়েছে। পেয়েছে। রামমোহন হেসে বললেন, তনুবাবু রুমালে বেঁধে এক-গোছা মোহর ছুঁড়ে দিয়েছেন ওর পায়ের কাছে।

শুধু তনুবাবু কেন, কলকাতার আট বাবুর মধ্যে যে সাত বাবু এখন জীবিত আছেন তাঁরা ঐ নর্তকীকে পুরস্কৃত করছেন সকলেই, তার মধ্যে আছেন ঐ নীলরত্নের পিতাও।

ফৈজ বক্স্ কলকাতায় পদার্পণের সঙ্গেসঙ্গেই তাই খ্যাত হয়ে উঠেছে।

সেই নর্তকীকে নিয়ে চলেছে রূপনারায়ণ। পায়ে যে পদ্ম ফোটায়, সে তো সাধারণ নাচিয়ে নয়। রূপনারায়ণের চোখে সে গোলাপ ফুটিয়ে দিয়েছে।

চোখের সেই নেশায় চুর হয়ে বসে আছে সে। পিনিস থেকে সে চলে গিয়েছে বজরায়।

পিনিসে এখন রাধা ও তার সঙ্গী চাঁপা। এখনে বসে শোনা যাচ্ছে বজরা থেকে আগত গানের শব্দ।

জানলা দিয়ে চেয়ে-চেয়ে বাধা নদীর দু কূল দেখছে। চন্দননগর ফরাসডাঙা কখন পার হয়ে গিয়েছে তারা তা টের পায় নি। রাত্রি নেমেছে, তবু চতুর্দশীর পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে উভয় কূল। নৌকোর ভিড়ে নদী থইথই করছে। তারা চলেছে ভদ্রেশ্বরের কিনার ধরে। উৎকণ্ঠ ভাবে চেয়ে দেখছে রাধা, তার সমস্ত শরীরে অদ্ভুত শিহরন। ক্রমে তাদের পিনিস এসে গেল গৌরহাটির ধারে।

রাধা ডাকল, চাঁপা, ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ।

চাঁপা সরে এসে উঁকি দিল রাধার কাঁধের পাশ দিয়ে।

—কি বউদি ?

—গৌরহাটি।

—ফিরিঙ্গি আনটুনির ভিটে বুঝি এখানে ?

রাধার চোখ ছলছল করে উঠেছে, সে বলতে পারল না— শুধু ফিরিঙ্গি আনটুনির না, তার ভিটেও এখানে। এরই কাছে।

ঐ সেই চালতে-গাছ। ইশ, আজও ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে একই ভাবে। জোয়ারে ফুলে উঠেছে জল, প্রায় ওর শিকড়ের গায়ে ছলছল করছে নদী। ঐ গাছতলাটার কথা খুব ভালো করে মনে পড়ছে রাধার। ওখান থেকে খেয়ানৌকো নিয়ে সে যেত তার মামার বাড়ি। ওই তো, ঐ পারেই চানক। কিন্তু সে পারটা অনেক দূরে, তাই উঠে গিয়ে ওদিকের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে সে দেখার চেষ্টা করল না তার মামাব বাড়ির দেশ। সে চেয়ে রইল তার নিজেব দেশের দিকে। আজ যদি এখন তেমনি ভাবে এসে দাঁড়াতেন তার বাবা, রাধা গৃহবধূ-বেশে এখন গেলেও সেদিনের সেই খুকিটির মত নিশ্চয় চিৎকার করে উঠত— বাবা বাবা বাবা।

বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট বোধ করতে লাগল রাধা। আজ এখানে তার বাবা নেই, মা নেই, মুরলী নেই, নবীন নেই। আজ সে একা, সে আজ অসহায়।

রাধার বুঝি খেয়াল নেই, একা সে নয়, তার সঙ্গে আছে তার সঙ্গী চাঁপা।

কিন্তু চাঁপার দিকে সে তাকাচ্ছে না, চেয়ে আছে ঐ চালতে-গাছটির দিকে। একদিন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে আর তার বাবা। সেদিন কি যেন একটা কাণ্ড ঘটেছিল এই গরিটির শ্মশানে। সেদিন সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু এখন তো তা বোঝে।

সেদিনের সেই ঘটনার পর তার বাবা অকারণেই কেমন শপথ করতেন— রাধার বিয়ে আমি দেব না, রাধার বিয়ে আমি দেব না।

অত শপথ করলেন বাবা, কিন্তু তিনি তাঁর শপথ রাখতে পারলেন না। এ বড় আক্ষেপ, এ বড় বেদনা রাধারানীর। সে শপথ তিনি যদি রাখতেন, তাহলে রাধাকে আজ এই কঠিন সংকল্প নিয়ে ঘরের বা'র হতে হত না।

ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল গৌরহাটির কিনার। রাধার চোখ থেকেও ক্রমে মুছে যাক সব স্মৃতি, সব অতীত, সব বর্তমান।

সতীকে ক'রে নিরাশা
অসতীর আশা পুরাও।

বজরায় চলে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরীর গানের এই কলির প্রমাণ দাখিল করছে রূপনারায়ণ।

আশার পূরণ যদি হয়, তাহলে সতী হয়ে বসে থেকে লাভ? রাধা বুঝি নিজের সংকল্পের কৈফিয়ত দিচ্ছে নিজেকেই।

রাধার এ সংকল্প সম্বন্ধে আমাদের কোনো মন্তব্য করা সাজে না। আমরা তাকে পরিত্রাণ করতে পারি নি, পরিত্রাণের কোনো পথও আমরা বলে দিতে পারি নি তাকে। তাকে সাবধান করে দেব, এ অধিকারই বা আমাদের কোথায়। উপযাচক হয়ে কোনো পরামর্শ আমরা তাকে দিতে গেলে সে আমাদের তিরস্কার করতে পারে। সে বলতে পারে— তোমাদের উপদেশ মানতে রাজি আছি, কিন্তু বলে দাও আমার সুখের পথ কি, আমার শান্তির উপায় কি। ঐ দেখ, আমার স্বামী। তার ব্যবহার লক্ষ্য করো তোমরা। তার স্ত্রীকে এখানে ফেলে সে মত্ত হয়েছে ঐ বিলাসে। কোন মেয়ে পারে এ অপমান সহ্য করতে? এত কষ্টের উপব এই অপমান শেলের মত কি বেঁধে না বুকে? আমার এ কষ্ট কতটা যদি বুঝে না থাকো, তাহলে নাও এই শেল, বুকে বিঁধিয়ে দেখতে হবে না, একবার তোমার বুকে শুধুমাত্র স্পর্শ করে দেখ— তাতেই জ্বালা কত।

সুতরাং রাধার কাযে আমরা কোনো রকম প্রতিবন্ধক হতে চাই না। আমরা নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে চলি তার সঙ্গেসঙ্গে।

সঙ্গেসঙ্গেই চলেছি আমরা। কোনো কথাই আমরা বলব না, তার চোখে জল দেখেও কোনো প্রশ্ন করব না তাকে।

চালতে-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে যে মহোৎসব সে দেখেছিল, তার মানে তার কাছে আজ স্পষ্ট। ও কথা ভাবলেই তার সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে। সেদিন সেই মেয়েটাকে জোর করে ধরে চিতায় নিক্ষেপ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল সকলে। শিউরে ওঠে গা। তেমন সুযোগ পেলে রাধাকেও নিশ্চয় অবিকল ঐ ভাবে নিক্ষেপ করবে শয়তানেরা। কিন্তু তাদের সে চক্রান্ত সে নিষ্ফল করে দেবে। অত সতী হয় না, অত সতীত্বগিরিতে কাজ নেই তার। সে বেছে নেবে নিজের পথ— এই তার সংকল্প।

চারদিক থেকে নৌকো ছুটেছে মাহেশের দিকে। নৌকোয়-নৌকোয় জ্বলে উঠেছে আলোর মালা, আকাশের তারাগুলো বুঝি খসে পড়েছে নদীর জলে। আর, সেইসঙ্গে নেমে এসেছে বুঝি অপ্সরা আর কিন্নরীর দল।

বাড়ছে। যতই ঐ ধ্বনি প্রবল হয়ে উঠছে, রাধার হাতের মুঠিও বুঝি প্রবল হচ্ছে সেই অনুপাতে। সেই বজ্রমুঠিতেও দেখা যাচ্ছে কম্পন। ফুলে-ফুলে উঠছে বক্ষ-ছুটি। কী একটা রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই হয়তো তার দেহে এই শিহরন জাগছে।

—বউদি, এস, এস। চাঁপা ডাকল।

ত্রস্তে সরে এল রাধা। চাঁপার পাশে বসে তাকাল জানলা দিয়ে।

বজরাটা তাদের পিনিসের পাশে এসে পড়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রূপনারায়ণকে। ফৈজ বক্‌স্ তার পাশে ব'সে, এক হাত ফৈজের কাঁধে তুলে দিয়ে অন্য হাতে তার পায়ের ঘুঙুর খুলে দিচ্ছে রূপনারায়ণ, কানের কাছে মুখ নিয়ে আধো-আধো ভাবে কি যে বলছে দাঁড়ের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে তা শোনা যাচ্ছে না।

বজরার মধ্যে অত স্পষ্ট আলো জ্বেলে নিয়ে, পাঁচজনের চোখের সামনে এই দীনতা প্রকাশে এতটুকু সংকোচ হচ্ছে না তার স্বামীর। বড় আশ্চর্য লাগছে, নিজের চোখে দেখা সত্ত্বেও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না রাধা।

সবাঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে, সবাঙ্গের অলংকারে সোনালি আওয়াজ বাজিয়ে, উঠে দাঁড়াল রাধারানী। তার শরীরের ঝাঁকিতে মাথার খোঁপাটা ভেঙে পড়ল পিঠের উপর।

দুই হাতে সেই বেণী জড়াতে-জড়াতে রাধা বলল, প্রতিজ্ঞা। আমার পা ধ'রে ঐ ভাবে অনুনয় করতে হবে। আমি করাব, আমি করাব।

গভীর নিশ্বাসে ওঠা-নামা করতে লাগল তার বুক ; নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে সে ডাকল, চাঁপা।

উঠে এল চাঁপা, বলল, কি বউদি ?

—বউদি না, বউদি না, বউদি না। কুলের বউ হয়ে আমি আর থাকব না চাঁপা। আমি হব—

একটা ভয়ানক কথা বলে ফেলল রাধা। ঘরের বধূ হবে বারবধূ? এ কী কথা বলে তার বউদি ?

চাঁপা যেন আকাশ থেকে পড়ল এই কথা শুনে, একটা আঙুল গালে ঠেকিয়ে বলল, সে কি বউদি ?

গলার স্বর নামিয়ে ছলছল চোখে রাধা বলল, আমাকে অত নির্বোধ মনে

করিস নে চাঁপা। আমি জেনে-শুনেই এসেছি। শান্তি স্থানে থাকে না, শান্তি থাকে মনে। আমার মনকে আমি নতুন করে গড়ে নেব।

—তা নাও। কিন্তু ও কি কথা বলে ফেললে বউদি? কোনো ভদ্দরঘরের বউয়ের কি ওসব কথা বলতে আছে, না, চিন্তা করতে আছে?

চাঁপাকে বুঝিয়ে বলার মত নরম গলায় রাধা বলতে লাগল, আজ কত বছর ধ'রে তুমি লেগে আছ আমার পিছনে। কত দিন কত কথা বলেছ, কত প্রস্তাব করেছ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সব বুঝতে পেরেছি।

সত্যিই সব বুঝতে পেরেছিল রাধা। কিন্তু সহসা একটা ভীষণ পথ গ্রহণ করতে অত সহজে রাজি হতে পারে নি। দিনের পর দিন কেটে চলেছে। নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারের গতির বিচার করেছে সে ধৈর্য ধরে। অনেক দিন অপেক্ষা করেছে সে, অনেক কাল। তার স্বামীর সমস্ত অবহেলা সব রকমের উপেক্ষা সে সহ্য করেছে, তিলে-তিলে দগ্ধ করেছে নিজেকে। ক্রমশ সে লক্ষ্য করল, গতি আরো বিপরীত দিকে ধাওয়া করেছে। রূপনারায়ণের ফূর্তির আড্ডা তার চোখের অলক্ষ্যেব বাগানবাড়ি থেকে এসে পৌঁছল তাদের বসতবাটীর সদরে। এতটুকু লজ্জা এতটুকু সংকোচ দেখাল না রূপনারায়ণ। বাড়ির পোষা বেড়ালটার সামনেও স্বামীরা স্ত্রীর হাত চেপে ধরতে সংকোচ বোধ করে নাকি, কিন্তু কোনো সংকোচ বা জড়তার লেশ মাত্র দেখা গেল না রূপনারায়ণের। সদরের বৈঠকখানায় নিয়ে এল কাশীর বাই কাশ্মীরের নর্তকী।

সেইদিন মনস্থির করে ফেলল রাধা, ঠিক করল—আর না। আর এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তার নেই। সেই দিনই চাঁপাকে সে বলল, চাঁপা, পাকাপাকি করে ফেল, রাজি আছি আমি।

কিন্তু চাঁপা এখন এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন একটা সৎপথে নিয়ে যাবার জন্যে রাজি করায় সে তার বউদি। একজন সম্ভ্রান্ত লোক রাধার রূপে আর গুণে মুগ্ধ; তিনি তাকে বধূ রূপে পেতে চান। চাঁপার সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল রাধা। কিন্তু, সেই রাধার মুখে আজ এ কী কথা?

রাধা বলল, চমকে উঠিস নে চাঁপা। অমন চমক আর ভালো লাগে না। একটা ঘরের বউকে বের করে নিয়ে গিয়ে কেউ কি তাকে কুলবধূ করে? আমাকে বোকা বুঝিয়ে লাভ? ডাঁশা পেয়ারা লোকে চিবিয়ে-চুষে খেতেই ভালোবাসে, কিন্তু তার ছিবড়ে গিলে খায় না, ছুঁড়ে ফেলে দেয় থু থু ক'রে।

একটু থেমে বলল, দু-চার দিনের সে জীবন যদি পাইই, তার স্বাদ জেনে নেব। তার পর আমাকে যে জীবন গ্রহণ করতে হবে, তার জন্যে আমি প্রস্তুত। তুমি তৈরি হও চাঁপা, কোনো ভয় নেই তোমার।

চাঁপা যেন ধরা পড়ে গিয়েছে তার বউদির হাতে। দু হাতে মুছে ফেলতে ইচ্ছে হল নিজের মুখের অলকাতিলকা। চম্পা-নাপিতানি সে, সেই নাপিতানির চাতুরী ধরে ফেলেছে তার বউদি? তবে তো বড চাপা মেয়ে এই বউদি। এতকাল তার সঙ্গেসঙ্গে থাকল চাঁপা, তবু বউদি একদিন প্রকাশ করল না যে চাঁপাকে সে চিনে ফেলেছে?

কে জানে কোথায় আজ সেই কানাগিন্নি। কে জানে বউদি কখনো তাকে বলে দিয়েছে কি না চাঁপার কথা। অভয় দিল বটে তার বউদি, তবুও চাঁপার এখন কেমন ভয় করছে।

—অমন মুখ ভার করে দাঁড়াস নে, চাঁপা। আমার বর হবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন যে ভদ্দরলোক, কোথায় তিনি?

চাঁপা দুই হাতে চেপে ধবল রাধার মুখ। বলল, চুপ চুপ চুপ। মাঝি-মাল্লাদের কানে যাবে বউদি। এতটুকু ডর নেই তোমার?

—যে ডুববে বলে শপথ কবেছে তার ভয কি বে, চাঁপা?

—তবু। তবু। প্রাণের ভয় না থাক, কুলেব ভয, লোকলজ্জার ভয়।

রাধা হাসল, বলল, আমি তো চললাম, চাঁপা। তোরা-সব সুখে থাকিস, যেথানেই থাকি আমি এই কামনা করব।

দুই চোখ ভিজে উঠল রাধার। গাল বেয়ে গডিয়ে পডতে লাগল জল।

বলল, শুধু খবর দিস আমার মা ও বাবাকে, আমার দুটো ভাই আছে, তাদের। বলিস, ভালো আছি আমি।

মাহেশের ঘাটে এসে যখন পৌছল তাদের নৌবহর, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহব। কলকাতা থেকে সখীসংবাদের পালা নিয়ে এসেছে এক পাল নৌকো, চারদিকের কলরবের মধ্যেও তাদেব নাকী কান্নার বিরাম নাই। তারা প্রাণপণ চিৎকার করে অভিনয় করে চলেছে।

চতুর্দিক থেকে অগণ্য যাত্রী এসে ভিড করেছে মাহেশের ঘাটে। কত মজা এসেছে নৌকো চেপে, কত মেয়েমানুষ এসেছে, কত বাইজী এসেছে, কত নাচিয়ে। চোখে ঘুম নেই কারো, নদীর কিনারে এসে জড়ো হয়েছে সকলে এই মজা দেখতে।

সারারাত জেগে থাকবে আজ সকলে। সারারাত ধরে চলবে নৌকাবিলাস।

যে পা দিয়ে পদ্মফুল ফোটাতে পারে কৈজ, রূপনারায়ণ দশ হাজার টাকা খরচ করে নিয়ে এসেছে সেই ছুটি পা; তাকিয়ার উপর সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সে কৈজের সেই পা-ছুটি টেনে নিয়েছে তার বুকের মধ্যে। তোফা তোফা রব তুলে কৈজের ছু পায়ে প্রাণ ভরে চুমো খাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে তা এ পিনিস থেকে। দেখতে পাচ্ছে রাধা।

ওসব দেখে মনের গ্লানি বাড়িয়ে আর লাভ নেই। সে তাই চোখ ফিরিয়ে নিল। নিজের গায়ের অলংকারগুলি সে খুলতে লাগল একে-একে।

—ওকি বউদি, ওকি করছ।

—মুক্ত হয়ে নিচ্ছি একেবারে। পূর্ণ মুক্তির আগে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাই সব বেড়ি থেকে।

—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে কি যেতে আছে?

রাধা বলল, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে লাভ কি। এ যে আমার সঙ্গেই থাকবে তার স্থিরতা কি। এই দেহটাকে যখন ছেঁড়া কাঁথার মত কেউ ফেলে দেবে, তখন এইসব গয়নাই হবে তার আকর্ষণ। এগুলি সঙ্গে থাকাই বিড়ম্বনা। বুঝিস নে চাঁপা, মান খোয়াতে চলেছি, কিন্তু প্রাণের টান যে আমার এখনো আছে। বাঁচতে চাই আমি।

চাঁপা সান্ত্বনার দেবার মত করে বলল, বাচবে বই-কি, ষাট। এমন সোনার প্রতিমা কি বিসর্জন দিতে আছে এত সহজেই?

—আমার শাশুড়ি বেঁচেছেন এক ভাবে। আমি বাঁচতে চাই অন্যভাবে। কিন্তু বাঁচার চেষ্টা আমাদের ছু জনেরই সমান।

একটু থেমে রাধা আবার বলল, আর, আমার ঠাকুরমা বেঁচেছেন আর-এক ভাবে। বিপদে পড়লে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ঠাঁই নিশ্চয় পাব।

রাধার ঠাকুরমার কাহিনী চাঁপাও জানে। এ কথা না জানে কে? কিন্তু ওসব কথা নিয়ে আলোচনা করা তো ঠিক না। কারো ঘরের গ্লানি নিয়ে হাসি-মকশরা করাও ঠিক না। করতেও চায় না চাঁপা। তাই এতদিন সে ওই প্রসঙ্গটি তোলে নি। কিন্তু আজ যখন রাধা নিজেই তুলল, তখন তাকে প্রবোধ দিতে ক্ষতি কি।

চাঁপা তাই বলল, ভাগ্যবতী নারী তিনি। তাই অমন পুরুষ পেয়ে গিয়েছেন তাঁর সহায়। কোনো বদমায়েশ বা কোনো বোম্বেটের হাতেও তো পড়তে পারতেন।

একটু থেমে চাঁপা বলল, তুমিও সৌভাগ্যবতী। তুমি যা-সব ভাবছ তা নাও হতে পারে বউদি। তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে আছে যে, তোমার গুণ দেখে সে মোহিত হতেও পারে তো। চিরদিন তোমাকে বুকে করেই হয়তো রাখবে। তা যদি রাখতে চায় বউদি, সে বুক থেকে নেমে যেয়ো না। তুমি সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে— এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

—আর হলপ করিস নে, চাঁপা। আমার ভালো লাগছে না।

নীচে গঙ্গায় জলের জোয়ার, উপর থেকে ঝরছে জ্যোৎস্নার জোয়ার। আকাশে আর জলে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই অপরিসীম সৌন্দর্যের দেশে গৃহকোণে কারো মন বাঁধা থাকতে পারে না। কিনারের গাছে-গাছে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে জ্যোৎস্নার তুফান, জোনাকিরা তাদের দ্যুতি হারিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। মর্ত্যের ক্ষুদে তারকা তারা, আকাশের ঐ গোলাকৃতি সুডোল চাঁদের গা থেকে যে রুপালি উৎসব বৃষ্টি হচ্ছে, সে উৎসবের মধ্যে তাদের আলোর সমারোহ আজ নিষ্প্রভ। এজন্যে খেদ হয়তো তাদের আছে, অথচ সে দুঃখ প্রকাশের অবসর আজ রাখে নি ওই জ্যোৎস্নার বন্যা। সুদিনে নিত্যসহচরকে যারা মনে রাখতে পারে, তাদের সংখ্যা বুঝি নগণ্য। কিন্তু আজ এই নদীতে যে উৎসবার্থীরা এসে জমায়েত হয়েছে তাদের সংখ্যাও সামান্য না।

শুধু জোনাকির কেন, ঝিঁঝিরাও আজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে; তারা তাদের নূপুরের ঝংকার দিয়ে সারাটা বৎসর মুখর করে রাখে এই কূল। কিন্তু আজ এখানে বেজে উঠেছে নূতন নূপুরের অপরূপ ঐকতান। ঝিঁঝিরা লজ্জা পেয়ে তাই সরে গিয়েছে নেপথ্যলোকে।

কিন্তু চাঁদের মুখের হাসিও বুঝি ম্লান হয়ে গেছে। চারদিকে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা, নদীর জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে তার সংখ্যা। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় পুলকিত নৃত্য করে চলেছে সেই আলো। মনে হচ্ছে, যেন জ্বলতে-জ্বলতে ছুটে চলেছে আজ গঙ্গা।

নীচে ঝাড় আলোর ও গেলাশী বাতিদানের এই তুমুল আস্ফালন দেখে জ্যোৎস্নার অন্তরালে মুখ ঢেকেছে তারারা। দু-চারটে নিলাজ তারা আকাশের

এক প্রান্ত থেকে উঁকি দিয়ে চঞ্চল চোখ মেলে কৌতূহল নিবারণ করছে।—কী হচ্ছে ওই অগাধ নীচে, মর্ত্যের দেশে স্বর্গের এই উৎসবসজ্জা কেন?

এ কেনর উত্তর পায় না কেউ। কে কোথায় পেয়েছে সব কেনর জবাব? চাঁদের কাঁধের পাশ দিয়ে যে-শিশুতারাটি তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে সেও পাচ্ছে না এই কেনর উত্তর। তবু সে তার ক্ষুদে চোখ দিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছে।

উপর থেকে চেয়ে দেখছে ওরা। কিন্তু নীচে থেকে কেউ তাকাচ্ছে না উপর দিকে। আকাশের ওই চাঁদের আননে কোনো শোভা আছে কি না-আছে তা পরখ করার অবসর কোথায়? আজ সকলেই নিজের চারিপাশ নিয়ে বিব্রত। চারিপাশ ঘিরে বসে আছে যে চন্দ্রাননেরা।

উপর থেকে ওরা বুঝতে পারছে না, কি ঘটছে এখানে। কিন্তু আমরা নীচের মানুষ। আমরা তাই এই উৎসব-ঘটার অর্থ বুঝতে পারছি পরিষ্কার।

মাহেশের স্নানযাত্রার উৎসব চলেছে এখানে।

জলে চলেছে অনর্গল হাসিগান। ডাঙায় বেচা-কেনা। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কারো চোখে ঘুম নেই। জ্যোৎস্নার বন্যায় দিনের আলোর মতই আলোকিত হয়ে উঠেছে এই ডাঙা। এখানে দোকানে-দোকানে দরদস্তুর করে-করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জনস্রোত।

গোলাবি খিলি সেজে-সেজে কূল পাচ্ছে না কানে-ঝুমকো-দোলানা ওই যুবতীটি। মাদুরের দোকান থেকে তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি পড়েই আছে।

শ্রীরামপুরের পাদরি-সাহেব যিশুর গুণগান করে চলেছেন, কিন্তু তাঁর কথায় কান নেই কারো।

কালীঘাটের পটুয়ারা পট সাজিয়ে ফেলেছে। দু-দু পয়সায় তোফা তোফা ছবি, কত ছবি তার শেষ নেই।—মাথার কাছে তাকিয়া নিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে এক কন্যা; জোড়া মেয়ে ওড়না হাতে নিয়ে নৃত্য করছে; মাথায় টেরি কাটা, গায়ে কালো কোর্তা, কাঁধে চাদর— ফুলবাবু দাঁড়িয়ে আছেন কোঁচানো কোঁচা হাতে নিয়ে, তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে আছে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী; এক হাতে ফুল অন্য হাতে পোষা টিয়া নিয়ে বসে আছে স্থূলাকার এক মেয়ে; আহা মরি মরি— কালাপেড়ে মসলিন গায়ে জড়িয়ে, চোখে সুর্মা টেনে, হাতে গোলাপফুল ধ'রে এ কে গো পীন-পয়োধরা; দু হাতে দুই ফুল— এক হাত মাথায় তোলা, এক হাত বুকে রাখা— চোস্ত হয়েছে তো এই নায়িকার চিত্র;

ছবির শেষ নেই— কানে দুল, নাকে নোলক, গলায় চিক, দু হাতে রুপোর মোটা-মোটা বালা, পায়ে মল, হাতে ধরা রুপা-বাঁধানো হুঁকা— তামাকু সেবন করছেন এই সুন্দরী ; পাশেই উনি বাজাচ্ছেন বেহালা ; বা বা, গলায় বিছে-হার, পায়ে পাঁজোড, জোড়াসন হয়ে ব'সে কোলের গর্তে বাঁয়া নিয়ে তবলা বাজাচ্ছেন এই তরুণী , পাশেই উনি কানে পরছেন দুল ; ফুলের সুবাস নিচ্ছেন ইনি ; আর ওদিকে উনি কি করছেন— দর্শকরা উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল— বাঁ হাতে একটি মস্ত পটল তিনি চিরছেন বুঝি, আর পাটল দুটি চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে এদিকে আছেন চেয়ে, ওই চোখ-দুটি ঠিক যেন পটলচেরা।

পটুয়ারা শুধু বসে নেই। তারা তাদের পটের ব্যাখ্যা করে চলেছে। সেই ব্যাখ্যা যেন শুনছে না, গিলছে ওই জমায়েত যাত্রীরা।

পনের দিন বাদে রথ, এখন থেকেই তারও মেলা বসে গিয়েছে। ঐ যে বাবুলোকেরা এসেছেন বড়-বড় না' ভাসিয়ে, ওঁদের কাছে মোটারকম কারবার করার আশা রাখে এই ব্যাপারীরা।

কয়েকটা পট এই রাত-দুপুরেও বিক্রি হয়ে গেল। এমনি কত পটের-বিবি নিজেদের বিক্রি করছে এই মেলার পিছনে ওই ছাউনিগুলিতে, তার হিসাব আমরা নাই-বা নিলাম।

কিন্তু যে হিসাব নেওয়ার জন্যে চুঁচড়া থেকে ওই নৌবহরের সঙ্গেসঙ্গে আমরা এই ঘাটে এসে পৌচেছি, সে হিসাব না নিলে তো চলে না।

তবে চলুন, হে পাঠক হে পাঠিকা, এই মেলার প্রান্তর পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে চলুন ওই গঙ্গাকিনারে। ওখানে যে ঘটনা এখন ঘটছে তা লিখতে গিয়ে ইচ্ছে করছে ছুঁড়ে ফেলি এই কলম।

আশা করি আপনারাও অনুমান করতে পেরেছেন সব। এখানে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারি যে, আপনাদের অনুমান ঠিকই। অতএব আমাকে সে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে অনুগ্রহ করে আপনারা আর অনুরোধ করবেন না।

লিখেও অনেক কথা বলা যায়, আবার না লিখেও নাকি জানানো যায় আরো অনেক কথা। আপনাদের এখানে যে কথা জানাবার আমার ইচ্ছে, যে ঘটনা আপনাদের দেখাবার জন্যে ডেকে নিয়ে এলাম এই গঙ্গাকিনারে, এখানে পৌছেই আমার সে সমস্ত পরিকল্পনা গেল বানচাল হয়ে। ভেবেছিলাম, এ আবার এমন কি ঘটনা, বেদনাজর্জর যে গৃহবধূ স্বামীর উপেক্ষায় ও অবহেলায়

অধীর হয়ে একটি ভয়ানক ঝাঁপ দেবার জন্যে সংকল্প করেছে, এখন সে দিচ্ছে সেই ঝম্প। রাত্রি-শেষের ক্লান্তিতে যখন সকলের চোখে নেমে এসেছে তন্দ্রা, যখন বজরায় ভাউলেতে ও পালোয়ারে আর-কোনো ব্যস্ত সমাগম নেই, যখন নিস্তেজ হয়ে দাঁড়ের ও বৈঠার গায়ে এলিয়ে পড়েছে মাঝিমাল্লারা, তখন, সেই স্বর্ণ সুযোগে, সেই গৃহবধূটি তার পিনিস পরিত্যাগ করে ধীরে-ধীরে নেমে গেল পার্শ্বে অপেক্ষমাণ ঐ দুই-তলা পানসিতে। নেমে গেল সে, সমাজ-সংসার-ধন-ঐশ্বর্য সব পরিত্যাগ করে সে নেমে গেল। কত নীচে সে নামল এখন পরিমাণ করা গেল না, কিন্তু সোনার প্রতিমাটি বুঝি নিজের জীবনকে রক্ষা করার জন্যে বিসর্জন দিল আজ নিজেকেই।

সেইজন্যেই ইচ্ছে করছে ছুঁড়ে ফেলি এই কলম, সেইজন্যেই ও-ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে এই সংকোচ। এবং সেইজন্যেই অনুরোধ, আপনারা যা অনুমান করেছেন তার বেশি কিছু এখানে লিখে দিতে আমাকে আর বলবেন না।

একটা ভয়ংকর শপথ রক্ষা করেছে রাধারানী। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অদৃশ্য করে নিয়েছে নিজেকে।

তার মা বাবা আর ভাইয়েদের কানে যখন পৌছবে এই সংবাদ, তখন তারা সহ্য করতে পারল কি পারল না, তা দেখতে আমরা আর যাব না সেই ফরাসগঞ্জের নিভৃত গৃহে। তাদের উঠোনের আমগাছে নূতন বোল দেখা দেবে, নিত্য প্রাতে ডেকে উঠবে ভোরের পাখি, কুয়োতে নিয়মিত পাওয়া যাবে শীতল জল। কোনো-কিছুরই বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়তো ঘটবে না, কিন্তু তাদের গৃহের মানুষদের মন নিশ্চয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে বেদনায়। গাঙ্গুলীবাড়ির পিসিমা আজও বেঁচে আছেন কিনা, আমরা জানিনে; যদি জীবিত থেকে থাকেন, তিনি এসে কুশল প্রশ্ন করবেন হরিশঙ্করকে, কিংবা ঐ গৃহের গৃহিণীকে— হেমাঙ্গিনীকে। হাটফেরতা মেয়েরা এসে যখন জড়ো হবে তাদের উঠোনে, তারা যখন জানতে চাইবে—কেমন আছে গো ঠাকরুন তোমার মেয়ে— তখন কী উত্তর দেবেন হেমাঙ্গিনী? যে-মেয়ের বিয়ে দেবেন না বলে হরিশঙ্কর এতবার করে জানিয়েছিলেন তাঁর মনের বাসনা, তিনি আজ তাঁর নিরুদ্দেশ মেয়ের উদ্দেশে কী প্রার্থনা জানাবেন? কাল হল বুঝি তাঁর শান্তিপুর-যাত্রা, ধনীভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি কিসের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, কেন তিনি সম্মত হয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে ঐ হাটের মাঝে সাজিয়েগুছিয়ে রাইরাজা বানাতে?—

রাজা হল শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণ ভাবে মনে।
এমন রাজার দেশে থাকিব কেমনে॥
হাতে রাজদণ্ড নাই, নাই সিংহাসন।
কেবল শাসন আছে, এ রাজা কেমন॥

ভোর চমকে উঠেছে গরিটির বাগানবাড়িতে, নিরুপমা তাঁতে বসে খুটখুট শব্দে মাকু চালাচ্ছে আর গুনগুন করে নিজের রচা রাইরাজার কাহিনী আবৃত্তি করছে। আনটুনি এখনো ঘুমচ্ছে অকাতরে। কবিয়ালের ঘুম ভাঙবে কখন কে জানে। অত বড় উৎসব চলেছে ঐ মাহেশে, নদীতে অত জনকল্লোল, কিন্তু এই ফিরিঙ্গিটার কোনো মন নেই ও-উৎসবে। কেলীর কুঠির সামনে দিয়ে কাতারে-কাতারে মানুষজন চলেছে কলকল করতে-করতে, হুশহাশ শব্দে চলেছে পালকি, তড়বড় শব্দে পল্টনদের ঘোড়া— এত শব্দ চারদিকে, তবু মানুষটা ঘুমোয় কী করে অকাতরে?

অমনি অকাতরেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল রূপনারায়ণও।

চোখে জল নিয়ে, মুখে দুশ্চিন্তা আতঙ্ক আর আশঙ্কার চিহ্ন যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলে, তার পিনিস থেকে চাঁপা এসে হাজির হল রূপনারায়ণের বজরায়।

ডাকতে লাগল কেঁদে-কেঁদে, বাবু গো। ও বাবু! বাবু—

অনেকক্ষণ ধরে ডাকল চাঁপা। উত্তর না পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সে, বলল, বাবু গো, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

কালো গোঁফ বেঁকে ঢুকে পড়েছিল মুখের মধ্যে, নাক দিয়ে নিশ্বাস না নিয়ে রূপনারায়ণ মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে ঘুমচ্ছে। তার মনে হল, তার স্বপ্নের মধ্যে কেউ বুঝি ডাকছে তাকে।

আরো কাঁদতে লাগল চাঁপা। রূপনারায়ণ তাকাল।

চাঁপা বলল, বাবু গো। কি সর্বনাশ হল। বউদি নেই!

কী হল কথাটা? রূপনারায়ণ ভালো করে চেয়ে বলল, কি হল?

—বউদি নেই গো, বউদি নেই।

ফৈজ বক্সের দুই পা ছিল বুকের উপর, দুই হাতে সে পা বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে বসল রূপনারায়ণ, বলল, কি?

—নেই। নেই গো। কোথাও নেই। পিনিসের নেই, ভাউলেতে নেই, পালোয়ারে নেই। ছুটে এলাম এখানে, এখানেও নেই।

গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল চাঁপা, কোথায় গেল গো বউদি!

এত কান্নার শব্দে সকলেরই চোখ থেকে বুঝি ছুটে গেল নেশা। সকলে উঠে বসল।

রূপনারায়ণ স্তব্ধ হয়ে বসে বলল, আছে নিশ্চয় কোথাও। মেলায় গিয়েছে হয়তো। বড্ডই সাহস। ঘরের বউকে আস্কারা দিতে নেই। একটু প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে অমনি স্বাধীন হয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা—

কঠিন হয়ে আর শক্ত হয়ে বসল রূপনারায়ণ— এবার পেলে হয়! বেনিয়ান রূপচরণের পুত্রবধূ সে, সে খেয়াল নেই। সাধারণ যাত্রীরা যেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে মেলায়, ওঁরও সাধ হয়েছে বুঝি তেমনি। ছোট-ঘরের মেয়ে হলে যা হয়।

রূপনারায়ণ বিশেষ ব্যস্ত বুঝি হল না। তার আশা আছে, শুধু আশা কেন, সে নিশ্চিত—ওই মেলার হল্লা দেখার জন্যে নেমে গিয়েছে সে। সকলে ঘুমে অচেতন, এই সুযোগ নিয়ে সে বুঝি গিয়েছে তার মনের বাসনা পূর্ণ করতে।

—ছি, দাদাবাবু। চাঁপা সজল চোখে বলতে লাগল, ও কথা মুখে আনতে নেই। আমাদের বউদি কি-জাতের মেয়ে তা তো জানি। সাধ্বী নারীর নামে ও-কথা ভাবতেও নেই, দাদাবাবু।

কিন্তু ভাবনা-চিন্তার বাইরে আজ সকলে। এদিকে এরা বসে-বসে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বধূটির আচরণে, আর রাঙা চোখগুলি আরো যেন রক্তরাঙা হয়ে উঠছে ক্রমশ।

পুব-আকাশে রক্ত ছিটিয়ে তখন উঠে আসছে সকালের সূর্য। ভোররাত্রের মুমূর্ষু জ্যোৎস্নার আড়ালে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, অকৃপণ আলো নিয়ে দেখা দিল সূর্য হয়তো তার পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করতে।

অনুসন্ধান আরম্ভ হল তখন থেকেই। সমস্ত নৌকোয় ছড়িয়ে গেল সংবাদ। সকলেই ব্যাপৃত হল সন্ধানে, সেইসঙ্গে নানারকম আলোচনাও চলতে আরম্ভ করল, নানারকম মন্তব্য, নানারকম হাসি ও মশকরা। ওরই মধ্যে কেউ কপালে করাঘাত করছে, কেউ বাজাচ্ছে বগল।

জলে যেমন সন্ধান চলছে, ডাঙাতেও তেমনি। রূপনারায়ণের নির্দেশে থানাদারের শরণাপন্ন হয়েছে মোতিলাল আর নরহরি। তিনি ভার নিলেন অনুসন্ধানের।

লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমেছে মাহেশে। সেই মানুষদের উদ্দেশ ঢ্যারা পিটে বলতে আরম্ভ করেছে চৌকিদারেরা—

চুঁচুড়ার রাধারানী। গায়ে গয়না, পায়ে পাঁজোড়,
গলায় সাতনরী। হারিয়ে গেছে। সন্ধান
পেলে থানাদারকে জানাও।

ঘাটে-ঘাটে ঢ্যারা বাজছে, ঘাটে-ঘাটে ওই আওয়াজ। জলে ডুব দিতে গিয়েই চমকে উঠছে স্নানার্থীরা ঐ শব্দে। ফিক-ফিক ক'রে হাসছে আবার কেউ-কেউ।

বল্লভপুর আকনা রিসিডা পযন্ত বেজে-বেজে চলে যাচ্ছে ঢ্যারা। কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না এখনো। বেলা দুপুর বেজে গেল।

অটল হয়ে বসে আছে রূপনারায়ণ। তার নেশা একেবারে কেটে গিয়েছে, একেবারে জীয়ন্ত মানুষ হয়ে বসেছে সে।

চাঁপার কান্নার বিবাম নাই। সে ফুঁপিযে-ফুঁপিযে কেঁদেই চলেছে। চোখের জলে মুছে গিয়েছে অলকাতিলকা।

জগন্নাথদেবের স্নান এবার। সমস্ত জনতা এসে দাড়িযেছে এখন কিনাবে। এই স্নান-দর্শনের জন্যেই তাদেব আগমন, এইজন্যে সকলের মধ্যেই ওর দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুলতা। এখন তারা ভুলে গিয়েছে বুঝি চুঁচুডাব বাধাবানীর কথা। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা ওই জগন্নাথ।

মিসলবন্দী হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে-করতে মন্দির থেকে জগন্নাথকে নিয়ে আসছেন পট্টবস্ত্রধারী পুবোহিতেরা। চারদিকে উঠেছে জযধ্বনি কলরব আর কোলাহল।

বজরার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল রূপনারায়ণ। সে দেখতে লাগল, পুরোহিতেরা জগন্নাথের মূর্তি বক্ষে ধারণ করে ভাগীবথীর জলে নেমে চলেছেন।

জানলা থেকে মুখ সরিয়ে চাঁপার দিকে চেয়ে রূপনারায়ণ ডাকলেন, নাপিতানি।

চোখ তুলে তাকাল চাঁপা।

রূপনারায়ণের বুঝি মনে পডে গেছে ভামিনীর কথা, বলল, তোমার বউদি ঝাঁপ দেয় নি তো জলে?

—কি করে বলব, দাদাবাবু। কিছুই আমি ভাবতে পারছি নে।

রূপনারায়ণ আবার বসে রইল চুপ করে। বেলা গডিয়ে চলল ক্রমশ। বিকেলও হয়ে এল। ফিরে যেতে হবে তাকে, কিন্তু ফিরে গিয়ে কি বলবে সে

চু চুড়ার লোককে? তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় রেখে এলে তোমার ঘরের বউকে— তখন কী উত্তর দেবে রূপনারায়ণ?

ঘটনা তো গোপন রাখা হল না। ইশ, বড় ভুলই হয়ে গেল। থানা-দারোগা না করলেই হত। ঢাক পিটে জানিয়ে দেওয়া হল সকলকে ঐ খবর।

ফৈজের মুখের দিকে তাকাতে বুঝি সংকোচ হতে লাগল রূপনারায়ণের। কিন্তু ফৈজের কোনো সংকোচ নেই, সে এক দৃষ্টে রূপনারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, তাকিয়াটা টেনে নিয়ে শক্ত হয়ে বসল রূপনারায়ণ। নিজের মনেই বুঝি বলল, যেমন বংশের মেয়ে তেমনিই হবে।

চাঁপা যেন কিছু বুঝল না, তার দাদাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সকলকে জানান্ দেবার মত করে এবার বলল রূপনারায়ণ, এইজন্যে ঘরে বউ আনার সময়, তার শুধু রূপ দেখে নয়, তার ঘরের কথা ভালো করে জেনে নিয়ে আনতে হয়। যেমন ঠাকুরমা, তেমনিই তো হবে তার নাতনি। ঘেন্নার কথা।

ঘৃণায় বুঝি নাসা কুঞ্চিত হয়ে আসতে লাগল তার, জ্বলে উঠতে লাগল সর্বাঙ্গ। এমন অঘটন ঘটে গেল কী করে— এই তার একমাত্র জিজ্ঞাসা ও একমাত্র বিস্ময়। নরহরিকে বা মোতিলালকে পুনরায় হুকুম করার ইচ্ছে হল না রূপনারায়ণের। যদিও সে জানে, হুকুম করা মাত্র তারা গিয়ে আবার খোঁজ আরম্ভ করবেই।

সারাটা দিন তন্নতন্ন করে যার খোঁজ ক'রে কোনো হদিশ পাওয়া গেল না, তাকে আর কী করে পাওয়া যাবে এই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে?

কিনারে জনকলরব বেজে চলেছে একটানা। ওই কলরব থামতে এখনো অনেক দিন বাকি। সোজারথ হবে, উল্টোরথ হবে, তবে কমবে ঐ ভিড়। সমস্ত ভিড় সরে যাবার পরও যদি, জীয়ন্ত মানুষটির বদলে তার কঙ্কালও খুঁজে পাওয়া যায়, তবুও বুঝি শান্তি।

শান্তি খুঁজছে রূপনারায়ণ। তার জীবনে এত আনন্দ, এত প্রমোদ, এত ফূর্তি— তবু কিনা শান্তির জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে সে।

ফৈজ বক্স্ কথা বলল এতক্ষণে, সারাদিন সে হতভম্ব হয়ে বসে ছিল, মিহি স্বরে মোলায়েম করে ডাকল, বাবুজি।

একটু বুঝি চমকেই উঠল রূপনারায়ণ, ঐ যে কাত্‌ হয়ে পড়ে আছে বীণ, তার তারে কেউ আঙুলের স্পর্শ দিয়ে এই আওয়াজ তুলল, না, এ সত্যিই কারো গলার স্বর ?

রূপনারায়ণ এতক্ষণে ফৈজের মুখের দিকে তাকাল, ও-মুখে কোনো বিষাদ নেই, বেদনা নেই, উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই ; ফুল্লনলিনীর মত প্রসন্ন ঐ মুখ। রূপনারায়ণ বলল, বলিয়ে।

ফৈজ বলল, আফসোস কেঁও বাবুজি। এক জরু চলী গয়ী, লাখো জরু মিল জায়েগী।

চলী গয়ী ? সত্যিই যদি জানা যায় যে, সে চলেই গিয়েছে, তা হলেও তো কথা ছিল। কিন্তু কিছুই জানা যাচ্ছে না— এইজন্যেই তো আফসোস। পানিমে গিয়া, কি, ডাঙামে গিয়া, কি, জাহান্নমমে গিয়া— কাঁহা গিযা, বাৎলায়গা কৌন ?

পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠল ঝুমঝুম শব্দে, নড়ে-চড়ে বসল ফৈজ। কিছুক্ষণ বসে থেকে সে সোজা হযে উঠে দাঁড়িযে যেন আদেশ কবল, বলল, মুন্সিজি, বোল বোলাও।

তবলায় বেজে উঠল বোল, সমস্ত শরীরে পুলকিত শিহরন জাগিয়ে তুলল ফৈজ। থুৎনিতে একটা আঙুল ছুঁইয়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িযে অপাঙ্গে রূপনারায়ণের দিকে চেযে গানের সুরে বলল—

আ জা আ জা আ জা, এ বাবুজি আ জা—
দিল্লাগি ছোড় দোও বাবু
আও দিল্‌কি রাজা।

চাঙ্গা হয়ে বসল সকলে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। পাক খেয়ে-খেয়ে নাচতে লাগল ফৈজ বক্‌স্‌।

পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল আবদারেরা। তাদেব হাত থেকে গেলাশ টেনে নিয়ে-নিয়ে আকণ্ঠ পান করতে লাগল রূপনারায়ণ।

পুলকিত হয়ে উঠল বজরা। ঢেউয়ের দোলে-দোলে কিংবা ফৈজের পদপাতেই বুঝি বজরাটা নেচে উঠল জলের উপর।

সন্ধ্যা নেমে এল ধীরে-ধীরে মাহেশের কিনারে। অন্ধকারের নেপথ্য থেকে স্নানযাত্রীদের কলকণ্ঠধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু তাতে এখানকার এই নৃত্য-গীতের কোনো বিঘ্ন ঘটছে না।

ফৈজ অনুনয় ক'রে ডেকে-ডেকে গেয়ে যাচ্ছে, সেই গানের সঙ্গে চলেছে নৃত্য। কতক্ষণ ধরে এ-নাচ চলবে কেউ জানে না। আলোকোজ্জ্বল বজরায় অভ্যন্তর থেকে সুরেলা আওয়াজ বেজে উঠছে চমকে-চমকে—

আ জা আ জা আ জা

আ জা দিল্‌কি রাজা।

পায়ের আলতা দিয়ে পদ্ম ফোটাচ্ছে না ফৈজ, সে এখন তার চোখের ও মুখের ভাষা দিয়ে বুঝি বসরাই-গোলাপ প্রস্ফুটিত করে তুলছে। সে ফুলের গোলাপি বর্ণের ছোপ লেগেছে রূপনারায়ণের চোখে, সে বুঝি তার সৌরভও পেয়ে গিয়েছে।

তার জীবনে কি ঘটেছে বা কি ঘটবে— এসব সামান্য ও সাধারণ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে সে এখন ইচ্ছুক নয়। হাজার হাজার বছর, লক্ষ শত বৎসর সে ঐ গানে কান পেতে এইখানে ঠিক এইভাবে বসে থাকতে রাজি। সব দুঃখ বুঝি ভুলে গিয়েছে রূপনারায়ণ— সব বেদনা, সব উদ্বেগ।

দূর্বার উপর বিছিয়ে দিলে মিলিয়ে যায় যে মসলিন, সেই সূক্ষ্ম সবনাম দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করেছে ফৈজ। আবৃত করেছে বটে, কিন্তু তাতে কোনোরূপ আবরণ হয়ে উঠেনি। বার-বার ঐ গান গেয়ে সে যখন দুটি আঙুলে তার হৃদয় দেখিয়ে দিয়ে বলছে—

আ জা দিল্‌কি রাজা

তখন রূপনারায়ণেব বুঝি ইচ্ছে হচ্ছে সে তার হৃদয়টা উৎপাটিত ক'রে ফৈজের অঙ্গের তরন্দমের নিভৃতে তা জিম্মা রেখে দেয়— ঐ শৌখিন আংরাখায় ফৈজের অঙ্গ রক্ষা হচ্ছে কতটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আসরে উপস্থিত সকলের প্রাণরক্ষা করা বুঝি দায় হয়ে উঠছে।

গোলাপি রঙের রেশমি রুমাল নেড়ে-নেড়ে রূপনারায়ণ ফৈজের নাচের তারিফ করছিল। সে রুমালে এক গুচ্ছ মোহর বেঁধে সে ছুঁড়ে দিল ফৈজের পায়ের কাছে। ফৈজ ফিরেও তাকাল না সেদিকে। চোখে কটাক্ষ হানতে লাগল শুধু এবং তার দিলের রাজাকে বার-বার অভ্যর্থনা করতে লাগল যেন তার তরন্দমের নিভৃতে।

গান থামল। ক্লান্ত হয়েছে বুঝি ফৈজ। বিন্দু-বিন্দু ঘাম জেগেছে কপালে। পাখাবরদারেরা ইঙ্গিতমাত্র ফৈজের শরীরে বীজন করতে আরম্ভ করল।

একটু সরে বসে রূপনারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে ফৈজ মিষ্টি হেসে বলল, আওরৎকা হাল তো এইসাই বাবুজি। মোহর ভি দিয়া বাবুজি, আপকা বহৎ মেহেরবানি।

ফৈজ কি বলল, বিশেষ কিছু বুঝতে পারল না রূপনারায়ণ। তার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল, কালো প্রজাপতির মত গোঁফ-জোড়া কেঁপে উঠল মাত্র।

ফৈজ বুঝেছে কত বড় অঘটন ঘটে গিয়েছে। নাচনেওয়ালি আর বাইজি নিয়ে মৌজ করতে যেখানে আসে সাহেবানেরা, জরু নিয়ে সেখানে এল কেন এই বাবুজি— এই বুঝি তার জিজ্ঞাসা। কিন্তু সে কথা তো সত্যিই জিজ্ঞাসা করা যায় না। বাইজি ফৈজ তাই আওরৎদের হালের কথা বলে, আর বাবুজির মেহেরবানির কথা বলে।

নৌকোয়-নৌকোয় নৃত্যোৎসব চলেছে। কখনো ভেসে আসছে কারো গলার গান, কখনো-বা কারো পায়ের নূপুরেব শব্দ, কখনো-বা কোনো হল্লা।

সেইসব শব্দে কান পেতে ফৈজের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে রূপনারায়ণ। ভালো করে মনে পড়ছে না সেই-মুখটা, কিন্তু সে-মুখটা কি এই-মুখটার চেয়ে কিছু হীন? মনে হয় না।

তাকিয়ার পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে রূপনারায়ণ ডাকল, আবদার।

তৈরিই ছিল তারা, বাবুর হুকুম তামিল করতে ছুটে এল।

এমন সময়ে তার বজরায় এসে হাজির হল এ কে? ভুরু টেনে ভালো করে তাকাবার চেষ্টা করল রূপনারায়ণ। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই চিনতে পারল সে। হেসে বলল, এসো মুকুন্দ।

পাথুরেঘাটার মুকুন্দরাম। উড়্‌নিটা গলায় জড়িয়ে নিতে-নিতে সে বসল। তার পর রূপনারায়ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিসব আলোচনা করতে লাগল। সে নাকি কিছুই জানত না, একটু আগে শুনল। এ পারে ছিল না সে, ঐ পারে সুখচরের কিনারে নৌকো বেঁধে ফুর্তি করছিল। খবরটা শুনেই চলে এল। তার আসার আরো কারণ অবশ্যই আছে। দিল্লির সেই নামজাদা নাচিয়ে ইয়েকে— মানে ফৈজ বক্‌স্‌কে— নাকি নিয়ে এসেছে রূপ—

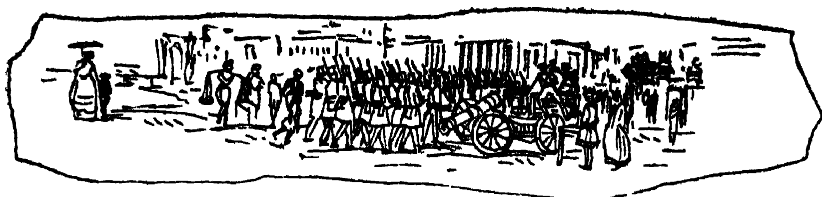
রূপনারায়ণ বলল, হ্যাঁ। এই সেই।

সোজা হয়ে বসে মুকুন্দ বলে উঠল, তবে চলুক নাচ, চলুক বাজনা। কত হাজার-হাজার ঘটনা ঘটে চলেছে এইখানে কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে, তার জন্যে ফুর্তি বন্ধ থাকে কেন, চালাও ফুর্তি—

গেলাশটা মুখের ভিতর উপুড় করে দিয়ে মুকুন্দ বলল, এই জলের উপর লিখে রেখে যাব নাম; মুছবে না, মুছবে না, মুছবে না। আর নাম যদি মোছেই, মুছুক। মুছবে না আমাদের কীর্তি। ঐ ঢেউ টলমল ক'রে বলবে, শুধু বলবে···—

রূপনারায়ণের গায়ের উপর ঢলে পড়ে মুকুন্দ বলল, কি বলবে, রূপ? কি বলবে এই হুগলী-নদীটা?

উত্তর দিল না রূপনারায়ণ।



॥ নবম স্ফুলিঙ্গ ॥

রংপুর থেকে রাধানগরে আসতে রামমোহনকে হয়রান হতে হয়েছে অনেক— কত পালকি-বদল, কত নদী-পাড়ি। পথেই কেটে গিয়েছে কতগুলো দিন। আমরা তাঁর সমস্ত যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী ছিলাম না, সামান্য কিছুটা পথ মাত্র আমরা কাটিয়েছি তখন তাঁর সঙ্গে, তা'তেই হয়তো ক্লান্ত হয়ে উঠেছি আমরা। সুতরাং অনুমান করতে পারা যায় সম্পূর্ণ পথটা অতিক্রম করতে তাঁর ক্লান্তিবোধ হয়েছিল কতখানি। রংপুর থেকে রাধানগর কতই বা দূর।

কিন্তু অত ক্লান্তি কিংবা অত কষ্টের কোনো প্রয়োজন হল না এখন। একটি মাত্র পাতা উলটে এক নিমেষে আমরা চলে এলাম অনেক দূরে— প্রায় দেড় শ বছরের ব্যবধানে।

কাহিনীর অধ্যায়গুলি যেমন লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে, আসল কাহিনী যদি সেইভাবে চলত তাহলে ইতিহাস হত বুঝি কতকগুলো ছেঁড়া কাগজের বাণ্ডিল। তাহলে তাকে পুঁজি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবার আগ্রহই হত না আমাদের। হয়তো তা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতাম, কিংবা তাকে পিষে-বেটে মণ্ড তৈরি করে নতুন ক'রে বানিয়ে নিতাম কাগজ— নতুন কোনো কাহিনী লেখার জন্যে। নানা কথার পদচিহ্ন প'ড়ে সে-কাগজ আবার হয়ে উঠত ভিন্ন কাহিনীর পদাবলী।

কিন্তু কাহিনী লাফিয়ে চলে না, কখনো দ্রুত কখনো-বা মন্থর হতে পারে তার গতি, অথচ তা চলে স্রোতেরই মত। সময়ের যেমন ছেদ নেই, নদীধারা যেমন চলে ছেদহীন গতিতে, কাহিনীর গতিও তেমনি। কখনো ঢেউ ওঠে, কখনো আবর্ত সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তবু ভেঙে যায় না স্রোত; কখনো বিষাদে ম্লান, কখনো খুশিতে রঙিন হয়ে ওঠে হয়তো জীবন, কিন্তু সময় তাতে ছিঁড়ে যায় না।

মাহেশের কিনারে একটি দুর্ঘটনায় একসঙ্গে সময় ও স্রোত আবর্তিত হয়ে উঠে বুঝি জট পাকিয়ে গিয়েছিল, সে-আবর্তে নিজেদের সমর্পণ করতে ইচ্ছে হল না আমাদের, তাই নিরুদ্দিষ্টা রাধারানীর উদ্দেশ পাবার কোনো চেষ্টা না করে আমরা স'রে এলাম অনেক দূরে।

অতীত থেকে বর্তমান কলকাতায়। ১৮১৬ থেকে ১৯৫৬ সালে।

চেহারা বদলে গিয়েছে, চলন বদলে গিয়েছে কলকাতার। পাত্র মিত্র সভাসদ্— সকলেরই বদল হয়েছে অনেক। পরিবর্তন মানেই উন্নতি— এ দাবি আমরা করব না। কিন্তু এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, পরিবর্তন যা হয়েছে তাতে আগের কলকাতাকে এখন এই কংক্রিট অ্যাসফাল্ট আর সিমেন্টের আস্তরণের ভিতর থেকে খুঁজে বের করা কঠিন। নূতন-নূতন ইমারত উঠে পুরাতন কলকাতার বনিয়াদ আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। এখনো হয়তো কিছু বাকি আছে, আরো কয়েক বছর পরে হারিয়ে যাবে সমস্ত পুরাতনেরই স্মৃতিচিহ্ন।

স্মৃতি নিয়ে রোদন করার ইচ্ছে আমাদের নয়। কিন্তু ইতিহাসের যাবতীয় স্বাক্ষর বুঝি উহ্য হয়ে যাবে, এই আমাদের ভয়।

বউবাজারের মোড় থেকে ছাতাওয়ালা-গলি চায়না-টাউন কলুটোলা পার হয়ে চলে গিয়েছে চিৎপুর রোড— কোনো এক কালে চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল এখানে, সেই দেবীর সম্মুখে নরবলি হত। সে মন্দির নেই, তার জন্যে আক্ষেপও নেই কোনো। কিন্তু লালবাজারের উলটো পারে চিৎপুরের উপরের ঐ দু-মহলা বাড়িটার উপরে বড় মায়া হচ্ছে, ওখানে থাকতেন মাইকেল মধুসূদন— ঐ ছয় নম্বর বাড়িটায় বসে তিনি রচনা করেছেন মেঘনাদবধ বীরাঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা। জীর্ণ হয়েছে বাড়িটা। ওটাকে চূর্ণ ক'রে কবে হয়তো ওখানে উঠবে আকাশচুম্বী একটি প্রাসাদ। মুছে যাবে চিহ্নটা। ঐ চিৎপুর ধরে বরাবর উত্তর দিকে চলে গেলে জোড়াসাঁকো— রবীন্দ্রনাথের ভিটে,

সেও এক ছয় নম্বর বাড়ি; কে জানে, হয়তো ওটাও ওখানে থাকবে না কিছুদিন পরে।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের উপরে ভরদুপুরে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি প্রাণী— সলিল সেন, ভিক্টর চক্রবর্তী, ও বরেন বসু। তিন বাউণ্ডুলে।

যখন-তখন এদের এমনি দেখা যায় যে-কোনো রাস্তার মোড়ে। ওরা পুরাতন কলকাতা খুঁজে বেড়ায় না, বর্তমান কলকাতাকে বুঝি খুঁটিয়ে দেখতে চায়।

সলিল বলল, ভিক্টরদা, ঐ বাড়িগুলোর স্কেচ এঁকে রাখো। আজ কেউ কদর না দিলেও একদিন ওর আদর হবে।

ছবি আঁকে ভিক্টর চক্রবর্তী, কিন্তু সবই তার পাগলাটে ছবি। মানুষটাও যেমন, তার ছবিও তেমনি। চোখ-দুটি কোটরে, গাল গর্তে, দাড়িগোঁফ কামানো, কিন্তু মাথাভর্তি চুল— ছিপছিপে লম্বা চেহারার মানুষ এই ভিক্টর।

সলিল আর বরেন প্রায় সমবয়সী, বাইশ কি চব্বিশ বছর বয়স তাদের। কিন্তু ভিক্টরের বয়স হয়েছে, চল্লিশের উপরে তো নিশ্চয়ই।

কিন্তু বয়সের এই ব্যবধানের জন্যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কোনো বাধা হয় নি।

ভিক্টরদা কেবল এদের বন্ধুই না, এদের ফিলজফার ও গাইডও। কিন্তু বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এই ভিক্টর চক্রবর্তী। এদিকে সদাচারী সাধারণ একজন দেশী মানুষ, আদপে-কায়দায় আচারে-আচরণে এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই, কিন্তু নামটা কেমন ফিরিঙ্গি-ফিরিঙ্গি।

ঐ লম্বা চেহারা, ঐ রোগা শরীর, ঐ বড়-বড় চুল— গায়ে ছিটের শার্ট প'রে তিনি ঘুরে বেড়ান এদের সঙ্গে। ট্রামে-বাসে চলাফেরা করে যারা তারা চেয়ে দেখে বার-বার। তারা চিনতে পারে না— কে এই লোকটা। অথচ এই লোকটার তুলীতে আঁকা ছবির সঙ্গে কিন্তু তাদের খুব পরিচয়। অদ্ভুত টেকনিকে আঁকা বড়-বড় পোস্টার তারা নিত্যই দেখতে পায় শহরের দেয়ালে-দেয়ালে। ভারতনাট্য কথাকলি মণিপুরী ছউ কিংবা বর্মার পোয়ে নাচিয়েরা যখন শহরে নাচ দেখাতে আসে, তখন ডাক পড়ে ভিক্টর চক্রবর্তীর। কিন্তু ডাক পাঠানো মাত্রই ভিক্টরকে পাওয়া যায় না। কাজের কথা শোনা মাত্র তার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যায়, কিছুতে উঠে আসতে চায় না নিজের

তোয়া থেকে। কিন্তু এসব ছবি ভিক্টর ছাড়া অন্য কোনো আর্টিস্টের হাতে খোলতাই হয় না, সুতরাং তাকেই চাই।

অবশেষে পাওয়া যায় তাকে। মোটা তুলী নিয়ে উঠে আসে ভিক্টর। নাচিয়েদের মুখ দেখে নেয় মুখোশ দেখে নেয়। তার পর ঘর খালি করে দিতে ব'লে রঙের মধ্যে তুলী ডুবিয়ে বসে সে।

কয়েকদিন পরেই পোস্টার পড়ে দেয়ালে-দেয়ালে। অনেক দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় ঐ ছবি। সারা শহর জেনে ফেলে, নতুন নাচের দল এসেছে কলকাতায়।

হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে কেউ কখনো কাজ করাতে পারেনি ভিক্টরকে। আদর দিয়ে আপ্যায়ন দিয়ে তাকে ক্রয় করা যায় অবশ্য। কিন্তু সে আদর-আপ্যায়ন সাচ্চা, না, ঝুটা— তা পরখ করে দেখার জন্যে ডাক শোনা মাত্রই গা তোলে না সে।

দুইজন উঠতি-কবি সলিল সেন আর বরেন বসু। এদের সঙ্গে কিছুদিন হল ভাব হয়েছে ভিক্টরের। বয়সে এরা দুজন তার কাছে বাচ্চা বটে, কিন্তু এই দুই জনের হালচাল দেখে এদের বড পছন্দ হয়েছে ভিক্টরের।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের উপরে দাঁড়িয়ে চীনাদের জুতোর দোকানের বেচা-কেনা দেখতে-দেখতে ভিক্টর বলল, কত টাকার কারবার করে ফেলল ওরা এরই মধ্যে। আর আমরা? আমরা কী করে সময় কাটাচ্ছি হে?

বরেন হাসল, বলল, খেলোয়াড়রা একা-একা খেলে কি সুখ পায়, ভিক্টরদা? তাদের খেলা দেখারও তো লোক চাই। আমরা সেই দর্শক, আমরা টাকা নিয়ে খেলি নে, টাকার খেলা দেখি।

বরেনের পিঠের উপর একটা হাত রেখে ভিক্টর তাকে বুঝি তারিফ করল, বলল, চল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

বউবাজার ধরে ফিরিঙ্গি-কালীবাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল তারা। যতই অকাজের মানুষ হোক এরা, সেই অকাজ করার জন্যেও ঘাঁটি তাদের একটা আছে। এখান থেকে সে-ঘাঁটি অনেক দূরে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট আর শঙ্কর ঘোষ লেনের মোড়ের ছোট দোতলা একটা বাড়ি।

সেখানে এখন যেতে হবে তাদের— সেই বারো নম্বরে। এ বাড়ির অন্য-কোনো পরিচয় তাদের কাছে নেই, তারা ঐ নম্বর উল্লেখ করেই এর পরিচয় দেয়। বাড়িটার নম্বর সত্যি কত তা জানবার উপায় নেই। জরাজীর্ণ তার

চেহারা, নোনা ধরেছে ইটে, নম্বরের প্লেটে মরচে ধরে খসে গিয়েছে কবে, কেউ জানে না। তবু ওরা নম্বর উল্লেখ করেই পরিচয় দেয় এর।

কলেজে একসঙ্গে পড়ার সময়ে বরেনে আর সলিলে অন্তরঙ্গতা হয়। এরা যে দুই জনেই কবি, এ খবর দুজনের জানা ছিল না। ক্লাসে চুপচাপ কাটিয়ে দেয় তারা। কিন্তু হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল সলিল। তার রাফ-খাতার মলাটের ভিতর দিকে ক্লাসের রুটিন লেখা, তার নীচে লেখা দুটি ছত্র—

রুটিন দেখেই দিন কাটে রে, লেখাপড়া হয় না,
পরান আমার সব কথা কয়, পড়ার কথাই কয় না।

এটা কবিতাও নয়, ছড়াও নয়, এ কেবল মনের কথা পরিষ্কার বাংলায় লিখে রাখা মাত্র। কিন্তু ছত্র-দুটি দেখেই সলিলের মুখের দিকে তাকাল বরেন, বলল, এ বুঝি তোমার কীর্তি?

সলিল হাসল। সেই হাসিতেই যেন আত্মসমর্পণ করা হয়ে গেল সলিলের। এবং ক্রমেই তারা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল, এবং সংকল্পই বুঝি করে ফেলল যে, ঝুটা কীর্তি নয়, আসল কীর্তির জন্যে তারা দৃঢ়সংকল্প।

তারা সংকল্প করল এক রকমের, কিন্তু তাদের অভিভাবকদের সংকল্প ভিন্ন রকমের। এইখানেই তাদের আক্ষেপ।

কিন্তু সলিল বলল, আক্ষেপ করি বটে, কিন্তু আক্ষেপ করার কোনো মানেও নেই। মানুষের মনের যা চাহিদা, তার জোগান যদি সহজ হয় তাহলে চাহিদার স্বাদ থাকে না, ঝাল-লঙ্কা-তেল-ঘি ঢেলে জবরদস্ত করে রান্না করা আলুনি মাংসের মত ঠেকে। যা চাই, তার মাঝখানে ভীষণ বাধা এলে চাওয়াটা সাচ্চা কিনা তারও যেমন প্রমাণ মেলে চাওয়াটাও জোরদার হয়ে ওঠে।

বরেন ঐ কথা কান পেতে শুনতে-শুনতে হেসে বলল, বা, ফার্স্ট ক্লাস বক্তৃতা। ক্লাস-লেকচারের চেয়েও ভালো লাগল, সলিল।

একটু থেমে সে বলল, বুঝতে পারছি, তোমার মনের কোথাও দারুন ঘা আছে।

সলিল যেন বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, ওসব মেয়েলি কথা ছাড়্ বরেন। ওই, ঘা আঘাত বেদনা— ডিক্সনারি থেকে কথাগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত।

—বটে? অভিধান থেকে নাহয় বাদ দিতে পারি, কিন্তু অনুভূতি

থেকে? সেখান থেকে ওগুলো উপড়ে ফেলে দিলে কি নিয়ে তোমার কবিতা হবে হে কবিরাজ?

উত্তর দিল না সলিল। মাথা নীচু করে চুপ করে বসে কি-যেন ভাবতে লাগল।

রোজই বড় ক্লান্ত দেখায় সলিলকে, মুখ দেখে মনে হয়— সে বুঝি ক্ষুধার্তও। কিন্তু কোনো কথাই সে বলে না। ক্লাসে প্রফেসার কী যে বলে যান, সব কথা শোনেও না হয়তো মন দিয়ে। আসলে এ-পড়াশুনায় মন নেই তার। বাণিজ্যে তো লক্ষ্মী বাস করেন, লক্ষ্মীর আরাধনা করার সংকল্প তার না, তার সাধ বুঝি সরস্বতী-সাধনায়। কিন্তু গ্রহের ফেরই বলো, আর অভিভাবকের জেদই বলো, সলিলকে আসতে হয়েছে কমার্স পডতে— বিদ্যাসাগর কলেজের এই ইভিনিং ক্লাসে।

গাঢ় নীল রঙের মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে কলেজে আসে সে, যেমন ক্লান্ত দেখায় তাকে তেমনি দীনহীন মনে হয়। বরেনের বুঝি মায়াই হয় তার উপর।

কবিতার শখ বরেনের আছে, ভালো রকমই আছে। কিন্তু সে বাণিজ্যও করতে চায়। জীবনে কিছু তো একটা করতে হবে। সেইজন্যে আই. কম. পাস করে এসেছে এই বি. কম. ক্লাসে। কিন্তু সলিল যেন জানে না তাকে কিছু করতে হবে কিনা, বাঁচার জন্যে রসদ দরকার হবে কিনা। ম্যাট্রিক পাস করার পর তাকে ভর্তি করা হল বিজ্ঞানে, আই. এস-সি. পাস করল সে, তার পর তাকে এনে এখানে নাম লিখিয়ে দেওয়া হল।

সলিল হেসে বলল, বিজ্ঞান পড়েও জ্ঞান বাড়ল না, এখন কমার্সও মনে হচ্ছে ফার্স। জীবনের কোনো প্ল্যানই নেই আমাদের, কোনো রকমে ছাত্রজীবনটা কাটিয়ে দেওয়া, তার পর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ করা— এই হচ্ছে আমাদের জীবনের রুটিন।

সেই রুটিন মেনেই তাই চলেছে। কিন্তু তার নিজের প্ল্যান কিছু না থাক্, তার অভিভাবকের কিছু-একটা প্ল্যান নিশ্চয়ি আছে। তা না হলে হঠাৎ তাকে এখানে এনে ফেলা হবে কেন।

ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে সলিল বালিগঞ্জ থেকে। সকালে সাড়ে-নটার ট্রেনে বাড়ি থেকে রওনা হয়, বাড়ি ফিরে যায় রাত সাড়ে-দশটায়। ছাত্র-জীবনটাই যদি এই, তাহলে জীবনসংগ্রাম কিরকম হবে তা সে নিশ্চয়

অনুমান করতে পারছে। অনুমান করে আর ভাবে, এইভাবে ছাত্রজীবন কাটিয়ে বাড়তি দম বুঝি আর থাকবে না। জীবনসংগ্রাম সে করবে কোন্ পুঁজি নিয়ে ?

কমার্স পড়ছে সে—এটা তো থিয়োরি, সেইসঙ্গে প্র্যাকটিকাল কিছু শিখে নেওয়া দরকার। সেইজন্যে সলিলের অভিভাবক তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সায়েন্স-কলেজের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টে। এখানে হাতে-কলমে কাজ শেখে সে। এ রকম কাজ শেখাবার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই, ঐ ডিপার্টমেণ্টের প্রফেসরকে অনেক ধরে করে এই সুযোগটা পাওয়া গিয়েছে যখন, তখন সলিলের উচিত এর পুরো সদ্ব্যবহার করা।

সলিল বলল, বেলা সাড়ে-দশটায় পৌছই সায়েন্স-কলেজে। বেলেঘাটা স্টেশন থেকে কম দূর না। এই পথ হেঁটে আসতে আধ ঘণ্টার উপর সময় লাগে।

—সারাদিন করিস কি সেখানে ?

—হাতুড়ি পিটি। দেওয়ালে-দেওয়ালে ইলেক্‌ট্রিক ওয়্যারিং করি। ড্রিল চালাই, শ্বেতপাথর ছিদ্র করি। শুনতে বেশ— অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স। কিন্তু প্রফেসারের ধারে কাছে না, আমার কাজ মিস্ত্রিদের সঙ্গে। কলেজে-পড়া বাবুকে পেয়ে তাদের খুব ফুর্তি। যেমন খাটায়, তেমনি চোখ রাঙায়।

বরেন বলল, মোদ্দা কথা, তারা চাকরি করে, মাইনে পায়, আর তাদেব কাজ করিয়ে নেয় তোমাকে দিয়ে ?

—নেয়। আমিও করি, সময় তো কাটাতে হবে ? পাঁচটা না বাজলে ছুটি নেই।

পাঁচটার সময় সলিল সায়েন্স-কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশিবাগান-গলি পার হয়ে হৃষীকেশ পার্কে ব'সে সময় কাটায়। কমার্স-কলেজে ক্লাস আরম্ভ ছটায়। এখানে বসে-বসে সে খেলা দেখে বাচ্চাদের। তার মনে হয় বুঝি, তারই-বা বয়স কত ? আঠারো কি উনিশ। এই বয়সে এই ক্লান্তি ও খিদে নিয়ে সে বসে আছে এখানে এমনি ভাবে, আর, তার বয়সী কত ছেলে ঐ যে ব্যাডমিনটন খেলছে ও পাশে।

রাত্রি নটা পর্যন্ত ক্লাস। বেলেঘাটা স্টেশন থেকে বালিগঞ্জের ট্রেন আটটা-পঞ্চান্নর পরেই দশটা-কুড়িতে। শঙ্কর ঘোষ লেনে বিদ্যাসাগর কলেজ। শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে ঝামাপুকুর আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হয়ে সে হেঁটে চলে

একা-একা। বাঁ বগলে বই চেপে ধরে শীতের রাত্রে কলেজ থেকে পাঠ সমাপন করে বাড়ির দিকে যাত্রা করে সলিল সেন।

বরেন বলল, কবিতা তো ছাতু হয়ে যাবার কথা হে। এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও রাফ-খাতায় ঐ রসিকতাটুকু তো লিখে রাখা হয়েছে? তোর বুঝি বাবা-মা নেই?

সলিল একটু হাসল, বলল, নেইই শুধু না। তাঁদের কথা আমার মনেও নেই।

—যাক্, চুকে গেছে ল্যাঠা। এবার চল, আমরা সংকল্প করি— আমরা বিদ্রোহী হব।

বরেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সলিল বলল, ওসব কাজ ঘোষণা ক'রে হয় না। ও এমনিই হয়। এবং, বুঝলে বরেন, একটু যেন হয়েইছে।

শুনে খুশি হল বরেন, বলল, আমার বাবা আছেন, কিন্তু মা নেই। আমি ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গেসঙ্গেই নাকি তিনি খতম হয়েছেন giving place to new। নতুন মা আছেন আমার! তিনি আমার পিতার স্ত্রী, আমার নমস্যা! সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারব না। শুধু বলব, অ্যাডিউ অ্যাডিউ। সুযোগ পেলেই হাওয়া হব।

বা, চমৎকার। একেবারে যেন রাজযোটক। সলিলেরও টান নেই তার বাড়িতে, সে তার সঙ্গী পেয়ে গেল তার মনের মতই আর-এক জনকে।

কমন-রুমে বসে কথা বলছিল দুজন। ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা পড়ল। বিজনেস অর্গ্যানিজেশনের ক্লাস এবার। ওরা দুজন তাই উঠল। জীবনে বিজনেস হোক বা না-হোক অর্গ্যানিজেশনটা শিখে নেওয়া মন্দ না। হাসতে-হাসতে ওরা রওনা হল।

করিডরে দাঁড়িয়ে বরেন বলল, ড্রেস পালটাও, সলিল সেন। ইউ লুক ভেরি পুয়োর, ভেরি শ্যাবি।

—এই নীল পাঞ্জাবি? থমকে দাঁড়াল সলিল, হাই তুলে বলল, নীলবর্ণ শৃগাল আমি। সারাদিন মিস্ত্রিগিরি করব, তার পর ক্লাসে আসব; অতএব এমন গাঢ় রঙের জামা না হলে ধুলোমাটি ধরা পড়ে যাবে না? যাকে বলে, ময়লা হয়ে যাবে না জামা? ছাত্রত্বের ও মিস্ত্রিত্বের কেমিকাল কম্পাউণ্ড করতে গিয়ে এ-সাজ হয়ে উঠেছে মেকানিকাল মিক্সচার।

—ঘুম পেয়েছে বুঝি? হাই তুলছ যে।

—না, কিছু না। একটু টায়ার্ড বোধ হচ্ছে। আজ হেডমিস্ত্রিটা ঘরের

পাকা মেঝের উপর চক দিয়ে দুটো প্যারালাল লাইন টেনে দিয়ে বলল, এই দাগ-বরাবর খুঁড়ে যাও, ছয় ইঞ্চি ডিপ ক'রে।

—কেন ?

—নতুন ইলেক্‌ট্রিক মটোর বসবে, তার লাইন যাবে।

হেসে উঠল বরেন বসু, বলল, এই তোমার অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ?

সেই অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স— যাকে বলে ফলিত পদার্থবিদ্যা— সব সময় প্রতিফলিত দেখা যায় সলিলের মুখে আর চেহারায় ; এই প্রতিফলনের দরুনই বোঝা যায় তার শরীরে কোনো পদার্থ নেই— জীর্ণ আর শীর্ণ সে শরীর। কিন্তু মন ক্লান্ত থাকলেও সে-মন মাঝে-মাঝেই ওঠে গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে, তাই রাফ-খাতায় দু-একটি ছত্র ওঠে জেগে— যা কাব্যও না, কবিতাও না, ছড়াও না ; কিন্তু তার মনের অতলে অন্তঃসলিলের মত একটা স্বচ্ছন্দ ধারা যে আছে তার প্রমাণ।

বরেন বেশ হাসিখুশি ছেলে, সেও কমার্সে এসেছে বটে, কিন্তু তার প্রাণেও রস আছে, তার প্রাণেও সাধ আছে ইচ্ছে আছে, সেও লেখে কবিতা। কিন্তু সে কথা তো এখানে জাহির করে বলা যায় না। তার বউদির গানের খাতার দুই মলাটের ভিতরে-বাইরে অনেক কবিতা লিখেছে বরেন। তার এই নীলিমা-বউদি মানুষটা খাসা টাইপের, বরেনের থেকে অনেক বড়, কিন্তু বরেনের যেন সমবয়সী— এমনি ভাবে তার সঙ্গে মেশে। সেদিনের লেখা দুটি ছত্র পড়ে নীলিমা-বউদি খুব তারিফ করেছে বরেনকে, বলেছে, ঠাকুরপো, বড় হয়ে তুমি বড় কবি হবে, তখন মনে রেখো এই বউদিকে।

সেই ছত্র-দুটি বরেনের মাথার মধ্যে গুঞ্জন তুলেছে এখন, সলিলকে পেয়েই বুঝি তার এই উৎসাহ। মনে-মনে সে আবৃত্তি করতে লাগল—

নীলে-নীলিমায় শারদ-আকাশ দুপুরে যেমন স্বচ্ছ
ক্রমেই দেখছি তুমি বউদিদি আকাশের মত হচ্ছ।

বউদির ভবিষ্যৎবাণী যদি ফলে তাহলে আনন্দের যে সীমা নেই! কিন্তু ওতে বউদির নাম-উল্লেখ আছে বলেই বউদির ভালো লেগেছে, না, সত্যিই ওতে কিছু পদার্থ আছে, বরেন ঠিক ধরতে পারে নি। যাই হোক, সেসব কথা নিয়ে মনকে এখন চঞ্চল করে কোনো লাভ নেই।

সলিলের দিকে চেয়ে বরেন বলল, তোমার অভিভাবকের ইচ্ছে হয়তো খুব সৎ, খুব মহৎ। তোমাকে একটা বড়-দরের মানুষ করে তোলাই হয়তো তাঁর

হচ্ছে।" কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি খুব প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ নন। একটা মানুষ নিজের খুশিতে খাটতে পারে সারাদিন, কিন্তু চাপে পড়ে খাটতে গেলে শরীর ভেঙে যায় অল্পেই। এটাকে বলা যেতে পারে ফলিত চ্যাংড়ামো—ইংরেজিতে অ্যাপ্লায়েড জোক্‌ও বলতে পারে, প্র্যাকটিকাল জোক্‌ও বলতে পার।

ওদের আক্ষেপ নিয়ে, অনুশোচনা নিয়ে, জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে, কাব্যের কল্পনা নিয়ে এই ভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন।

কিন্তু ওদের এই ছাত্রজীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সময় আমরা কাটাতে চাই নে।

ভিক্টর চক্রবর্তীর সঙ্গে ওদের বউবাজার ধরে রওনা করে দিয়ে আমরা অন্য কথায় এসে পড়েছি, এতক্ষণে ওরা নিশ্চয় এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, এবার আমাদের ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গ নিতে হয়।

ফিরিঙ্গি-কালীবাড়ি পেরিয়ে ওরা ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে পড়েছে। তিনটি মানুষ গল্প করতে-করতে হেঁটে চলেছে পাশাপাশি।

ওদের বুঝি জ্ঞান দিতে-দিতে চলেছেন ভিক্টরদা। জীবনে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে না পারলে জীবনের কোনো দাম হয় না। দরজা বন্ধ করে ঘরের কোণে বসে-বসে বয়স বাড়ালেই অভিজ্ঞতা বাড়ে না। অভিজ্ঞতার উপকরণ ছড়ানো থাকে বাইরে— পথে-ঘাটে, হাজার-হাজার মানুষের ভিড়ে। সুতরাং সবত্র পরিক্রমা করে বেড়ালেই জীবনের লাভ। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করে, সে লাভের ফল কি। ভিক্টরদা তার উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করবেন, বলবেন, **ask me another,** এর উত্তর জানা নেই তাঁর। অভিজ্ঞতার যদি কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে মূল্য আছে কোন্ জিনিসের ?—টাকার ? টাকা করতে হলেও তো অভিজ্ঞতা চাই। টাকা ক'রে যারা বড় হয়েছে, এবং টাকা না-ক'রে যারা বড় হয়েছে, অঙ্ক ক'ষে গ্র্যাফ এঁকে দেখানো যেতে পারে, তারা সকলেই আগে অর্জন করে নিয়েছে অভিজ্ঞতা।

ভিক্টরদার এসব কথা হচ্ছে এক ধরণের কৈফিয়ত মাত্র। তিনি চরকির মত ঘুরে-ঘুরে বেড়ান সারা কলকাতা, এক-এক দিন এক-এক জন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে তাকে ধ'রে নিয়ে এসে লম্বালম্বা বক্তৃতা দিতে থাকেন। কিন্তু এখন এই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বরেন ও সলিলকে যে লেকচার দিয়ে চলেছেন তা হচ্ছে তাঁর এই স্বভাবের কৈফিয়ত স্বরূপই যেন। দুটি ইয়ং ছেলেকে তিনি পেয়েছেন তাঁর শাগরেদ

রূপে, এতে ভিক্টরদার মনেও খুশি কম না। সঙ্গীহীন জীবন ভিক্টরদার, এই দুটি সঙ্গী তাঁর কাছে তাই অন্তরঙ্গ সুহৃৎ।

কলুটোলা রোডে বাঁক নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পিছনের প্যারীচরণ সরকার রাস্তা ধরে এসে পড়ল তারা কলেজ স্ট্রীটে।

পথের ধারের পুরনো বইয়ের স্টলে এলোমেলো খোঁজাখুঁজি করতে লাগল বই। কি বই যে দরকার, তার কোনো স্থিরতা নেই। কিন্তু হঠাৎ চাহিদা অনুযায়ী পাওয়াও তো যেতে পারে বই।

পথের উপর উবু হয়ে বসে সলিল আর ভিক্টরদা মলাট উল্টে উল্টে বই খুঁজছেন। হঠাৎ ভিক্টরদা বলে উঠলেন, নিয়ে নাও এইটে।

—কি বই ওটা? সলিল জিজ্ঞাসা করল।

—থ্রি পোয়েট্‌স্।

হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে উপুড় হয়ে দাঁড়াল বরেন, দেখল, শেলী বায়রন কীট্‌স্— তিন কবির জীবনী ও তাদের কয়েকটি কবিতার সংকলন।

তিন মূর্তি ঐ একটি বইয়ের উপর ঝুঁকেছে, সুতরাং চট করে বইটার দাম বেড়ে গেল। চড়া দাম হেঁকে বসল দোকানী, অনেক দর-কষাকষি সত্ত্বেও দাম কমাতে চাইল না।

উঠে দাঁড়িয়ে ভিক্টরদা বললেন, চলো। অত দাম দিয়ে নেবার দরকার নেই। তোমরা কবি, তাই তোমাদের জন্যে নেবার ইচ্ছে ছিল।

বরেন এবার একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলল, আর দেরি করলে হবে না। ক'টা বাজে খেয়াল আছে?

সত্যি, খেয়াল ছিল না। অকাজের মানুষ হলে কি হবে, অকাজও তো একটা কাজ। তাই তারা হাঁটা দিল আবার।

ভিক্টরদা বললেন, তোমরা কবি, তোমরা কাগজ চালাচ্ছ। তোমাদের জন্যে নেবার ইচ্ছে ছিল। যাই হোক, চলো।

ওরা সোজা হেঁটে চলল। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ঘাঁটির উদ্দেশে।

বড় রাস্তার উপরে ক্ষুদ্র দোতলা বাড়ি। উপরের রেলিঙের সঙ্গে ঝোলানো সাইনবোর্ড, বড়-বড় হরফে লেখা—

বসেন'স কলেজ অব কমার্স

শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং, বুক-কীপিং, অ্যাকাউণ্টেন্সি

সাকসেস গ্যারাণ্টিড

বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে দুই বন্ধু বি. কম. পাস করে এবং ইউনিভার্সিটি থেকে কমার্সে এম. এ. পাস করে নিজেদের সাকসেসের জন্যে বিস্তর চেষ্টা করে কোনো সুবিধা করতে না পেরে খুলেছে এই কোচিং কলেজ। তাদের নিজেদের কোনো সাকসেস হল না ব'লে তারা কারো সাকসেসের সহায় হতে পারবে না কেন। সুতরাং তারা সাইনবোর্ডে বড়-বড় হরফে সাফল্যের গ্যারান্টি ঘোষণা করে এই কলেজ খুলেছে।

নীচে রাস্তার উপরের দুটি ঘরে মনোহারি ও জুতোর দোকান, ভিতরে দুটি বড়-বড় অন্ধকার ঘরে জিতেন রক্ষিতের ছাপাখানা। দোতলায় তিনটি কামরা, দুটিতে এদের কমার্স-কলেজ, অন্যটা বিধবাবিবাহ-সহায়ক-সমিতির আপিস। কমার্স-কলেজের একটি ঘর ছাপাখানার ও কলেজের কম্‌বাইন্‌ড্‌ আপিস-ঘর, অন্যটা ক্লাস-রুম। ক্লাস-রুমে তিনটি জোড়া-বেঞ্চি, একটির উপরে একটা টাইপরাইটিং মেশিন রাখা, অন্য দুটোয় ব'সে অন্যান্য সাবজেক্টের ছাত্রেরা ক্লাস করে।

ভিক্টরদা বললেন, বীজ থেকেই অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকেই বৃক্ষ। সুতরাং ভয় কি। তোমাদের এই কলেজ একদিন একটা ইউনিভার্সিটি হয়ে যেতে পারে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বরেন তাড়া দিচ্ছিল। বুক-কীপিংএর ছাত্র-দুজনের ক্লাস নেবার সময় হয়ে গিয়েছে। ওরা এসে দেখল, ছাত্ররা এসে গেছে, বরেন তাই সোজা ঐ ঘরে চলে গেছে।

আপিস-ঘরে লম্বা বেঞ্চে বসে প্রুফ দেখতে-দেখতে সলিল বলল, সেই আশাতেই আছি ভিক্টরদা। আশা না থাকলে তো বাঁচা যেত না।

জিতেন রক্ষিত এদের কেউ না, কিন্তু তবু এদেরই একজন। ছাপাখানা চালায়, কিন্তু নিজেকে চালায় না বিন্দুবিসর্গ— হাঁটু-দুটো বুকের মধ্যে নিয়ে ধীরে-ধীরে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে আর হাসে।

এদের কথা শুনে জিতেন বলল, সলিলবাবু, বিজ্ঞাপনের কথা বলছেন তো? আমি এনে দেব দু-পেজ।

বিজ্ঞাপনের কথা এরা বলে নি, এরা বলছিল আশার কথা। সলিল তাই হাসল, জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, বিজ্ঞাপনের কথা তো আমরা বলি নি, কি শুনতে কি শুনলেন?

বুকের কাছ থেকে হাঁটু-দুটো সরিয়ে টান হয়ে বসে জিতেন বলল, ঠিকই

শুনেছি। আশা না থাকলে যেমন জীবন বাঁচে না, বিজ্ঞাপন না থাকলেও তেমনি পত্রিকা বাঁচে না।

একটু থেমে হেসে বলল, আমাদের কাছে আমাদের জীবন আর এই পত্রিকা সমান।

অট্টহাস্য করে উঠলেন ভিক্টর চক্রবর্তী। টেবিল চাপড়ে বললেন, চাই, ঠিক এমনি প্রকাশকই আমরা চাই, জিতেন রক্ষিত।

মাথা নীচু করে প্রুফ দেখছিল সলিল, মাথা তুলে ভিক্টরের দিকে চেয়ে বলল, আস্তে। বরেন ক্লাস নিচ্ছে ও-ঘরে।

মোট ছাত্রের সংখ্যা কখনও পনেরো হয়, কখনো কুড়ি। ওদের কাছ থেকে টিউশন-ফি যা পাওয়া যায় তাতে এখানকার ঘরভাড়া উঠে যাচ্ছে, এটাই অনেকটা আশ্বাসের কথা। সলিলও প্রাইভেট টিউশনি করে, বরেনও; তাতে হয়তো ওরা নিজেদের ছোট-ছোট প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়। জিতেন রক্ষিত এখানেই থাকে, এই আপিস-ঘরে; তার চাহিদাও বড় না, ঐ ছোট ছাপাখানা দিয়ে কোনো গতিকে চলে যাচ্ছে, এতেই ও খুশি।

আর ভিক্টর চক্রবর্তী? তার অবস্থা এদের মধ্যে সবার চেয়ে ভালো— বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে তাঁর নিজের বাড়ি—নীচে চীনা-জুতোওয়ালার দোকান, উপরে একটা ঘর, একটা বড় ছাদ—থাকার জন্যে ঐ ঘর, আর খানা খাওয়ার জন্যে ঐ দোকানের ভাড়া, আর হাওয়া খাওয়ার জন্যে ওই ছাদ। বাড়িটা ক্লাইভের আমলের বটে, কিন্তু এখনো টিকে আছে, এবং আশা করা যায় ভিক্টরদা যতদিন টিকে থাকবেন ততদিন আয়ু ওর থাকবে। উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি পেয়েছেন বটে এই বাড়ি, কিন্তু তাঁর বংশের কে যে পুরনো কলকাতার এই কসাইটোলায় বাড়িটা তৈরি করেছিল তা জানার তাঁর বড় কৌতূহল। সে-আমলে এই এলাকাটা ছিল শহরের সাহেবপল্লীর আওতায়, তাঁর সেই অখ্যাত পূর্বপুরুষটি নিশ্চয়ই ছিলেন সে-আমলের মস্ত সাহেবান। নইলে সুতানটী ছেড়ে তিনি এইখানে এলেন কি ক'রে? কে জানে, খোঁজ করলে হয়তো জানা যাবে— চিৎপুরের ফিরিঙ্গি কমল বসুর একজন পরমসুহৃদ ছিলেন তিনি। কিন্তু খোঁজ আর করে কে।

খোঁজ না করলেও ভিক্টরের মাঝেমাঝেই সন্দেহ হয় নিজেকে নিয়ে— তার পূর্বপুরুষ সত্যিই কোনো ফিরিঙ্গি ছিল কিনা। কমল বসুর মত ফিরিঙ্গি না, সত্যিকারের ফিরিঙ্গি। কমল বসু তো, যতদূর ভিক্টর জানে, নির্ভেজাল

দেশী মানুষ, পোর্তুগিজ সদাগরদের দপ্তরে কাজ করার আর তাদের সঙ্গে খানাপিনা মেলামেশা করার দরুন ফিরিঙ্গি আখ্যা পেয়ে যায়।

নিজের সম্বন্ধে ভিক্টরের সন্দেহ হওয়ার কারণ হচ্ছে তার নিজের নামটা। তার বাবার নাম ভবভূতি চক্রবর্তী, ঠাকুরদার নাম দ্বৈপায়ন, কিন্তু তার নাম ভিক্টর হল কি করে? প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের সময় ভিক্টরের জন্ম; তার বাবা ভবভূতি চক্রবর্তী ইংরেজদের একজন বড় মোসায়েব ছিলেন; যুদ্ধের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলে এক নৌযুদ্ধে ইংরেজদের বড়রকমের জয়ের খবর যেদিন এল সেইদিন ভবভূতির ঘরে ভূমিষ্ঠ হল এই সন্তানটি। তাই এর নাম রাখা হল ভিক্টর।

তা হল বটে, কিন্তু হেরিডিটি ব'লে একটা কথা আছে না? রক্তে-রক্তে চলে আসে একটা ধারা—চোখা নাক, কটা চোখ, জোড়া ভুরু, সাদা চামড়া। হয়তো এসব মাঝখানে এলোমেলো হয়ে যায় কয়েকটা জেনারেশনে, আবার হঠাৎ সেগুলি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় হয়তো কোনো এক বংশধরের শরীরে। কিন্তু সেটা শরীরের কথা, মনের কথা নয়। মাঝখানে দ্বৈপায়ন আর ভবভূতি পর্যন্ত হারিয়ে গিয়ে থাকবে সেই মন, কিন্তু আবার সেই মন এসে দেখা দিতে পাবে ভবভূতিরই মধ্যে, তার কিয়দংশের প্রমাণ তিনি দিয়েছেন ইংরেজ-ভক্তিতে এবং কিছুটা হয়তো তাঁর এই পুত্রের নামকরণে।

তার পিতামহের ওপার পর্যন্ত ভিক্টরের অনুসন্ধানের উৎসাহ যায় নি; তবু তার সন্দেহ, সে নিজে বুঝি খাঁটি দেশী মানুষ না। শুধু নিজের নামই না, নিজের স্বভাবও মাঝেমাঝে যাচাই করে দেখে ভিক্টর। বাল্যকাল থেকে এই চীনাপটীতে বাস করার জন্যেই কি না কে জানে, ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আর চীনাদের সঙ্গে মিশতেই যেন তার বেশি আগ্রহ।

নিজেকে নিয়ে সন্দেহ করতে পারে ভিক্টর, সে শুধুমাত্র বর্তমান কলকাতারই অধিবাসী। কিন্তু আমরা যখন পুরাতন ও নূতন উভয় কলকাতার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি, আমাদের তাই ভিক্টরকে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বরেনের ক্লাস ওভার হয়ে গিয়েছে। টাইপরাইটিঙের ছাত্র এসেছে, সে প্র্যাকটিস করছে খটখট শব্দে। তাকে লেসন্ দিয়ে এসেছে সলিল, একটা লম্বা সেনটেন্স, যাতে এ থেকে জেড অবধি সব-ক'টা অক্ষরের ব্যবহার আছে—দি কুইক ব্রাউন ফক্স্ জাম্প্ড্ রাইট ওভার দি লেজি ডগ। খটখট শব্দে সেই সেনটেন্সটি বার-বার টাইপ করে হাত রপ্ত করে নিচ্ছে ছাত্রটি।

ভীষণ কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন বরেন বসু, একটা গ্লাস নেওয়া যা-তা কথা নয়। সে এসে সলিলের পাশে বসল, নিশ্বাস ফেলে বলল, কতদূর হে তোমার এ সংখ্যা জার্ম্?

—ইংরেজি কবিতা-পত্রিকা এটা নয়। সুতরাং বাংলা নামই উচ্চারণ করতে পার অনায়াসে। তুমিও কি ফিরিঙ্গি হয়ে যাচ্ছ নাকি বরেন?

বেঞ্চে বসে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে হাঁটুর উপর প্রুফশিট নিয়ে দেখতে-দেখতে মন্তব্য করল সলিল সেন।

ভিক্টর চক্রবর্তী নড়ে বসল, বলল, কি বললে? কার কথা বলছ, সলিল। ফিরিঙ্গি আবার পেলে কা'কে?

অন্যমনস্ক ছিল বুঝি ভিক্টর, সলিল হেসে বলল, কি ভাবছিলেন ভিক্টরদা? নতুন কোনো ছবির কথা বুঝি?

ভিক্টর হেসে বলল, না, নতুন ছবির কথা না— নতুন কবির কথা। তোমরা দুটি আছ, আর-একজন হলেই তিনজন হয়ে যাবে। একটা বই লিখব আমি, নাম দেব— থ্রি পোয়েট্স্।

জিতেন রক্ষিত উঠে রেলিঙের গায়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এই কথা শুনে সে বুঝি উৎসাহিত হয়ে উঠল, চট করে ভিতরে এসে বলল, আর আমি পাবলিশ করব এখান থেকে, আমার এই ছাপাখানায় ছাপা হবে সে বই।

কম্পোজিটর নিরঞ্জন ভট্টাচার্য মোটা কাঁচের চশমা চোখে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে প্রুফ। হাত বাড়িয়ে সলিল প্রুফটা নিল।

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য জিতেন রক্ষিতকে বলল, এক ছটাক আন্দ লাগবে। নইলে কবিতা কম্পোজ হচ্ছে না।

দেয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে সোজা হয়ে বসে নিরঞ্জন-কম্পোজিটরের মুখের দিকে চেয়ে সলিল বলল, আন্দ নিয়ে দরকার কি এখন।

জিতেন বিব্রত হয়ে উঠেছে, বলল, এখন কেনাকাটির কথা তুলবেন না, নিরঞ্জনবাবু। চালিয়ে নিন।

সমস্যাটা কি, দেখার জন্যে সলিল ব্যস্ত হল। নিরঞ্জন দেখাল, টাইপ না থাকায় এই লাইনটা কম্পোজ আটক আছে।

সলিল প'ড়ে দেখে বলল, ঠিক আছে। শব্দ না করে আওয়াজ করে করে দিন। তাহলে হবে তো, তাতে আপনার আন্দ নিশ্চয় আর দরকার হবে না?

মোটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে লাইনটার উপর চোখ বুলাতে-বুলাতে নিরঞ্জন বলল, দুই অক্ষরের জায়গায় চার অক্ষর হয়ে গেল, তাতে কবিতা ঠিক থাকবে কি করে, ছন্দ যে নষ্ট হয়ে যাবে!

—যাক্। যাদের আব্দ নেই, তাদের জব্দ হওয়াই উচিত।

জিতেন রক্ষিত বিড়ি ধরাতে-ধরাতে বলল, তাদের শব্দ না করাই দরকার।

সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে।

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য কপিটা নিয়ে চিন্তা করতে-করতে নেমে গেল নীচে। তার মন বুঝি ওঠে নি।

ভিক্টরদা জিজ্ঞাসা করলেন, কি, হল কি?

সলিল বুঝিয়ে বলল, একটা লাইন ছিল—

হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে সম্বিৎ ফিরে পাই

এখন শব্দটা বাতিল করায় সেই লাইনটা দাঁড়াল—

হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পাই

কোনো গতিকে ছন্দটা বাঁচানো গেল। আর, ছন্দের চেয়েও যা বড় কথা—

সকলে আবার হেসে উঠল একসঙ্গে, বলে উঠল, পয়সা। জিতেন বক্ষিতের পয়সা বেঁচে গেল। আনতে হল না এক ছটাক আব্দ।

জিতেন রক্ষিত নির্বিকার। তার পয়সা বাঁচলেই-বা কি, খরচ হলেই-বা কি। তার নিজের আর লাভ-ক্ষতি কি এতে? শূন্যটা যদি বেঁচে যায় তাহলেও থাকে শূন্য, শূন্যটা যদি খরচ হয়ে যায় তাহলেও—

জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে সলিল বিনিয়ে-বিনিয়ে আর বানিয়ে-বানিয়ে বলল—

পকেট গড়ের মাঠ, জানি বন্ধু, জানি, সব জানি,
সাহারায় পিপাসার্ত তাই ব'লে হবে নাকি প্রাণী?

ভিক্টরদা বলে উঠলেন, হবে হবে।

কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, তোমার হবে হে সলিল, কবিতা হবে। আলবৎ চলবে তোমাদের এই পত্রিকা— এই বীজাণু।

বীজাণুর পরিচয়-স্বরূপ সূচীপত্রের উপরে লেখা—

কবিতা এক-রকমের ব্যাধি, বীজাণু তার অগ্রদূত।

মাসে এক বার করে বের হয় এই কবিতাপত্রিকা। যুগ্মসম্পাদক সলিল

সেন আর বরেন বসু, এবং প্রকাশক জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত। প্রচ্ছদের ছবি এঁকে দিয়েছেন শিল্পী ভিক্টর চক্রবর্তী।

ভিক্টরদার উৎসাহে, জিতেন রক্ষিতের অধ্যবসায়ে, এবং সলিল-বরেনের সম্পাদকতায় বীজাণু নিয়মিত আবির্ভূত হচ্ছে।

পত্রিকাও চলেছে, কমার্স-কলেজও চলেছে, ছাপাখানাও চলেছে। চলেছে সবই, কিন্তু এ-চলায় তেমন যেন তেজ নেই। তাতে ক্ষতি হয় নি কারো। তাদের উৎসাহে যে তেজ আছে, এই তাদের কাছে যথেষ্ট। সেই উৎসাহ সম্বল করে এরা প্রত্যহ মিলিত হয় এখানে।

ছাপাখানার কাজ জোগাড় করতে বের হয় জিতেন। ছোট-ছোট কাজ —যাকে বলে জবওআর্ক— জোগাড করে আনে হয়তো কিছু। সেইসঙ্গে সেই-সেই কোম্পানির কাছ থেকে বীজাণুর জন্যে ছোট-ছোট বিজ্ঞাপন। এসব পার্টির কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় হবে কি না, সেসব ব্যাপার নিয়ে ওদেব চিন্তা নেই, তাদের পত্রিকার জন্যে বিজ্ঞাপন যে পাওয়া গিয়েছে এতেই তাদের আনন্দ।

কয়েকদিন ভিক্টর চক্রবর্তীর দেখা নেই। এর কারণ অছে। সেরাইকেলা থেকে ছউনাচের দল আসছে, তাদেব জন্যে পোস্টার আঁকায় ভিক্টর এখন ব্যস্ত।

ভিক্টরদা আসছেন না, তাঁর সঙ্গ না পাওয়ায় এদের উৎসাহ একটু ঝিমিয়ে আসছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আগাম আনন্দও আছে। এবার দেখা যাবে নতুন এই নাচ। বেঁচে থাকুন ভিক্টরদা, নাচ দেখার কোনো অসুবিধে হবে না তাদের। দেশবিদেশ থেকে ছোট-বড-মাঝারি যত নাচই আসুক, সব দেখার সৌভাগ্য তাদের ঘটেছে, এবং, আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও ঘটবে।

পোস্টার আঁকতে কি এত সময় লাগে? দশ-বারো দিনের বেশি যেন কেটে গেল! শো'ও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তবুও তিনি আসছেন না দেখে সলিল আর বরেন সেদিন ধর্মতলায় নাচঘর আপিসে গিয়ে হাজির হল। গিয়ে দেখে, ঘরভর্তি এক পাল মেয়ে-পুরুষের ভিড—একটা টেবিলের ওপারে চেয়ারে পা তুলে ধ্বংসস্তূপের মত বসে আছে ভিক্টর চক্রবর্তী।

এদের দেখেই উঠে বসার চেষ্টা করতে-করতে ভিক্টর বলল, ব্যাপার কি? এস এস। এতদিনের মধ্যে একবার আসতে পার নি? কি খবর বলো।

খবর ওরা দিতে আসে নি, নিতে এসেছে। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কথা

বলাই অসুবিধে। ওরা তাকাতে লাগল চারদিকে। কী যে বলবে কিছু বুঝতে পারল না।

বসার আর কোনো জায়গা নেই, টেবিল দেখিয়ে দিয়ে ওদের ওর উপরে বসতে বলে ভিক্টরদা বললেন, আর ভালো লাগে না পোস্টার আঁকতে। ঐ দেখ, ঐটে এঁকেছি।

ওরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা মস্ত ছবি—কোলে একটি শিশু নিয়ে একটি মেয়ে বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে।

ভিক্টর বলল, পরশু রাত প্রায় বারোটার সময় ওকে ধরে নিয়ে এসে বসাই এখানে, এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে এঁকে নিলাম ছবিটা। একটা টাকা দিয়ে দিলাম হাতে, খুশি হয়ে চলে গেল।

—ও কে ভিক্টরদা ?

—একটা ভিখিরি মেয়ে। নতুন বাচ্চা হয়েছে, ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে বসে কাঁপছিল শীতে। ঐ পথে যেতে-যেতে হঠাৎ চোখ পড়ল, আর অমনি ধরে নিয়ে এলাম।

সলিল বলল, শীতের রাতে আবার ছেড়ে দিলেন ? গেল কোথায় ও ?

—জাহান্নমে।

উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল ভিক্টর চক্রবর্ত্তী, এক দৃষ্টে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চেয়ে বলল, চলো, পালাই এখান থেকে। চলো, দেখি গিয়ে হারামজাদিটা বেঁচে আছে, না, মরে পড়ে আছে রাস্তায়।

একেবারে বদ্ধ পাগলের মত চেহারা হয়েছে ভিক্টরের, চোখ-দুটো উগ্র আর রুক্ষ হয়ে উঠেছে। কী যে বলতে চায়, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ভিক্টব বলল, নাচ নাচ নাচ। কি হবে এই ছউ-নাচে, কি কাজ ছাই নাচ দিয়ে ? দেখ-না, দেখ-না, জাঁক দেখ, জমক দেখ। রাত্রে নাচ দেখবে, টিকিট কিনতে এসেছে, তারই সাজের ঘটা এই।

রুক্ষ উগ্র আর শুকনো ভিক্টর চক্রবর্তীর চোখ-দুটো বুঝি ভিজে উঠেছে একটু, বলল, চলো।

নাচঘরের আপিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ধর্মতলা থেকে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ধরে চলল। ভিক্টরের মুখে একটি কথা নেই। কেবল তাকাচ্ছে চারিদিকে। কিছু খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও— তার চোখে ফুটে উঠেছে সেই ব্যাকুলতা।

ওয়েলেসলি স্ট্রীট, রিপন স্ট্রীট, ম্যাকলিওড স্ট্রীট— কত রাস্তা যে ঘুরল তারা তার সংখ্যা নেই। কিন্তু কেন ঘুরছে তারা এভাবে, তা তারা নিজেও জানে না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে চলেছে। কত অচেনা রাস্তা, কত অচেনা গলি। সলিলদের কাছে অচেনা বটে, কিন্তু সব রাস্তা ভিক্টরের যেন নখদর্পণে।

মল্লিকবাজারের পাশের রাস্তা দিয়ে ওরা লোয়ার সারকুলার রোডে এসে পড়ল। রাস্তা পার হয়ে ওপারে গিয়ে ঢুকল ঐ কবরখানায়।

দু-পাশে অগণ্য সমাধিস্তম্ভ রেখে সরু পথ ধরে চলেছে তারা ধীরে-ধীরে, সেইসব সমাধির উপর কত আক্ষেপ আর কত কান্না সিসার অক্ষরে স্তব্ধ হয়ে আছে।

অনেক ঘুরে-ফিরে ভিক্টর সম্মুখে তাকিয়ে বলল—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে!

ওরা সম্মুখে চেয়ে পড়ল সিসার অক্ষরের ওই অনুরোধ—

তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ-সমাধিস্থলে

ঘাসের উপর বসে ভিক্টর বলল, বোসো, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ভিক্টর বলল, ওই ভিখারি মেয়েটার কথা কেবলই ঘুরছে আমার মাথায়। কোথায় গেল সে, কি হল তার।

—কি আর হবে। ভিখারিদের কিছু হয় না, ভিক্টরদা। নিশ্চয় ও আছে কোথাও।

সলিলের কথা শুনে ভিক্টর বলল, ঐখানেই আমার আপত্তি। সে থাক্‌, এটা চাই নে সলিল। ও থাকলে ওর অনেক দুর্ভোগ আছে। তোমরা তাকে দেখ নি, সে-মুখ আর সে-চোখ, আশ্চর্য—

ভিক্টর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, বলল, বাজে কাজ ছেড়ে দিলাম। আর ওসব পোস্টার-আঁকা নয়। এবার আঁকব ছবি।

বরেন বলল, ঐ ছবিটায় মেয়েটার চোখে মমতা এমন ফুটিয়েছেন ভিক্টরদা, চমৎকার হয়েছে।

—তোমার সুখ্যাতি শুনে খুশি হলাম। কিন্তু তাকে যদি তোমরা দেখতে তবে ও-ছবির সুখ্যাতি করতে না। মেয়েটার চোখের মমতার কথাই মনে হচ্ছে। তার কোলের বাচ্চাটার কথা তাই মনে পড়ছে বার-বার। নিশ্চয় বেঁচে যাবে, কি বলো?

সলিল বলল, নিশ্চয়। বললাম যে, ভিখারিদের কিছু হয় না।

আর কোনো কথা বলল না ভিক্টর চক্রবর্তী।

কিন্তু হঠাৎ এখানে কেন এল, সে কথা বুঝতে পারল না সলিল আর বরেন। জিজ্ঞাসা করতেও পারছে না। এখানে এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকাও তো যাবে না। এখান থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট কম দূর না, তাদের কমার্স-কলেজ আছে, তাদের বীজাণু আছে।

ভিক্টরদা বললেন, চলো। এবার যাব। মধুসূদনের বাড়ির স্কেচ এঁকে রাখতে অনুরোধ করেছিলে আমাকে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কথা। এখানে এলাম তাই শপথ করতে। বাজে কাজ আর নয়, কাজের কাজ শুধু করতে হবে। তোমরাও শপথ করো।

ভিক্টরদার পাগলামোর সঙ্গে পরিচয় তাদের আছে, কিন্তু আজকের এই পাগলামোটা নিছক পাগলামো বলে মনে হল না। মনে হল, তিনি যেন সত্যিই কিছু-একটা প্রতিজ্ঞা করে বসলেন আজ।

এর পরেও অনেকদিন ভিক্টরদা বীজাণু-আপিসে বা কমার্স-কলেজে পদার্পণ করেন নি। হঠাৎ তাঁর এমন কী হল বুঝি বুঝতেই পারছে না সলিল বরেন জিতেন। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে তাঁর খোঁজ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ওখানে গিযে পাগোলকে ঘাঁটানো ঠিক হবে কি না তারা যেন বুঝতে পারে না।

জিতেন রক্ষিত লেখাপড়ার ধার ধারে না, কবিতাও বোঝে না, ছবিও না। কিন্তু অদ্ভুত তার গরজ। এদের পত্রিকার জন্যে তার যেমন ব্যস্ততা, ভিক্টরদার ছবির জন্যেও তার তেমনি কৌতূহল। বলল, নিশ্চয় ছবি-টবি আঁকছেন, এখন গিয়ে ওঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। যা শুনলাম, মনে হচ্ছে, প্রেমেই পড়েছেন যেন।

জিতেনের এটা রসিকতা। কিন্তু হঠাৎ কথাটা শুনেই বরেন যেন সায় দেবার জন্যে তৈরি হল, তারও মনে হল, কথাটা ঠিক, বলল, জানলে সলিল, আমার বউদিকে হোল্ স্টোরিটা বলেছি, বৌদিরও ঐ মত, বললেন, এ কিছু না —প্রেম।

কিন্তু ভিক্টরদা প্রেমে পড়বেন, এ তো ভাবা যায় না, এবং কি না এক ভিখারিণীর প্রেমে?

সলিল চিন্তা করছিল, বলল, কিছুই অসম্ভব নয়। ভিক্টরদা তো সামান্য

কথা? রাজারাজড়ারাও ভিখারিণীর প্রেমে পাগোল হয়েছেন, পড় নি ব্রাউনিঙের কবিতা?—সিংহাসন থেকে নেমে এলেন রাজা ক্যাফেটুয়ে **to meet her greet her on her way?**

সলিল আবার বলল, এ ভীষণ রোগ, বরেন। যাকে-তাকে ধরতে পারে যখন-তখন। আর, একবার ধরলে নিস্তার নেই। এ অনেকটা যক্ষ্মা রোগের মতই, এ হচ্ছে মনের থাইসিস। আমার তো তাই মনে হয়—

যক্ষ্মা বলো প্রেম বলো, এরা
একই রোগ, যে নামেই ডাকো।

নেক্‌স্‌ট ইশু বীজাণুতে ছাপব ভাবছি এই কবিতা—

এ রোগ কঠিন কতখানি
ভুক্তভোগী-মাত্র শুধু জানে,
ব্যক্ত তার যদিও কিঞ্চিৎ
বাংলা আর ইংরেজি বানানে।

সলিলের এই নতুন কবিতা শুনে হাসতে লাগল সকলে একসঙ্গে। সে যে প্রেমকে যক্ষ্মা বানিয়ে ছাড়ল, এই কথা ভেবেই তাদের হাসি। বীজাণুতে সে যে তারই বীজাণু ছাড়বে বলে প্রস্তাব করছে, এতেই যেন তাদের সে কি আতঙ্ক।

কিন্তু ভিক্টর চক্রবর্তী কি চিরদিনের মতই গা-ঢাকা দিল নাকি? শেলীর সেই **like a child from the womb, like a ghost from the tomb** হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলেই তারা যেন খুশি হয়।

ও ঘরে খটখট শব্দে টাইপ-মেশিন চলেছে, নীচে নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ছাপাখানার জব-ওআর্ক সেরে তার প্রুফ উপরে পাঠিয়ে দিয়ে বীজাণুর কপি নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, হয়তো খুঁজে দেখছে সব রকম টাইপ আছে কি না। সেদিন শব্দের জায়গায় আওয়াজ বসানোর পর থেকে তার মাথার মধ্যে কেবলই অস্বস্তি পাক খাচ্ছে— টাইপের অভাবে কবিতার ছত্র বদল হয়ে যাবে? এসব ঠিক না।

উপরের ঘরে সলিল বরেন ও জিতেন আলোচনা করছে তাদের ভাগ্য নিয়ে আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টে আর্মেচার-ওআইন্‌ডিং, ম্যাগনেটো-রিপেয়ারিং, ড্রাই-সেল-তৈরি, আর ইলেকট্রিক-ওয়্যারিং শিখে এখানে এসে অবশেষে সলিল সেন ও-ঘরে শর্টহ্যাণ্ডের নোট দিচ্ছে—

পা, যে উই অল গো টু ; বুক কীপিংএর ডেবিট-ক্রেডিট করাচ্ছে ; আর এ-ঘরে বসে প্রুফ দেখছে কবিতা-পত্রিকারি। তার সঙ্গে ভাগ্যের এ কী ফলিত্ত চ্যাংড়ামো ?

হঠাৎ গলার স্বর পাওয়া গেল ভিক্টরদার, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে তিনি ডাকছেন— কই হে শেলী, শেলী আছ নাকি ? কোথায় হে বায়রন ?

ভিক্টরের গলা শোনা মাত্র ওরা খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু ও কী নাম, কী নাম ধরে ডাকছেন তিনি ?

সলিল আর বরেন তাড়াতাড়ি উঠে এল, সঙ্গে জিতেন রক্ষিতও। এই গলার স্বর শুনে ও ঘরে টাইপ-মেশিনের শব্দও থেমে গেল।

ভিক্টরদার মুখের দিকে তারা তাকাতে লাগল কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে। প্রেমে পড়লে চেহারা নাকি খারাপ হয়ে যায়, ভিক্টরদার চেহারা খারাপ হয়েছে কি না তারা লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ও-শরীরের খারাপ-ভালো ধরা শক্ত, ও-শরীরে সার তো নেই মোটে, হাড়মাত্র সার। তা হতে পারে, কিন্তু নীরস-তরুবরে আর শুষ্ক-কাষ্ঠে তফাত হয়তো একটু আছে। সেই পার্থক্যটুকু ধরার জন্যেই বুঝি তাদের চেষ্টা।

ভিক্টর চক্রবর্তী সোজা চলে এল ঘরে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নতুন-একটা ছোকরাকে, পরনে তার ময়লা প্যাণ্ট, হাফ-হাতা শার্ট ; গায়ের রং কটা।

কে এ ? ওরা ধরতে পারছে না। ছেলেটার চোখের মণি-দুটো সবুজ-সবুজ, আর ঐ চোখে সবুজ স্বপ্নও একটু যেন ধরেছে বলে মনে হয়, একটু উদাস-উদাস একটু এলোমেলো ভাব। চোখ-মুখ বড়ই বিষণ্ণ। সলিলদের বয়সীই হবে, দু-এক বছরের ছোটও হতে পারে। ঘরে ঢুকে ও এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল বিস্ময়ের চোখে, সলিলদের দিকে তাকাল, ভিক্টরদার দিকে তাকাল।

জিতেন রক্ষিত তার বিছানার ছেঁড়া সুজনীটা নতুন কাজে লাগিয়েছে কিছুদিন হল, কেরাসিন-কাঠের টেবিলটা ঢেকেছে সেটা ভাঁজ করে। ভিক্টর সেই টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসেছে, আর ওরা লম্বা বেঞ্চিতে।

ভিক্টর চক্রবর্তী হাসতে-হাসতে বলল, তোমাদের অবস্থা যেন ফিরেছে বলে মনে হয়। টেবিলের গায়ে জামা চড়িয়েছ।

বরেন হেসে উঠল, বলল, অনেক ফিরে গেছে ভিক্টরদা। দোরগোড়া

থেকেই ফিরে চলে গেছে। টেবিলের গায়ে জামা দেখে কেন, আমাদের গায়ের জামা দেখে আমাদের অবস্থা—

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সলিল বলল, এ-অবস্থার কোনো বদল হবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ভিক্টর চক্রবর্তী বলল, বরেন বলছে চৌকাঠ পর্যন্ত এসেছিল, তা যদি এসে থাকে নিশ্চয় একদিন ঢুকে পড়বে এই ঘরে।

হেসে উঠল সকলে এক সঙ্গে। সবুজ চোখের আগন্তুক ঐ ছেলেটিও।

তার দিকে চেয়ে ভিক্টর বলল, কেমন লাগছে জায়গাটা ?

স্মিত হেসে সে বলল, ভালো। ভেরি গুড।

—তোমাব মনের মত ডেরা তো ?

উত্তর দিল না সে এবার, মাথা একটু নীচু করে হাসতে লাগল।

এতক্ষণে ভিক্টর চক্রবর্তীর বুঝি হুঁশ হল, বলল, আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম মাইকেল কুর্টিস। আমার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড, পরিষ্কার বাংলা জানে। আর, যা শুনলে তোমরা বেশি খুশি হবে— কবিতা লিখতেও পারে। সঙ্গে এনেছ তো হে মাইকেল ?

ওরা চমকে তাকাল মাইকেল কুর্টিসের মুখের দিকে।

ভিক্টর চক্রবর্তী বলল, এর নাম সলিল সেন, এ বরেন বসু— এডিটরস্ অব বীজাণু, আর ইনি জিতেন রক্ষিত— পাবলিশর।

করজোড়ে নমস্কার করল ওরা সকলে, প্রতিনমস্কার করল মাইকেল কুর্টিস। এ নাকি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কিন্তু স্বচ্ছন্দ বাংলায় বলল, বড় খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

স্বচ্ছন্দ বাংলায় বলল বটে, কিন্তু বলার ধরণে একটু ফিরিঙ্গি টানও ধরা গেল স্বচ্ছন্দেই।

সলিল জিজ্ঞাসা করল, সত্যি আপনি কবিতা লেখেন বাংলায় ?

মাইকেল কুর্টিস লজ্জিত হাসি হেসে বলল, ঠিক, লিখি বলা হয়ত যায় না, চেষ্টা করি।

—বের করো না হে পকেট থেকে। ভিক্টর ওপাশ থেকে আদেশ করার মত করে বলে উঠল।

আশ্চর্য মানুষ বটে এই ভিক্টর চক্রবর্তী, একটা-না-একটা অদ্ভুত কাজ তার করা চাইই। রাত-দুপুরে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনবে ভিখিরি মেয়েকে,

সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়াবে সারা শহরে, শপথ করার জন্যে হাজির হবে সমাধিস্তম্ভের নীচে, কবিতা লেখার জন্যে জোগাড় করে নিয়ে আসবে কোথা থেকে এক ফিরিঙ্গি ছোকরাকে।

ভিক্টরের কথা শুনে ছেলেটাকে চাপ দিতে লাগল সলিলরাও। ঠিক উৎসাহের বশে হয়তো নয়, কিছুটা কৌতূহলে, কিছুটা ভদ্রতার খাতিরে। ভিক্টরদা এভাবে যখন বলছেন, তখন ওদেরও একটু গরজ দেখানো উচিত অবশ্যই।

ওদের পিড়াপিড়িতে মাইকেল তার বুকপকেট থেকে বের করল ছোট-একটা নোটবই, সলিলের হাতে সেটা দিল। জিতেন রক্ষিত উৎসুক চোখে তাকাতে লাগল সেইদিকে।

ওদিকে ভিক্টর চক্রবর্তী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যেন, ছেলেটার কবিতা পড়ে ওরা কি মন্তব্য করে জানবার জন্যে তাঁর আগ্রহের যেন অন্ত নেই। পা তুলে বসে ছিল, পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল ভিক্টর।

প্রথমেই একটা ইংরেজি কবিতা লেখা—

The day of Death is anti-mild
Like an untrained orphan child,
Or 'tis like a mother's heart
Who has been from sons apart.

পর-পাতায় তার নিজের এই কবিতারই বুঝি বাংলা তরজমা—

হে মৃত্যু, তোমাকে আমি জেনেছি হে, চিনেছি সম্যক,
পিতাহীন মাতাহীন ছন্নছাড়া হতভাগা দুরন্ত বালক
যেমন শৃঙ্খলাহীন উচ্ছৃঙ্খল, অতর্কিত করে আক্রমণ—
হে মৃত্যু, তুমিও সেই বালকের পেলে আচরণ।
কিংবা তুমি সে-মাতার বেদনার্ত হৃদয়ের মত
পুত্রশোকে যার বক্ষে শান্তি নাই, যে-বক্ষ বিক্ষত।

কবিতা-দুটি পড়ে সলিল বরেনের মুখের দিকে তাকাল, বরেন তাকাল ভিক্টরের দিকে। কেউ কোনো কথা বলল না।

ভিক্টর সিগারেট ধরাল। জিতেন রক্ষিত ধরাল বিড়ি। ঐ দুই ধোঁয়ায় এক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হল কমার্স-কলেজের এই আপিস-ঘরে। সেই আবহাওয়ার মধ্যে বসে ওরা নোটবইয়ের পাতা উল্টে-উল্টে পড়ে যেতে লাগল মাইকেল কুর্টিসের কবিতা— কোনোটা মন্দ, কোনোটা মাঝারি, কোনোটা-বা

বেশ পছন্দসই লাগতে লাগল তাদের। কিন্তু তবুও বিস্মিত হতে লাগল তারা, একটা ফিরিঙ্গি ছোকরা এমন ভাবে কবিতা লিখতে শিখল কি করে ?

তারা ভাবছে বটে নানা কথা, কোনো মন্তব্য করছে না, ধীরে-ধীরে পড়ছে তারা টুকরো-টুকরো কবিতা—

এ-বর্তমানের মধ্যে কেন তুমি বেঁধেছ নিবিড়,
বন্ধন মোচন কর, কর মুক্ত ; এ-শীর্ণ শরীর
কোন্ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুদ্‌ব্যোমে বল-না সঞ্চয় ?
সমুদ্রের দিকে নদী, ভবিষ্যৎ-উদ্দেশে সময়
ধায় জানি চিরকাল। সে-নিয়ম লঙ্ঘিত হবে না ?
কে আমি, কেন এ আমি— আপনারে অকৃত্রিম চেনা
হবে না, হবে না ? জানি, মন কারো নাই বিপরীতে—
আমি বিপরীত, তাই এই মন ছুটেছে অতীতে।
হে অতীত, কথা বল, দুটো কথা বল কানে-কানে
তোমার গুঞ্জনে পেয়ে যাব তবে জীবনের মানে।

সলিল তাকাল কুর্টিসের দিকে, বলল, চমৎকার। ভারি ভালো লেগেছে আপনার কবিতা। কবে থেকে লিখছেন ?

এ কথার কোনো জবাব পাওয়ার আগেই ভিক্টর ওদিক থেকে বলে উঠল, কবে থেকে লিখছে তা দিয়ে দরকার কি, মনে কর-না লিখছে জন্মের আগে থেকেই। ভালো লেগেছে কি না বল, পছন্দ হয়েছে কি না তোমাদের ?

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সলিল, বরেনও প্রশংসায় হয়ে উঠল পঞ্চমুখ। তাদের প্রশস্তি শুনে খুশি হল ভিক্টর চক্রবর্তী, বলল, তবে বোঝো। কেবল ছবিই আঁকি না, কবিতাও বুঝি। কি বল ?

ওরা হাসতে লাগল। জিতেন বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল ঐ নতুন কবির মুখের দিকে। কিন্তু নতুন কবিটি কারো দিকে তাকাচ্ছে না।

সলিলের মাথার মধ্যে গুঞ্জন করছে ঐ কবিতার ছত্র— অতীতকে ডেকে-ডেকে কুর্টিস পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে নিজের, তার জীবনের মানে জানার জন্যে অনুনয় করছে। পঞ্চভূতে-গড়া তার এই শরীর সে পেল কোথা থেকে, এই তার কাছে এক পরমজিজ্ঞাসা। চিরাচরিত গতির বদলে সময়কে ধেয়ে চলতে বলছে বিপরীত দিকে— অতীতের দিকে।

সলিলকে সকলে ক্ষমতাবান কবি বলে, কিন্তু এই কবিতাটি বীজাণুতে

ছাপা হলে সলিলের সে গৌরব নিশ্চয় তার কাছ থেকে কেড়েই নেবে এই নতুন কবিটি।

সলিল বলল, পরের সংখ্যায় এই কবিতাটি ছাপতে চাই ভিক্টরদা। কি বলো বরেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অভিমত জানিয়ে উঠলেন ভিক্টরদা, বললেন, এ তো আনন্দের কথা হে। তোমাদের দুই কবির দলে ভর্তি করে দিলাম এই নতুন কবিকে। তোমরা হলে থ্রি পোয়েট্‌স্‌। তুমি শেলী, তুমি বায়রন, আর এ হল কীট্‌স্‌। কেমন, ভালো নামকরণ করি নি?

সলিল আর বরেন বুঝি পুলকিত হয়ে উঠল, কুর্টিসের মুখের দিকে তাকাল তারা। এবার তারা বুঝতে পারল, কেন ভিক্টরদা সিঁড়ি থেকে তাদের ডাকছিলেন নতুন নাম ধরে। একে নিয়ে আসার সময়ই তাঁর তা হলে মতলব ছিল এদের সকলকে নতুন নামে চিহ্নিত করে দেবার।

সলিল আর বরেন বলল, গ্র্যাণ্ড। আমরা রাজি আছি ভিক্টরদা, আপনার দেওয়া এই নতুন নাম মাথা পেতে নিলাম আমরা।

ভিক্টরদা বললেন, খুশি হলাম। ঐ সঙ্গে বুক পেতে নাও তোমাদের এই নতুন বন্ধুকেও।

সেদিন কমার্স-কলেজের সব রুটিন ওলট-পালট হয়ে গেল। যা তারা চেয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই এসেছেন ভিক্টরদা—like a child from the womb, like a ghost from the tomb, একেবারে অতর্কিত ভাবে। সেই সঙ্গে আরো বিস্মিত করেছেন একজন নতুন অতিথিকে এনে। কে এ, কেন এ, কোথা থেকে এ এল— এ প্রশ্ন জেগেছে তাদের মনে; কোথা থেকে জোগাড় করলেন একে ভিক্টরদা, কি করে যোগাযোগ হল এর সঙ্গে— এসব প্রশ্ন তাদের মনে জেগেছে, কিন্তু সেদিন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা যায় নি। শুধু বিস্ময় নিয়েই কেটে গেছে দিনটা।

জিতেন রক্ষিত কোনো কথা বলে নি, চুপ করে বসে সে এদের কথাগুলি বুঝি গিলছিল, লেখাপড়ার ধার সে না ধারুক, শেলী বায়রন কীট্‌সের নাম সে শুনেছে অনেক বার। গত শতকের নামজাদা এই তিন কবির কথা সে শুনেছে নানা প্রসঙ্গেই। তাই এদের এই নতুন নামকরণে সে নিজেকে গর্বিতই বোধ করতে লাগল। তার বুঝি মনে হতে লাগল সেও ঐ নামজাদাদের মধ্যে একজন হয়ে যাবে— ঐ কবিদের বন্ধুদের একজন।

বীজাণুতে যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে ফিরিঙ্গি-কবির ঐ কবিতাটি। পত্রিকা ছাপা হয় আড়াই শ, তার মধ্যে শ-খানেক কপি যায় বিতরণে, থান-পঞ্চাশ থাকে পড়ে, আর বাকিটা হয় বিক্রি। সুতরাং পাঠকসংখ্যা এর বেশি না। কিন্তু সংখ্যা যা-ই হোক, কবিতা যারা পছন্দ করে তারা এ পত্রিকা একটু-আধটু পড়ে।

ফিরিঙ্গি-কবির কবিতাটি পড়ে তাদের অনেকেই তাই কৌতূহলী হল। মাইকেল কুর্টিস নামটা ছদ্মনাম না, আসল নাম— জানতে চেয়ে চিঠিও দিয়েছে কয়েকজন। ছদ্মনাম হলে মিটেই গেল, কিন্তু আসল নাম যদি হয়ে থাকে তবে কে এ?

ঐ এক প্রশ্ন। নিজের সম্বন্ধে যে কৌতূহল জানিয়েছে কুর্টিস, অবিকল সেই কৌতূহল জানিয়েছে পত্রলেখকেরা। —কে এ? কোথায় এর দেশ? কি এর পরিচয়? কোথাকার এ মানুষ?

চিঠিগুলো পড়তে দিল সলিল, কুর্টিস মনোযোগ দিয়ে পড়ে হেসে বলল, মাই মাদারল্যাণ্ড ইজ বেঙ্গল, অ্যাণ্ড ফাদারল্যাণ্ড ইজ ইংল্যাণ্ড।

বলেই সে আবৃত্তি করল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

এই কথা দিকে-দিকে রাষ্ট্র হোক—
আমি তোমাদেরই লোক।

কেমন যেন হেঁয়ালিতে আর রহস্যে পূর্ণ বলে মনে হল কুর্টিসের ঐ কথা এবং এই আবৃত্তি। মাদারল্যাণ্ড আর ফাদারল্যাণ্ড সে দু জায়গায় ভাগ করল, আবার বলছে— আমি তোমাদেরই লোক?

হ্যাঁ। এ দাবি করতে পারে বুঝি কুর্টিস। যে অতীতকে সে অনুনয় জানিয়েছে কানে-কানে কথা ব'লে তার জীবনের মানে ব'লে দেবার জন্যে, সে অনুসন্ধান করেছে সেই অতীত। তন্নতন্ন করে সে খুঁজেছে, খুঁজে-খুঁজে পেয়েছে সেই ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুদ্‌বোমের সন্ধান। ভিক্টরদা নূতন নাম দিয়েছেন তাঁর— কীট্‌স্। ভালো নাম, গর্ব করার মতই নাম। সেই শেলী বায়রন কীট্‌স্ জীবিত ছিল যে-কালে, সেই কালের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করে সে আহরণ করে নিয়ে এসেছে নিজের পরিচয়। তার জীবনের জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে গিয়েছে সে, তাই সে বলে— আমার মাদারল্যাণ্ড বাংলাদেশ, ফাদারল্যাণ্ড বিলেত।

বলে বটে, কিন্তু ব্যাখ্যা সে করে না তার এই উক্তির। সব সময়ই

চিন্তায় মগ্ন থাকে সে। সব সময়েই মনে-মনে চলে তার নিবিড় গবেষণা। অনেক দিন ধরেই সে নিজেকে নিয়ে এই গবেষণা করে চলেছে। কিন্তু ঠিক-মত বুঝতে পারে নি। অতিসম্প্রতি সে বুঝি খোঁজ পেয়েছে নিজের।

এর নামই কি আত্মজিজ্ঞাসা? মানুষ নিজেকে খোঁজ করে কি এই ভাবেই। আজ যে বৃক্ষ শাখা-পল্লবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে তার শিকড় খুঁড়ে তুলে তা চিরে-চিরে বীজের সন্ধান ক'রে লাভ আছে কি না, এ তর্ক কুর্টিসের সঙ্গে করা চলে না। এবং সেও অবশ্যই এ ধরণের তর্ক পছন্দ করবে না।

প্রত্যহ বিকেলের দিকে সে আসে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের এই ঘাঁটিতে। এখানে আসতে ভালো লাগে তার। তার এই বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায় সে। এক রকম পালক-ওয়ালা পাখি একসঙ্গেই ঝাঁক বেঁধে থাকে। সেও তাই এখানে আসে ঝাঁক বাঁধতে।

প্রত্যহ আসতে-আসতে পুরাতন হয়ে গেল সে। আর সে নতুন বন্ধু নয়। এখন সে হয়ে গিয়েছে অনেকটা অনেককালের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

ওরা ওকে কুর্টিস বলে না, নামটা বাংলা করে নিয়েছে, বলে— কীর্তীশ। বলে, বাংলাদেশ যখন তোমার মাদারল্যাণ্ড, নামটাও তখন বাংলা করে নেওয়া গেল।

ভিক্টরদাও আসেন। তিনি এর নতুন নামটি শুনে হাসেন, বলেন, বঙ্গীয় সংস্করণে কীর্তীশ বলতে পার বটে, কিন্তু আমার দেওয়া নাম যেন চাপা পড়ে না যায়। অনেক ভেবে অনেক সন্ধান করে তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছি যে কবিকে তার কীতি বেড়ে উঠুক ধীরে-ধীরে, অধীশ্বর হয়ে উঠুক সে তার কীর্তির, এটা চাইব। কিন্তু আমার দেওয়া নাম বাতিল হোক, এ সহ্য করব না।

জিতেন রক্ষিত ভুলে যায় নি ভিক্টরদার সেই পরিকল্পনা, বই লিখবেন তিনি একটা, জিতেন পাবলিশ করবে সেটা। ছোট হোক তার এ ছাপাখানা, এখান থেকেই সে ছেপে বের করতে পারবে সে বই। বইও নিশ্চয় এমন-কিছু বড় হবে না। কি লেখা হবে সে বইতে তা নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই, সে বিষয় সে চিন্তাও করে না— এমনি একটা বই সে তার ছাপাখানা থেকে ছাপতে পারলেই যেন আনন্দের অন্ত পাবে না।

জিতেন রক্ষিত কথা বলায় তৈরি হয়ে উঠেছে, হাসতে-হাসতে বলল, ভিক্টরদা, আপনাকে আমি একটা পুরস্কার দিতে চাই।

—কি পুরস্কার দেবে বল ?

—ভিক্টোরিয়া ক্রসই দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা বুঝি আর এখন দেওয়া চলে না, আপনাকে দেব একটা বীরচক্র।

ভিক্টর চক্রবর্তী হেসে বলল, হঠাৎ এ ইচ্ছা কেন ?

—আপনার অসাধ্য কিছু নেই, ভিক্টরদা। একদিন হঠাৎ একটা ইচ্ছা জানিয়ে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন, আর-একটা কবি হলেই এরা তিন কবি হয়ে যাবে ; সে-ইচ্ছা পুরণ করলেন আপনি নিজেই। আপনার অসাধ্য কিছু নেই। আপনাকে তাই দিতে চাই বীরচক্র— ভি. সি.।

হেসে উঠলেন ভিক্টর চক্রবর্তী, বলে উঠলেন, নতুন করে দেবার দরকার কি জিতেনবাবু, আমি নিজেই তো ভি. সি.। যারা দুর্জয় সাহসের কাজ করতে পারবে তারাই পাবে আমাকে। ভিক্টোরিয়া ক্রস রূপেই হোক আর বীরচক্র রূপেই হোক তারা তো পাচ্ছে আমাকেই।

একটু থেমে বললেন, এই যেমন তোমরা পেয়েছ। এমনি একটা কমার্স-কলেজ খুলে, এমনি একটা ছাপাখানা চালিয়ে, এমন একটা পত্রিকা যারা বের করতে পারে, তাদের যে কিছুতেই পরোয়া নেই, তাদের সাহসের যে সীমা নেই, জীবনের যে মায়া নেই তাদের— এ কথা কি আমি বুঝি না ? বুঝি। তাই তো আমাকে পেয়ে গেছ তোমরা।

হাসতে লাগলেন ভিক্টর চক্রবর্তী।

তা বটে, দুঃসাহসেরই কাজ করে চলেছে এরা। বাইরে পৃথিবীতে চলেছে কত সংগ্রাম, কত সংঘর্ষ, কত প্রতিযোগিতা ; কিন্তু এরা এই বারো নম্বরে বসে নির্বিকার নিরাসক্ত জীবন কাটিয়ে চলেছে। তাদের এই সাহস দেখেই ভিক্টরদা যেন পাইয়ে দিয়েছেন নিজেকে, ধরা দিয়েছেন এদের কাছে।

ভিক্টরদা আর জিতেন কথা বলছিল। ওরা কেউ ছিল না এতক্ষণ। ঘরটা তাই কেমন নিস্তেজ আর নীরব হয়ে আছে।

সলিল এসেছে। পাশের ঘর থেকে তার গলা পাওয়া যাচ্ছে। দেরি হয়ে যাওয়ায় এ ঘরে ঢুকবার আগেই ঢুকে পড়েছে ক্লাস-রুমে।

একটি না দুটি তো ছাত্র, তার জন্যেই সলিলের কী উঁচু গলা। ও যদি

সত্যিকারের কোনো কলেজের অধ্যাপক হয় তা হলে গলা আরও কত উচুতে চড়াবে, কে জানে।—পি বি টি ডি চে জে কে গে— পিটম্যানের শর্টহ্যাণ্ড শেখাচ্ছে সলিল; দেয়ালে-ঝোলানো ছোট একটা ব্ল্যাক বোর্ডে আউটলাইন এঁকে-এঁকে দেখাচ্ছে।

ভিক্টরদা হেসে বলল, ছোকরাটা শেখাচ্ছে শর্টহ্যাণ্ড, কিন্তু কী লংভয়েস একবার শোনো। যেন কোনো কবিকণ্ঠ নয়, কোনো ক্লাসিক-মিউকের ওস্তাদ গলা ছেড়ে সারেগা না মারেগা চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে।

এখনও চলেছে সলিলের ডেলি-প্যাসেঞ্জারি। একটি মান্থলি টিকিট সম্বল। ওই ভরসায় ভর করে সেই বালিগঞ্জ থেকে এত দূর এই বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে তাদের কমার্স-কলেজে ও বীজাণু-কার্যালয়ে তার আগমন। বেলেঘাটা স্টেশন থেকে টানা পদব্রজে—হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট স্ট্রীট, বেচু চাটার্জি স্ট্রীট, শঙ্কর ঘোষ লেন, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। চেনা রাস্তা। তার কলেজজীবন থেকে এই কবিজীবন পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে যেন এই রাস্তা।

এই রাস্তা ধরে আসতে-আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে তার অনেক, ট্রেনও লেট ছিল। সোনারপুরের কাছে নাকি কি-একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। দেরি হয়ে গিয়েছে ব'লে সে সোজা তার ক্লাস-রুমে চলে গিয়েছে।

সে পড়াচ্ছে ও ঘরে। এ ঘরে জিতেনের সঙ্গে কথা বলছেন ভিক্টরদা, আর পেন্সিল দিয়ে কি যেন আঁকছেন। আঁকছেন আর কথা বলছেন।

জিতেন উঁকি দিয়ে-দিয়ে দেখছে, আর মনে-মনে বুঝি তারিফ করছে এই মানুষটার গুণের এমন বাউণ্ডুলে, এমন পাগোল, এমন ছন্নছাড়া— কিন্তু হাতটা তো ভারি অদ্ভুত। পেন্সিলের ম্যাজিক দেখাচ্ছেন বলে মনে হয় জিতেনের।

সলিল এ ঘরে এসেছে। তার ক্লাস নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এসেই সে বলে উঠল, কি খবর, ভিক্টরদা।

—খবর চমৎকার। এখানে বসে লেকচার শুনছিলাম তোমার। আমরাও শিখে গেলাম শর্টহ্যাণ্ড। কি বল জিতেনবাবু? শুধু শর্টহ্যাণ্ড না, টাইপ-রাইটিংও, এর পয়লা লেসন্ তো মুখস্থ হয়ে গেল— এ এস ডি এফ জি, সেমিকোলন এল কে জে এইচ।

—ওসব রাখুন ভিক্টরদা, অন্য কথা বলুন। আমাদের নতুন মলাটের কতদূর কি করলেন বলুন।

ভিক্টরদা হাসতে লাগলেন, বললেন, এই-যে খসড়া আঁকছি। এর পর আঁকব তোমাদের তিন কবির তিনটি স্কেচ।

মাঝখান থেকে উৎসাহ দিয়ে উঠল জিতেন রক্ষিত, বলল, আঁকুন আঁকুন আঁকুন। এদের পত্রিকায় না লাগলেও, কাজে লেগে যাবে ভিক্টরদা, আমাদের বইতে ছেপে দেব।

তা নাহয় হবে। সে তো ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু বর্তমানের কথা হোক এখন। বরেন কোথায়?

জিতেনই কথা বলল আবার, বলল, সে তার নীলিমা-বউদির আদুরে ঠাকুরপো, হয়তো আসার পথে সেখানে আটক পড়েছে। রোজ তো একবার করে হাজরে দেওয়া চাই।

সলিল একটু হাসল, বেঞ্চে বসে পড়ল সে, বলল, সম্ভবত তাই। গল্প যা শুনি ওর বউদির, তাতে মানুষটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। খুব নাকি হাসি-খুশি, খুব ফুর্তিবাজ।

ভিক্টরদা মন্তব্য করলেন, আর, নিশ্চয় খুব রসিকাও। নইলে কবির বউদি হওয়া কি যায়? কি বল?

সলিল কিছু বলে না, জিতেনও বলে না কিছু। কিন্তু সলিলের মনে পড়ে অনেকদিন আগের কথা। সেই কলেজের কথা। তখন থেকেই এই বউদির গল্প শুনছে সলিল। বাচ্চাকাচ্চা হয় নি, ঝাড়াঝাপ্টা মানুষ তার বউদি; গান-বাজনায় খুব শখ। কিন্তু গানের গলা নেই। তাই সেতার বাজানো শিখতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাও মন দিয়ে ধৈর্য ধরে শিখতে পারেন না। বরেনের দাদা আপিসে চলে গেলে একা বাড়িতে সময় কাটে না, তাই কখনো বাজান হারমোনিয়ম, কখনো-বা ঐ তারযন্ত্র।—এইটুকু মাত্র সলিলের শোনা আছে, এর বেশি সে জানে না।

ভিক্টরদা তো রসিকতা করছেন বেশ। কিন্তু তাঁর নিজের কথা তিনি একটু বলুন। তাঁর সেই বেগার-মেড, অর্থাৎ কিনা সেই ভিখারিনি-কন্যাটির খবর কি?

কিন্তু সলিল এখন একা, বরেনও নেই, কুর্টিসও নেই; সুতরাং ও-কথা তোলার ঝুঁকি সে নিতে চাইল না। ভিক্টরদার তো মেজাজ, হঠাৎ ক্ষেপেও উঠতে পারেন। ক্ষেপে উঠলে তাঁকে ঠাণ্ডা করার সাধ্য সলিলের একার নেই।

সুতরাং ও কথা তোলা হল না, ওই প্রশ্নটি মনের মধ্যেই জমা হয়ে রইল। সলিল কেবল উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল বীজাণুর মলাটের নতুন ছবির খসড়া এগিয়েছে কত দূর।

বরেনের কথাই ভাবছিল ওরা, এসে গেছেন বরেন। সিঁড়িতে ওর গলা পাওয়া গেল, কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছে।

ভিক্টরদা মুখ তুলে তাকালেন, জোড়া কবি এসে উপস্থিত একসঙ্গে— বরেন ও কুর্টিস। ভিক্টরদা বললেন, এই যে এসো, এসো কবি-স্কোয়্যার।

পাশের ঘর থেকে বিধবাবিবাহ-সহায়ক-সমিতির কর্ণধার কংসারিমোহন এদের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনে মুচকে-মুচকে হাসে।

শুভসংবাদ নিয়ে এসেছে বরেন। সে স্থির হয়ে বসল লম্বা বেঞ্চের কোণে, পাশে বসাল কুর্টিসকে। বলল, হঠাৎ এর সঙ্গে দেখা হ্যারিসন রোডের মোড়ে। গল্প করতে-করতে চলে এলাম। শোনো, বউদি ডেকেছেন আমাদের। তাঁর ওখানে আমাদের নিমন্ত্রণ।

ভিক্টরদা সোজা হয়ে বসলেন, একটু হাসলেন, বললেন, কি, কবি-সম্বর্ধনা হবে বুঝি?

হাসল বরেন, বলল, সম্বর্ধনা নয়, সমাদর। বউদি আমাদের কবিতা শুনবেন, এবং প্রতিদানে হয়তো মিষ্টিমুখ করাবেন।

জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে ভিক্টরদা হতাশার স্বরে বললেন, আর, আমরা? আমরা বুঝি যেতে পারব না? যেহেতু কবিতা লিখতে জানি নে?

—নিশ্চয় যেতে পারবেন। বরেন বলল, কাউকে তো চেনেন না বউদি। কারো নাম করে তাই কিছু বলেন নি। শুধু বলেছেন, তোমরা একদিন এসো।

দুই হাত উঁচুতে তুলে ভিক্টর চক্রবর্তী বলে উঠলেন, গ্রহণ করলাম ঐ নিমন্ত্রণ। জয় হোক বরেনের। কিন্তু, দুঃখিত, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব না আমরা— আমি ও জিতেনবাবু। তোমরা যাও, আমরা যাব এর পরের বার। যদি বেঁচে থাকি ততদিন। আশা করি, আমরা বাঁচব।

বরেন থাকে এন্টালির সাউথ রোডে, বরেনের বউদি থাকেন শিয়ালদার কাছেই নূরমহম্মদ লেনে। প্রত্যহ বউদির সঙ্গে দেখা করে আসা চাই বরেনের। তার এ-রুটিন অনেক কালের। বরেনের বাড়ির কেউ পছন্দ করে না তার

এই বউদিকে। এই জন্যে আর কেউ এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি, কিন্তু বরেন সম্পর্ক না রেখে পারে নি। বউদির যে সাজগোছের এবং গানবাজনার জন্যে আত্মীয়দের তাঁকে অপছন্দ, বলতে কি, বরেনের কিন্তু সেসব কোনো কালেই খারাপ লাগে না।

ছোট বাড়ি। দু খানা মাত্র ঘর। গুনতিতে অবশ্য দু খানা, কিন্তু আয়তনে দেড় খানা। এখানে বাস করেন নীলিমা-বউদি! ঘিঞ্জি গলির মধ্যে বাড়ি। ছোট ঘরটার জানলা দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় হেস্নাগনাল এক টুকরো আকাশ।

দাদা আর বউদি মিলে দু-জনের সংসার। বৃন্দাবনবাবু বরেনের পিসতুতো দাদা, বয়সে প্রায় বরেনের বাবার বয়সী। অতি নিরীহ আর নম্র মানুষ, কারো সাতে-পাঁচে নেই। আপিস করেন, আপিস থেকে ফিরে এসে পলকা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে চোখ বুজে ধ্যান করেন। পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করেন নীলিমা-বউদি, শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আপিসের খাটুনির কথা জিজ্ঞাসা করেন। রিটায়ার করার আর ক-বছর বাকি জানতে চান।

—কেন গো। সে খবরে দরকার কি।

বউদি বুঝি একটু হাসেন, বলেন, কলকাতায় আর না। যাদের আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, মরলে কেউ খবর নেয় না যাদের, তাদের এ শহরে থেকে লাভ? তুমি রিটায়ার করলে আমরা ইয়েতে চলে যাব।

স্বামীর নাম করেন না নীলিমা-বউদি। তাঁর অনেক দিনের সাধ, বৃন্দাবনে গিয়ে কাটাবেন শেষজীবনটা।

বৃন্দাবনবাবু একটু হাসেন, বলেন, বুঝেছি। প্রথমজীবন আর মধ্যজীবন কেটে গেল এই বৃন্দাবনে. শেষজীবনটাও বুঝি চাও তার সঙ্গেই কাটাতে?

স্বামীর রসিকতা শুনে খুশিতে হেসে ওঠেন নীলিমা-বউদি, বলেন, যতই বয়স বাড়ছে, ততই যে রসও বাড়ছে দেখছি?

বৃন্দাবনবাবু জীর্ণশীর্ণ মানুষ, কিন্তু নীলিমা-বউদি তার বিপরীত। গায়ে-গতরে বেশ পুষ্ট, ধবধবে কাচা পাটভাঙা শাড়ি তাঁর গায়ে মচমচ করে। গোলগাল সিঁদুরের টিপ কপালে মস্ত করে আঁকা। সামনের দাঁত-দুটো একটু উঁচু। কিন্তু পরনের শাড়ির মত দাঁতগুলোও যেন ধবধবে করে কাচা।

চরিত্রের উপর বয়স হবে নীলিমা-বউদির। কিন্তু কে বলবে বয়স তাঁর অত। এখনো একটা চুলে পাক ধরে নি, একটা দাঁত নড়ে নি।

নীলিমা-বউদির পাশে বৃন্দাবনবাবুকে বুঝি মানায় না। না, বৃন্দাবনবাবুর পাশে মানায় না নীলিমা-বউদিকে? বাইরে থেকে না মানালেও মনে-মনে এঁরা খুব মানানসই। নীলিমা-বউদিই তাঁর সব আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কেড়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে ফেলেছেন এখানে। সে অনেক দিনের কথা। বিয়ের পাচ-সাত বছর পরেই।

সেই থেকে কেউ পছন্দ করে না এঁকে। কারো সঙ্গে সম্পর্কও নেই এঁর। এ যেন পৃথিবীর জনতার কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে অন্তহীন সমুদ্রের মাঝখানে এক নিভৃত দ্বীপে গৃহরচনা।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে নীলিমা-বউদি লণ্ঠনের পলতে কমিয়ে দিয়ে ছোট ঘরটায় বসে হারমোনিয়াম বাজান, যত-সব পুরনো গান— ঢলঢল সুকোমল নয়ন-দুটি, কিংবা, খয়ের-গোলা টিপ জ্বলে, কও-না কথা মুখ তুলে বউ।

উপরের ভাড়াটে অর্চনার মা ঠাস করে জানালা বন্ধ করে দিয়ে বলে ওঠেন, ওই আরম্ভ হল বাইজির গলাবাজি। । থাকা দায় হল এ বাড়িতে। ভদ্দরপাড়ায় এ সওয়াও দায়।

কিন্তু ও-কথায় কান দেয় না কেউ। নীলিমা-বউদি তাঁর কাঁপা-কাঁপা গলায় গেয়ে চলেন, খয়ের-গোলা টিপ জ্বলে—

এ-ঘরে এই গান চলে, ও-ঘরে ইজিচেয়ারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন বৃন্দাবনবাবু। পরম নিশ্চিন্ত মনেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। তিনি জানেন, তাঁর স্ত্রী তাকে সস্নেহে ডেকে সযত্নে খাইয়ে যথাসময়ে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়াবেন।

তাই। প্রায়ই হয় এমন ঘটনা। অনেক দিন নীলিমা-বউদি বলেন, থাক্ না। উঠতে হবে না। তুমি শুয়ে থাকো অমনি, আমি ব্যবস্থা করছি।

ইজিচেয়ারের পাশে হালকা তেপায়া এনে তার উপর থালা রেখে নীলিমা-বউদি পাশে দাঁড়িয়ে ভাতের গ্রাস দিয়ে দেন বৃন্দাবনবাবুর মুখে। ক্লান্ত শিশুর মত চোখ বুজে বৃন্দাবনবাবু চিবতে থাকেন ভাত। কাঁটা বেছে-বেছে নীলিমা-বউদি মুখে মাছ দিতে-দিতে বলেন, একটু দেখে চিবোও, কে জানে, কাঁটা রয়ে গেল কিনা; আবার গলায় না বিঁধে যায়।

দু-জন মানুষের তো সংসার, কে দেখতে আসছে, কিভাবে সময় কাটছে

এদের, কি ভাবে জীবন চালাচ্ছে এরা। তাই, বৃন্দাবনবাবু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন নূরমহম্মদ লেনের আধো-অন্ধকার ঘরের এই নীরব নিভৃতিতে।

স্ত্রীর স্নেহের হাতের যত্ন ও আন্তরিকতা উপভোগ করতে করতে মাঝে-মাঝেই তাঁর মনে হয় নানারকমেব কথা। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব বলতে যাদের কেউ নেই, তাদের ভবিষ্যৎ সত্যিই আতঙ্কের। বৃন্দাবনবাবু হঠাৎ চোখ বুজলে কী গতি হবে নীলিমার ?

তার উপর, নীলিমার দুর্নামের শেষ নেই। একটু হাসিখুশি কি হতে নেই মেয়েমানুষদের ? একটু সাজগোছ করলে ক্ষতি কি ? একটু নাহয় হারমোনিয়ম বাজায়, একটু নাহয় সেতার সাধে ! তাতেই কি অশুদ্ধ হয়ে গেল মহাভারত ? এসব না করলে, কী নিয়ে সে থাকবে, এ কথা কেউ একবার হিসেব ক'রে দেখে না। প্রত্যহ যাকে সারাদিন একেবারে একা-একা থাকতে হয় তার সময় কাটাবার অবলম্বন তো চাই একটা-কিছু। যত-সব অনাচারী মানুষের ভিড চারদিকে, দুপুবে একটু কালের জন্যে আসে বরেন, তাকে জড়িয়েই কত মুখরোচক গল্প বানিয়েছে এরা।

কিছু-কিছু কানে আসে বৃন্দাবনবাবুর। কিছুই তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু মানুষ তো বটেন তিনি ; তাই মনটা এক-এক দিন হঠাৎ খচখচ করে ওঠে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, তারা তারা।

—কি হল, কি হল ? ও-ঘর থেকে দৌড়ে আসেন নীলিমা-বউদি, বলেন, শরীর অসুস্থ নাকি গো ? না, মনটা ভারী। আপিসে কারো সঙ্গে ঝগডা হয় নি তো ? ঠাকুরদেবতাকে অমন ক'রে ডাকতে শুনি নে তো কখনো। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে। শরীর কিংবা মন দুর্বল না হলে কি কেউ ঠাকুরদেবতাকে অমন ক'রে ডাকে ?

কোনো বাধা মানেন না নীলিমা-বউদি, কোনো আপত্তিও না। বলেন, ওঠো। চেয়ার ছাড। চল, টান হয়ে শোবে চল বিছানায়। শরীরটাকে একটু আরাম দাও। চল, ওঠো। আমি ঘুম পাডিয়ে দিচ্ছি। একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস কর।

বৃন্দাবনবাবু আর বাধা দিতে পারেন না, অগত্যা তাঁকে রাজি হতে হয়। উঠে গিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়েন তিনি।

লণ্ঠন কমিয়ে দিয়ে নীলিমা-বউদি স্বামীর মাথার কাছে বসে চুলের মধ্যে

আঙুল চালিয়ে দিতে-দিতে গুনগুন শব্দে গান করেন, কথাগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু সুরটা বেশ মিষ্টি লাগে বৃন্দাবনবাবুর। বুঝি ঘুমিয়েই পড়েন তিনি।

সময় কেটে যায় নূরমহম্মদ লেনে। দিনের পর দিনও কেটে যায় একে-একে।

স্বামীকে বশ করেছেন নীলিমা-বউদি। এ অতি নির্ঘাৎ সত্যি। এই নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে আলোচনার অন্ত নেই, তারা বলে, ডাইনি মেয়েমানুষ বটে। নিশ্চয় তুক জানে, নইলে পুরুষমানুষকে অমন বশ করতে পারে ক'টা মেয়ে?

নীলিমা-বউদির কানে এসে পৌঁছে যায় ঐ কথা। তিনি হাসতে থাকেন নিজের মনেই। উঁচু হয়ে বসে স্টোভে পাম্প দিতে দিতে হাসতে থাকেন।

ইজিচেয়ার থেকে ঘাড় কাত্ করে তাকিয়ে বৃন্দাবনবাবু বলে ওঠেন, ও কি গো। পাগোল হলে নাকি। নিজের মনেই অমন হাসছ যে?

হুশহুশ শব্দে জ্বলে ওঠে স্টোভ। তার উপরে কেটলি বসিয়ে দিয়ে আঁচলটা গলায় জড়াতে-জড়াতে নীলিমা-বউদি হেসে ওঠেন খিলখিল করে। বলেন, আমার ভাগ্য বড় মন্দ।

—কেন, হল কি।

—আমার স্বামীটা পুরুষমানুষ।

মানে কিছু বুঝতে পারেন না বৃন্দাবনবাবু, বলেন, ব্যাপার কি?

—ব্যাপার বিশেষ কিছু না। স্বামীর গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নীলিমা-বউদি বললেন, তুমি যদি পুরুষমানুষ না হতে তাহলে এই অপবাদ হত না আমার। পুরুষমানুষকে আমি নাকি তুক করতে জানি। আমি নাকি ডাইনি।

কথাটা নিয়ে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে হাসি-মশকরা চলল, আত্মীয়স্বজনদের গালমন্দ চলল, নিজের অদৃষ্টকে নানাভাবে দোষারোপ করা চলল। ইতিমধ্যে কখন টগবগ করে ফুটে উঠেছে জল। কেটলির মুখ দিয়ে জল পড়ে দপ করে নিভে গেল স্টোভ।

আঁচল জড়ো করে তাড়াতাড়ি কেটলি নামিয়েই এক-চিমটি চিনি স্টোভের উপর ছড়িয়ে দিলেন নীলিমা-বউদি, আবার জ্বলে উঠল স্টোভ হুশহুশ শব্দে।

এই শব্দে চাপা পড়ে গেল আলোচনা। কিন্তু মনের মধ্যে দপদপ করে জ্বলে উঠতে লাগল তাপ। যার আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব তাকে এই চোখে দেখছে তার ভবিষ্যতের ভরসা কোথায়? বৃন্দাবনবাবুর চেহারার দিকে তাই

বার-বারই তাকান নীলিমা-বউদি, নিশ্বাস ফেলেন। বলেন, তোমার খাওয়া-দাওয়া বুঝি ঠিক হচ্ছে না, কেমন কাহিল হয়ে যেন পড়ছ তুমি।

কিন্তু বৃন্দাবনবাবু বুঝতে পারেন না সত্যিই তিনি কাহিল হয়ে পড়ছেন কি না। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে তিনি হাসেন, জিজ্ঞাসা করেন, বরেন এসেছিল আজ?

—এসেছিল। হ্যাঁ, শোনো। বলতে ভুলে গিয়েছি। ওরা-সব কবি হয়েছে আজকাল, জান তো? ওদের আমি নেমন্তন্ন করেছি এই রবিবার সকালে।

—ওদের কাদের?

—ওদের তিন বন্ধুকে। বরেন, আর তার দুই বন্ধু— সলিল সেন, আর মাইকেল কুর্টিস।

—কি নাম বললে?

—কি জানি, কি বলতে কি বলেছি। উচ্চারণে ভুল হয়েছে বুঝি। একটা ফিরিঙ্গি-ছোকরা— দিব্যি নাকি বাংলা জানে, দিব্যি কবিতাও লেখে নাকি বাংলায়।

হেসে উঠলেন বৃন্দাবনবাবু, বললেন, দিব্যি আছ। এসব জোটাও কোত্থেকে? যাক্ গে, দেখা যাবে চাক্ষুষ।

অচিরেই এসে গেল সেই রবিবার। চাক্ষুষ দেখা দিতে এল কুর্টিস, আর সলিল বরেন তো এলই। ভিক্টরদা আর জিতেন সত্যিই এল না।

ছোট বাড়ির ছোট আয়োজন। আসবাবপত্রও কম। নীলিমা-বউদি মাদুর বিছিয়ে দিয়েছেন মেঝেয়। তিন বন্ধুতে বসল সেই মাদুরে।

বৃন্দাবনবাবু তাঁর ইজিচেয়ারে বসে এদের দেখতে লাগলেন। ঐ ফিরিঙ্গি-ছোকরাটার দিকেই তাঁর কৌতূহলী চোখ। সবুজ-সবুজ চোখের তারা দিয়ে কটা রঙের ছেলেটা ঘরের চার দেয়ালে চোখ বুলিয়ে চলেছে। দেয়াল-ভরা ক্যালেণ্ডার, চার-পাঁচ বছরের পুরনো ক্যালেণ্ডারও আছে ওর মধ্যে— ছবি আছে বলে ফেলে দেন নি নীলিমা-বউদি।

ও-পাশের ছোট ঘরটায় স্টোভ জ্বলছে। নীলিমা-বউদি এ-ঘর ও ঘর করছেন। সলিল ওরই মধ্যে দেখে নিচ্ছে তাঁকে। কতদিন থেকে সে শুনছে এই বউদির গল্প, এতদিন বাদে তার সৌভাগ্য হল সেই বউদিকে দেখার।

গল্প শুনে সলিল নিজের মনে যেরকম ছবি এঁকে নিয়েছিল, তার সঙ্গে কিন্তু মিলছে না একটুও ; কিন্তু তা বলে সে যে হতাশ হয়েছে এমন নয়। কিন্তু তার ধারণা ছিল, নীলিমা-বউদির বয়স বুঝি এর চেয়ে বেশি।

বৃন্দাবনবাবু কুর্টিসের দিকে চেয়ে ছিলেন। ট্রাউজার পরনে ছেলেটার, হাঁটু মুড়ে মাদুরে বসতে ওর নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে ব'লে তাঁর মনে হল। তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইউ ডু ওয়ান থিং। ইউ কাম হিয়ার, অ্যাণ্ড টেক দিস সিট।

বিব্রত হয়ে উঠল কুর্টিস, তাড়াতাড়ি জোড়াসন হয়ে বসতে চেষ্টা করতে লাগল।

বরেন বলল, ইংরেজি কেন, দাদা ? বাংলা ও জানে।

কুর্টিস বলল, আমি বেশ আছি। আপনি বসুন ওখানে।

তিনটি কাঁসার রেকাবিতে খাবার নিয়ে এলেন নীলিমা-বউদি। ওদের সম্মুখে দিতে-দিতে বললেন, কোনো উৎসবও না, কোনো ঘটাও না, একটু মিষ্টিমুখ মাত্র। বরেন-ঠাকুরপোর কাছে তোমাদের কথা শুনে-শুনে তোমাদের বড় দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল।

সলিল কি-যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃন্দাবনবাবু কথা আরম্ভ করেছেন দেখে সে চুপ করে গেল, হেসে উঠে বৃন্দাবনবাবু বললেন, কোনো কবিসম্মেলনও না। কবিদের ধরে এনে তাদের মঞ্চে তুলে স্বরচিত কবিতাপাঠের রেওয়াজ হয়েছে না ? কাগজে খবর দেখি প্রায়ই। বেচারা কবিরা ! মিষ্টি-মিষ্টি কথা জোগাড় ক'রে ছন্দ মিলিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয় তাদের, আবার কিনা, সেই লেখা নিজেকে পড়ে শোনাতে হবে। কত দায় কবিদের। পাঠকরা অনুগ্রহ করে শুনবেন, কত কৃপা তাঁদের। তাই না ? কি বল হে কবিত্রয় ?

ওরা কিছু বলে না, কিছু বলাও এখন অসুবিধে। বউদির তৈরি মালপো এখন ওদের মুখের মধ্যে।

বউদিও বসেছেন সামনেই একটা আসন বিছিয়ে। কত গল্প কত আলোচনা যে আরম্ভ করেছেন দাদা তার শেষ নেই। কে কতদূর পড়াশুনা করেছে, এখন কে কি করে, কি করে তারা তিনজনে একত্র হল— ইত্যাদি নানা কাহিনী। তারা যে কবিতার পত্রিকা বের করেছে, এবং এই তিন জনে হয়েছে থ্রি পোয়েট্‌স্, ভিক্টরদা এদের যে নতুন নাম দিয়েছেন— সব বৃত্তান্ত জানা হয়ে গেল বৃন্দাবনবাবুর।

নীলিমা-বউদিও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন এদের কাহিনী। সলিলও কথা বলছে, কুর্টিসও বলছে। বরেন শুধু বসে আছে চুপ করে।

বৃন্দাবনবাবুর প্রশ্নের শেষ নেই। ফিরিঙ্গি-ছেলেটির সম্বন্ধে প্রথম তাঁর যে-ধারণা ছিল, এখন বুঝি তার একটু বদল হয়েছে। তিনি তার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কচিকচি দাড়ি গোঁফে ভরে গিয়েছে মুখ, তার মধ্যে থেকে স্পষ্ট আর উজ্জ্বল হয়ে আছে চোখের দুটি তাজা দৃষ্টি।

নীলিমা-বউদি বললেন, বড় খুশি হলাম তোমাদের দেখে। বরেন-ঠাকুরপোর বন্ধু তোমরা, কোনো সংকোচ কোরো না, যখন ইচ্ছে হবে এসো। আমি একা মানুষ, তোমরা পাঁচ জন এলে ভালোই লাগে।

অর্চনার মা বারোয়ারী উঠোনটুকু পেরিয়ে যাবার সময় একবার তাকাল এদিকে— তাজ্জব, ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গিরাও ঢুকতে আরম্ভ করেছে এই বাড়িতে? জাতজন্ম আর রইল না।

উপরে উঠে গেলেন তিনি। তাঁর বড়ই আশ্চর্য লাগতে লাগল এদের এই আচরণ। এত লোক এখানে ঢুকতে আরম্ভ করেছে কেন, কিছুই যেন বুঝে পারলেন না তিনি।

বৃন্দাবনবাবুও আশ্চর্য হচ্ছেন, কিন্তু অন্য ভাবে। তিনি চেয়ে-চেয়ে দেখছেন এদের। এবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, কিছু কাজ কর নাকি তুমি?

কুর্টিস উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার হয়ে উত্তর দিল বরেন, বলল, ও হচ্ছে মটোর-মেকানিক, সার্কুলার রোড আর ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলম লেনের মোড়ের গ্যারেজে কাজ করে।

বৃন্দাবনবাবু কুর্টিসের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু ছেলেটা যখন লেখাপড়া জানে, তখন লেখাপড়ার একটা কাজ জোগাড় করে নিলেই ভালো হয় না?

এর উত্তর দিল কুর্টিসই, একটু সংকোচের সঙ্গেই ধীরে-ধীরে সে বলল, লেখাপড়ার কাজ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, এটাও তো মন্দ কাজ না। বেশ আছি। হাতের কাজ করি গ্যারেজে, মাথার কাজ করি নিজের ঘরে। আর, কাজটার নাম যদি বদলে নিই, তবেই তো বেশ। মটোর-মেকানিক না ব'লে যদি বলি ইঞ্জিনিয়ার?

—বা, চমৎকার। ঐ কাজের সঙ্গে কবিতা লেখা, সুন্দর কম্বিনেশন তো। হাসলেন বৃন্দাবনবাবু।

বরেনও হাসল, বলল, আমাদের মধ্যে আর-একজনও আছেন। ইলেকট্রিক মটোরের আর্মেচার ওআইন্ডিং শিখে তিনি এখন—

সলিল বাধা দিয়ে উঠল, বলল, চল, চল, এবার উঠি।

বাধা দিলেন নীলিমা-বউদি, বললেন, বোসো-না, রবিবার ছুটির দিন, এঁরও আপিস নেই, তোমাদের কলেজও নিশ্চয় আজ বন্ধ?

বউদির কাণ্ডই আলাদা, এ কথার মধ্যে আবার ঐ কলেজের কথা কেন; তাদের ঐ কলেজ নিয়ে কোনো আলোচনা করতে তাদের ভালো লাগে না এতটুকু; বউদি কি জানে না যে নামেই ওটা তালপুকুর, কিন্তু ঘটিও ডোবে না?

বৃন্দাবনবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তোমাদের পরিচয় হল কোথায়?

বরেন বলল, ভিক্টরদা। একদিন একে নিয়ে এলেন। আমাদের ভিক্টরদা —ভিক্টর চক্রবর্তী।

একে-একে আরম্ভ হল অনেক কথা, একে-একে বিবৃত করা হল সব বৃত্তান্ত।

আউটরাম ঘাটে বসে ছবি আঁকছেন ভিক্টরদা। রোজই তাঁর ওখানে গিয়ে বসা চাই। কুর্টিসও চষে বেড়ায় সারা কলকাতা। এই নতুন কলকাতার মাঝখানে সে খুঁজে বেড়ায় পুরনো কলকাতার কঙ্কাল। হেস্‌টিংস, প্রিন্সেপ ঘাট, বাবুঘাট, চাঁদপাল-ঘাট— সে ঘুরে বেড়ায় গঙ্গাব কিনার-বরাবর। এই কিনার ধরেই ক্রমশ গড়ে ওঠে এই কলকাতা। আজ প্রাসাদে-অট্টালিকায় সুসজ্জিত হয়ে মানুষের ভিড়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে যে-শহর, কুর্টিস তাকে বলে শ্মশান— পুরনো কলকাতার সমাধিস্থল, মনে-মনে সে বলে—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে—

দাঁড়িয়ে একবার সুদূর অতীতের দিকে নিক্ষেপ কর দৃষ্টি, তাহলে এই সমাধির মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করতে পারবে সেই সময়টা, যে-সময়ে ধীরে-ধীরে জেগে উঠছে এই শহরের বাণিজ্য, এবং এই শহরের বাসিন্দা।

ছবি আঁকছিলেন ভিক্টরদা, ঘুরতে-ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হল এই মাইকেল কুর্টিস। কৌতূহলী হয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল ভিক্টরদার পিছনে। অনেকক্ষণই দাঁড়িয়ে ছিল সে, দেখছিল, কিভাবে পেন্সিলের দাগে-দাগে এঁকে উঠছে এক-একটা চিত্র।

হঠাৎ পিছনের দিকে তাকালেন ভিক্টরদা, এই অচেনা অজানা ফিরিঙ্গিটার মুখের দিকে চেয়ে বিরক্ত হলেন তিনি, উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট ? হোয়াট মেক্‌স্ ইউ হিয়ার। প্লিজ স্ট্যাণ্ড অফ।

ফিরিঙ্গিটা স্মিত হেসে স্বচ্ছন্দ বাংলায় জবাব দিল, কিছু চাই না। আপনার ছবি-আঁকা দেখছি।

এর মুখে বাংলা শুনে ভিক্টরদা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, উঠে দাঁড়ালেন, ওকে নিয়ে গিয়ে বসলেন জেটির বেঞ্চিতে।

সম্মুখে খলখল শব্দে জলের হাসি এসে লুটিয়ে পড়ছে জেটির কাঠের পাটাতনের উপরে, নানা আকারের নৌকো যাতায়াত করছে এদিকে-ওদিকে। বড় বড় জাহাজের চোঙ থেকে ধোঁয়া উঠছে, গোঙরানির শব্দের মত বেজে-বেজে উঠছে জাহাজের বাঁশি।

পাশে বসিয়ে ছেলেটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলেন ভিক্টর চক্রবর্তী। প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিব্রত করে তুলতে লাগলেন তাকে, কিন্তু এতটুকু বিব্রত বোধ করল না সে। একে একে সে বলতে লাগল তার কথা।

ভিক্টরদাও নিজেকে খুঁজেছিলেন কিছুদিন আগে, নিজের উৎসের সন্ধানে উধাও হয়েছিল তাঁর মন, এই ছেলেটিকেও তেমনি আত্ম-অন্বেষণ করতে দেখে একে ভালো লেগে গেল তাঁর।

দারজিলিঙের কনভেণ্টে সে পড়ত। তখন তার বয়স পাঁচ কি ছয়। তার বাবার নাম অ্যালফ্রেড কুর্টিস, মা ফ্লোরেন্স। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে সে। বেশ আরামেই ছিল সে, বেশ নিশ্চিন্তই। সেবার ধস নামল পাহাড়ে, কত লোক মারা গেল ঠিক নেই। কত বাড়ি সেই ল্যাণ্ড-স্লাইডের সঙ্গেসঙ্গে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল অগাধ খদে। তাদের বাড়িটাও গড়িয়ে যায়, কিন্তু খদে পড়ে না, একটা মস্ত বড় পাথরের চাঙে আটক পড়ে। সেইবার হল ট্র্যাজিডি। তার বাবা-মা মারা গেলেন একসঙ্গে, মিরাকুলাসলি বেঁচে গেল সে। অরফ্যানেজে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের কনভেণ্টের নেটিভ ক্রিশ্চান বিনোদিনী বিশ্বাস অনেক আর্জি করে তাকে পালন করার জন্যে নিজের কাছে রাখার পারমিশন পেলেন। সেই থেকে সে ঐ মিস বি. বি.-র কাছেই ছিল। বছর-পাঁচ হল তিনি মারা গেছেন।

কুর্টিস বলল, হ্যাঁ, ওকে সবাই মিস বিবি বলত। এঁর কাছে থাকার ফলেই আমি বাংলা শিখি। তার পরের কথা ? সে অনেক কথা, মিস্টার চক্রবর্তী।

একটু হেসে স্টুর্টিন আবার বলল, পরের কথা অনেক কথা বটে, কিন্তু আগের কথাও বুঝি সামান্য না। আমি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এই জমিতে কবে প্রথম আরম্ভ হল আমাদের এই বংশ, আমি খুঁজতে শিখলাম তার আদি। মিস বিবিই আমার মনের মধ্যে এইসব আজগুবি প্রশ্ন ঢুকিয়ে দেন বলা যায়।

বৃন্দাবনবাবু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সব কথা। নীলিমা-বউদিও গালে হাত দিয়ে ঝুঁকে বসে শুনলেন এই কাহিনী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীলিমা-বউদি বললেন, বড় দেখতে ইচ্ছে করছে ওই মিস বিবিকে। তাঁর কোনো ফটো নেই তোমার কাছে?

—আছে। দেখাব বউদি আপনাকে।

হঠাৎ ওই ফিরিঙ্গিটার মুখে এই বউদি সম্বোধন শুনে তিনি বুঝি একটু অভিভূত হলেন। বললেন, এর পরে যে দিন আসবে নিয়ে এসো।

বৃন্দাবনবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন, সবই তোমাদের বেশ, কিন্তু তিন কবি তিনটি বিদেশী কবির নাম না নিয়ে এ দেশের কবিদের নামের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নিলে আর-একটু বেশি খুশি হতাম। কীট্‌স্ বায়রন শেলী না হয়ে তোমরা যদি, ধরো, কীর্তিবাস বিদ্যাপতি শঙ্কর হতে— তাহলে আরো খুশি হতাম আমরা। তোমাদের ভিক্টরদাকে বোলো এ কথা। বোলো, ওক গাছ আমরা ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের দেশের মাটিতে ওই গাছের চারা পুঁতলে তা থেকে ওক হবে না, হয়ে উঠবে বট। তা-ই যদি হয়, তাহলে বিদেশী ওকের চারা এনে পণ্ডশ্রম করব কেন, দেশী বটেরই বীজ পুঁতব আমাদের মাটিতে।

বৃন্দাবনবাবুর কথা শুনে ওরা তো আশ্চর্য হলই, এমনকি নীলিমা-বউদিরও বড় আশ্চর্য ঠেকতে লাগল। এমন নিরীহ নম্র সাদামাটা মানুষ, কিন্তু ইনিও কথা বলতে জানেন এমন ভাবে, এ কথা নীলিমা-বউদিরও জানা ছিল না। সব কথার মানে তিনি না বুঝুন, কিন্তু বৃন্দাবনবাবু যে একটু ভাববার কথা বলেছেন তা সহজেই ধরতে পারলেন নীলিমা-বউদি।

সেদিন অনেকক্ষণ নূরমহম্মদ লেনের আধো-অন্ধকারে ঢাকা ছোট ঘরের মেঝেয় বসে অনেক গল্প করে বিদায় নিয়ে এসেছে তারা। বিদায় নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু মন তাদের এখনো টানে ঐ নূরমহম্মদ লেন, ঐ নীলিমা-বউদি, ঐ বৃন্দাবন মজুমদার।

হাসিখুশি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন নীলিমা-বউদি। নির্জন দুপুরে যখন তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে যান তখন তাঁর মন হয়ে ওঠে গুমট। ছোট ঘরটায় একটা ভাঙা চৌকি পাতা, ঠিকে ঝি থালা-বাসন মেজে ঐ চৌকির উপরে ছড়িয়ে রেখে যায় সেগুলি। হারমোনিয়মটাও থাকে ওখানে, এক-এক দিন থালাবাটির ভিড়ে যেন আটক পড়ে ঐ হারমোনিয়াম।

ভর-দুপুরে মন যখন বেজায় ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে, তখন তিনি উঠে গিয়ে ছড়ানো থালাবাটি সরিয়ে দিয়ে বসেন চৌকিটার কিনারে, কাঁইকাঁই শব্দে বাজাতে থাকেন হারমোনিয়ম—

পা সা নি ধা পা মা গা রে সা রে
নি সা গা গা গা মা মা পা ধা

সেই সঙ্গে তিনি চাপা গলায় গান ধরেন—

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি
আঁধার তোমার সবই মিছে

উপরের অর্চনার মা কান খাড়া করে শুনতে থাকেন ঐ গান, সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে তাঁরে। ভদ্রপাড়ায় এই ভরদুপুরে এই বেলেল্লাপনা—এ কি সওয়া যায়? না, আর না; বাড়িওলাকে বলে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করতেই হবে।

বিহিত ব্যবস্থা করার জন্যে তিনি সংকল্প করতে থাকেন উপরে বসে, আর নীচতলার ঘর থেকে কাঁপা গলার আওয়াজ বাজে—

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি—

অর্চনার মা নিজের মনেই বলেন, ভয় আর পাবে কেন? নষ্ট মেয়েদের সাহস একটু বেশিই হয়ে থাকে। এ যে জানা কথা গো, জানা কথা।

এখানে সংগীতসাধনা চলেছে নীলিমা-বউদির, ওদিকে বারো নম্বরে বসে গল্প করছে তিন জনে। নতুন প্রচ্ছদপটে ভূষিত হয়ে তাদের পত্রিকা বের হচ্ছে এবার, ভি. সি.-র আঁকা মলাটচিত্র এই সংখ্যার বাড়তি আকর্ষণ।

জিতেন রক্ষিতের যেমন উৎসাহ, কম্পোজিটর নিরঞ্জনের উৎসাহ তার চেয়ে কম না। ছাপাখানার আসল কাজ, অর্থাৎ জিতেন রক্ষিতের জীবিকার কাজ, তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে নিরঞ্জন প্রুফ তুলে দিচ্ছে এদের। একটি মাত্র কম্পোজিটর আর একটি ট্রিড্‌ল্ মেশিন দিয়ে চলেছে এই ছাপাখানা এবং এই পত্রিকা-প্রকাশ।

মাইকেল কুর্টিস ঘোড়ায় চড়ার মত করে বসেছে বেঞ্চিটায়— দুই পা ঝুলিয়ে দিয়েছে দুই পাশে, সামনে নিজের কবিতার প্রুফ রেখে তা পড়ছে।

মাথা তুলে সে বলল, সলিলবাবু, আমরা যেখানে ব'সে তার কাছেই ওই চোরবাগান। তাই মনে হচ্ছে আমরাও বুঝি কীর্তি রেখে যাব। ঐ চোর-বাগান থেকেই বের হয় বাঙ্গাল-গেজেটি— বাঙালি-পরিচালিত ও বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সমাচারদর্পণ হয়তো এর দু-এক সপ্তাহ আগে, কেউ-কেউ বলেন পরে, বের হয়। দু-একদিন আগে পরে হোক না, তা-তে কি আসে যায়?

ওরা শুনছিল মন দিয়ে, কুর্টিস বলল, সে পত্রিকা বের করেন একজন কম্পোজিটর— গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর নাম। তাই মনে হচ্ছে, নিরঞ্জনবাবুও কম্পোজিটার— নিরঞ্জনবাবুও ভট্টাচার্য, তার উপর তাঁর যা উৎসাহ, তিনিও অমনি ইতিহাসে নিজের নাম না লিখিয়ে ফেলেন। আজি হতে শত বর্ষ পরে আমাদেরই মত কেউ হয়তো পড়বে নতুন ইতিহাস, দেখবে, বাংলায় কবিতার মাসিক পত্র সর্বপ্রথম যিনি বের করেন তিনি আর কেউ না— নিরঞ্জন ভট্টাচার্য।

সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে, কুর্টিস বাধা দিয়ে বলল, হাসি না। গঙ্গা-কিশোরের উৎসাহ দেখে সে আমলেও নিশ্চয় হেসেছে অনেকে। তাদের সেই আধো-আধো হাস এখন ইতি হয়ে গেছে। এখন তাই তা হয়েছে ইতিহাস।

সকলে আবার হেসে উঠল একসঙ্গে শব্দ করে। কার কাছ থেকে সে শিখল এমন ভাষা? মিস বিবির কাছ থেকে নাকি? মাইকেলের মুখের দিকে তাকাল সলিল আর বরেন।

ওর জীবনে ট্র্যাজিডি আছে। তার থেকেই বুঝি ওই মটোর-মেকানিক ভারি-ভারি ট্রাকের নীচে বুক পেতে শুয়ে যখন মেরামত করে কলকব্জা তখনো বুকের মধ্যে গর্জে ওঠে সেই ট্র্যাজিডির প্রতিধ্বনি, কানে বুঝি বেজে ওঠে তার সেই পাহাড়ের ল্যাণ্ড-স্লিপের শব্দ, চারদিকের মানুষের আর্তনাদের প্রতিধ্বনি।

তখন শিশু সে। স্পষ্ট তাই মনে পড়ে না। স্বপ্নের মত ভেসে ওঠে সেই আওয়াজ। কিন্তু মিস বিবি, অমন স্বপ্নের মত না, প্রত্যক্ষ স্পষ্ট হয়ে জেগে আছেন তার চোখে।

মাথা নীচু করে প্রুফ দেখতে আরম্ভ করল সে। কীট্‌স্‌ নয়, কীর্তীশ নয়— কীর্তিবাস হয়ে উঠতে হবে নাকি তাকে, বরেনের দাদার এই ইচ্ছা।

বরেনের আর সলিলের কমার্স-কলেজের কাজ আর কতটুকু? বাকি সময়ে তাদের দু-একটা টিউশনি করতে হয়— তার পরেই তাদের ছুটি। কুর্টিনের গ্যারেজ-ডিউটিও দিনে আট ঘণ্টা, দিনের বাকি ষোলো ঘণ্টা তার নিজের। নিজেদের এই উদ্‌বৃত্ত সময় তারা কাটায় পথে-পথে ঘুরে।

সেদিন ঘুরে-ফিরে তারা বারো নম্বরে যখন ফিরে এল সন্ধে তখন গড়িয়ে গিয়েছে। এসে দেখে অন্ধকার ঘরে বসে আছে জিতেন ও কংসারি। আলো জ্বালেনি, সদর রাস্তার করপোরেশনের আলোতেই তাদের এই দোতলা ঘর কথা বলার মত আলোয় আলোকিত হয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই এদের এভাবে বসে থাকাতে দেখে সুইচ টিপে দিয়ে হেসে উঠল সলিল, বলল, কি জিতেনবাবু, কি পরামর্শ হচ্ছে? বিবাহ-টিবাহ করার মতলব না কি? কি, কংসারিবাবু, ভালো পাত্রী আছে নাকি সন্ধানে?

মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল কংসারিমোহন।

জিতেন রক্ষিত সপ্রতিভ, সে বলল, মন্দ কি, তা করলে হয়।

তিন বন্ধুতে বসল লম্বা বেঞ্চে পাশাপাশি। কংসারিমোহন কথা কম বলে, বিধবাবিবাহ-সহায়ক-সমিতির কর্ণধার বলেই তার এ গাম্ভীর্য কি না ঠিক বুঝতে পারে না বুঝি তিন বন্ধুতে। কংসারির মুখের দিকে তাকায় তারা।

কংসারিমোহন মুখ খুলল, বলল—

বেঁচে থাকুন বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

সেকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেকেই ব্যঙ্গ করেছে এভাবে। কিন্তু এখন ওতে আর ব্যঙ্গ নেই, ওতে নতুনত্বও নেই। জিতেনবাবু যদি সত্যি বিয়ে করেন, আমার হাতে পাত্রী আছে। শুধু জিতেনবাবু কেন, আপনাদের সকলের জন্যেই আছে।

বরেন জিজ্ঞাসা করল, আমাদের ভিক্টরদা, তাঁর জন্যে?

একটু চিন্তা করে কংসারিমোহন বলল, হ্যাঁ, তা পাওয়াও দুষ্কর হবে না।

সলিল বুঝি একটু চিন্তায় পড়েছে, বলল, সত্যি, ওই রকমের মানুষ আর আমরা পাচ্ছিনে এ শতকে। গত শতকে এক-এক জন মানুষ যেন

এক-একজন জায়েন্ট— দিক্‌পাল। রামমোহন বলো, বিদ্যাসাগর বলো, সকলেই বিরাট-বিরাট পুরুষ এক-একজন।

বরেন যোগ দিল ঐ কথায়, বলল, মানুষও একটা ফসল। আমাদের মুরশিদাবাদে দেখেছি এক বছর আমের ভীষণ ফসল হয়, পরের বছর হয় আমের দুর্ভিক্ষ। এও অনেকটা তাই। গত শতকে অনেক বড়-বড় মানুষ জন্মেছে ব'লে এ শতকটা এমন ফাঁকা।

নড়ে-চড়ে বসছিল মাইকেল কুর্টিস, সে ওদের কথায় সায় দিতে পারল না, সে বলল, উঁহু। মানি নে। লাস্ট সেঞ্চুরিতে সাধারণ মানুষেরা ছিল এতই তুচ্ছ আর নগণ্য যে, ওরই মধ্যে সামান্ত-একটু মাথা তুলতে পারলেই মস্ত বড় বলে দেখাত ; কিন্তু এই সেঞ্চুরিটা অন্ত রকমের। এখানে সাধারণ লোকের স্ট্যাণ্ডার্ড বেড়ে গেছে অনেক, প্রায় সকলেই মাথা তুলেছে অনেকখানি। এই জনতার মধ্যে কাউকে বড় হতে হলে, পাঁচ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বড হতে হলে, ভীষণ বড় হতে হবে। কিন্তু জানই তো, ভীষণ বড় হওয়া বড ভীষণ কথা।

একটু থামল কুর্টিস, আবার বলল, চিরকালের শক্তিমান মানুষ হচ্ছে এক-এক জন গালিভার। সেঞ্চুরির মধ্যে দিয়ে ট্র্যাভেল ক'রে চলেছে তারা। উনিশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের শক্তিমানেরা পৌছেছিলেন লিলিপুটের দেশে, তাঁদের শক্তি তাই খুব বড় বলে মনে হয়েছে, খুব লম্বাচৌড়া বলে মনে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু এই শতকে আমরা এসে পৌছেছি ব্রবডিগন্যাগের দেশে, আমরা সবাই তাই আজ এত ছোট। এখন বেশ পরিমাণ-মত বড় কাজ করতে পারলেও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা বড় কঠিন। সাধারণ মানুষেরা ফেঁপে-ফুলে এক-একটা বিরাটাকৃতি ব্রবডিগন্যাগ হয়ে উঠেছে যেন, এর মধ্যে নিজেকে জাহির করতে হলে কত বড হতে হবে একবার পরিমাপ করে দেখ।

সলিল চিন্তায় পড়েছে, তবু মনে-মনে সে বুঝি পরিমাপ করল, বলল, অক্টারলোনি মনুমেণ্টের মত।

—ঠিক। কিন্তু তাও বুঝি বেশি দিন না। যে সময়ে ওটা তৈরি হয়েছিল তখন কলকাতা প্রাসাদময়ী নগরী বটে, কিন্তু পাঁচ-ছয় তলা বাড়ি বুঝি ছিলই না। এখন কলকাতা ভরে গিয়েছে আট-নয় তলা বাড়িতে, বারো-তেরো তলাও উঠেছে। এখন অক্টারলোনির মহিমাও যায়-যায়।

সতীদাহ-প্রথা রদ হয় যে বছর, সেই ১৮২৯ সালে তৈরি হয় ঐ স্তম্ভ, এরই মধ্যে ও ছোট হয়ে গিয়েছে কত। নেহাত ভাগ্য ভালো, এখনো ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে ব'লে তবু লোকের চোখ পড়ে ওর দিকে। ওকে ঘিরে ঘরবাড়ি উঠে গেলেই ওটা একেবারে উহ্য হয়ে যাবে।

একটু হেসে কুর্টিস বলল, কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম আমরা, জিতেনবাবুর বিয়ে থেকে সার ডেভিড অক্টারলোনির স্মৃতিস্তম্ভে। বিয়ের কথা যখন উঠল তখন বলি, ঐ ভদ্রলোক— ওই অক্টারলোনি— নবাব নসীরদ্দৌলা নাম নিয়ে দিল্লিতে বিয়ে করেন বেগম সমরুকে। খুব মুসলিম-প্রীতি ওঁর ছিল, তাই দেখেছ তো, তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের ডোলটা মুসলিম ইমারতের ডোল অনুসারে গাঁথা হয়েছে। কিছুটা ওর ইটে গাঁথা, কিছুটা চুনারের পাথরে।

দেখেছে ওরা, কিন্তু লক্ষ্য বুঝি করে নি। কুর্টিসের কথা শুনে মনুমেন্টের চেহারাটা ভেবে নিল। ভেবে নিয়েই বুঝতে পারল, বুঝতে পারল, ঠিক, ঠিকই বলেছে কুর্টিস।

পরদিন বিকেলে তিন বন্ধুতে গিয়ে হাজির হল মনুমেন্টের পাদদেশে। সেখানে বসে তারা নানা গল্প করছে। কোথায় পেরিন সাহেবের বাগান, কোন্‌টা সুতানটী, কোন্‌টা গোবিন্দপুর, কোন্‌টা চৌরঙ্গির ঘরবাড়ি, কবে তৈরি হল ফোর্ট; ক্লাইভের আমলের কাহিনী থেকে লর্ড কর্নওয়ালিশ, লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত নানা কথা।

গোবিন্দ মিস্ত্রিরের নবরত্ন মন্দিরের কথা উঠল, এই মনুমেন্টের চেয়েও অনেক উঁচু ছিল তার চূড়া। একে-একে খসে গিয়েছে সব, বদল হয়ে গিয়েছে কত।

গল্প করতে-করতেই তারা উঠল, মাঠের ভিতর দিয়ে একটু হেঁটে রাস্তা পার হয়ে মিউজিয়মের পাশ দিয়ে সদর স্ট্রীট ধরে তারা ক্রমে এসে পড়ল ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে। অনেক পুরনো কালের রাস্তা এটা। ক্রমেই পথঘাটের নাম বদল হচ্ছে। একদিন আর বুঝি খুঁজে পাওয়া যাবে না এই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট।

পার্ক স্ট্রীট পার হয়ে ওপারে গিয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটা বাড়ি দেখিয়ে কুর্টিস বলল, এই দেখ বাড়িটা। এখানে জন্মগ্রহণ করেন উইলিয়ম মেকপিস থ্যাকারে— সেই ইংরেজ ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের মাটিতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

রাস্তার অন্যপারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কুর্টিস বলে যাচ্ছে ওই বাড়িটার কথা।

—থ্যাকারে তো অনেক পরে, তার আগে ওই বাড়িতে থাকত সার্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিস। রাজা রামমোহনের জন্ম যে বছর, সেই ১৭৭৪ সালে, ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী সার্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের জাহাজ এসে দাঁড়াল চাঁদপাল-ঘাটে। সেই জাহাজে ইংলণ্ড থেকে এসেছিল আরো অনেক প্যাসেঞ্জার, তার মধ্যের একজনের নাম ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিস। এই বাড়িটার উপর তাই আমার এত টান।

—কে তিনি?

—তিনি আমার পূর্বপুরুষ।

কথা বলতে-বলতে ওরা হেঁটে চলল। ধর্মতলা স্ট্রীট ধরে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে বউবাজারের মোড়ে এসে পড়ল ওরা।

বরেন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল এখান থেকে, ওর দাদার নাকি অসুখ, খবর পেয়েছে, তাই নূরমহম্মদ লেনে যাবে।

বরেন বউবাজার ধরে হাঁটা দিল, সলিল আর কুর্টিস কলেজ স্ট্রীট ধরে চলল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের দিকে।

এর পরে তিন-চার দিন কেটে গিয়েছে, বরেন বারো নম্বরে আসে নি। নবকলেবরে তাদের পত্রিকা বেরিয়ে গেল, এদিকে-ওদিকে একটু কলরবও উঠল, কিন্তু বরেনের পাত্তা নেই। হল কি ওর? দাদার অসুখের কথা বলে সেদিন চলে গেছে, মনে পড়ল তাদের। অসুখ তাহলে একটু বাড়াবাড়ি রকমের নয় তো?

ঐ দাদাটিকেও বড পছন্দ হয়েছে এদের। তাই মনে পড়তে লাগল তাঁর কথা।

গবেষণা করতে লাগল তারা, একদিন গিয়ে খবর নিয়ে আসা উচিত। নূরমহম্মদ লেনে যেতে যদি দ্বিধা হয়, তাহলে এণ্টালির সাউথ রোডেও তো যাওয়া যেতে পারে।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ঘরে বসে জল্পনা করছে তারা, মাঝখান থেকে ভিক্টরদা মন্তব্য করে উঠলেন, বেইমান।

ওরা চমকে উঠল। ভিক্টরদা ওদের চোখের দিকে চেয়ে বললেন, বেইমান ছাড়া কি? চর্ব্যচোষ্য খেয়ে এলে সেদিন, তাতে কোনো দ্বিধা হল না; এখন ওখানে গিয়ে একটা খবর নিয়ে আসতেই যত দ্বিধা। ধিক।

ভিক্টরদার ধিক্কার শুনে ওরা দৃঢ় হল। দৃঢ় হল, যাবেই। এবং এখান থেকে উঠেই সোজা যাবে নূরমহম্মদ লেনে।

কিন্তু ভগবান যাদের সহায় তাদের মারে কে। যেতে হল না তাদের। স্বয়ং বরেন এসে উপস্থিত হল।

—কি খবর, কি খবর বরেন? দাদা কেমন আছেন? বউদি?

বরেন বসল, বলল, ভালো আছেন। পরশু ভীষণ ক্রাইসিস গিয়েছে, তোমাদের খবর দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু পেরে উঠলাম না।

সলিল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখন কেমন আছেন?

—এখন ভালো। টায়ফয়েড হয়েছে। ভালোভালো ওষুধ বেরিয়েছে, ডাক্তাররা ভরসা দিয়েছেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

ভিক্টরদা বললেন, তাহলেই হল। কিন্তু খুব খরচের মধ্যে পড়েছেন তোমার বউদি। কি করে চালাচ্ছেন? তোমরাও হয়েছ এমন-সব ঠাকুরপো, এক কানাকড়ি সাহায্য করার মুরোদ নেই।

সলিল মন্তব্য করল, ঠাকুরপোরা নাহয় কিছু না, ভাশুর-ঠাকুরটিও তো আছেন। ভয় কি।

বরেন একটু বুঝি রুষ্ট হয়েছে, বলল, সাহায্য! ওই কথা একবার বলে দেখ-না, ফোঁশ করে উঠবেন বউদি।

জিতেন রক্ষিত কথা বলছিল না, এবার বলে উঠল, ওটুকু অহংকার থাকা ভালো।

বরেন বলল, অন্তত গায়ে অলংকার যতক্ষণ আছে। বউদি প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাঁচিয়ে ওঁকে তুলবেনই।

এদের কথা উৎকণ্ঠ হয়ে শুনছিল কুর্টিস, বলল, একেই বলে সতী।

কা'কে সতী বলে, এবং কা'কে না-বলে, তা নিয়ে এদের মাথাব্যথা নেই এখন, এখন ওদের একমাত্র কামনা শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠুন বৃন্দাবনবাবু।

ভিক্টরদা জিজ্ঞাসা করলেন, এখন রুগ্নীর কাছে আছে কে?

বলতে বড় সংকোচ হল বরেনের। বউদির এই অসময়েও কেউ যে আসে নি, এ কথা বলতে তার কথা আটকে যাচ্ছিল। এমন-কি তাদের বাড়ির কেউও আসে নি, এইটেই তার কাছে সবচেয়ে বড় সংকোচ। কিন্তু এরা তো কেউ চেনে না তার নতুন-মাকে, তাঁর দাপটে সকলে অস্থির। নীলিমা-বউদির বাড়িতে যাবার কথা তোলাই কষ্ট, তা হোক-না যত বড়ই দুর্ঘটনা।

ভিক্টরদা আবার প্রশ্ন করায় বরেন সংক্ষেপে বলল, বউদি।

—তবে তুমি শিগগির যাও। আর দেরি কোরো না, বরেন। বলে যাও, রাত্রিজাগার জন্যে যদি দরকার হয়, এরা যাবে। বল তো, আমিও যেতে পারি।

বরেন যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখন তো কমের দিকে, দরকার হলে খবর দেব।

বরেন চলে গেল। বরেনের চেহারাও একটু খারাপই দেখাল যেন। ঐ বেচারার একার উপর তাহলে ভার পড়েছে খুবই। ওদের আত্মীয়স্বজনেরা বর্জন করে রেখেছে ওর বউদিকে, দুর্দিনে একমাত্র ওই সহায় হয়েছে তার বউদির।

বউদির গানের খাতায় বরেনের অনেক কবিতার খসড়া লেখা আছে, রুগীর পাশে বসে সে সেইগুলি পড়ে, নীলে-নীলিমায় শারদ আকাশের সঙ্গে তার এই বউদির তুলনা করে সে আঁকিবুঁকি কেটেছিল ওই গানের খাতায়, এখনো সে-লাইনগুলো পড়া যায়। হারমোনিয়মের পাশে পড়ে থাকে গানের খাতা, থালাবাসনের জল পড়ে ভিজে চুপসে গেছে অনেক লাইন।

সেদিন বরেন যাবার পর আরও তিন-চারদিন কেটে গেল, এর মধ্যে সে আর আসে নি। তার না আসা দেখে এরা একটু ব্যস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সেদিন সে ভালো খবর দিয়ে গিয়েছে বলে এরা নিশ্চিন্তও আছে একটু।

কিন্তু নিশ্চিন্ত নেই ভিক্টরদা। তিনি আজ আবার বললেন, ধিক। খবর নিতে হয় হে, এটা নিয়ম। হয়তো আসতে পারছে না রুগী ছেড়ে, কত রকমের অসুবিধায় পড়তে পারে— অসুখবিসুখে ওষুধপত্র আনা আছে, ওসব আনার জন্যে লোক চাই। যাও, যাও, শিগগির যাও তোমরা।

ওরা যাবার জন্যে যখন উঠেছে, ভিক্টরদা বললেন, চল, আমিও যাচ্ছি। চল জিতেনবাবু, একসঙ্গেই যাই সকলে।

দল বেঁধেই চলল ওরা। ওদের ইচ্ছে, ওরা রুগীর খবর নিয়ে বরেনকে একেবারে ধরে নিয়েই আসবে। আর, রাত্রিজাগার যদি দরকার হয় তাহলে ডিউটি ভাগ করে দেবেন ভিক্টরদা।

ওরা ঝামাপুকুর লেন হয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাদের পত্রিকার চাহিদা বেড়েছে কতটা জিতেন রক্ষিত হিসেব দিচ্ছে তার। পটলডাঙার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ওরা ঠিক করল, সলিল আগে একা গিয়ে খবর নিয়ে আসবে, তারপর দরকার বুঝলে ওরা যাবে।

সেই রকম ব্যবস্থাই পাকা হল। ওরা এসে পড়েছে নূরমহম্মদ লেনের কাছে।

হ্যারিসন রোডের উপর থেকেই ওরা ঐ গলির মোড়ে একটা ভিড় লক্ষ্য করছে। কিন্তু, কলকাতার ভিড় তো, একটা মরা ইঁদুর দেখলেই মস্ত ভিড় জমে যায়।

ভিড়ের গায়ে ওরা এসে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ব্যাপারটা কি হয়েছে। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না। আরো অনুসন্ধান না করে ওরা নীলিমা-বউদির বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সেখানেও ভীষণ ভিড়।

দরজার কাছে এসে ভিক্টরদা ডাকতে লাগলেন, বরেন, বরেন, বরেন।

ওই গলার শব্দ শুনে বরেন বেরিয়ে এল ছুটে। দুই চোখ তার জলে ভরা।

ওরা সকলে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে বলল, কি, হয়েছে কি ?

কেঁদে ফেলল বরেন, বলল, বউদি সুইসাইড করেছেন।

—কি ক'রে ? কি ক'রে ?

—গায়ে স্পিরিট ঢেলে আগুন দিয়ে। বাথরুমের দরজা এঁটে বন্ধ করা ছিল। বাঁচানো গেল না।

বরেনের হাত চেপে ধরে সান্ত্বনা দেবার মত করে ভিক্টরদা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বরেন, হঠাৎ এরকম কেন—

ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বরেন বলল, ঘণ্টা-খানেক আগে মারা গেছেন দাদা।

—হোয়াট ? ওদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে দাঁড়াল কুর্টিস, ইয়োর বউদি ইজ নো মোর্ ? দাদা ইজ ডেড ?

কোনো উত্তর দিতে পারেনি বরেন।

নূরমহম্মদ লেনের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকে গেছে বরেনের। দীর্ঘকালের এই সম্পর্ক একদিনে হঠাৎ মুছে গেল একেবারে।

বারো নম্বরে সে রোজই আসে, কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না, চুপচাপ থাকে। কখনো ও-ঘরে উঠে গিয়ে ক্লাস নেয়, কখনো এ-ঘরে এসে পুরনো সংখ্যা বীজাণু নিয়ে তার পাতা উল্টে-টল্টে পড়তে থাকে।

ঐ ঘটনার পর কুর্টিসও কেমন-যেন গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে আছে। নীলিমা-বউদির এই ট্র্যাজিডিটা তার বুকেও যেন কঠিন ভাবে আঘাত দিয়েছে।

বরেন বলল, কী জেদ দেখ। আমাকে একদিন হেসে-হেসে যা বলেছিল শেষ-বেশ ঠিক তাই করল? এক চিতাতেই পুড়ল?

কুর্টিস আড়চোখে তাকাল বরেনের মুখের দিকে। নিজেকে সে খুঁজে বেরিয়েছে। মিস বিবির কাছে সব জেনে নিয়েছিল সে, তার পর লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আর ইণ্ডিয়া আপিসে চিঠি লিখে-লিখে আনিয়েছে অনেক তথ্য, সেইসব তথ্য মিলিয়ে-মিলিয়ে সে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে, নিজেকে খুঁজে পেয়েছে বলাগড়ে— বলাগড়ের এক নীলকুঠিতে।

পরের দিন সলিলকে নিয়ে কুর্টিস বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গেল, হয়তো পুরনো কালের কলকাতার খোঁজ করতে। সমাচার-দর্পণের আর সম্বাদ-কৌমুদীর সংখ্যাগুলি হয়তো আছে ওখানে। শোভাবাজারের রাজবাড়িতে ছিল, কিন্তু সেখান থেকে পরিষদ্ নাকি নিয়ে এসেছে তার সংগ্রহে।

সম্বাদকৌমুদীর জীর্ণ সংখ্যার পাতা সন্তর্পণে ওলটাতে-ওলটাতে কুর্টিস বলল, রামমোহন রায় লিখতেন এই কাগজে। সহমরণের বিরুদ্ধে লেখার জন্যে এই পত্রিকা সেকালের মানুষের বিষ-নজরে পড়ে, জান নিশ্চয়? এত লেখা হল, তবু নীলিমা-বউদিও মানল না সেই নিষেধ।

একটু হাসল কুর্টিস, ম্লান সে হাসি, চাপা গলায় সে বলল—

সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে-মাটি সোনার বাড়া

সাত পুরুষ আছি এই বাংলা দেশে।

ব'লে সে একটা ছক দেখাল সলিলকে। বলল, বলাগড়ের নীলকুঠিতে সেই ধারার সৃষ্টি। প্রথমপুরুষ হচ্ছেন ইনি— ম্যাক্‌গ্রেগর কুর্টিস, তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে একজন ফোর্ট উইলিয়মের শেরিফের দপ্তরে কাজ করতেন; আর-একজন নিমকমহলে— দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন চব্বিশপরগনার সল্ট এজেন্টের দেওয়ান, তখন তাঁর অধীনে কাজ করতেন এই পুত্রটি, আমি তাঁরই অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। তাই, এই বাংলায় বাঙালির মধ্যে সুখেতে আছি।

একটু থেমে সে বলল, ম্যাকগ্রেগরের একটি কন্যাও ছিল খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু তৃতীয় পুত্রের ও ঐ কন্যাটির আর কোনো সন্ধান পাই নি। কিন্তু চেষ্টা ছাড়িনি, সলিলবাবু।

ম্যাকগ্রেগর কুর্টিসের কাহিনীও বলল সে, কি ভাবে তিনি গঙ্গাবক্ষ থেকে এক বিপন্ন বঙ্গললনাকে উদ্ধার ক'রে তার পাণিগ্রহণ করেন। ব'লে বলল, সেই বঙ্গললনার পূর্বের কোনো সন্তান ছিল কি না এ খোঁজও করার ইচ্ছে।

পারে কি না কে জানে। কোথায় গেল তারের শাখাপ্রশাখা খুঁজতে ইচ্ছে করে খুব। তারাও তো আমার আত্মীয়।

সলিল শুনছিল ঐ কাহিনী। কি ক'রে মাইকেল কুর্টিস খুঁজেছে নিজেকে, কত চিঠি লিখেছে সে চারদিকে কত তথ্য আনিয়েছে নিজের উৎসের সন্ধানের জন্যে।—

হে অতীত, কথা বল, ছুটো কথা বল কানে-কানে
তোমার গুঞ্জনে পেয়ে যাব তবে জীবনের মানে।

সলিলের কানে বেজে উঠল কুর্টিসের লেখা ঐ ছত্র-ছুটি, সে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে।

সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে বেরিয়ে ওরা ছু-জন সার্কুলার রোড ধরে মানিকতলা বাজার পার হয়ে সোজা চলল।

কুর্টিস হেসে বলল, আমি সতীদাহের সন্তান। জোর-জবরদস্ত করে কাউকে দাহ করা ঠিক না, সলিলবাবু। নীলিমা-বউদিকে কেউ জবরদস্ত করে নি বলছেন? করেছে— করেছে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের আচরণ। তারা যদি সম্পর্ক রাখত তাঁর সঙ্গে, তারা যদি সহায় হত তাঁর, তাহলে তিনি এভাবে বিদায় নিতেন না।

নানা কথা বলতে-বলতে এগিয়ে চলেছে তারা। ছুঃখের কথা, বেদনার কথা, আনন্দের কথা।

কুর্টিস থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এই সেই মানিকতলার বাগানবাড়ি, পুলিস-ফাঁড়ি হয়েছে এখন। এখানে বাস করতেন রামমোহন রায়। এইখান থেকে হেঁটে তিনি কতদিন গিয়েছেন গঙ্গার ঘাটে।

সলিল বলল, জানি। পড়েছি তাঁর জীবনী।



॥ অন্তিম স্ফুলিঙ্গ ॥

কিছুদিন আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে কত ঘটনাই ঘটে গিয়েছে হুগলী-নদীর দুই পারে— সে খবর আমাদের রাখা হয় নি।

মাহেশের কিনার থেকে অন্তর্ধান করার পর রাধারানীর জীবনে কি ঘটেছে সে খবরও আমরা রাখতে পারি নি। বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম আমরা, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে— শতাব্দীর ওপারে।

আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনে এ সময়টা দীর্ঘ মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু একটি জাতির জীবনে এ সময় সামান্যই। মাত্র কয়েকটি বছর বাস করার জন্যে আমরা আবির্ভূত হই কোনো জাতির মধ্যে, অল্পদিনের মধ্যেই বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয় আমাদের। কিন্তু জাতির বিদায় নেই। ঐ নদীর স্রোতের মতই সে জীবিত থাকে। কখনো ফুলে ওঠে জোয়ারে, কখনো স্তিমিত হয়ে যায় ভাটায়।

বছর-দুই বাদে আবার আমরা ফিরে এসেছি পুরাতন পরিবেশে। ফিরে এসে দেখছি, কোনো দিকেই কোনো পরিবর্তন নেই। দু বছর আগেও এই শহর-কলকাতা যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে।

রামমোহন-গৃহে অধিবেশন বসছে আত্মীয়সভার। কিন্তু সভার সদস্য-সংখ্যা একটু বুঝি কমেছে। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসে

মিলিত হতেন তাঁদের অনেকেই আজ অনুপস্থিত। ব্যক্তিত্ব এক জিনিস, আর অভিমত অন্য।

কিন্তু লোকবল কমলেই মনোবল কমবে কেন। বরঞ্চ, এতে মনের শক্তি বেড়ে যাওয়ারই কথা। যখন সহায় ও সম্বলের উপর ভরসা রাখা যায় না, তখন নিজের উপরই পূর্ণ ভরসা রাখা ছাড়া গতি কি।

সেই ভরসায় ভর করেছেন রামমোহন। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা বর্জন করেছেন রামমোহনকে। কোনো রূপ পরিবর্তন বা কোনো সংস্কার পছন্দ করেন না যাঁরা, তাঁরা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন রামমোহনের। এই বিরোধিতার সম্মুখে তিনি দ্বিগুণ বলিষ্ঠ মনে দণ্ডায়মান।

পুরাতন পরিবেশে ফিরে এসে এই পরিবর্তনটুকু আপাতত আমাদের চোখে পড়ছে। চোখে পড়ছে, বেদান্তের কলম সরিয়ে রেখে সতীদাহের কলম নিয়ে তিনি নিজের অভিমত প্রকাশে রত হয়েছেন। তাঁর মাতার কাছে তিনি যে শপথ করেছেন, সে শপথ পালনের জন্যে এইবার বুঝি প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন তিনি।

অন্নদাপ্রসাদ বসে ছিলেন চুপ করে, এতক্ষণে বললেন, নিরুপম ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্কমোহন ভট্টাচার্য ও ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এঁদের হয়তো আপনি চিনবেন না— চতুষ্পাঠী আছে এঁদের। আমার কাছে গিয়েছিলেন পরশু।

রামমোহন বললেন, তাঁরা আসুন-না, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে আরাম পাব না হয়তো, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য জানা যাবে।

—বক্তব্য আর কি ? আপনি গর্হিত অন্যায় কাজ করছেন, তাঁদের বিশ্বাস এই রকম।

একটু হেসে রামমোহন বললেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের চেয়ে বড় পণ্ডিত নিশ্চয় তাঁরা নন। বিদ্যালংকার-মশায়ও তো আমার মতে বিস্তর ত্রুটি ধরেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিচার তো হয়ে গিয়েছে। এঁরা কি বলতে চান ?

অন্নদাপ্রসাদ বললেন, এঁরা প্রবর্তক। সামাজিক প্রথার কোনো পরিবর্তন এঁরা মানতে রাজি না।

রামমোহন পুনরায় হাসলেন, বললেন, পরিবর্তন হলে সমাজ বুঝি অধঃপাতে যাবে ? অসহায় নারীদের পুড়িয়ে মারলেই সমাজের মঙ্গল, এ ভুল কবে তাঁদের ভাঙবে, অন্নদাবাবু ?

এর কি উত্তর দেবেন অন্নদাপ্রসাদ? রামমোহনকে তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ। তিনি যেন ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠছেন, ক্রমশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। তাঁর মনের প্রতিজ্ঞার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে উঠছে যেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে।

রামমোহনও বসে ছিলেন, পরিপূর্ণ দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, শাস্ত্রের নামে ব্যভিচার বন্ধ করতেই হবে, অন্নদাবাবু।

অন্নদাপ্রসাদ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে নূতন সংবাদপত্রের— সমাচারদর্পণ। সম্পাদক, জন ক্লার্ক মার্শম্যান— জোশুয়া'স্ সান্ বলে যে বালকটির পরিচয় দিয়েছিলেন কেরী সাহেব অনেকদিন আগে রামরাম বসুর কাছে, সেই বালক এখন যুবক হয়ে এই কাজের ভার নিয়েছে।

নানা সমাচার প্রকাশিত হচ্ছে সমাচারদর্পণে। সুখের সমাচার অনেক আছে, সেই সঙ্গে দুঃখের সমাচারও ছাপা হচ্ছে এতে— নদীর দু-কূলে সহমরণের বার্তা।

ঐসব বার্তা পাঠ করেন রামমোহন, অমনি বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মন। ক্রমেই, তিনি লক্ষ্য করছেন, এই ধরণের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ইদানীং আরো যেন বেড়ে উঠেছে এই বীভৎসতা।

যতই বেড়ে উঠছে এই ঘটনার সংখ্যা, ততই বুঝি বল বৃদ্ধি হচ্ছে তাঁর। তাঁর যেন মনে হচ্ছে, প্রদীপ নিভবার আগে এ যেন বেশি করে জ্বলে ওঠা।

গঙ্গার ওপার থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমাচারদর্পণ, আর গঙ্গার এ পারে চোরবাগান থেকে গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করছেন বাঙ্গাল গেজেটি। তাঁর পুস্তক-ব্যবসায়ও চলেছে সমানে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত সংবাদ বাছাই করতে-করতে গঙ্গাকিশোর তাঁর বন্ধু ও সহযোগী হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, বলছেন, মশা আর মাছির উৎপাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে হে, হরচন্দ্র। এ সম্বন্ধে একটু লেখা আবশ্যক। নালা-নর্দমায় জল জমে পচে উঠছে, এ গুলি বন্ধ করা তো সম্ভব নয়, সাফ করার জন্যে অন্তত উদ্যোগী হতে হয় সকলকে।

হরচন্দ্র ছাপাখানার টাইপ সাজাচ্ছিলেন, বললেন, বন্ধ করা সম্ভব না-ই বা কেন। মারাঠা-খাল বন্ধ করে তার উপরে চওড়া রাস্তা হয়ে গেল, আর, এই সামান্য নালা বন্ধ হবে না?

—হয় তো হোক। লটারি-কমিটিকে তাহলে পরামর্শ দিয়ে কয়েক ছত্র লিখে দেওয়া যাক এই সংখ্যায় ?

গঙ্গাকিশোর বুঝি অবশেষে সেই কাজেই মনোনিবেশ করলেন।

সমাচারদর্পণে ও বাঙ্গাল গেজেটিতে যুগপৎ সংবাদাদি পরিবেশিত হচ্ছে।

কিন্তু এ সংবাদ বুঝি সব সংবাদ নয়। চলমান গেজেটিরা ভোরে গঙ্গাস্নান সমাপন করে গৃহে-গৃহে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে যথানিয়মে। কিন্তু সে অন্তরকমের সংবাদ— দান ধ্যান ব্রত পাইনের সংবাদ। এ শহরে বদান্য ব্যক্তি কে, কে তার পুত্রের অন্নপ্রাশনে কত ব্যয় করেছে, কে তার পিতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণবিদায় করেছে কি ভাবে— তারই দীর্ঘ বিবরণ বিতরণ করতে-করতে গঙ্গা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন সিমুলিয়ার দিগম্বর ভট্টাচার্য।

হাতে তামার কোশাকুশি ও পিতলের ছোট ঘণ্টা। গঙ্গামৃত্তিকায় ললাট চর্চিত, পরিধানে সিক্ত পট্টবস্ত্র।

পোস্তার নিত্যানন্দ পালের বৈঠকখানায় ঢুকে বিনা ভূমিকায় তিনি বললেন, দানে-ধ্যানে তোমার জুড়ি পাওয়া ভার হে নিতাই। কিন্তু তোমার সে গৌরব বুঝি যায়। জোরবাগানের যোগেন্দ্র বসাক আর জোড়াসাঁকোর কৃপানাথ শিকদার কী দানটাই করল পরশু— গোব্রাহ্মণে তাদের কী অচলা ভক্তি। পিতার শ্রাদ্ধ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটি করে পালঙ্ক, এক জোড়া করে গরদের থান, পঞ্চাশটি করে মোহর।

নিতাই পাল স্তব্ধ হয়ে বসে শুনল বৃত্তান্ত। দানের বৃত্তান্তের যেন শেষ নেই, দিগম্বর বলে যেতেই লাগল।

একটু দম নিয়ে গলার স্বর একটু নামিয়ে সে বলল, আর ইয়ে, আহিরিটোলার অনুকূল পোদ্দার, আগে যেমন ছিল দানে মুক্তহস্ত, এখন তেমনি হয়েছে কঞ্জুস। ছি ছি।

টুংটুং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে বলল, তার পুত্র মারা গেল, পুত্রবধূ হল সতী। এত বড় শুভ-উৎসবে ব্রাহ্মণের যা পাওনা তা দিতে কত গড়িমসি। শেষপর্যন্ত দিল অবশ্য।

আর কে-কে দানে খ্যাতিমান হয়ে উঠছে, আর কে-কে হয়ে উঠছে কৃপণের অধম, উঁচু আর নীচু গলায় তাদের নাম ও বংশপরিচয় দিয়ে বিদায় নিল দিগম্বর। যাবার সময় বলল, ওঁ, কল্যাণমস্তু, শতং জীব, শতায়ু ভব।

আশীর্বাদ করে পোস্তার রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে চলল দিগম্বর।

জোড়াসাঁকোর অনাদিনাথ পোদ্দারের গদিতে দাঁড়িয়ে ঐ একই বৃত্তান্ত দাখিল করল, তারপর দর্জিপাড়ার ইন্দুভূষণ মল্লিকের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দুভূষণকে বলল ঐ একই কথা— প্রাতঃভ্রমণ করে ইন্দুভূষণ তখন ফিরছিল।

গৃহে-গৃহে সংবাদ বিতরণ করে দিগম্বর যখন প্রাতঃস্নান সেরে নিজ গৃহে ফিরল রোদ তখন তেতে উঠেছে।

অচিরেই এই সংবাদ ছড়িয়ে যায় চারদিকে। এক মুখ থেকে অন্য কানে, সেখান থেকে অন্যত্র।

যাদের খ্যাতি এর দ্বারা বিপন্ন হয়ে ওঠে তারা নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

খাজাঞ্চিবাবুকে ডেকে নিত্যানন্দ পাল হিসাব তলব করে। কোন্‌খানে কবে ত্রুটি হয়েছে ব্রাহ্মণবিদায়ে খোঁজ করে তার। বলে, আপনাদের জন্যে মানমর্যাদা কিছু রাখা যাবে না, খাজাঞ্চিবাবু। সাশ্রয় করতে হয় তো অন্য কোনো বিষয়ে করুন, ব্রাহ্মণবিদায়ে সাশ্রয় করা— এর চেয়ে মহাপাতক আর নেই, খাজাঞ্চিবাবু।

খাজাঞ্চিবাবু মেনে নেন এই সতর্কবাণী। নীরবে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝি কবুল করেন তাঁর ত্রুটি, এবং ভবিষ্যতে এ-রকম বেহিসাব আর হবে না ব'লে যেন প্রতিশ্রুতিই দেন।

মুখে-মুখে যে-সংবাদ রটে, লিখিত সংবাদের চেয়ে তার গুরুত্ব একটু বেশি বলেই মনে করে সকলে। এইজন্যে দিগম্বর ভট্টাচার্যদের তুষ্ট রাখার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না।

খ্যাতি বা অখ্যাতি নিয়ে যারা বিব্রত তারা সহজেই ঐসব সংবাদে বিচলিত হয়, কিন্তু সুনাম-দুর্নাম গ্রাহ্য করে না যারা তারা দিগম্বরদের করুণা করে, এবং সম্ভবত ঘৃণাও করে। মানুষের দুর্বলতাই যাদের জীবনের মূলধন, প্রকৃতপক্ষে তারা যে কত অসহায় এবং কতটা দুর্বল তার পরিমাপ করতে বসে সময় নষ্ট করা বৃথা।

প্রত্যহ প্রাতের নিয়ম অনুসারে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর গোলোকদাস নাপিত সংবাদপত্র নিয়ে এসে রামমোহনের পাশে বসল। নিজের মনে বৈষয়িক কাজ করে চলেছেন তিনি, আর গোলোক দাস সংবাদ পড়ে শোনাচ্ছে। তিনি সব সংবাদ শুনছেন কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে

না। কিন্তু মাঝে-মাঝেই তিনি একটু মাথা তুলে তাকাচ্ছেন গোলোকদাসের দিকে।

চা এল। চা পান করতে-করতে তিনি শুনতে লাগলেন সংবাদের পর সংবাদ।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকাতেই, এই-যে, হেয়ার সাহেব?

—গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং। রামমোহন তাঁকে প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, কাম ইন প্লিজ। বসুন।

রামমোহন তাঁর পাশে বসে বললেন, এ রেইন অব টেরর ইজ গোয়িং অন হিয়ার ইন দিস কান্ট্রি।

কি ব্যাপার জানতে চাইলেন ডেভিড হেয়ার। একে-একে সব বলে যেতে লাগলেন রামমোহন। গোলোকদাস এতক্ষণ তাঁকে যেসব সংবাদ পড়ে শোনাল তারই সারাংশ বলতে লাগলেন তিনি।

একটু থেমে বললেন, দি কান্ট্রি নিড্স্ এ স্ট্রং গবর্নর-জেনারেল।

তাঁর মনের উদ্বেগ অশান্তি ও প্রতিজ্ঞার বিষয় নিয়ে হেয়ারের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন রামমোহন, বললেন, দেশের লোক শত্রু হয়েছে আমার। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না আমি তাদের শত্রু নই। আমাকে সংহার করে তাদের কোনো লাভ হবে না। হুগলীর জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ওকেলি সাহেবের রিপোর্ট পড়েছেন নিশ্চয়?

হেয়ার তাঁর সটাক মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, পড়েছেন।

কলকাতার এবং তার আশপাশের অঞ্চলের বাসিন্দারা সব রকম নৈতিক স্খলনের ও নানারকম অনাচারের সম্রাট হয়ে উঠেছে, কলকাতা হচ্ছে কালীক্ষেত্র, এই কালী যেন হয়ে উঠেছেন যত-সব মস্তপের ডাকাতের ও চোর-বাটপাড়ের ঈশ্বরী; কলকাতায় কালীসাধকের সংখ্যাই বেশি— এই সাধকেরা সতীদাহকে কোনো রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে না, মনে করে একটা আমোদ-প্রমোদের উৎসব বলে। এই জন্যেই এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুতহারে।

হুগলীর জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এই রিপোর্টের সঙ্গে রামমোহন একমত তো বটেনই, হেয়ারও ঐ মত পোষণ করেন জানালেন।

রামমোহন বললেন, এত যে বেড়ে উঠেছে তারা তার অন্য কারণও অবশ্য আছে। বছর-পাঁচেক আগেও এসব ব্যাপারে পুলিস হস্তক্ষেপ করে নি। তখন লোকে জানত, গবর্নমেণ্ট এ প্রথার ঘোরবিরোধী। এইজন্যে ভয়ে-ভয়ে কাজ সারত। কিন্তু এখন পুলিস হস্তক্ষেপ করছে—কাজটা শাস্ত্রীর বিধান অনুযায়ী হচ্ছে কি না দেখার জন্যে গবর্নমেণ্টের নির্দেশ জারী হয়েছে। এই নির্দেশের ফলেই লোকে ধরে নিয়েছে, এতে সরকারী অনুমোদন আছে। তাদের ভয় ভেঙে গিয়েছে। পুলিসকে এখন শুধু বুঝিয়ে দিলেই হল যে, হ্যাঁ, শাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম পালন ক'রেই এই অনুষ্ঠান তারা করছে।

হেয়ার বললেন, Yes, they are burning a score or even two score women with one quite unimportant man. I recently read of a pyre kept alight for three days, while relays of widows were fetched from a distance।

হেয়ারের কথা শুনতে-শুনতে দুই চোখ বুঝি রক্তবর্ণ হয়ে উঠল রামমোহনের, দাঁতের উপর দাঁত বুঝি চেপে বসে গেল। বললেন, আমাকে খুন করতে চায়, তা ওরা পারে অনায়াসে। সামান্য একটা মানুষের চিতায় অতগুলি নারী বিসর্জন যারা দিতে পারে, তাদের অসাধ্য কিছু নেই। একটা চুল্লি জ্বালিয়ে রেখে জীয়ন্ত-জীয়ন্ত মেয়েদের দূর-দূরান্তর থেকে টেনে নিয়ে এসে যারা নিক্ষেপ করতে পারে ঐ অগ্নিকুণ্ডে, তারা না-পারে কি ?

একটু থেমে বললেন, আমি খুন হতে রাজি আছি।

এঁরা কথা বলছেন, এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন অন্নদাপ্রসাদ ও দ্বারকানাথ।

—আসুন। আসুন। অভ্যর্থনা করলেন রামমোহন, জিজ্ঞাসা করলেন, আরও কার পায়ের শব্দ যেন পাচ্ছি, আর-কেউ এসেছেন নাকি ?

অন্নদাপ্রসাদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকেই বললেন, হ্যাঁ, এসেছেন ওঁরা— ভট্টাচার্য-মশায়রা।

উঠে পড়লেন রামমোহন, দরজার কাছে এসে বললেন, এই-যে আসুন, আসুন।

অনেকে এসেছেন— মৃগাঙ্কমোহন ত্রৈলোক্যনাথ নিরুপম, আর এসেছেন দিগম্বর।

প্রশস্ত ফরাসের উপর ভট্টাচার্য-মহাশয়েরা বসলেন এক ধারে, অন্য ধারে রামমোহন এবং তাঁর আত্মীয়ত্রয়।

রামমোহন হেসে বললেন, আপনারা আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আপনাদের ক্রোধের হেতু জানার আমার আকাঙ্ক্ষা।

অন্যান্য ভট্টাচার্যদের মুখের দিকে চেয়ে ত্রৈলোক্যনাথ একটু বিচলিত হয়ে বললেন, আপনি হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করছেন।

—উহুঁ। মাথা নাড়লেন রামমোহন, বললেন, একে বিরোধিতা বলছেন কেন, এ হচ্ছে সংস্কারপ্রচেষ্টা। আপনারা বিজ্ঞ, আপনারা মান্য—ধর্ম হচ্ছে জীবের সেবা, জীবের সংহার নয়।

সংহার? বলে কি এই ম্লেচ্ছটা? রামমোহনের কথা শুনে চমকিত হয়ে উঠলেন ওঁরা, গায়ের থেকে নামাবলী ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বললেন, হারীতের স্মৃতির অনুসারে এই সহমরণ ও অনুমরণের ব্যবহার করা হচ্ছে।

—তদনুসারে কি হচ্ছে ভট্টাচার্য-মশায়? যে বচনের যে অর্থ আপনারা করেছেন তার দ্বারাও বলা হয়েছে— স্বেচ্ছায় জ্বলচ্চিতায় নারীরা আরোহণ করতে পারে। কিন্তু কার্যত, অগ্রে বিধবাকে পতির দেহের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন করা হয়, তার উপর কাষ্ঠ দেওয়া হয়, তার পর অগ্নি সংযোগের কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দ্বারা চুপিয়া রাখা হয়। কোন হারীত-বচনে এ রূপ নির্দেশ আছে অনুগ্রহ করে বলুন।

ত্রৈলোক্যনাথ বললেন, বন্ধনাদির নির্দেশ শাস্ত্রপ্রাপ্ত নয় বটে, কিন্তু এইরূপই পরম্পরায় হয়ে আসছে। এই জন্যেই এরূপ করা হয়।

রামমোহন হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না, বললেন, আপনার এ যুক্তি বড় হাস্যকর। স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ চৌর্যাদি কর্ম যদি কোনো-এক বিশেষ অঞ্চলে, কোনো বর্বর জাতির মধ্যে, প্রচলিত থাকে তাহলে ঐসব কর্মকে আমরা কি সৎকর্ম রূপে গ্রহণ করব?

ত্রৈলোক্যনাথ এর উত্তর দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে দিগম্বর ভট্টাচার্য বলে উঠলেন, এরূপ সহমরণে বা অনুমরণে পাপই হোক কিংবা যাই হোক, আমরা এ ব্যবহার নিবারণ করতে দিতে সম্মত নই। এর কারণ এই যে, এ প্রথা বন্ধ হলে এরূপ আশঙ্কা আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী যদি সহগমন না ক'রে বিধবা অবস্থায় থাকে তাহলে তার ব্যভিচার হওয়ার

সম্ভাবনা। কিন্তু সহমরণ করলে এ আশঙ্কা থাকে না, জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হয়ে থাকেন এবং পতিও জেনে যেতে পারেন যে তাঁর অবর্তমানে স্ত্রীঘটিত কোনো কলঙ্কের চিন্তা নাই।

হেয়ার সাহেব বাংলা তেমন বলতে পারেন না বটে, কিন্তু বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয় না। তিনি এই যুক্তি শুনে হেসে তাকালেন দ্বারকানাথের দিকে। দ্বারকানাথ ও অন্নদাপ্রসাদ খাটো গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপে রত হলেন।

রামমোহন এ যুক্তির কি প্রত্যুত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না, কেবল বললেন, কেবল আশঙ্কা দূর করার জন্যে এইরূপ নৃশংস কাজে উৎসাহ দান করতে চান? পতি বর্তমান থাকতেও তো এমন আশঙ্কা থাকতে পারে। তার কি উপায়?

দিগম্বর বললেন, স্ত্রীলোকেরা অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তকরণ, বিশ্বাসের অযোগ্য, সানুরাগা, ধর্মজ্ঞানশূন্য।

এবার উত্তেজিত হয়েছেন রামমোহন, তাঁর কণ্ঠস্বর সহসা উচ্চগ্রামে উঠে এল, বললেন, অত অনায়াসে তাদের অল্পবুদ্ধি বললেন, কিন্তু তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে নিয়েছেন? বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানশিক্ষা দিয়েও যদি দেখা যায় তারা তা গ্রহণে অক্ষম, তবেই অল্পবুদ্ধি বলা সাজে। আপনারা তাদের এ সুযোগ দেন না, সহজেই অল্পবুদ্ধি বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। আপনারা জ্ঞানী লোক, আপনাদের জ্ঞান দান করা আমার অর্বাচীনতা। তবুও বলি, কালিদাসের পত্নী, কর্ণাটরাজের পত্নী, লীলাবতী, ভানুমতী প্রভৃতি নারীর কথা আপনারা জানেন— তাঁরা সর্বপ্রকার শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন ব'লে খ্যাত; যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন, এবং মৈত্রেয়ী তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণে সক্ষম হন। আর, আর-একজনের নাম এই সঙ্গে করি, তিনি সুদূর কালের নারী নন্, আমাদেরই কালের এবং আমাদের চাক্ষুষ দেখা— হটীবিদ্যালংকার। তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের বিষয় আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে নারীদের অল্পবুদ্ধি বিবেচনা করে তাদের প্রতি অবিচার করা কি সংগত? আর, আপনাদের দ্বিতীয় অভিযোগ, তারা অস্থিরান্তঃকরণ। আপনাদের এ কথায় আশ্চর্য হয়েছি। অগ্নির নাম শুনলে যে দেশের পুরুষ মৃতপ্রায় হয়, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করে— এ তো আপনারা প্রত্যক্ষ

দেখেন, তবুও তাদের অস্থিরান্তঃকরণ বলেন? আপনারা পারবেন জলন্ত চুল্লিতে ঝাঁপ দিতে?

একটু থেমে পুনরায় তিনি বললেন, তারা বিশ্বাসের অযোগ্য, তারা বিশ্বাসঘাতক? এ দোষ পুরুষে অধিক, কি, স্ত্রীতে অধিক? প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে কত পুরুষ তাদের স্ত্রীকে এবং কত স্ত্রী তাদের স্বামীকে প্রতারণা করছে তার হিসাব রাখেন? প্রতারিতা স্ত্রীর সংখ্যা অন্তত দশ গুণ, এবং পুরুষের এই প্রতারণা-কার্য দোষের মধ্যেও গণ্য নয়। দৈবাৎ কোনো নারী ওরূপ অপরাধ করলে তার কি দশা হয়? তাদের বলছেন সানুরাগা। কিন্তু এক-একটি পুরুষ দুই তিন দশ কি তদধিক বিবাহ করেন; কিন্তু স্ত্রীর পতি এক, এবং তিনি মৃত হলে কি ঘটনা ঘটে তাদের অদৃষ্টে?

আবার একটু থামলেন রামমোহন, বললেন, তাদের আপনারা ধর্মজ্ঞান -শূন্যতার অপবাদ দিচ্ছেন। এ হচ্ছে ঘোর অধর্মের কথা। কত দুঃখ যন্ত্রণা তিরস্কার অপমান সহ্য করেও ধর্মভয়েই তারা সব সহ্য করে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থের নিমিত্ত কতগুলি বিবাহ করেন? বিবাহের পর সব স্ত্রীর সঙ্গে জীবনে আর সাক্ষাৎ করাই সম্ভব হয় না। তবু ধর্মভয়েই তাঁদের সেইসব পত্নী পিতৃগৃহে ভ্রাতৃগৃহে পরাধীন অবস্থায় কত গ্লানি সহ্য করে জীবন যাপন করে? তবু বলেন, ধর্মভয় তাদের নাই?

ফরাশ থেকে নেমে উঠে দাঁড়ালেন রামমোহন। চাপকানে পায়জামায় ও পাগড়িটুপিতে আচ্ছাদিত তাঁর আপাদমস্তক। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, নমস্কার।

ভট্টাচার্য-মহাশয়েরা ফরাশ থেকে নেমে এলেন, প্রতিনমস্কার করলেন তাঁরা।

রামমোহন বললেন, মৌখিক সামান্য আলোচনা হল মাত্র। বিস্তারিত ভাবে এই কথোপকথন আমি লিপিবদ্ধ করে মুদ্রিত করে অবিলম্বেই বিতরণ করব। আপনারাও পাবেন।

ভট্টাচার্যেরা বিদায় নিচ্ছেন, এমন সময়ে ব্যস্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল গোলোকদাস।

—কি খবর, গোলোক?

গোলোকদাস বলল, কাশীমিত্তিরের ঘাটে সতী হচ্ছে। অনেক লোক এসেছে ভিড় ক'রে।

একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রামমোহন তাকালেন তাঁর আত্মীয়ত্রয়ের দিকে, বললেন, গাড়ি জুৎতে বলো, গোলোকদাস।

ভট্টাচার্যেরাও এই সংবাদ শুনলেন। তাঁরা দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন।

অন্নদাপ্রসাদ একটু বুঝি ভীত গলাতেই বললেন, কোথায় যাবেন?

—কাশীমিত্তিরের ঘাটে।

ফরাশ থেকে নামতে-নামতে দ্বারকানাথ বললেন, এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে? চারদিকে সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

রামমোহন তার উত্তরে বললেন, আমিও কম ক্ষিপ্ত নই, দ্বারকানাথ।

হেয়ার কোনো কথা বললেন না। হয়তো কোনো পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু গাড়ি জুৎতে যখন বলা হয়েই গিয়েছে তখন আর ও মানুষটিকে বাধা দেওয়া যাবে না। শুধু বললেন, লেট্'স্ অ্যাকম্প্যানি হিম।

আগে-আগে রওনা হয়ে গেল রামমোহনের ঘোড়াগাড়ি। পিছনে ঝালরদার পালকি চলল তিনটি। গাড়িটা গেল রাস্তা ধরে, পালকি চলল খানা-ডোবার পাশ দিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে— এতে পথ অনেক কম হবে, তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে।

ওঁদের পালকি যখন ঘাটে এসে পৌঁছল তখন শ্মশানভূমিটায় যেন তিলধরণের স্থান নেই। তাঁরা তিনজন সেই জনতা ভেদ করে অগ্রসর হলেন। মান্য ব্যক্তিদের আগমন দেখে জনতার মধ্যের অনেকে বিস্মিত হয়েছে।

তাঁরা ভিতরে এসে প্রবেশ করে দেখলেন, চিতা সজ্জিত হয়ে আছে, তার পাশে আম্রশাখা-হস্তে বসে আছে রোরুদ্যমানা এক মহিলা, রুক্ষ চুল পড়েছে চোখে-মুখে, পরনের বস্ত্র বিস্রস্ত।

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছেন রামমোহন, কেন সে সংকল্প করেছে মৃত্যুবরণ করার জন্যে, এ কাজের জন্যে কেউ তাকে প্ররোচনা দিয়েছে কি না, বেঁচে থাকায় তার সম্মতি নেই কেন। তাকে যদি আজ রক্ষা করা যায় ঐ চিতা থেকে তবে সে সুখী হবে কি না।

কেঁদে উঠল মহিলাটি, বলল, না না না। বাঁচতে আমি চাই না। আমাকে বাঁচালে আমি মরে যাব।

অদূরে দণ্ডায়মান পুরোহিত বিজ্ঞের মত শির আন্দোলন করলেন। এবং

তাঁর পাশের পুলিসের লোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। পুলিশকে কিছু হয়তো বুঝিয়ে দিচ্ছেন পুরোহিত।

জনতার মধ্যে উল্লাসের গুঞ্জন বেজে উঠল, তারা আপত্তি জানিয়ে বলতে লাগল, এই মৌলভীটা এসেছে কেন এখানে।

কে এক-জন বলল, আসবে না? হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করতে হবে না? ঘরে বসে আবার বেদান্ত পাঠ করা হয়!

অথর্ব বৃদ্ধ এক ব্যক্তি দন্তশূন্য মুখের মাড়ি ঘষে বলে উঠল, উঃ, মস্ত বড় বৈদান্তিক।

দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটা জোয়ান ছেলে পাশেই, সে ঐ বৃদ্ধটির দিকে চেয়ে বলল, না দাদু। বৈদান্তিক উনি হবেন কেন, বৈদান্তিক আপনি।

কথাটার তাৎপর্য প্রথমে বুঝতে পারেনি বৃদ্ধটি, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পেরে মুখ বিকৃত করল সে, কি একটা অশ্রাব্য কথা বলে বসল। সে মুখের দিকে তাকালে মনে হয় ওটা বুঝি একটা দন্তহীন বিভীষিকা।

গরানহাটা রামবাগান চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে স্নানার্থিনীরা এসেছিল গঙ্গায়। কেউ স্নান সেরে, কেউ-বা স্নানের আগেই উঠে এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে ঝাঁক বেঁধে। একটু আগেও তারা খলখল কলকল শব্দে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। কিন্তু ঐ মস্ত-মানুষটিকে এবং আরো তিন জনকে একেবারে চিতার কাছে চলে আসতে দেখে চুপ করে গিয়েছে তারা। চুপ করে যেন চাপ বেঁধে গিয়েছে। কারো চোখের কোণে কালি, কারো নাকে মোতির নোলক, কারো বা নিতম্বে রুপার গোট— কিন্তু সকলেরই মুখ কেমন মাজা-ঘষা পালিশকরা। তাই মনে হয় যেন একটা ফুলের তোড়াই ওরা।

ওই তোড়ার মধ্যের একটি ফুলের দিকে যদি নজর পড়ে গিয়ে থাকে, নজর পড়া মাত্র যদি বুকের মধ্যে দপ্ করে উঠে থাকে, তা হলে, হে পাঠক হে পাঠিকা, আপনাদের অনুরোধ করব সে চোখ ফিরিয়ে আনতে। যদি চোখ ফিরিয়ে আনতে না পারা যায় তাহলে বন্ধ করুন চোখ। রুদ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে শুনুন কি বলছেন রামমোহন রায়!

দৃপ্ত গলায় রামমোহন বলছেন, মেনে নিয়েছি, এ চায় সতী হতে। জোর নয়, জবরদস্তিও নয়, স্বেচ্ছায় এ চায় সহমৃতা হতে। তবে, ও-ব্যবস্থা কেন। আগেই স্বামীর পাশে শায়িত করে রজ্জুতে বেঁধে কাষ্ঠ চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা

কেন। অগ্রে জ্বলিত হোক চিতা, সেই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করুক এ। শাস্ত্রের এই তো বিধান।

থানার দারোগাবাবু উঠে এসে দাঁড়ালেন রামমোহনের পাশে। রামমোহন তাঁকে বললেন, হ্যাঁ, শাস্ত্রের বিধান এই— অগ্রে চিতা জ্বলিত হবে, তার পর স্বেচ্ছায় আরোহণ করবে সেই চিতায়।

বিধান এই? বেশ। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। বলল, আমি রাজি আছি। চিতা জ্বালানো হোক তবে আগে।

ফুলের তোড়ার মধ্যে যে ফুলটির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়েছিল আপনাদের, এবার চেয়ে দেখুন— সে কুসুমে যেন কীট, সে ফুলের পাপড়ি ভিজে উঠেছে বুঝি শিশিরে, নাকে তার মোতির নোলক নেই, কিন্তু দুচোখে ফুটে উঠেছে দুটি টলটলে মুক্তো।

সেদিন ফিরে গেলেন রামমোহন। তাঁর সঙ্গেসঙ্গে ফিরে গেলাম আমরাও। মেয়েটার মনের জোর দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন তিনি, আমরাও কম স্তম্ভিত হই নি।

সমবেত জনতা বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে, সে বিদ্রূপে কর্ণপাত না ক'রে ফিরে গিয়েছেন তিনি। ঐ জনতার বিশ্বাস, তাদের কাছে হার মেনে যেতে হয়েছে ওই মৌলভীকে।

কিন্তু হার-জিতের প্রশ্ন নয়। আবার কোনো সংবাদ পাওয়া মাত্র গিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন ঘাটে-ঘাটে। পরাজয়ই যদি তবু বলা হয় একে, তাহলে একদিন যাকে পরাস্ত হতে হয়েছে তার কাছে বারবার পরাভূত হয়েছে জনতা। জনতা পরাভূত হয়েছে বটে, কিন্তু ধর্মের ধারক ও বাহক যারা তাদের পরাস্ত করা বড় কঠিন। কত যুগযুগান্তর পূর্ব থেকে কত চেষ্টা হয়েছে এই প্রথা-রদের; কিন্তু অদ্যাবধি তা সম্ভব হল না। মোগল বাদশাহেরা অনেক চেষ্টা করেছেন, হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত যাতে না লাগে এইজন্যে অতি সতর্কভাবে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু সফল হয় নি তাঁদের সে প্রয়াস। পেশবা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সত্তবিধবাদের নিবৃত্ত করার জন্যে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিবারণ করা সম্ভব হয় নি তাঁদের দ্বারাও। বৃটিশ সরকারও চেষ্টা করছেন অনেকদিন থেকে, কিন্তু তাঁদেরও এ চেষ্টার মধ্যে তেমন দৃঢ়তা নেই। এ পর্যন্ত যতটা জানা যায় তাতে দেখা যায়— বৃটিশ সরকারের এ-বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হচ্ছে সেই-বছরে, যে বছরে জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন।—ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ-ভারতে।

ক্যাপটেন টামিন নামে এক শ্বেতাঙ্গ এক সদ্যবিধবা রমণীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে নিরাপদ এলাকায় ; তার এই কার্যের জন্যে একদল জনতা তাকে আক্রমণ ক'রে এক বিরাট দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

রামমোহনের জন্ম-বৎসরে যখন এ-দেশে প্রথম বৃটিশ চেষ্টা আরম্ভ, তখন রামমোহনকে জীবনপণ করেই চেষ্টা করতে হবে সেই বৃটিশ গভর্নমেন্টকে দিয়েই এ-কাজ সম্পাদন করতে পারা যায় কি না। এই জন্যেই তিনি চান একজন স্ট্রং গভর্নর-জেনারেল। দ্বিধা থাকবে না যার মনে, দৃঢ় মনে যে তার সংকল্প ঘোষণা করতে পারবে।

ভট্টাচার্যদের সঙ্গে কথোপকথনের মুদ্রিত বিবরণ প্রচারিত হয়েছে—সহমরণবিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের সম্বাদ।

দিন গত হচ্ছে ক্রমশ। বছরও কাটল। নানা প্রকারের কাজের মধ্যে নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছেন বটে তিনি, কিন্তু তাঁর প্রধান কাজের কথাটি বিস্মৃত হন নি। সহমরণ-বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কাজ অগ্রসর হয়েছে কতটা তার পরিমাপ করতে তিনি পারেন না। এখনো সংবাদ পাওয়া-মাত্র তিনি যাত্রা করেন গঙ্গার ঘাটে, স্বামীর মৃত্যুতে শোকাকুল নারীদের চরম পন্থা অবলম্বন থেকে তাদের নিবারণ করার জন্যে তাদের সঙ্গে কথা বলেন, পুরোহিতদের সঙ্গে তর্ক হয়। কিন্তু শান্ত সমাহিত অবস্থায় অটল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। চতুর্দিকে যেন শত্রুব্যূহ, তার মধ্যে তিনি যেন অসহায় অভিমন্যু। কিন্তু সেই ব্যূহ থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসার পথ তাঁর অজানা নয়।

গঙ্গাকিশোরের বাঙ্গাল গেজেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন সমাচারদর্পণ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু সে পত্রিকা মিশনারিদের পত্রিকা ; এবং সে পত্রিকার থেকে রামমোহন সংবাদ অবগত হতে পারেন মাত্র, নিজের অভিমত ব্যক্ত করার জন্যে আবশ্যক বোধ করেছেন আর-একটি সংবাদপত্রের। এই জন্যে প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে সম্বাদকৌমুদী। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে ব্যক্ত করে চলেছেন অভিমত। সাধারণ শ্রেণীর পাঠকদের জন্যেই অবশ্য এ পত্রিকা, কিন্তু সেইসঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যও তিনি উপকরণ দান করে চলেছেন এতে। সবই করে চলেছেন বটে, কিন্তু সব উপকরণের মধ্যে থেকে প্রকৃত উপকরণ যা স্পষ্ট রূপে দেখা যায় তা হচ্ছে সহমরণের উচ্ছেদ-সাধনের যুক্তি।

হিন্দু ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দানের জন্তে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু দুর্নাম তাঁর রটেছে এতই যে, তাঁর এ কাজটিও কেউ সমর্থনের চোখে দেখছে না।

স্কুল পরিদর্শন করে তিনি দ্বিপ্রহরে পথে অপেক্ষমাণ তাঁর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছেন, দেখলেন কাঁধে হাত দিয়ে দুটি যুবক চলেছে রাস্তা দিয়ে, তারা বলছে

খানাকুলের বামুন একটা করেছে ইস্কুল
জেতের দফা হল রফা, থাকবে নাকো কুল।

হাসিই পায় ঐ ছড়া শুনে। হাসি পায় নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে না, ঐসব ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভেবে।

কিন্তু ভেবে লাভ নেই কোনো। এদের স্বাজাত্যবোধ যতদিন না জাগবে, নিজেদের কূপমণ্ডুকতা যতদিন না ঘুচবে, ততদিন ওদের কুল রক্ষা করে কে। খানাকুলের কোনো বামুনও পারবে না, গোকুলের কোনো কুলপতিরও সাধ্য নয়।

কয়েকদিন পরেই মানিকতলার বাগানবাড়ি সেজে উঠল আলোকের মালায়। গেলাশী বাতিদানে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সারা গৃহ। প্রতি ঘরের দরজায়-জানালায় নতুন পর্দা বিলম্বিত হল। ঘরে-ঘরে আলোর ফুলঝুরি। অতিথি-অভ্যাগত এসে পৌঁছচ্ছেন একে একে। ঝালরদার পালকি, চেয়ার-পালকি, রুপো দিয়ে মোড়া পালকির হাঙর-মুখো বাঁট।

কি ব্যাপার? ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন নাকি ঐ মৌলভী সায়েব? এত সায়েব আর এত সায়েবানের ভিড, এত কালা বিবি আর গোলাপি বিবির আমদানি যে!

সিমুলিয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করে কেউ, কেউ-বা এই পথ দিয়ে গড়পারে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায়। ব্যঙ্গ করে বলে— সারা শহর আঁধার-ঘেরা, রামের ঘরে বাতি। শহরের সব আলো কুড়িয়ে এনে জড়ো করেছে বুঝি এখানে?

মানিকতলার বাগানবাড়িতে আজ উৎসব। বেনিয়ান রামমোহন আর আত্মীয়সভার রামমোহন শহরে শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ কাউকেই আমন্ত্রণ করতে ত্রুটি করেন নি। কয়েক দিন আগে খবর এসেছে— আফ্রিকায় আবিসিনীয়দের জয় হয়েছে। তাদের সেই বিজয়কে উপলক্ষ্য করে আজ এখানে এই আনন্দ-সমাগম।

বাজির খেলা চলেছে আকাশে। হুশ-শ শব্দে উধাও আকাশে উড্ডীন হচ্ছে হাউই। রঙবেরঙের আলোর ফুল ফুটে উঠছে শূন্যে।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তলোয়ার বল্লম আর বর্শার খেলা দেখাচ্ছে বাজিকরেরা। সহস্র মোমের আলো তাদের গায়ে পড়ায় মনে হচ্ছে তারা যেন মানব নয়, ময়দানব।

ঘরে-ঘরে বেজে চলেছে বাজনা, নর্তকীদের নূপুর থেকে-থেকে বেজে-বেজে উঠছে তার তালে-তালে। নিকি নর্তকী এসেছে। যত-সব সেরা-সেরা নাচিয়ে এসে থাক্ এই কলকাতা শহরে, নিকির জুড়ি হতে আজও কেউ পারে নি। এখন বয়স হয়েছে তার একটু, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না, নাচের পা-দুটো এখনো তার কচি। রাঙা সাটিনের পায়জামার উপর সবনম মসলিনের ঘাগরা, একটা পাক খেলেই ছড়িয়ে প'ড়ে প্রায় সারা ঘর ঘিরে ধরে ঐ ঘাগরা। কৈজ বক্‌স্‌এর আসার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারে নি। জিন্নত বাই এসেছে, সুপনজান এসেছে, হিঙ্গুল এসেছে, আর এসেছে নতুন নর্তকী— রানী-বাই।

ঘরে-ঘরে নাচছে নর্তকীরা। অতিথি-অভ্যাগতেরা পান চিবচ্ছেন আর ঐ নাচ দেখছেন।

দক্ষিণদুয়ারি হল-ঘরে নাচছে রানী-বাই। দিব্য নাচ নাচছে। নিকির নাচ থামা মাত্র সে ঘর থেকেও অনেকে এসে জড়ো হয়েছেন এখানে।

দু জন বিদেশিনী একদৃষ্টে দেখছেন ঐ নাচ। একজন হচ্ছেন শ্রীমতী বেলনস, আর-একজন ফ্যানি পার্কস্‌। দুজনেই স্কেচ এঁকে নেবার জন্যে ব্যস্ত। ঐ ওরিয়েন্টাল চোখ, ওরিয়েন্টাল মুখ, আর ওরিয়েন্টাল ফিগার খুব পছন্দ হয়েছে তাঁদের।

শ্রীমতী বেলনসের অ্যালবাম পূর্ণ হয়ে উঠেছে নানারকম চিত্রে। কিন্তু শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস মাত্র কয়েক বছর হল এসেছেন এ দেশে, তাঁর চিত্রের পরিমাণ এখনো তাই কম।

দুজনে বসে-বসে নাচ দেখছেন ও আউটলাইন এঁকে নিচ্ছেন তাঁদের খাতার পাতায়।

অতিথি-অভ্যাগতদের সমাদর করে ঘরে-ঘরে ঘুরছেন গৃহকর্তা। তাঁর সমাদরে সকলেই প্রীত, কিন্তু তার চেয়েও প্রীত এই উৎসবের আয়োজন হয়েছে যেজন্যে, সেই কারণটির কথা ভেবে। কোন্ দূর দেশে অজানা অচেনা

মানুষেরা জয়ী হয়েছে, সেই জয়কে মানুষের জয় হিসাবে বরণ করে এই আনন্দোৎসবের আয়োজন।

এ-ঘরে এসে উপস্থিত হলেন রামমোহন। কেদারায় বসলেন তিনি। বেলনস পরিচয় দিলেন নিজের, তাঁর নবীন বান্ধবীটির সঙ্গেও পরিচয় করে দিলেন গৃহকর্তার। তাঁর অঙ্কিত চিত্রের অ্যালবামটি তাঁর হাতে দিয়ে অভিমত জানতে চাইলেন। পাতার পর পাতা উল্টে দেখছেন রামমোহন— সম্ভ্রান্ত-মহিলার গঙ্গাস্নান, আলাপরত পল্লীনারী, কালীঘাট থেকে ছিন্নমস্তক ছাগ স্কন্ধে প্রত্যাবর্তন, গঙ্গায় নারীর অর্ঘ্যদান। একে-একে দেখে তিনি তাঁর অভিমত জানালেন, বললেন, ইউ ড্র ভেরি নাইস পিকচার্স, দে আর অ্যাকিওরেট অ্যাণ্ড লাইভলি।

খুশি হল বেলনস। রামমোহন কথা বললেন তার পর ফ্যানির সঙ্গে— ফ্যানি পার্কস ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে। ফ্যানি তাঁর সংকল্প ঘোষণা করে বললেন, তিনি এদেশে এসেছেন, খুব ভালো লাগছে এই দেশটা— তিনি ভ্রমণকাহিনী লিখবেন, সেজন্যে মেটিরিয়াল সংগ্রহ করায় এখন ব্যস্ত।

তাঁকে উৎসাহ দিয়ে ওদিকে তাকালেন রামমোহন। বলে উঠলেন, কি খবর নীলরত্নবাবু, কেমন লাগছে নাচ-গান? চুঁচুড়ার সব খবর ভালো তো?

নাচ চলেছিল ঝুমঝুম শব্দে, চমকে উঠল রানী-বাই— হঠাৎ যেন বেসুরে বেজে উঠল ঘুঙুর, ঘুঙুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নাকি ঘাগরা? নাচতে-নাচতেই সে তাকাতে লাগল ঐ দিকে? কি নাম বললেন যেন গৃহকর্তা? —চেনা নাম আর শোনা নাম মনে হচ্ছে যেন, চুঁচুড়ার খবর সব ভালো তো?

দোপাট্টা দিয়ে মুখটা ঢেকে নিল রানী-বাই। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠেছে। চুঁচুড়ার নীলরত্ন বুঝি উনি? কত দিন কত বার সে নাম শুনেছে ওঁর, কিন্তু দেখে নি কখনো। আজ তাই সে পাক খেয়ে-খেয়ে নাচছে আর তাকাচ্ছে ঐ মানুষটার মুখের দিকে। ইচ্ছে করছে, সেও জিজ্ঞাসা করে— চুঁচুড়ার খবর সব ভালো তো?

কিন্তু ইচ্ছে করলেই সব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। মুখের একাংশ আছে, সেই সঙ্গে ভয়ও আছে তাকে-না চিনে ফেলে কেউ। তাই সে ওড়না দিয়ে আড়াল করে নেচে-নেচে পাক খেয়ে চলেছে সে মলমলে-ঢাকা ফরাশের উপর।

যে-ওরিয়েণ্টাল চোখ দুটির স্কেচ এঁকে নিচ্ছেন ঐ বিদেশিনী দুই মহিলা,

সেই চোখ-দুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার। সারা হল-ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখ লক্ষ্য করছে সে। চুঁচুড়া থেকে আর কেউ আসে নি তো?

সব নাচ এখনো দেখানো হয় নি রানী-বাইয়ের। ওপাশের ঘরে সেরা নাচিয়ে নিকি খুবই বাহবা আদায় করে নিয়েছে। তা নিক। কিন্তু পুরুষদের বাহবা কখনো ফুরিয়ে যায় না, এ ব্যাপারে তারা ফতুর হয় না কখনো। একটা কিছু চুটকি ঢঙ দেখাতে পারলেই তওফা তওফা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে এই ঘর।

ঘাগরা ছড়িয়ে পা ভাঁজ করে বসে পড়েছে রানী-বাই। নতুন করে সাজানো হচ্ছে ফরাশ। আরদালি বেয়ারা পেয়াদারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অভ্যাগতেরা উঠে গেলেন একে-একে। খানাপিনা করতে গেলেন তাঁরা। এই অবসরে এখানে নতুন করে আয়োজন হতে লাগল নতুন নৃত্যের।

পা ভাঁজ করে বসেছে রানী-বাই। মাথা নীচু করে বসে সে ভাবছে ঐ গৃহকর্তাটির কথা। বছর-পাঁচের কথা তো হলই, কাশীমিত্তিরের ঘাটে দেখেছিল সে এই মানুষটিকে। তার মাত্র বছর-খানেক আগে সে এসে উঠেছিল রামবাগানে। এ-পথে তখন সে একেবারে নতুন, নাচে-গানে রপ্ত হয়নি তখনো, তাই সহজেই সেদিন দু-চোখ সজল হয়ে উঠেছিল তার। কিন্তু এখন আর অত সহজে ভেজে না চোখের পাতা।

কাশীমিত্তিরের ঘাটে সেই মেয়েটি সেদিন খুব বুকের পাটা দেখিয়েছে, কিছুতেই রাজি হল না সে বাঁচতে। না বেঁচে ভালোই হল বুঝি তার। বেঁচে থাকলে তার বরাতে কি ঘটত কে জানে।

তার শিশুকালের কথা মনে পড়ে রানী-বাইয়ের। গরিটির শ্মশানে সে তার বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখেছিল অমনই একটা দৃশ্য। সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে আছে তার আগুনের উপর।

তার বাবা এখন কোথায়? বেঁচে আছেন তিনি? তাঁর কথা প্রায়ই তার মনে হয়। আর মা?

সহজে এখন চোখের পাতা ভেজে না বটে, কিন্তু ঐ কথা ভেবে দুই চোখ সজল হয়ে উঠেছে তার। ওড়না দিয়ে শুষিয়ে নিল সেই জল। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সে, বুঝি চমকেই উঠল। মুরলী আর নবীন? কত বড় হয়েছে তারা এখন? তারা আবার এসে উপস্থিত হয় নি তো এই আসরে? কেউ যেন চিনতে না পারে তাকে— কেউ না।

নতুন করে পাতা হয়েছে ফরাশ। ফরাশের উপর ঘন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফাগ। তার উপর পাৎলা মলমল দেওয়া হয়েছে বিছিয়ে। ওর উপরে দাঁড়িয়ে নাচবে এখন রানী-বাই।

খানাপিনা সমাপন করে অভ্যাগতেরা আসন নিয়েছেন আবার। এই নাচটি দেখার আগ্রহ তাঁদের অপরিসীম। নেচে-নেচে পা দিয়ে ফুল ফোটাবে নাকি ঐ বাইজি।

বিদেশিনী মহিলা-দুটির চোখে কৌতূহল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা খাতা বন্ধ করে ঝুঁকে বসে আছেন ঐ নাচ দেখার জন্যে, নর্ত্তকীর পায়ের তুলিতে ছবি আঁকা দেখার জন্যে।

সারেঙ্গী ছড় টানল, করুণ কান্নার শব্দে বেজে উঠল তারযন্ত্রটি। তবলায় বেজে উঠল বোল।

উঠে দাঁড়াল রানী-বাই। করজোড়ে নমস্কার করল সে ঘুরে-ঘুরে সকলকে। গান আজ না, গান আজ সে গাইতে পারবে না। তার গলা ধরে এসেছে।

চারদিকে দৃষ্টিপাত করল সে, দেখার চেষ্টা করল— কোথায় সেই ভদ্রলোকটি, সেই নীলরত্ন। ওঁর কথা কতবার সে শুনেছে, কতবার তাকে বলেছে সেই কানাগিন্নি। আজ ওঁকে বড় আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে রানী-বাইয়ের। তার জীবন থেকে কত দূরে চলে গিয়েছে আজ কানাগিন্নি, কোথায় গিয়েছে সে তাও কেউ জানে না।

ফরাশে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সে বলল, কি ফুল ফোটাব? ফরমাশ করুন বাবুসায়েব, বাৎলে দিন বিবিসায়েবা।

—গোলাপ গোলাপ। বসরাই-গোলাপ।

রব উঠল চারদিক থেকে। মোচ চুমরে শক্ত হয়ে বসলেন সাহেবানেরা।

পাঙ্খাবরদার জোরে-জোরে টানতে লাগল পাখা। সারা ঘর ফুরফুর করে উঠল হাওয়ায়।

রানী-বাই কর জোড় করে বলল, মাফ করবেন। বন্ধ করতে হবে ওই পাংখা। নইলে হাওয়া লেগে উড়ে যাবে এই গোলাপ। আপনাদের একটু তকলিব হবে এতে। কিন্তু একটু কাঁটা না সহ্য করতে পারলে কি গোলাপ মেলে, বাবুসায়েব?

—তায়েফা তায়েফা তায়েফা।

বড় সুন্দর কথা বলেছে তো ওই বাইজি। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে কখনো ? কষ্ট করতে রাজি আছে সকলে। তাই, তখনি বন্ধ হয়ে গেল পাখা।

ঘর গুমট। চারদিক স্তব্ধ। সকলের চোখের দৃষ্টি গিয়ে বিঁধছে বুঝি ঐ বাইজির গায়ে পঞ্চশরের মত।

নিপুণ ভঙ্গিতে আরম্ভ হল নৃত্য। সকলের চোখের দৃষ্টি বাইজির অঙ্গ ছেড়ে নেমে এল তার পায়ে। আঙুলে ভর দিয়ে সর্বাঙ্গে তরঙ্গ তুলে অতি ক্ষুদ্র একটা বৃত্তের মধ্যে পাক খাচ্ছে রানী-বাই।

পাক খাচ্ছে, আর, একি আশ্চর্য, মলমলের শুভ্রতা ভেদ করে ফুটে উঠছে এক-একটা পাপড়ি। দেখতে-দেখতে জেগে উঠল পাপড়ির দল! ফুটে উঠল পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ।

করতালি দিয়ে উঠল হল-ঘরের প্রত্যেকে। বাইজির পায়ের আঙুলের কাজে মোহিত হয়ে গিয়েছে সারা হল-ঘর।

নীচে-বিছানো ঘন ফাগ মলমল ভেদ করে জেগে উঠেছে ফুল হয়ে। অদ্ভুত কারুকাজ তো বলতে হবে একে!

নীল গোলাপি সবুজ— নানা রঙের রেশমি রুমালে বাঁধা গুচ্ছগুচ্ছ মোহর ছুঁড়ে দিতে লাগল অভ্যাগতেরা।

শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে হাটখোলার রামতনু দত্ত বললেন, হার মানাল ফৈজ বক্সকে।

হার মানিয়েছে রানী-বাই। সমস্ত ধৈর্য নিষ্ঠা চেষ্টা সমর্পণ করে বহুদিনের সাধনার পর সে শিখেছে এই পায়ের কাজ। চেষ্টা করতে গিয়ে কতদিন অবশ হয়ে গিয়েছে তার অঙ্গ, কিন্তু মন অবশ হয় নি তার।

রাজকৃষ্ণ বললেন, যা বলেছেন তনুবাবু। বাই বলতে মুসলমান বাইই আমরা বুঝি— নিকি বুঝি, নান্নিজান বুঝি, জিন্নৎ বুঝি, বেগমজান বুঝি, ফৈজ বক্স বুঝি, হিঙ্গুল বুঝি। কিন্তু সকলকে বুঝি হার মানাল এই হিন্দু বাই।

ছুঁড়ে দিলেন না তনুবাবু, স্বয়ং উঠে গিয়ে রুমালে জড়ানো একগুচ্ছ মোহর দিয়ে এলেন রানী-বাইয়ের হাতে।

হাত জোড় করে নমস্কার জানাল বাইজি, বলল, বহুৎ মেহেরবানী।

যেন শুধরে দিতে চাইলেন তার ভাবাটা, তনুবাবু তাই বললেন, মেহেরবানী কেন, বল, খুব অনুগ্রহ আপনার। অবশ্য অনুগ্রহ এটা নয়, এ হচ্ছে পুরস্কার।

তলোয়ারে-বন্দুকে বাইরে বাজিকরের খেলা চলেছে সমানে, আর সেইসঙ্গে পুড়ছে বাজি— আকাশেও চলেছে বাজির খেলা।

অচিরেই ছড়িয়ে পড়ল ঐ নাম, হুগলী-নদীর এপারে-ওপারে। সব বাইজির কীর্তি হরণ করে নিল রানী-বাই।

কীর্তি চুরি হয়তো গেল, কিন্তু পসার চুরি গেল না কারো। এ বাইজির দেমাক আছে, কোনো বাগানবাড়ির ফুর্তির আসরে যোগ দেবার জন্যে বায়না নিতে চায় না এ। গণ্যমান্যদের আসরে যেতে পারে, কিন্তু লোচ্চাদের আসরে যেতে বড় আপত্তি। কিন্তু খেমটা নাচতে নেমে ঘোমটা দেওয়া এ নয়। লোচ্চারা তার আসরে এলে গা ঢেলে তাদের সঙ্গে লুচ্চোমি করতে সে রাজি। আর, এই কাজই তো তার এখনকার জীবনের কাজ।

যে যা কাজ নিয়েছে, সেই কাজ করে চলেছে সে। খানাকুলের সেই বামুনটাও করে চলেছেন তাঁর কাজ। একজন জবরদস্ত গভর্নর-জেনারেল না হলে তাঁর বুঝি চলছেনা। লর্ড আমহার্স্ট এসেছেন। এঁর দ্বারা কোনো কাজ সিদ্ধ হবে কিনা, দেখতে হবে এবার।

কারো যোগ্যতার উপর নিজের চেষ্টাকে বিসর্জন দেওয়া নয়, কোম্পানির কর্মকতারা যদি সহযোগিতা না করে তাহলে সামান্য মানুষের পক্ষে এ-কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

লোককে শত্রু বানিয়েই চলেছে এই মানুষটি। হিন্দুদের বিশ্বাসে ঘা দিয়ে তাদের পরম শত্রু তো হয়েইছে, পাদরিদের সঙ্গেও আবার আরম্ভ করেছে তর্ক। হিন্দুধর্ম নিয়ে আরম্ভ করেছে লড়াই। মানুষটাকে বুঝতে তাই বড় অসুবিধা। নিজে এ হিন্দু না খ্রীষ্টান, মুসলমান না জৈন— কে বলবে।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পর গোলোকদাস সংবাদ পড়ে শোনাচ্ছিল সমাচার-দর্পণ থেকে—

> কীর্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কলেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক ইঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

কান পেতে ঐ কাহিনী শুনলেন, কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলেন রামমোহন।

কিন্তু এখানে সংবাদের শেষ নয়, নূতন ধরণের আর-একটি ঘটনার বিবরণ পাঠ করল গোলোকদাস—

> গত মহাবারুনী যোগে উড়িষ্যা প্রদেশের অনেক লোক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মোং বাঁশবাড়িয়া গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত রহিয়াছিল দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই রাত্রিতে তাহার পীড়া হইয়া প্রাণ ত্যাগ হইল। পরদিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া ঐ মোকামে গঙ্গাতীরে চারিদিকে চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল ও ঐ কুণ্ড কাষ্ঠ ও চন্দন কাষ্ঠ ও ধুনা ও আর আর সুগন্ধি মসলাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। পরে ঐ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল দেখিয়া আপন মৃত স্বামির শরীর ঐ প্রজ্বলৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঐ স্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া ও সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া এক হাঁড়ী ঘৃত কর্ণদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল।
>
> এতাদৃশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্দেশে নাই তৎপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল।

পাঠ সমাপন করল গোলোকদাস। রামমোহন তার দিকে চেয়ে বললেন, এতদ্দেশে নাই, অর্থাৎ বাংলাদেশে নাই, এই বুঝি সমাচারের অভিমত? রীতি পৃথক, কিন্তু নৃশংসতা একই।

গোলোকদাসকে বিদায় দিয়ে সম্বাদকৌমুদী পত্রের জন্যে রামমোহন লিখতে বসলেন। এসব ব্যাপারের বিরুদ্ধে লেখার জন্যে পত্রিকাটি জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছে। তাতে বিশেষ আক্ষেপ তাঁর নেই। কিন্তু সম্পাদক ভবানীচরণও যে এর সংস্পর্শ ত্যাগ করে গিয়েছেন, এতেই তাঁর খেদ। যাই হোক, তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে তিনি গোলোকদাসকে ডাকলেন। তার হাতে রচনাটি দিয়ে বললেন, আহিরীটোলায় একবার যাও গোলোক। আনন্দচন্দ্রকে এটা দিয়ে এস।

আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন, সেইজন্যে তাঁর কাছে রচনাটি পাঠিয়ে দিয়ে রামমোহন উঠে বাগানের দিকে গেলেন। রামদাস নাকি কয়েকটি নতুন আমের কলম লাগিয়েছে কয়েকদিন হল।

খুরপাই চালিয়ে কাজ করছিল রামদাস, বাবুর পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল।

এদিকে মানিকতলার বাগানে নতুন চারা রোপা হচ্ছে, ওদিকে সারা কলকাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করারও উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। চান্দনী বাজারের পূর্বে ব্যাপারিটোলা থেকে আরম্ভ করে এক রাস্তা বানানো হয়েছে সম্প্রতি, দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিক বউবাজার পর্যন্ত বরাবর এসেছে এই রাস্তা। এতে সোজা চানকের রাস্তার সঙ্গে এর যোগ হয়েছে। এই পথ অনেক বাড়ি বাগান ও পুষ্করিণীর উপর দিয়ে গিয়েছে, কোম্পানি বাহাদুর উপযুক্ত খেসারতও দিয়েছেন মালিকদের। ধর্মতলা থেকে বউবাজারে যেতে হলে অনেক ঘুরে যেতে হত, এখন লোকের গমনাগমনের অনেক সুবিধা হয়েছে।

কলকাতা জার্নালে সম্প্রতি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, খিদিরপুরে জাহাজের ইয়ার্ড অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডেনরিচ পর্যন্ত এক নতুন রাস্তা হবে, এবং টালির খালেব উপরে সাঁকো তৈবি হবে। সাবেক রাস্তা দিয়ে গার্ডেনরিচে যেতে যতটা দূব হয়, এই নতুন রাস্তা তৈরি হলে পথ ক্রোশ-খানেক কম হবে। এতে রাস্তার দু পাশের জমির মূল্য বাড়বে। মল্লিকদের, দেওয়ান গোকুল ঘোষালের, ও বাবু তারানন্দ ঘোষের এতে অনেক উপকার। সুতরাং পথনির্মাণের সব খরচ কোম্পানি একা বহন না ক'রে মল্লিকদের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ আর যে-যে সাহেবের গার্ডেনরিচে বাড়ি তাদের কাছ থেকে কিয়দংশ নেওয়া হোক— কেউ-কেউ সংবাদপত্র মারফত এইরূপ পরামর্শও দিয়েছেন।

নূতন পথ নির্মিত হোক, নালা-নর্দমা বন্ধ করা হোক, পথের ধুলা মারার জন্যে পথে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হোক, খরচের কিয়দংশ লাভবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেওয়া হোক— সবই ভালো। কিন্তু মানুষের মন সাফ না করতে পারলে শুধু শহরের শোভাবর্ধন করেই কি লাভ আছে?

এই দিকে বিশেষ কেউ মনোযোগ দিচ্ছেন না, এ বড় আক্ষেপ। মনোযোগ তো দিচ্ছেনই না, যদি কেউ সামান্য উদ্যোগ করছে তাতে সকলের বাধাদানের অন্ত নাই। তারা যদি রক্ষণশীল, তাহলে সবই সংরক্ষণ করুন তাঁরা। তাহলে নালা-নর্দমা বন্ধের উদ্যোগকে বাধা দেওয়াও তাঁদের কর্তব্য, রক্ষণশীলই যদি তাঁরা তাহলে রক্ষণ করুন ওসব পদার্থও।

লর্ড আমহার্স্ট মানুষটা কেমন তা যাচাই হয় নি। রামমোহন তাঁকে এক পত্র লিখতে বসেছেন, এমন সময়ে নীলরত্ন এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে প্রবেশ করে বিনা ভূমিকাতেই তিনি বললেন, বায়রন মারা গিয়েছেন। হিন্দুকলেজের ছেলেরা শোকসভার আয়োজন করেছে।

রামমোহনের কাছে সংবাদটা নতুন না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, যাবই তো স্থির করেছি। বায়রনের কবিতা তো পড়েছেন—**On with the dance, let joy be unconfined,** আমাদের দেশের এখন সেই অবস্থা। নেচে চলেছে সকলে, শ্মশানে-শ্মশানে চলেছে ঐ উৎসব। ঐ ঘটনার খবর পেলেই আমার মনে পড়ে ঐ ছত্রটি।

কিন্তু হে পাঠক, আমাদের মনে পড়ে অন্য কথা। মনে পড়ে মুকুন্দরামের কথা। মাহেশের কিনারে রূপনারায়ণ তার পত্নীকে হারিয়ে যখন ব্যাকুল ভাবে বসে আছে তার পিনিসে, তখন শৌখিন মুকুন্দ এসে তাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে যখন বলল— কত হাজার-হাজার ঘটনা ঘটে চলেছে এইখানে তার জন্যে ফুর্তি বন্ধ থাকে কেন, চালাও ফুর্তি, তখন আমাদের মনে পড়েছিল ঐ ছত্রটি।

বায়রন গত হয়েছেন। এ'তে ব্যথিত না হবে কে? এই তো বছর-তিন আগে সামান্য বয়সে মারা গেছে আর-একটি কবিও, যতদিন বেঁচে ছিল সে, কেউ তার নাম করে নি, কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার নাম উচ্চারণ করল সকলে, বলল—কীট্‌স্। উপেক্ষা আর অনাদরে ম্রিয়মাণ হয়ে মারা গেল ঐ কবিটি—

Who killed John Keats?
"It is I", says the Quarterly
So savage and tartarly.

তাতার-দস্যুর মত নির্দয় আক্রমণ করেই তাকে বুঝি হত্যা করেছে কোয়ার্টারলি নামের ওই পত্রিকাটি।

ঐ কবিটির মৃত্যুর কথা ভুলতে-না-ভুলতেই পর বছর মারা গেল ওদেরই বন্ধু শেলী। ইংরেজি কবিতা যারা পছন্দ করে, তাদের কাছে কীট্‌স্ আর শেলীর মৃত্যুসংবাদ সামান্য না, সেই অসামান্য সংবাদ বাসী হতে-না-হতেই আবার মৃত্যু হল ওদেরই আর-এক জনের। একটি ঝাঁকেরই পাখি ছিল বুঝি ওরা, একটি তীরে তাই পরপর ওরা পতিত হল মৃত্যুর কবলে।

হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা ওদের অধ্যাপক রিচার্ডসনের সভাপতিত্বে স্মরণ-সভার আয়োজন করেছে।

ওঁরা সেই স্মরণসভায় যোগদানের জন্য যাত্রা করুন, আসুন, এই অবসরে আমরা অন্য কথা জেনে নিই।

এখানে এই জাহ্নবীর উপকূলে শহর-কলকাতার বক্ষে কবি বায়রনের জন্যে নিবেদিত হোক শোক। মাই নেটিভল্যাণ্ড, গুড নাইট— ব'লে স্বদেশের ও সর্বদেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন বায়রন। কিন্তু কলকাতা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে যশোরের সাগরদাঁড়িতে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে রাজনারায়ণ দত্তের সহধর্মিনী জাহ্নবী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হয়েছে এক শিশু। বায়রন-বিয়োগের বেদনা হয়তো দূর হবে তাকে দিয়ে।

হাতে তালি বাজিয়ে তাকে খেলা দিচ্ছেন জাহ্নবী দেবী, বলছেন, মধু মধু মধু।

অদূরেই মধুস্বরে কল্লোল তুলে বয়ে চলেছে কবতক্ষ নদী। সেই নদীর কল্লোলে এবং শিশুর কাকলিতে সাগরদাঁড়ির দত্তগৃহ মধুময় হয়ে উঠেছে।

ঐরূপ মধুচ্ছন্দেই বয়ে চলেছে শহর-কলকাতার দীর্ঘ শরীরের কিনার দিয়ে এই হুগলী-নদীও। সুখ আছে এখানে, শোক আছে, দুঃখও আছে, বেদনাও আছে। কিন্তু সে সব নিমজ্জিত করে প্রবল হর্ষের ধ্বনিতে বেজে ওঠে নদীর স্রোত।

মাহেশের স্নানে এখনো যাতায়াত করে যাত্রীরা, এখনো নৌকায়-নৌকায় ভরে যায় ঐ নদী।

কিন্তু রূপনারায়ণ আর আসে নি। জীবনে প্রবল ঘা খেয়ে বুঝি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সে। স্তব্ধ হয়েছে সে, কিন্তু তার জীবনের ধারা স্তব্ধ হয় নি। মাহেশে যায় না বটে, কিন্তু মাহেশই একমাত্র তীর্থ নয়— দমদমার বাগান আছে, সিঁথির বাগান আছে, ইয়ারেরা আছে।

তার স্ত্রী হয়েছে পলাতক। কতরকমের আজগুবি কাহিনী রচনা করে এ কথা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে রূপনারায়ণ। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা বুঝি যায় না। আমিষের গন্ধ ঢেকে রাখা কি সম্ভব? সুতরাং তার সব কাহিনী চাপা পড়ে গিয়ে ফাঁশ হয়েছে প্রকৃত ঘটনাই। তার উপর ঢ্যারা পিটে যে কথা প্রচার করা হয়েছিল, সে কথা তো চাপা থাকার কথা না।

বেকুব হয়ে গিয়েছে রূপ। তাদের দুঃসময়ে সকলেই বর্জন করেছে তাকে—

চুঁচুড়ার সকলে তাকে করেছে একঘরে, কিন্তু দুর্দিনের যারা বন্ধু তারাই প্রকৃত বন্ধু। সকলেই ছেড়ে গিয়েছে তাকে, ছাড়েনি কেবল নরহরি আর মোতিলাল।

*

আত্মীয়-সভার সভ্যরা সেদিন বসে আছেন মানিকতলার গৃহে। নীলরত্নও আছেন উপস্থিত। বেদান্ত নিয়ে, পাদরিদের নিয়ে, এবং ভট্টাচার্যদের আচরণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না, তিনি যথারীতি গিয়েছিলেন সাহেবপল্লীর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে এসে এই আলোচনায় যোগ দিলেন।

একটু পরে নীলরত্নের দিকে চেয়ে রামমোহন বললেন, বেনিয়ান রূপচরণের কথা শুনে এলাম আজ, আপনাদের চুঁচুড়ারই লোক। বাপের বিষয়সম্পত্তি নাকি নষ্ট করছে তাঁর পুত্র ?

নীলরত্ন বললেন, হ্যাঁ। ও-পুত্রের কথা আর বলবেন না। সবই প্রায় নষ্ট করেছে, এখনো অবশিষ্ট হয়তো আছে কিঞ্চিৎ। যেভাবে চলেছে তাতে এটুকুও বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না।

—অনেক টাকা করেছিলেন রূপচবণ।

—অনেক বললে সব বলা হয় না—অগাধ। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েছিলেন। একটি মাত্র পুত্র হল উত্তরাধিকারী। কিন্তু সর্বস্ব নষ্ট না করা পর্যন্ত তার হযতো শান্তি নেই।

দ্বারকানাথ মৃদু হাস্য করলেন, বললেন, গুণধর পুত্রই তা হলে ও নয়, গুণবানও। পিতার ধন পুত্রে নষ্ট করে, এ নিয়ম জেনেছে ও, তাই কিছু রেখে যেতে চায় না। ওর সন্তানাদি কি ?

নীলরত্ন বললেন, সন্তানাদি কিছু নেই।

ব'লে তিনি একটু চুপ করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলে যেতে লাগলেন চুঁচুড়ার সেই কেলেঙ্কারির কথা। সবিস্তারে তিনি বর্ণনা করলেন সেই কাহিনী।

বললেন, বাড়ির মেয়েদের মুখে শুনেছি, অমন রূপ নাকি বেশি হয় না। সোনার প্রতিমার মত দেখতে। সেই প্রতিমা সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে গঙ্গায়। ব'লে বেড়ায় বটে ডুবে মরেছে ; কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করছে না কেউ।

—বিশ্বাস না করার আছে কি ? অমন যার স্বামী, সে মেয়ে তো জলে ডুবে মরবেই। দ্বারকানাথ মন্তব্য করলেন।

হেসে উঠলেন নীলরত্ন, বললেন, জলে ডুবলেও তো ভেসে উঠতেই হবে। কিন্তু—

দ্বারকানাথ বলে উঠলেন, জলে ডুবলেই কেবল ভেসে ওঠার কথা না, জলে যদি নাইই ডুবে থাকে তাহলেও তো ভেসে ওঠার কথা—এতদিনে তা হলে কি কোনো সন্ধান পাওয়া যেত না ?

—সন্ধান ? একটু চিন্তা করে নীলরত্ন বললেন, সন্ধান কে করবে ? যার স্ত্রী, খোঁজ করার কথা তার। কিন্তু সে আছে নিজেকে নিয়ে মত্ত হয়ে। ইয়ার নিয়ে ডিয়ার নিয়ে আর বাইজি নিয়ে।

রামমোহন বললেন, আরে বেরাদর, দেশাচার পালন তো করতে হবে। দেশের গতি এখন ঐ দিকে, কোন্ ধনীনন্দন আছে যে কবির লড়াই, হাফ-আখরাই, মত্ত আর জঘন্য রুচির মেয়েদের নিয়ে যেতে নেই ? ঐ সব মানুষরা অনাচার করে-করে তিলে-তিলে ক্ষয় করেন নিজেদের, অকালেই মারা যান, আর অবশেষে কিনা তাঁর উপেক্ষিতা স্ত্রীকে সহযাত্রী করার জন্যে চিতাশয্যায় শয়ান দেখতে চান।

গঙ্গার এপারে মানিকতলার গৃহে কথা হচ্ছে যাকে নিয়ে, গঙ্গার অপর পারে সে আছে পরম আরামে বসে। ইয়ারে পিযারে মেশামেশি হযে বসে গান শুনছে আকা-বাইয়ের।

একটা কবির দল তৈবি কবেছে আকা-বাই। দাশরথি রায নামে বিশ-বাইশ বছরের একটি যুবক ওকে গান বেঁধে দেয়।

আকা-বাই বাইজি নয়, যজ্ঞেশ্বরীর মত সেও এক মেয়ে-কবিয়াল। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে তার তফাত এই যে, নিজের গান নিজেই বাঁধে যজ্ঞেশ্বরী, কিন্তু আকার গান বেঁধে দেয় দাশু নামে ঐ যুবাটি।

দাশরথি বসে আছে পাশে। আকা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িযে সুর করে গেয়ে চলেছে গীত—

গৌরাং-ঠাকুরের ভক্ত চ্যাংড়া
যত অকালকুষ্মাণ্ড ন্যাড়া
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
গৌর বলে আনন্দে মেতে
একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে
বাগদীকোটাল ধোপাকলুতে একত্র সমস্ত।

বিল্বপত্র জবার ফুল
দেখতে নারেন চক্ষুর শূল
কালী নাম শুনলে কানে হস্ত ॥

আকা-বাই দুই কান দুই হাতে চাপা দিয়ে গলা চড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে, দুচোখে তার রঙ্গভরা হাসি, গাইতে লাগল—

কি না ভক্তি, কি তপস্বী
জপের মালা সেবাদাসী
ভজন কুঠরী আইরী কাঠের বেড়া
গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে
ছেলে-সুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যাংশে কুলীন বড় ন্যাড়া।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল রূপনারায়ণের বৈঠকে। হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল সকলে। ঐ হাসি শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল আকা-বাই, সে ফিরে গাইল ঐ অংশটা—

গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে
ছেলে-সুদ্ধ করেন বিয়ে
জাত্যাংশে কুলীন—

বাঁধনদার দাশু রায়ও যোগ দিল হাসিতে।

মোতিলাল রূপনারায়ণের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বড় রসবতী বটে এই মেয়েমানুষটি। নাগরও পেয়েছে বড রসিক।

ব'লে সে চোখ ইশারা করে দেখিয়ে দিল ঐ দাশুকে, বলল, ওর গানের বাঁধনদার হচ্ছে ওর প্রাণের জিম্মাদার।

কথাটা শুনেই চাঙ্গা হয়ে বসল রূপনারায়ণ। আকা-বাইকে সে ঠিক একজন মেয়েমানুষ বলে মনে করছিল না। দেখতেও তেমন চটকদার নয়, বয়সও তেমন তেজী নয়। কিন্তু মোতিলালের কথা শুনেই তার মন গিয়ে আছড়ে পড়ল বুঝি আকা-বাইয়ের বুকের উপর।

আকা তখন নাচের ভঙ্গিতে পাক পেয়ে গান করছে—

চলিলেন পদ্মিনী স্বামী, যেন শুকদেব-গোস্বামী
ডাকলে কথা কন না কারু সনে

মজিয়ে নিজে মনসিজে

কত কি যে ভাবছে নিজের মনে।

—বাহবা বাহবা বাহবা। চারদিক থেকে বেজে উঠল তারিফ।

কিন্তু রূপনারায়ণের মন নেই ওতে, তার মন মেতে উঠেছে মনসিজে, মোতিলালের একটা হাত চেপে ধরে সে বলল, ওকে চাই।

—কি আছে ওর? কি চাইবে?

—ওই গলা, ওই গান। আর, কিছু যদি না থাকবে তাহলে ঐ ছোঁড়াটা মজেছে কেন?

মোতিলাল বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে বলল, ছোঁড়াটা মজে নি ওতে, ও-ই মজেছে ওই ছোঁড়াতে। কচি নাগর চায় না কোন্ নাগরী? নিজের বয়স যতই বাড়ে, নিজের চাওনা বাড়ে কম-বয়সে।

রূপনারায়ণ তবু বুঝি বোঝে না, বলল, তবু—

বাধা দেবার ইচ্ছেও নেই মোতিলালদের, কিন্তু তাদের মন বুঝি সায় দিতে চায় না এতে, তাই চুপ করে থেকে যেন বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হবে।

দাশুর সঙ্গে কথা বলছে আকা-বাই। বাঁধনদারের কাছে নতুন গানের বায়না ধরেছে বুঝি। রূপনারায়ণ একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওই দিকে। তার সমস্ত চেতনা যেন দুই চোখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়েছে ওই মেয়েমানুষটির উপর।

মোতিলাল রূপের হাতে গেলাশ এগিয়ে দিয়ে বলল, চোস্ত বাইয়ের খবর পেয়েছি। আকা-বাই দিয়ে কি হবে, তার চেয়েও পাকা বাই সে। তাকে জোগাড় ক'রে চলো যাই সিঁথিতে।

ঠোঁটের কাছে থেমে গিয়েছে গেলাশ, রূপনারায়ণ বলল, কোথাকার বাই, কাশ্মীর না লখনউর?

মোতিলাল বলল, ওসব না। এ হচ্ছে খাঁটি কলকাতার। নাম রানী-বাই। খুব সরেস চিজ ব'লে শুনেছি। মুখখানা নাকি পদ্মের মত, আর পায়ে ফোটায় গোলাপ।

আর চিন্তা করল না রূপনারায়ণ, আকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মোতিলালের হাত চেপে ধ'রে গদগদ গলায় বলল, আমি তাকে চাই। যত টাকা লাগে।

চাওয়ার আর বিরাম নাই। তার বুকখানা বুঝি আকাঙ্ক্ষার মহাসমুদ্র। কত চাওয়া চেয়েছে সে, অনেক পাওয়াও পেয়েছে। চেয়ে চেয়ে আর পেয়ে-পেয়ে সেই তৃষ্ণার অতলে তলিয়ে আছে। মুখখানা পদ্মের মত, পায়ে ফোটায় গোলাপ— কথাটা কানে লেগে গেল তার। তার মনে পড়ে গেল অন্ত আর-একজনের কথা। পায়ে পদ্ম ফোটায় যে, কি নাম যেন?— কৈজ বক্স্। কৈজের নাচটা এখনো লেগে আছে চোখে, নৌকোর মধ্যে সে রকম আয়োজন করা যায় নি, তাই তার পায়ে ফোটানো পদ্ম দেখতে পায়নি রূপনারায়ণ, কিন্তু মুখখানা দেখেছে, সত্যি একটা গোলাপের মত।

রূপনারায়ণ আবার বলল, যত টাকা লাগে, চাই তাকে।

এই তো চাই। এমন মানুষ না হলে তার মোসায়েব হয়ে লাভ কি। বাইজিতে আর বাগানবাড়িতে গিয়েছে প্রচুর, তার মধ্যে থেকেই নরহরি আর মোতিলাল ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে কম না। এখন পৈত্রিক পুঁজি অবশিষ্ট আছে কতটা সে কথা খাজাঞ্চিবাবুও বলেন নি, সে-কথা জানার কৌতূহলও নেই রূপনারায়ণের।

দশ বছরের বেশিই গত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, সেই ঘোরতর ঘটনার পর থেকে। তখন ভালোমত বুঝতে পারা যায় নি, কিন্তু এখন সন্দেহ হয় চাঁপার উপর। সে নিশ্চয়ই জানে সব ঘটনা। নিশ্চয় সেই চক্রান্ত করেছে।

কিন্তু চাঁপাকে এখন পাবে কোথায়? সে যে এখন অন্য মানুষ। কপালে রসকলি এঁকে নতুন রসে ডুব দিয়ে আছে সে। সে এখন মস্ত বড় ভক্ত। গোসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে, হয়তো এবেলা-ওবেলা করছে বিয়ে।

কিন্তু চাঁপার খোঁজে দরকার নেই আমাদের। সে কালনাতেই থাক্, কাটোয়াতেই থাক্, কিংবা নবদ্বীপেই থাক্— তাকে দিয়ে কোনো কাজ নেই আমাদের। দস্তবি যা সে পেয়েছে, তাতে হেসে-খেলে এ-জীবনটা হরিভক্তিতে মেতে থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

আকা বাই সেদিন গান গাইল আরো কয়েকটা। কিন্তু তার গানে আর কান নেই এদের। এদের কানের মধ্যে তখন বেজে উঠেছে নতুন নূপুরের ধ্বনি।

আকার দলকে বিদায় দিয়ে ওরা নতুন মজার জন্যে তৈরি হয়ে বসল বুঝি।

বিরাট এলাকা ঘিরে বাড়িটা। ঝাঁকে-জমকে-রোশনাইতে পুলকিত ছিল এই গৃহ। কিন্তু এখন এখানে সবই প্রায় নীরব। যে সোপানে একদিন

রাধারানীর কোমল পায়ের চিহ্ন পড়েছে, এখন সেখানে নিঃশব্দে বিচরণ করে বেড়ায় নিঃসঙ্গ মার্জার। যে কক্ষে সুউচ্চ পালঙ্কে শয্যা গ্রহণ করত ওই বরতনু, এখন সেখানে একাকী গড়াগড়ি দেয় পরিত্যক্ত উপাধান।

লক্ষ্মী আর সরস্বতী চলে গিয়েছে বিদায় নিয়ে। তার পর একে-একে অন্যান্য দাসীর সঙ্গে চলে গিয়েছে হৃদয়। যেসব দাসীর কাছে লালাবাবুর চোখের চাউনি খারাপ লাগে না, টিকে আছে তারা। আর আছে ভবসুন্দরী—বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু সে বলে, যে বাড়ির নিমক খেয়েছে সে এতকাল, অত বড় নিমকহারাম হব কী করে, ছেড়ে যাব কী করে সে বাড়ি।

ঘরে-ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে চামচিকা। দেয়ালে-দেয়ালে ঘা খেয়ে মরছে তারা। তবু তাদের পাখায় অবসাদ নাই।

আরমানি গির্জায় এখনো ঢং ঢং করে বেজে চলেছে সময়ের শব্দ ; দূর থেকে ভেসে আসছে ব্যাণ্ডেল-গির্জার ঘণ্টাধ্বনি।

বাইরে থেকে রায়বাড়িটির কোনো পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এর ভিতরের চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে বিপুল। কে আছে এই বাড়িতে, যে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে ? সারা চুঁচুড়াও বর্জন করেছে এই গৃহটিকে। যে গৃহের বধূ গৃহত্যাগী হয় সে গৃহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কে চায় পাতকী হতে ? আজ এই রায়বাড়ি তাই পরিত্যক্ত।

বাইরে থেকে কোনো পরিবর্তন হয় নি চুঁচুড়ারও। বাইরেটা ঠিক অবিকল আছে আগের মতই, কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে এর অভ্যন্তরে।

এই তো মাস-কয়েক আগের কথা। ওলন্দাজেরা তাদের এই উপনিবেশটি সমর্পণ করেছে ইংলণ্ডীয়দের হাতে। ওলন্দাজদের দখল থেকে এ গিয়েছে এখন কোম্পানির হেফাজতে।

এই শহরের বড় সাহেব ছিলেন বোমন। হলাণ্ডের অধিপতি ভার ন্যস্ত করেন বোমন সাহেবের উপর, সেই অধিকারে ইংরেজ পক্ষ থেকে আগত বেইল সাহেব ও সনাইথ সাহেবের হাতে এই শহরটি সমর্পণ করলেন বোমন। কাগজপত্র নিয়ে লেখাপড়া হল নেপথ্যে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে স্থানীয় অধিবাসীদের চোখের সম্মুখে পতাকাদণ্ডের অগ্রভাগ থেকে নেমে এল হলণ্ডীয় নিশান।

আরমানি গির্জার সংলগ্ন সরকারী দালানের সোপান থেকে ঘোষণাপত্র পাঠ

করলেন রেইল সাহেব— এই স্থান এতদিন পর্যন্ত হলণ্ডীয়দের অধিকারে ছিল, কিন্তু এক্ষণ থেকে এ স্থান ইংলণ্ডীয়দের অধিকারভুক্ত হল।

এই ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গে যে-দণ্ডে হলণ্ডীয় পতাকা উড্ডীন ছিল, সেখানে উড্ডীয়মান হল ইংলণ্ডীয় নিশান। নিশান ওঠা মাত্র সিপাহীরা তিন বার বন্দুকের দেওড় করল।

একটি বিরাট জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই উৎসব দেখেছে, একটি কথাও তারা বলে নি। কার স্থান, কে কাকে দান করছে— এ চিন্তা নেই তাদের মনে।

এই ভাবেই বুঝি হাতবদল হয় বিষয়সম্পত্তি। হুগলী আর চুঁচুড়া এখন এক হয়ে গেল।

রূপনারায়ণের সম্পত্তিও ঠিক ওইভাবেই হাতবদল হয়ে চলেছে। কিন্তু তার জন্যে এমন-কোনো ঘোষণা পাঠের প্রয়োজন হচ্ছে না, কোনো সিপাহী বন্দুকের দেওড় করছে না। ভাটার সময় যেমন নিঃশব্দে বয়ে যেতে থাকে ঐ স্রোত, অমনি নিঃশব্দ গতিতে ভাটা নেমে আসছে তার ভাণ্ডারে।

উজার হয়ে যাক-না এই ভাণ্ডার, কি ক্ষতি তাতে? তার জীবনও ক্রমশ চলেছে শূন্যের দিকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে অনেক আগেই, সে কালির দাগ এখন হয়েছে আরো ঘন, শিথিল হয়ে এসেছে মুখের চামড়া।

কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি, শিথিল বুঝি হয় নি কামনা। রূপনারায়ণ অনেকক্ষণ ধরে কি-যেন ভাবছিল, মোতিলালের দিকে চেয়ে বলল, কোথায় তোমার রানী-বাই?

গঙ্গার অপর পারে, এখান থেকে অনেক দূরে, রানী-বাইয়ের বারো-বেহারার পালকি চলেছে তখন হুশহাশ শব্দে। ঝালরে ঝলমল করছে পালকি। পথের দুই ধারও উঠেছে বুঝি ঝলমলিয়ে।

গঙ্গা নাইতে চলেছে রানী-বাই। এর আগে গিয়েছে পায়ে হেঁটে, কিন্তু এখন আর পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। আগে-আগে চলেছে দুজন বরকন্দাজ, রূপো দিয়ে বাঁধানো মোটা-মোটা লাঠি তাদের হাতে নিয়ে।

পালকির ভিতরে রানী-বাই আছে, এবং আছে তার দাসী হীরামতি। গুনগুন গুঞ্জনে কথা বলতে-বলতে চলেছে তারা। পালকির ঝাঁকিতে দুলে উঠছে অঙ্গ।

রামবাগানের গৃহ সে ত্যাগ করেছে কিছুদিন হল। এখন আছে গরানহাটায়। ও-বাড়ির মাসির সঙ্গে পারা দায়— যা চায় না রানী তা করাবেই ওই মাসি। টাকার খাঁকতি বড় বেশি ওর। বলে, বাগানবাড়িতে মজা করতে যাবি নে তো খাবি কি? শরীরে যৌবন আছে, তাই অত দেমাক। আমাদের দেমাক একদিন ছিল রে।

মুখে খৈ ফোটে ওই মাসির, যা নয় তাই বলে। বলে, সারা অঙ্গে ফুটে আছে ফুল, নেচে-নেচে পা দিয়ে ফোটাচ্ছিস গোলাপ আর গাঁদা। কিন্তু সব পাপড়িই ঝরে যায় রে; ঝরার আগে আখেরের জন্যে কিছু করে রাখতে হয়। বাগানবাড়িতে মজা আছে যেমন, মোহরও আছে তেমনি।

তা থাক্। অনেক মোহর পেয়েছে সে। এতেই তার হবে। ঘরে বসে মজা করে যে যা দিয়ে যাবে তাতেই চলবে তার। পাপড়ি যদি ঝরে যায়, ঝরুক। পরের কথা পরে হবে।

কিন্তু মাসি বড় কুঁদুলে। কার দৌলতে আজ রানীর এত ডাক-হাঁক, সে কথা মনে করতে বলে তাকে। এসেছিল তো একটা গেঁয়ো হদ্দ, কিছুই ছিল না জ্ঞানগম্যি। কে মানুষ করল তাকে! ওস্তাদজিদের ধরে শেখাল সে নাচ, শেখাল গান। শুধু গতর বেচে খেতে হলে ও-গতরের গতি এর মধ্যেই কি হত, ভেবে কি দেখতে হয় না একটু?

কথাগুলো ঠিকই মাসির। এখানকার আদবকায়দা কিছুই জানা তার ছিল না। চাঁপার সেই লোকটি তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল পেরিনের বাগানের কাছের এক মস্ত বাড়িতে। তাকে নিয়ে কত আনন্দ, কত উল্লাস। মাস-কয়েক যেতে-না-যেতেই সেই লোকটি নিয়ে আসতে লাগল তার ইয়ারদের! কত চোখরাঙানি, কত শাসানি তার— ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। মাহেশের ঘাট থেকে নৌকোয় তুলে নিয়ে যখন সে তাকে নিয়ে উধাও হল, তখন তার কত প্রতিজ্ঞা কত শপথ— তাকে সে সুখে রাখবে, সুখে রাখবে, সুখে রাখবে। কিন্তু মাস-কয়েকের মধ্যেই নিজের সুখ শেষ হয়ে গেল, তাই বারো-ইয়ার নিয়ে এসে বারোয়ারি সুখের ধাক্কায় মত্ত হল সে। প্রথম ক'টা দিন বড় কষ্ট হয়েছিল তার, নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। অবশেষে সে ছেড়ে দিল নিজেকে। তাদের হাতে। তার পর যা হয়— খুঁটিনাটি করে ভাবতে পারছেনা সে— একদিন সেখান থেকে তাকে নিয়ে এসে তুলল তারা রামবাগানে।

সে রামবাগান ছেড়ে দিয়েছে এখন সে। এ-পথে এসেছে বলেই নিজের সব সংস্কারই তাকে ত্যাগ করতে হবে কেন। বাগানবাড়িতে বড় ভিড় হয়, ওখানে গিয়ে নিজেকে সে উন্মুক্ত করে দিতে পারবে না। হাসিই পায় তার, গৃহবধূ সে আর নয়, কিন্তু গৃহের কোণে থেকে গর্হিত কাজ করা কি যাবে না? যার মজা করার শখ, সে আসুক-না তার কাছে, কিন্তু সে যাবেনা কারো কাছে।

নবীন আর মুরলী বড় হয়েছে, তাদের মুখ চেয়েও তো চলতে হবে তাকে। হঠাৎ যদি কখনো দেখা হয়ে যায় তাদের সঙ্গে, তা হলে, নিজের কথা সে ভাবে না, ভাবে ওদেরই কথা। অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে গেলে নিজের পরিচয় চাপা দিয়ে রাখা বুঝি কঠিনই হয়ে পড়বে।

রামবাগানের মাসির কাছে সে ঋণী। ঐ মাসির চেষ্টাতেই রানী আজ রানী-বাই হয়েছে, এবং তার মনের সব চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা পালন করতে পেরেছে। তার এই দুই পায়ে ফুল ফোটাতে শিখেছে সে— এই কাজটার যদি এতই দাম, তবে তাকে সেটা শিখে নিতেই হবে।

মনে পড়ল সেই কৈফ বক্সের কথা। পায়ে ফুল ফুটিয়ে তাক লাগিয়েছে দুনিয়াকে। আলতা-ছোপা পা দিয়ে ছবি এঁকেই এত দেমাক, সে-দেমাক ভাঙবে বলে প্রতিজ্ঞা ছিল তার। তার পায়ে আলতা দিয়ে নিতে হয় না, ফরাশে ছিটাতে হয় না গোলাপ-জল। শুকনো ফরাশে সে তার এই পা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারে পদ্ম, ফোটাতে পারে গোলাপ। এই পাও এখন বুকে তুলে নেবার মানুষের কোনো অভাব নেই এই শহরে। অনেক মানুষই বুক পেতে দিচ্ছে এই পায়ের কাছে।

এখন গরানহাটায় আছে রানী-বাই। তার পালকি চলেছে পোস্তার রাস্তা ধরে হুশহুশ শব্দ করতে-করতে। বারো-বেহারায় বয়ে নিয়ে চলেছে এই বরতনু।

টাকশালের ঘাটে এসে পালকি নামল। ওড়িয়া বেহারারা কাঁধের গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে বসল পাকুড়-গাছের তলায়। পালকি থেকে নেমে রানী-বাই দাসীর সঙ্গে নেমে গেল ঢালুপথে। জলের কিনারে এসে দাঁড়াল সে।

এ-পাশে ও-পাশে স্নানে নেমেছে অনেক মানুষ। তাই, একটু আব্রু চাই। লম্বা সাটিনের পরদায় দুই কিনার ধরে দুই বরকন্দাজ নেমে গেল কোমর-জলে, মাঝখানটা ধরে হীরামতি দাঁড়াল পাড়ে। এরই অন্তরালে অবগাহন-স্নান

করছে রানী। বরকন্দাজ-দুটি হয়তো একটু-আধটু তাকাচ্ছে ভিতরের দিকে; কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি নাই— কী না জানে ওরা গরানহাটার বাড়ির। ওদের কাছে আব্রুর কোনো দরকার হয় না।

স্নান করছে সে, আর তার কানে আসছে ধমকের শব্দ। কে যেন শাসন করছে কাকে, বলছে, ঈশ্বর, কথা শোনো। বেআড়াপনা ছাড়ো।

নিজের শরীর মাজতে-মাজতে নিজের মনেই হাসতে লাগল রানী-বাই। কে কার ঈশ্বরকে এমন করে শাসাচ্ছে? কারো প্রার্থনাই শোনে না যে ঈশ্বর, সে কিনা শাসন শুনবে। কত অনুনয় করেছে সে কতবার কিন্তু কখনো সাড়া পায় নি সে ঐ দেবতার কাছ থেকে।

কিন্তু তবু ওদিকের শাসন থামে না। ক্রমাগত ধমক খেতে থাকে ঈশ্বর। কিন্তু তবু কথা সে শোনে না।

—নামো জলে, দিয়ে এসো ডুব।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না নিশ্চয়। অবশেষে অন্য ভাবে শাসন আরম্ভ হল—চলো, ফিরে চলো। না, কিছুতেই না। স্নান কিছুতে করতে পারবে না। চলে এসো, চলে এসো।

বড়ই কৌতূহল হল রানী-বাইয়ের। কিন্তু এখন সে যে-অবস্থায় আছে, এ ভাবে এই আব্রুর ভিতর থেকে বেবিরে আসা যায় না। তাই গা মাজা সাঙ্গ করে ফিরে ডুব দিয়ে নিল সে। উঠে এসে সারা শরীর মুছল, মাথার চুল পিঠের দিকে ছাড়িয়ে দিয়ে হাতে গামছা ধরে ফটফট করে ঝাড়ল চুলের জল, কাপড় জামা পরে নিয়ে বলল, হীরা।

—কি বলছ গো?

—পরদা সরা।

অনেকটা সময় নিয়েছে সে। কিন্তু পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেও দেখে ঈশ্বরের উপর জুলুম এখনো থামেনি।

ছয়-সাত বছরের একটি ক্ষুদে ছেলেকে শাসন করছেন এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। আগে ইনি জলে নামাবার জন্যে জোর করছিলেন, কিন্তু এখন বলছেন বিপরীত কথা। কিছুতে নাইতে দেবেন না বলে তার হাত ধরে টানছেন। কিন্তু ঐটুকু ছেলে হলে হবে কি, তার গোঁ অসাধারণ। সে কিছুতে নড়তে চায় না।

এগিয়ে গেল রানী-বাই, বলল, মাপ করবেন। কি হয়েছে?

—নাওয়াতে এনেছিলাম, জলে নামতে চায় না। এখন, জলে নামতে বারণ করেছি, ও নামবেই।

মৃদু হাসল রানী-বাই, বলল, ছেড়ে দিন-না তবে। নামুক।

ছেড়ে দেওয়া মাত্র ছেলেটি তর্‌তর্‌ করে কোমর-জল পর্যন্ত নেমে গেল কৈ-মাছের মত থলবল করতে-করতে, তারপর গুপ গুপ করে ডুব দিতে লাগল।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বললেন, আমার ছেলে। যা করতে বলব তার উলটোটা করবে। নাওয়াতেই এনেছিলাম, কিন্তু নাইল না। বারণ করেছি আর ঐ ডুব দিয়ে চলেছে এক নাগাড়ে।

রানী-বাই বলল, একটু একগুঁয়ে হওয়া ভালো। কারো কথা না শুনে নিজের মত-অনুসারে চলাই বুঝি ও চায়।

—চায়, ভালো। কিন্তু মান্য করবে না গুরুজনদের? এটাও কি ভালো?

উত্তর দিতে পারল না রানী-বাই, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

ছেলেটা উঠে এসেছে উপরে। গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা মুছছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রানী-বাই জিজ্ঞাসা করল, কি নাম তোমার?

ঘাড় কাৎ করে বড়-বড় চোখে চেয়ে সে বলল, ঈশ্বর। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—কোথায় থাকো?

—বড়বাজারে?

—দেশ কোথায়?

ছেলেটি বীর বিক্রমে যেন দাঁড়াল, বলল, বীরসিংহ গ্রামে।

আর কোনো প্রশ্ন করল না রানী-বাই। পালকিতে গিয়ে বসল, ঝালরে ঝলমল করতে-করতে পোস্তার পথ ধরে গরানহাটার দিকে চলল পালকি।

রানী বলল, ছেলেটাকে দেখলি হীরা?

—দেখলাম। বড় বেআড়া, বড় বজ্জাত।

রানী বলল, ভালো ভালো মানুষ তো কত দেখছি হীরা, তুইও তো দেখেছিস কত। দু-একটা বেআড়া মানুষ না হলে বুঝি মানায় না আর সংসার। তেজি মানুষ দেখি না যে একটাও।

হীরামতি কোনো উত্তর দিল না এ কথায়।

গরানহাটার গলিতে এসে নামল রানী-বাই। ভরদুপুরেও এপাশে ওপাশে উপরে নীচে কাঁইকাঁই শব্দে বাজছে হারমোনিয়ম, পুঁ-পুঁ করে উঠছে ফ্লুট।

দো-ফের করে কাপড় পরা গোটা-কতক মেয়ে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পানওলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। এদের পালকি এসে নামতেই ওরা ফিরে তাকাল এদিকে, ফিকফিক করে হাসল, মিসি-মাখা দাঁতে ঝিলিক দিয়ে উঠল খুশি, বলল, এসেছেন আমাদের মহারানী।

চাপাগলায় গেয়ে উঠল দোকানদার—

বিবি-সাহেবের বয়স কত বলবে বলো কে।

কোমর কষে নবযৌবন বেন্ধে রেখেছে।

খিলখিলিয়ে উঠল মেয়েলোকেরা। তাবিজ-পেড়ে পরনের শাড়ির প্রান্ত তুলে পাড় দিয়ে ঠোঁটের পানের পিকের দাগ মুছে বলল, বাজারে খুব দর ওর। ওর দর যেমন, ওর দেমাকও তেমনি। ঘরের বউ যেন। কারো সঙ্গে বাইরে যাবে না ফুর্তি করতে, ওর ঘরে এসে মজা লোটো প্রাণ ভরে। কত বায়না!

ওপাশে ময়রার দোকানে মাছি ভনভন করছে। রসকরা বাদামতক্তি ছানাবড়া সরভাজা ঘিরে ধরেছে মাছিতে।

এর একটু তফাতেই শুঁড়িখানা। ফিরিঙ্গি সদাগরদের নৌকোর মাঝিরা ওখানে বসে হল্লা করছে।

মস্ত বাড়ি। উঠোন থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। নীচটা স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার, কিন্তু উপরটা শুকনো খটখটে আর আলোভরা।

দোতলার রেলিঙের ধার দিয়ে পাক খেয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল রানী-বাই।

মোহিনীর ঘর থেকে বাবুটি এখনো যায় নি। কাল সারারাত জ্বালিয়েছে, এখনো দম ফুরায় নি তার। মোহিনী-গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে ও-ঘর থেকে। চাকরানীটা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে। মোহিনীর ছাড়া নাই, সাঁড়াশির মত করে দুই হাত দিয়ে তাকে ধরে পড়ে আছে বাবুটি।

রোজ গঙ্গা-নাইতে যায় রানী-বাই। গঙ্গার কিনারে দাঁড়িয়ে সে তাকায় যতদূর দৃষ্টি যায়। ওই দিকেই তো গরিটি, ওই দিকেই চুঁচুড়া। তারা যেখানকার সেখানেই আছে তারা, কিন্তু আজ কতদূরে চলে এসেছে সে নিজে। গা মাজতে-মাজতে এই হিসাব করে সে। ইচ্ছে হয়, সাঁতার কেটে চলে যায় সে ঐ দেশে, চুঁচুড়ায় না— গরিটিতে। হঠাৎ গিয়ে হাজির হয় সে তাদের সেই ফরাসগঞ্জের আমের ছায়াঘেরা উঠোনে। তাকে দেখে কি চিনতে পারবেন তার মা, চিনতে পারবেন বাবা? তার ভাইয়েরা কি চিনতে পারবে

তাকে? আর গাঙ্গুলিবাড়ির সেই পিসিমা, আর, আর, হায়, নেই সে, নেই সেই কদম-মাসি।

কদম-মাসি যেভাবে নিস্তার পেয়ে গিয়েছে এই সংসার থেকে, সেইভাবে সেও যদি নিস্তার পেত তাহলে হয়তো ভালো হত এর থেকে। প্রত্যহ রাত্রে কত অচেনা মানুষের মুখ থেকে একই স্তুতি শুনতে হচ্ছে তাকে, কত পীড়ন কত পেষণ সহ্য করতে হচ্ছে— তার ঠিক নাই। এইভাবে কতদিন আর চলবে জীবনটা?

এ-বাড়ির মাসি রোজই সাবধান হতে বলে, বলে, বাইগিরি চলবে কি চিরকাল? হয় হবি মাসি, নয় হবি দাসী— এই তো লিখন রে, এ-ললাটে। যতদিন সুদিন আছে, লুটে নে।

লুটে নিচ্ছে সে। কসুর করছে না। কোনো মায়া নেই, কোনো মমতাও নেই নিত্যরাতের নতুন অতিথিদের উপর। ওদের কি চিনতে বাকি আছে তার? ওরাও তো প্রত্যেকেই চুঁচুড়ার সেই মানুষটার মতই, স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই, মনে-মনে তাই সে চিন্তা করল— রূপনারায়ণ।

আজ আবার ঐ ধমকের শব্দ। ঈশ্বরকে শাসন করছেন তার পিতা। বলছেন, নেয়ে নাও, নেয়ে নাও, নেয়ে নাও।

রানী কাছে গিয়ে বলল, নাইতে চায় না বুঝি?

—না। না-নাওয়াই দরকার আজ। জ্বর হয়েছে ওর।

জ্বর হয়েছে, নিয়ে আসতে চান নি, তবু জোর করে এসেছে ঐ ছেলেটা। তাই তার বাবা ওকে জবরদস্ত করছেন নাইবার জন্যে। যদি এতে সে না নেয়ে ঘরে ফেরে।

—ভীষণ গোঁয়ার, ভীষণ জেদি, ভয়ংকর একরোখা।

ছেলের নামে বুঝি নালিশ জানালেন তার বাবা। মুশকিলে পডলে কারো কাছ থেকে সামান্য সহানুভূতি পেলে এই রকমই বুঝি বেরিয়ে আসে মনের কথাগুলো। বললেন, এখনই এই, বড হলে কী যে হবে ভগবান জানেন।

হোক, বড় হোক ও। ওর জেদের পরীক্ষা হোক। সেসব দেখার জন্যে বেঁচে থাকার আশা রাখে না রানী। কিন্তু ঐ যে, সে গিয়েছিল নাচতে মানিকতলায়, সে বাড়ির ঐ লোকটির কিছুটা জেদ সে দেখেছে কাশীমিত্তিরের ঘাটে। মারমুখো একটা জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কেমন নির্ভীক ভাবে তিনি পরীক্ষা দিলেন তাঁর জেদের। সেদিন ওঁকে চিনতে পারে নি সে, কিন্তু এখন

চেনে, নামও জানে এখন। তার ঘরে যে বাবুরা আসেন, তাঁরা খুব গালমন্দ করে ঐ মানুষটার নাম করে। সে গালমন্দের মধ্যে থেকেই সে একটু-আধটু বুঝতে পারে মানুষটার জেদ।

বলা যায় না, বড হয়ে এ ছোঁড়াটাও হবে হয়তো আর-একজন ঐ ধরণেরই মানুষ।

সেদিন ঘরে ফিরে এসে রানী-বাই শুনল তার বায়না এসেছে, মোটা টাকার বায়না।

—কিসের বায়না, মাসি ?

—সিঁথির বাগানে যেতে হবে নাচতে। মেলা টাকা দেবে। বলে গেল, যত টাকা লাগে।

মৃদু হেসে রানী জিজ্ঞাসা করল, যেতে বলছ নাকি, মাসি ?

মাসির নথ এসে পডেছিল ঠোঁটের উপর, মাথা ঝাঁকি দিয়ে সেটা সরিয়ে বলল, আমি বলার কে। তবে, এটুক বলতে পারি— আমাকে ডাকলে আমি যেতাম।

রানী-বাই হাসতে লাগল, বলল, তবে তুমিই যাও-না, মাসি।

রেগে উঠল মাসি। সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল রাগে, নিতম্বের গোট নডে উঠল, বলল, গেছি বে গেছি। অত ঠাট্টা কেন। কত ডাকসাইটে বাবুর সঙ্গে নৌকো-বাইচে বাগানবাডিতে গেছে রে তোদের এই বিন্দি-মাসি। তোরা আর ক'টা বাবু দেখছিস ? এখন তো সব ফোতো বাবু। সে-জাঁক সে-জমক তোরা দেখবি কোথা থেকে ?

একটু থেমে বিন্দি বলল, সিঁডির ধাপে-ধাপে মোহর ছডিয়ে উঠে আসত বাবুরা, সেসব মোহব পেত চাকর-চাকরানীরা। তোরা এখন যা পাচ্ছিস তা ঐ চাকর-চাকরানী দস্তুরি।

চমকেই উঠল যেন একটু রানী-বাই, তবু বলল, সেসব গেল কোথায় মাসি ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিন্দি-মাসি বলল, ওসব থাক না রে। চিৎপাতের ধন উৎপাতে যায়। নইলে তোদের বাডিউলি-মাসি হব কেন, সেসব থাকলে আজ হতেম মহারানী।

থাকে না নাকি সেসব ধন ? তবে-যে আখেরের জন্যে ভাবতে বলত তাকে তার রামবাগানের মাসি ? যদি না'ই থাকে, তবে অত ঝঞ্ঝাট করে

বেড়িয়ে পুঁজি করার চেষ্টা কেন। নিকি নর্তকীকে নাকি মাসে হাজার টাকা দিয়ে চাকর রেখেছে কে, আশ্চর্যই লাগে রানীর। একজনের চাকর হয়েই যদি থাকতে হবে তবে ঘরের বউ হয়ে থাকলেই হয়। ঘরের বা'র হয়ে বাঁধা-মাগ হবার অর্থ হয় না। ঐ হাজার টাকা পুঁজি করে রাখতে পারছে নাকি নিকি? সে ধনও নিশ্চয় খরচ হয়ে যাচ্ছে উৎপাতে।

সুতরাং আর কি, ভাবতে রাজি নয় রানী। ভবিতব্য আছে ভবিতব্যের মধ্যে। আজকের দিনটাই তার থাক্ হিসাবের মধ্যে।

রানী বলল, না মাসি, আমি যাব না। দিক-না তারা যত টাকা ইচ্ছে, দিক-না এই ঘরে এসে।

দাঁতে জোর কমেছে, সাঁচি পান ছেঁচছিল বিন্দি-মাসি। পানের মণ্ড মুখে দিতে-দিতে সে বলল, গেছে তারা কাছেই কোথায় ঘুরে আসতে। আবার আসবে বলে গেছে, এলে ঐ কথাই বলব।

—হ্যাঁ। বোলো, ঘরে এলে গান শোনাব, নাচ দেখাব, সব দেখাব। কিন্তু সিঁথিতে না, দমদমায় না। এই গরানহাটায়।

কিছুক্ষণ পরেই রানী গলা শুনতে পেল নীচ থেকে, মাসি বলছে, না গো না। বললাম যে, ও যাবে না। ও কি তোমাদের নিকির মতন, কি হিঙ্গুলের মতন বাই? ওর দর আলাদা। ঘরে এসো, মোহর ফেলো, মজা কোরো।

উপর থেকে রেলিঙে বুক রেখে ঝুঁকে রানী জিজ্ঞাসা করল, কে মাসি, কে এসেছে?

নীচ থেকে গলা চড়িয়ে মাসি বলল, কে আবার। ঐ চুঁচড়োর তারা।

—কোথাকার?

—কেন, শুনতে পাস নে নাকি কানে? কানে কি হীরের ঝাঁপি পরে আছিস এখনো? চুঁচড়ো, চুঁচড়ো।

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রানী-বাইয়ের। নিজেকে শক্ত ক'রে দাঁড় করিয়ে সে গলার স্বর নরম করে নিল, ঝুঁকে বলল, ওখানে তো হাজার মানুষের বাস। মানুষটার নাম জেনে নাও, মাসি।

মাসিকে জেনে বলার সুযোগ না দিয়ে যারা এসেছে তারাই উপর দিকে চেয়ে বলল, রূপনারায়ণ, রূপনারায়ণ রায়।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানী-বাই। এর পর কি কথা বলবে সে বুঝতে পারল

না। মাথার ভিতরটা বুঝি ঝিমঝিম করে উঠেছে। অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এক পাল কবুতর ছাদের কার্নিশে বসে বকবক করে চলেছে ক্রমাগত, কড়া রোদের গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে যেন একটা উড়ন্ত চিল চিৎকার করে উঠল। বাইরে রাস্তায় ফিরিওলা এই অবেলায় কর্কশ গলায় হাঁক দিল— বেলফুল।

রেলিঙের গা থেকে ছুটে ঘরের মধ্যে গেল রানী-বাই, ব্যস্ত হয়ে ডাকল, হীরা হীরা হীরা।

ঘর গোছগাছ করছিল হীরা, চুপসানো বালিশগুলো থাবা দিয়ে-দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছিল।

রানী বলল, হীরা, শিগগির নীচে যা। কারা এসেছে তাদের বলে আয়— তাদের বাবু যেন আসেন।

বিরক্তই হল বুঝি হীরা, বলল, কে এমন লাটের বাবু সে? আসতে হয় এমনিই আসবে। তোমাকে সেধে ডাকতে হবে নাকি?

—সেধে না রে, সেধে না। নিজের গরজেই লোক পাঠিয়েছে। শুধু বলে আসা, যেন আসে।

হীরা রওনা হল। পিছন থেকে রানী-বাই বলল, বলিস, দিনের বেলা এলে আমি বিরক্ত হই। দিনে আমি ঘুমোই। রাতের বেলা যদি আসে, আসতে পারে।

হীরা নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

সোজা হয়ে আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না রানী-বাই। সে গিয়ে তার বিছানার উপর পড়ল। হীরার ফাঁপানো বালিশ দিল চুপসে।

কানাগিন্নির নাচের কথা মনে পড়ছে আজ, বাইজিদের নাম করে-করে পাক খেয়ে-খেয়ে নেচেছিলেন কানাগিন্নি। সেসব বাইজি তখন ছিল কত দূরের, কত নীচের। আজ সেই বাইজির দলেরই একজন সে। আজ তাঁকে খুঁজে পেলে সে অনুনয় করে বলবে— ও গিন্নি গো, ওই নামের সঙ্গে জুড়ে দাও গিন্নি আর-একটা নাম—জুড়ে দাও এই রানী-বাইকে।

কিন্তু কত দূরে, আর কোন্ নেপথ্যে চলে গিয়েছে সেই কানাগিন্নি; আর কত নীচে আর কোন্ অন্তরালে এসে উপস্থিত হয়েছে সে নিজে।

হীরা ফিরে এসেছে। ফিরে এসে দেখে রানী-বাইয়ের চোখের জলে ভিজে গিয়েছে বালিশ।

হীরা বলল, ওরা রাজি গো। কারা গো ওরা? অনেক কালের চেনা মানুষ বুঝি? চোখে জল এনে দিল যে এমন? আর, অমন কেঁদো না গো, কেঁদো না। ওরা রাজি তোমার কথায়। রাতেই আসবে। পরশু।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হীরা নিজের মনেই বলে উঠল, আদ্দিখ্যেতা!

কম দিন তো গত হয় নি এর মধ্যে, শুয়ে-শুয়েই হিসাব করল রানী-বাই। বারো বছর। একটা যুগ কেটে গিয়েছে তার জীবনের উপর দিয়ে। চুঁচুড়ার ঐ প্রাসাদের বন্দীশালায় দিন যেন কাটত না। কিন্তু সে-বন্দীশালা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার দিনগুলো কেটে গিয়েছে যেন হুহু করে।

এতদিনে তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে নিশ্চয় কিছুটা। আয়নায় নিজেকে দেখে তা পরখ করা কঠিন। রোজকার কণা-কণা পরিবর্তন চোখে পড়ে না। প্রত্যহের সেই কণা-পরিমাণ পরিবর্তন একত্র হয়ে বারো বছরে নিশ্চয় কিছু পার্থক্য ঘটিয়েছে চেহারায়। তা যদি ঘটে থাকে, রক্ষে। সে যেন চিনতে না পারে তাকে। যতদিন সে ছিল ঐ বন্দীশালায় তখন কতটুকুই-বা দেখেছে তাকে। চিনতে পারার কথা না। তবু সাবধান হয়েছে রানী-বাই, রাতের বেলা আসতে বলেছে অতিথিকে, দিনের আলোয় ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না সে।

রানী-বাই বুঝি রাজরানী হয়ে উঠতে চায়। ঘর-দুয়ার গোছগাছ করার জন্যে হীরাকে হুকুম দিতে লাগল নরম কেদারায় বসে। পিকদানবরদার পাখাবরদার হুকাবরদারদের তটস্থ রাখল, রুপাবাঁধা সোনাবাঁধা আলবোলা গুড়গুড়ি মেজে রাখালো। সাঁচি পান এনে রাখালো পানদানে—ছোট-এলাচ বড়-এলাচ লবঙ্গ জায়ফল জয়ত্রী জোয়ান ধনে সুপারী কর্পূরে সাজিয়ে রাখালো পানদান। চরসের আর মোহিনী-গাঁজার আয়োজন ঘর থেকে পরিষ্কার করিয়ে কিনে আনাল ব্রাণ্ডি।

ফরমাশ খাটতে-খাটতে হয়রান হয়ে হীরা বলল, কে গো লোকটা, এমন ব্যাপার তার জন্যে কেন?

যেন আকাশ থেকে পড়ল রানী-বাই, বলল, সে কী রে। এই শহরে আছিস, চিনিস না ঐ মান্য লোকটিকে? মস্ত বেনিয়ান ছিল ওর বাপ। খুব নামডাক ওর। তাজ্জব করলি হীরা, তাকে চিনিস না তোরা?

সত্যি, তাজ্জব হয়েছে হীরাই। ঠিকা-বাবু আসুক কি বাঁধা-বাবু আসুক,

কোনো মাগীকে কি কোনো বাইজিকে এমন সাজ-সাজ রব করতে শোনেনি সে।

রানী-বাইয়ের দেমাক দেখে চমকে গেছে রূপনারায়ণের সঙ্গীরা। এমন দেমাক আজ পর্যন্ত দেখে নি তারা কোনো মেয়েমানুষের। 'বাবু যদি এসেছেন ফুর্তি করতে, বাবুই আসুন তবে; চেলারা এ ঘরে কেন? তারা অন্য ঘরে বসুক। নীচতলায় পাশাপাশি ঘরে আছে দশ গণ্ডা মেয়ে। সেখানে তারা যাক।

নরহরিকে ও মোতিলালকে অগত্যা নেমে আসতে হয়েছে নীচে। রানী-বাইয়ের ঘরে একা রূপনারায়ণ।

হে পাঠক হে পাঠিকা, পুনরায় আপনাদের সম্বোধন করি— একদিন মাহেশের কিনারে হাতের কলম ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আজ ইচ্ছে হচ্ছে কুড়িয়ে আনি আরো অনেক কলম। দশগুণ দ্রুততায় টুকে রাখি ওদের এই মিলনকাহিনীটা।

দূরপ্রান্তের দেয়ালে দেয়ালগিরিতে জ্বলছে নিষ্প্রভ মোম। ঐ ঈষদালোকের অন্তরালে রূপনারায়ণ চেপে ধরেছে রানীর দুটি হাত, বার-বার সাধছে তাকে— নাচো, একটু নাচো।

অটল হয়ে বসে রানী-বাই দেখছে এই মানুষটার মুখ। অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছে, অনেক কাবু হয়ে গিয়েছে লোকটা। এক দৃষ্টে সে চেয়ে আছে ঐ মুখের দিকে।

—কি দেখছ?

—দেখছি তোমাকে।

এর দেমাকের কথা বলছিল না নরহরিরা? দেমাকই তো বটে। চট করে তুমি বলে বসতে পারল এ? আশ্চর্যই হল রূপনারায়ণ। কিন্তু কিছু বলল না। ঐ সম্বোধনে একটু খুশিই হল যেন। রানী-বাইয়ের মত এমন-একটা বাই তার সঙ্গে প্রথম-আলাপেই কথা বলছে এমন অন্তরঙ্গভাবে। রূপনারায়ণ বলল, তুমি বড় সুন্দর।

হাসল রানী-বাই, বলল, এর আগে আরো সুন্দর ছিলাম।

—তখন কোথায় ছিলে তুমি? খোঁজ পাই নি কেন।

—কেন? একটা নিশ্বাস ফেলল রানী, বলল, সে-কথা বলব কী ক'রে। খোঁজ বোধ হয় করো নি।

—কোথায় ছিলে আগে ?

—গঙ্গার ওপারে। ছি, জায়গার নাম জানতে চাইতে নেই। আমরা নষ্টমেয়ে, আমাদের সব ঠিকানা কি আমরা জানতে দিই কাউকে ?

নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে বসেছে তারা। কথার পর কথা বলে চলেছে। যেন কথা বলতেই আসা এখানে। কত কথা জিজ্ঞাসা করছে রূপনারায়ণ, কত কথা জানতে চাচ্ছে রানী-বাই— তার সংখ্যা নাই।

রানী-বাই বলল, কেন আসো তোমরা এখানে ? এখানে এসে কি আরাম পাও তোমরা ? ঘরে বউ নাই ?

কথাটা জিজ্ঞাসা করেই সে রূপনারায়ণের মুখের দিকে তাকাল এ-কথার উত্তর শোনার জন্যে, রূপনারায়ণ বলল, না নাই।

—বিয়ে করো নি বুঝি।

—করেছিলাম।

—মরে গেছে বুঝি বউ ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রূপনারায়ণ বলল, না। মরেনি, একদিন হঠাৎ—

বাধা দিয়ে উঠল রানী-বাই, বলল, থাক্ থাক্, ঘরের কথা বলতে নেই সবাইকে। অন্য কথা বলো।

কিন্তু অন্য কথা না, রূপনারায়ণ তার ঘরের কথাই বলতে লাগল, বলল, একদিন হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে সে।

মনের কথা উজাড় করে বলতে চায় বুঝি রূপনারায়ণ। জীবনে অনেক গণিকা অনেক বাইজি দেখেছে সে, তাদের কারো কাছ থেকেই বুঝি এমন সদয় আর সরল আচরণ সে পায় নি, তাই এ-স্বাদ তার কাছে নতুন লাগছে। বিয়ে-করা বউয়ের কাছে মানুষে কেমন ব্যবহার পায়, সে জানে না। হয়তো এই রকমই পায়। সে তাই গদ্‌গদ চোখে চেয়ে আছে রানী-বাইয়ের মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে রানী-বাই জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর খোঁজ করোনি ?

—করেছি। পাই নি।

—আবার বিয়ে করলে না কেন ?

—বিয়ে ? রানী-বাইয়ের কাঁধের উপর হাত দিয়ে রূপনারায়ণ বলল, যার বউ কুলত্যাগ করে সে যে হয় একঘরো। তাকে আর কেউ মেয়ে দেবে কেন ?

—ওঃ, এই কথা ?

আর-একটা হাত রানী-বাইয়ের কাঁধের উপর তুলে রূপনারায়ণ বলল, এই তো বিয়ে হল আমার তোমার সঙ্গে।

কাঁধ থেকে দুই হাত ধীরে-ধীরে সরিয়ে দিয়ে সরে বসে রানী-বাই বলল, রোজ রাতে বুঝি এমনি বিয়ে হয় তোমাদের ?

এ কথার উত্তর দিতে পারল না রূপনারায়ণ। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ, তার পর বলল নাচো, নাচো একটু। তোমার নাচের কত নাম। একটু দেখাও নাচ।

কিন্তু ওঠে না রানী-বাই। অনড় হয়ে বসে আছে সে। কি যেন ভাবছে বসে-বসে। তার দুর্ভাগ্যের কথাই সে ভাবছে, না, তার সৌভাগ্যের কথা ? সমস্ত অতীত এসে আজ যেন ধরা দিয়েছে অর্গলবদ্ধ এই ঘরে। গরিটির থেকে শান্তিপুরের যাত্রার কথা, তাদের বিবাহের সেই দীর্ঘ মিছিলের কথা, মাহেশের সেই স্নানযাত্রার কথা, চাঁপার জোগাড় করা সেই বাবুটির কথা।

আবার অনুনয় করল রূপনারায়ণ, বলল, এবার একটু নাচো। দেখি তোমার ঐ পায়ের কাজ। ঐ পায়ে নাকি ফুল ফোটে ?

—ফোটে।

—তবে নাচো। ব'লেই চট্ করে রূপনারায়ণ তার হাত ছেড়ে দিয়ে চেপে ধরল পা-দুটো।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানী-বাই। বলল, ছি, তুমি পুরুষমানুষ, তোমরা পুরুষের মত চলবে। মেয়েমানুষের পায়ে কি হাত দিতে আছে তোমাদের ?

মুখে সে বলল ঐ কথা, কিন্তু মন তার বুঝি ভরে উঠেছে ভয়ংকর জয়ের আনন্দে। হলপ করেছিল সে, সে প্রতিজ্ঞা পালন করল সে। ফৈজ বক্সের পা যে তুলে নিতে পারে বুকে, সে যে রানী-বাইয়ের পাও চেপে ধরবে, এ আর বেশি কথা কি। কিন্তু তার মনে হল, এ কথা বেশিই। এই পা-দুটি সে তৈরি করেছে কঠিন চেষ্টা দিয়ে, কঠোর পরিশ্রম দিয়ে, দিনের পর দিন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে। সে পা আজ ধন্য হল।

উঠে দাঁড়াল সে, তার পা-দুটি বুঝি কাঁপছে একটু-একটু।

রূপনারায়ণ ঘাড় তুলে তার দিকে চেয়ে বলল, নাচবে না ?

সারাঘর সে সজ্জিত করেছে অপরূপ সাজে, কিন্তু আশ্চর্য, নিজেকে সে সাজায় নি আজ ভালো করে। সাধারণ একটা শাড়িতে অঙ্গ ঢেকে আটপৌরে সাজে

আজ সে সজ্জিত। হীরার প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে, আমাকে দেখতে তো আসছে না, আসছে আমার নাচ দেখতে।

সেই নাচ দেখানোর জন্যে তৈরি হল রানী-বাই। কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে এনে কোমরে নিল জড়িয়ে, বলল, শুধু নাচ না, গান গাই আর নাচি?

—বা বা বা, চমৎকার। এই তো চাই।

রানী-বাই হাসল, বলল, সারেঙ্গী নাই, তবলচি নাই—

কথা কেড়ে নিয়ে রূপনারায়ণ বলল, কেবল তুমি আর আমি।

রানীও হাসল, বলল, শুধু নাচ আর শুধু গান।

দরজার ওপারে তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে পিকদানবরদার হুকাবরদার। পাঙ্খাবরদার কোন্ নেপথ্যে ব'সে শুধু পাখার দড়ি টেনে চলেছে জোরে-জোরে।

হীরা বুঝি হার মেনেছে এই আদিখ্যেতার কাছে। বিন্দি-মাসির ঘরে গিয়ে বসে সে মুণ্ডপাত করছে রানী-বাইয়ের।

ঘরের মধ্যে গান ধরেছে রানী-বাই, খাসা গলা তো, গান করছে রানী-বাই—

কর্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ গেল দুখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।

পাক খেয়ে-খেয়ে নাচছে রানী-বাই আর গাইছে—

নাহি চেনো ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা
অসতীর আশা পুরাও
রাজ্যে থেকে ভার্যের প্রতি কার্যে না কুলাও।

চমকে তাকাল রূপনারায়ণ ঐ মুখের দিকে। এ যেন শোনা গান, জানা গান। জিজ্ঞাসা করল, এ-গান শিখলে কোথায়?

রূপনারায়ণের পাশে ঘন হয়ে বসে রানী-বাই বলল, যার গান তার কাছ থেকে।

—কার গান?

—যজ্ঞেশ্বরী কবিয়ালনির।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে রূপনারায়ণের। সেও শুনেছে বটে তারই মুখে ঐ গানটি। কথাগুলো মনেই ছিল না তার, আজ শুনে মনে পড়ল।

রানী জিজ্ঞাসা করল, কিছু খাবে ?

ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল রূপনারায়ণ তৃষ্ণার্ত চোখে, রানী বুঝতে পারল বুঝি, বলল, যা খুঁজছ আছে। সব আছে, সব পাবে।

আজ বুঝি নিজেকে উজাড করে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে রানী-বাই। গেলাশ তার হাতে দিতে-দিতে সে বলল, মাঝে মাঝে এসো।

—আসব বই-কি। যা খাতির পেলাম এখানে, এ কি ভুলবার ?

ভুলবার নয়। ঘরের দূরপ্রান্তের দেওয়ালগিরিতে পুড়ে-পুড়ে ক্ষয়ে এসেছিল মোম। সে দিকে লক্ষ্য ছিল না এদের। হঠাৎ দ্বিগুণ আলো ছড়িয়ে জ্বলে উঠেই নিবে গেল বাতি। অমনি দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলে উঠল বুঝি রানীরও বুক।

নিটোল অন্ধকার ঘরে রূপনারায়ণ গদ্‌গদ গলায় বলল, তুমি আমার কে ? এত আদর, এত যত্ন কেন আমাকে ?

রানী-বাই কি উত্তর দিল বোঝা গেল না।

বড় মধু পেয়ে গিয়েছে বুঝি রূপনারায়ণ এখানে। তাই বড় মায়া পড়ে গিয়েছে তার, মমতায় ভরে উঠেছে তার মন। প্রায়ই তাই আসতে হয় এখানে, প্রায়ই চুঁচুড়া থেকে রওনা হয় তার বজরা। টাকশালের ঘাটে নেমে পালকি চেপে চলে আসে এখানে।

নরহরিরা ভাবে অন্তিমকালে হরিনাম করছে নাকি তাদের এই কাপ্তেন ? কত মেয়েমানুষের সঙ্গে কত মেলামেশা হল, কিন্তু এমন লটঘট তো বাধে নি কারো সঙ্গে। শরীরের যা অবস্থা আর বাঁচবেই-বা ক'দিন, এই সময়ে তার যে টান হয়ে গেল একটা নাচনাউলির উপর !

হীরামতিরাও বড় বেআড়া-বেআড়া কথা বলে। কিন্তু সেসব কথা কানে গেলেও রানী তা যেন শুনতে পায় না, এমনি ভান করে।

বিন্দি-মাসির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হীরা বলে, ও যে এমন পিরিতখোর মাগী কে জানত বল, মাসি। এ পথে এইচিস কি পিরিত করতে, না, পয়সা করতে ? পিরিত চাস তো খসে যা-না এ-তল্লাট থেকে।

গলা নামিয়ে হীরা বলে, আর, পিরিতই যদি চাস তবে ধর্‌-না এক তাজা জোয়ান। অমন মদে-ঝলসানো চালসে-ধরা মিন্সেকে ধরে লাভ কি ?

কি যে লাভ তা বললে কি হয়, রানী তার নিজের অভিরুচি অনুসারে

চলেছে। কেন তার এমন ইচ্ছে হল, সে কথা কেমন করে সে খুলে বলবে কা'কে ?

ঠিক এক নিয়মে চলেছে গরানহাটার গলি। নানা সাজে সজ্জিত হয়ে দরজায়-দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে সুন্দরীরা। কারো পরনে গাটো বল্লট লাগানো সাটিনের পায়জামা আর আঙিয়া ; কারো-বা কলকাদার ঢাকাই শাড়ি ; কারো রঙ গালে, কারো ঠোঁটে, কেউ কানবালায় আর হীরা-পান্নার ধুকধুকিতে, কেউ-বা ডায়মন-কাটা চিক ও তাবিজ বাজুতে ; কেউ সোনার গোটে, কেউ রুপার চন্দ্রহারে অঙ্গ সজ্জিত করে মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে মশকরা করে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে সে খবরে কারো যেন কোনো কাজ নাই। তাদের সারা দুনিয়া এসে জড়ো হয়েছে বুঝি এই গরানহাটার গলিতে।

সারা দুনিয়ার কথা থাক্। এই শহর-কলকাতাতেই আরো কত ঘটনা ঘটছে, সেদিকে লক্ষ্য দিতে পারি নি আমরাও। চোখে সুর্মা টেনে দাঁতে মিশি মেখে এখানে ওরা দাঁড়িয়ে থাক্, আমাদের দৃষ্টি আমরা টেনে নিয়ে যাই এখন অন্যত্র।

হিন্দুকলেজের ছাত্ররা হিপ্ হিপ্ হুর রে ধ্বনি তুলেছে ধর্মতলার মোড়ে। কি ব্যাপার দেখার জন্তে পথে দাঁড়িয়ে গিয়েছে লোক।

তিনটি ছেলে পথের ধারের যবনের দোকান থেকে রুটি কিনেছে। এই আনন্দে তারা আত্মহারা।

সাহেবের বাড়িতে রুটি আর ডিম ফিরি করে ফিরছিল ফিরিওলা, তাকে ডাকল ওদের একজন, প্রকাশ্যে দিনের আলোয় ওর কাছ থেকে কিনল বিস্কুট। সে বিস্কুট মুখে দিয়েই তারা চেঁচিয়ে উঠল— হিপ্ হিপ্ হুর রে।

জেলেপাড়ায় পুজো সেরে ঐ রাস্তা দিয়ে আসছিল শালগ্রাম শিলা হস্তে আত্মানন্দ ভট্টাচার্য। থমকে দাঁড়াল সে, বলল, জাহান্নমে গেল, জাহান্নমে গেল দেশটা, ম্লেচ্ছ হয়ে গেল সব।

নিজের ভাগ্যকেই বুঝি ভৎর্সনা করতে-করতে এণ্টালির দিকে চলে গেল আত্মানন্দ।

হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আচরণ নিয়ে বড় বিব্রতই হয়ে পড়তে হয়েছে এই শহরকে। এরা ছারখারে দেবে বুঝি দেশটা।

এখানে, এই ধর্মতলায় মোড়ে এরা যখন হিপ্‌ হিপ্‌ হুর রে ধ্বনি তুলেছে, সেই সময়ে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি তুলে পটলডাঙার রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে একটি ঘোড়া।

মানিকতলার বাগানবাড়ির ফটক ভেদ করে ঘোড়সওয়ার ভিতরে ঢুকে গেল।

ওই শব্দ শুনে বেরিয়ে এল গোলোকদাস, কি সংবাদ?

সংবাদ নাকি বিশেষ কিছু না। নতুন লাটসাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন রামমোহনকে। সেই বার্তা নিয়ে এসেছে এই এডিকং।

—কে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—গবর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

রামমোহন একটু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। হঠাৎ কেন এ-তলব বুঝতে পারলেন না তিনি, কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তাঁকে গিয়ে বলুন, আমি এখন পার্থিব কোনো কর্তব্য পালনের দায়িত্ব ত্যাগ করেছি, আমি এখন ধর্মের তত্ত্বালোচনায় ও পরমসত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তাঁর ন্যায় মহিমান্বিত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হবার আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই, এজন্য তিনি যেন আমাকে মার্জনা করেন।

অশ্বক্ষুরের আঘাতে ধুলো উড়িয়ে তীরবেগে উধাও হল অশ্বারোহী।

গবর্নর-জেনারেলের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সে জানাল এই বার্তা।

জিজ্ঞাসা করলেন গবর্নর-জেনারেল, তাঁকে তুমি কি বলেছিলে?

—বলেছিলাম, গবর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তাঁকে আহ্বান করেছেন।

এ কথা শুনে তিনি এডিকংকে বললেন, আবার যাও। গিয়ে বল— তিনি যদি অনুগ্রহ ক'রে এসে একবার দেখা করেন তাহলে মিস্টার উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কৃতার্থ হবেন।

পুনরায় অশ্বারোহী এসে উপস্থিত। কিজন্যে তাঁকে এই অনুরোধ কিছুই বুঝতে পারেন নি রামমোহন। কিন্তু এবার বিনীত ভঙ্গিতে পাঠানো তাঁর এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করা গেল না। গবর্নর-জেনারেল নয়, মিস্টার বেণ্টিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

লাটপ্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখা করে এলেন বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে। দেখা করে ফিরে আসার পর তাঁকে বিশেষ চিন্তিত দেখাল।

হরিহরানন্দের সঙ্গে কথা বললেন না, গোলোকদাসকে সরে যেতে বললেন, হাতের কাছে টেনে নিলেন তিনি পুঁথি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ব্যাপৃত হলেন রচনাকাজে।

দীর্ঘ বাইশ বছর মাদ্রাজের গবর্নর ছিলেন বেণ্টিঙ্ক। তার পর সত্ত তিনি গবর্নর-জেনারেল-পদে উন্নীত হয়ে এসেছেন কলকাতায়। এখানে আসার আগেই মন বুঝি প্রস্তুত করেই এসেছেন তিনি।

দীর্ঘদিন তিনি মাদ্রাজে ছিলেন, কিন্তু মাদ্রাজের উপকণ্ঠে কখনো যান নি। কিন্তু একদিন তিনি অশ্বারোহণ ক'রে তাঁর সঙ্গী স্লীম্যান-সাহেবের সঙ্গে ভ্রমণ করতে-করতে সমাধিস্তম্ভের স্থায় প্রস্তরনির্মিত মঞ্চ দেখতে পেলেন অগণ্য। লতাগুল্মের আচ্ছাদনে কোনোটি আবৃত, কোনোটি-বা অনাবৃত।

এ-জিনিস পূর্বে কখনো দেখেন নি তিনি, তাই স্লীম্যানের কাছে জানতে চাইলেন, কী এসব ?

স্লীম্যান বললেন, এগুলি ? এগুলি হচ্ছে সতী-স্টোন।

এ কথা শুনে একটি কথাও বললেন না বেণ্টিঙ্ক। অশ্বপৃষ্ঠে বসে তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে-করতে এগিয়ে চললেন। হয়তো মনে-মনে কোনো সংকল্প তাঁর এল, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করলেন না তিনি।

স্লীম্যান তাঁকে বললেন পূর্ণ বৃত্তান্ত। শুধু এই অঞ্চলের কথা না, সারা ভারতের কথা। সারা ইণ্ডিয়াতে ছড়িয়ে আছে এই রকম কত সতী-স্টোন, তার কথা। যার সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। গভীর অরণ্যের অন্তরালে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে চিতোর এখন অদৃশ্যপ্রায়, এখান থেকে সেই চিতোর অবধি পথের দু ধারে ছড়িয়ে আছে এইরূপ স্তম্ভ কিংবা প্রস্তর-ফলক। চিতোরের সেই উচ্চ মালভূমিও পরিপূর্ণ এইরূপ প্রস্তর-ফলকে। সেখানে পুরসুন্দরীদের স্নানাগার, একদা সেখানে তাদের কলকণ্ঠ ও কঙ্কনকিঙ্কিনী জলধারার সঙ্গে জলতরঙ্গের ধ্বনিতে বেজে উঠত ; সে স্নানাগার এখন শুষ্ক ও জলহীন ; তারই কিছু ঊর্ধ্বে প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদতুল্য একটি বিশাল স্তম্ভ, নাম তার মহাসতী। এখানে এসে দাঁড়ালে এই নির্জনতাকে নিদারুণ নির্দয় বলে মনে হয়। দূরে দেখা যায় সেই বিরাট রণক্ষেত্র, সবই এখন পরিত্যক্ত ও লোকালয়হীন ; কিন্তু সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে তাদের পাখার বিচিত্র বর্ণের রামধনু সৃষ্টি করে উড়ে বেড়ায় প্যারট আর পীকক। নীচে শান্ত সরোবর, তার জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে অগণ্য ধারায়, গড়িয়ে-গড়িয়ে সে ধারা গিয়ে পড়েছে আরও নিম্নভূমির

সমতলে। স্বামীর চিতায় আরোহণ করার পূর্বে এই সরোবরে শেষ স্নান সমাপন করত সুন্দরীরা; প্রাসাদ থেকে সরোবরে আসবার গোপন পথটির চিহ্ন আছে এখনো— ঐ পথ বেয়ে আসত তারা শেষ অবগাহনের জন্যে। এই জহরব্রতে আত্মাহুতি দিত যেসব নারী তাদের চিতাভস্ম সংরক্ষণ করা হত ঐ গোপন পথটির অগাধে রচিত ভূগর্ভের ভস্মাধারে। এ ঘটনা, স্লীম্যান বুঝি হিসাব করে বললেন, প্রায় পাঁচ শ বছর আগের— আলাউদ্দিন যখন আক্রমণ করেছিল চিতোর। এরই কাছে হচ্ছে সেই মহিলাটির সমাধি, যাকে বলা যায় ইণ্ডিয়ান হেলেন, কিন্তু যে রূপেই হেলেনের তুল্য, কিন্তু আচরণে নয়— এরই কাছেই সেই পদ্মিনীর প্রাসাদতুল্য সমাধিস্তম্ভ।

তার পর তিনি বললেন উদয়পুরের কথা। এখানে রানার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে একত্রে কতজন নারী আত্মাহুতি দিয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায় সহজেই, রানার সমাধির পার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক গণনা করলেই পাওয়া যাবে সে হিসাব। এখানে একস্থানে ষাটটি ক্ষুদ্র ফলক তিনি দেখেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের, বিশেষত বিজয়নগরের, ঘটনার কাছে রাজস্থানের এ কাহিনী নগণ্য। পোর্তুগিজ মিশনারিদের রিপোর্ট সত্য বলে মেনে নিতে মন সায় দেয় না, তাঁরা এরূপ হিসাব দিয়েছেন যে, এই দক্ষিণ-ভারতের এক চিতায় এগারো হাজার নারী আত্মাহুতি দিয়েছে। হয়তো এগজাজারেশন একটু আছে এতে, কিন্তু এ কথা কে না জানে, একটি পুরুষের চিতায় দুই বা তিন হাজার নারীর আত্মাহুতির রীতি দু-তিন শতাব্দী আগেও বিজয়নগরের সাধারণ রীতি ছিল।

বেণ্টিঙ্ক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন ঐ কাহিনী, এবং চাক্ষুষ দেখেছেন এই প্রস্তরফলক। শুনেছেন, কোনো মন্তব্য করেন নি।

এর কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতায় এলেন গবর্নর-জেনারেল হয়ে। নিজেকে প্রস্তুত করেই নিয়ে এসেছিলেন সম্ভবত। কলকাতায় এসে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করে যখন জানতে পারলেন যে, এখানে একটি বাবু আছেন যিনি সতী-বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছেন, অনেক কাজ করেছেন, তখন তাঁর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন বলে ভরসা হল বেণ্টিঙ্কের, এবং সেইজন্যেই তিনি তাঁর এডিকংকে পাঠিয়েছিলেন বাবু রামমোহন রায়ের কাছে।

বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে এসেছেন রামমোহন। ফিরে এসেই তিনি মনোনিবেশ করেছেন কাজে। ঐ প্রথাটি

প্রকৃতই হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ আচার কি না, জানতে চেয়েছেন বেণ্টিঙ্ক। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার যুক্তি ও প্রমাণ আবশ্যক। এবং কি কারণে এই প্রথা এখানে প্রচলিত তারও হেতু যেন লিখিত ভাবে বেণ্টিঙ্কের কাছে পেশ করা হয়— এই তাঁর অনুরোধ।

সেই অনুরোধ-পালনে ব্যাপৃত হয়েছেন রামমোহন।

প্রথমে তিনি উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি বেণ্টিঙ্কের। ইতিপূর্বে লর্ড আমহার্স্টও অনেক প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে শেষপর্যন্ত কিছু না করেই বিদায় নিলেন। তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়ে যখন এলেন এই নতুন গবর্নর-জেনারেল, তখন এঁকেও ঐ আমহার্স্টের মতই একজন বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এই কারণেই প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর আহ্বান।

কোম্পানির অধিকৃত এলাকার সাতটি অঞ্চলের সাত জন ইউরোপীয় শাসকের কাছে অভিমত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন আমহার্স্ট, তাঁরা সকলেই এক-বাক্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত জানান। নিজামত আদালতের বিচারপতি স্মিথ এ প্রথা উচ্ছেদের পরামর্শ দেন, সেনাবাহিনীর মধ্যেও এজন্যে কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাই বলে তিনি জানান। তবুও আমহার্স্ট ভরসা পেলেন না কিছু করতে। কিছু না করেই বিদায় নিলেন তিনি। তাঁর বুঝি ভয় ছিল, হঠাৎ এ প্রথা উচ্ছেদ করে দিলে তার প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানির রাজত্বই হয়তো উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

অপরাহ্নের হাওয়া এসে লেগেছে তাঁর বাগানের আম্রকুঞ্জে। ধীরে ধীরে বাগানে গিয়ে পদচারণা করতে লাগলেন রামমোহন। বুঝি ক্লান্তি দূর করার জন্যেই।

ওদিকে গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছে দুটি বালক। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাদের দোল দিতে লাগলেন, দোলনা থেকে তারা নামলে নিজেই দোল খেলেন ঐ দোলনায় বসে। খেলা করতে লাগলেন তিনি ঐ বালকদের মতই। এতে মনের ক্লান্তি হয়তো দূর হল একটু।

এই বালক-দুটির একটি তাঁর পুত্র রমাপ্রসাদ, আর অপরটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ— তাঁর পুত্রের সহপাঠী।

প্রায় প্রত্যহই এরা দু-জন খেলা করে এখানে। প্রত্যহ এসে এদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়তো তিনি পারেন না। কিন্তু আজ এদের সান্নিধ্য পেয়ে তাঁর মন বুঝি খুবই প্রসন্ন হল।

তাঁর মাথায় চিন্তা আছে, সেইজন্যে বেশিক্ষণ তিনি অতিবাহিত করতে পারলেন না বাগানে। ঘরে এসে বসলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে ঐ ঘরে এল দেবেন্দ্রনাথ ও রমাপ্রসাদ। এসে তারা দেখল, মধু আর রুটি খাচ্ছেন তিনি। ওদের দেখে মৃদু হাস্য করলেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথকে ডেকে তাকে কুশল প্রশ্নাদি করলেন, তাঁর স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে স্কুল জানতে চাইলেন, তার পর বললেন বেরাদর, দেখছ তো কি খাচ্ছি আমি? কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভক্ষণ করি।

হঁতুয়ার ধারেই তাদের স্কুল, এখান থেকে বেশি দূর না। সেখান থেকে সোজা চলে এসেছে দেবেন্দ্রনাথ এখানে। এই জন্যে 'বাবা কি করছেন' প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। বেশিক্ষণ আর সে দাঁড়ালও না, প্রস্থান করল।

কয়েক দিন ধরে কাজ করে সব প্রস্তুত করা হয়ে গেছে তাঁর। সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে তিনি ভিতরের ঘর থেকে বৈঠকখানায় এসে দেখেন অনেকে এসে গেছেন। পাদরি অ্যাডাম সায়েব, হেয়ার সাহেব, হরিহরানন্দ, দ্বারকানাথ, অন্নদাপ্রসাদ, কালীনাথ রায়— এবং তাঁদের ব্রহ্মসভার অনেক সদস্য।

তাঁরা সব শুনেছেন এবং সব জানেন। তাঁর উপরে কি ভার ন্যস্ত করেছেন বেণ্টিঙ্ক তা এ শহরে আর অজানা নাই কারো। ইণ্ডিয়া গেজেট ফলাও করে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে—

An eminent native philanthropist who has long taken the lead of his countrymen on this great question has been encouraged to submit his views of it in a written form···

সেই গেজেট খুলে নিয়েই পড়ছিলেন তাঁরা। আরো কয়েকটি পত্রিকা ছিল—সমাচারদর্পণ, সম্বাদকৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা।

দ্বারকানাথ বললেন, চন্দ্রিকা-সম্পাদক তো ভয়ানক রুষ্ট হয়ে উঠেছেন, এ বিষয়ে আপনার কোনো অভিমত গ্রাহ্য নয় ব'লে মন্তব্য করেছেন।

দ্বারকানাথ কিছুটা পাঠ করে শোনালেন— আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেব দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্মসংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কথন প্রবৃত্ত হইবেন না।

চন্দ্রিকার ওই অভিমত শুনে হাস্য করলেন রামমোহন, প্রতিধ্বনি করে উঠলেন, চিরাকালাবধি স্থাপিত ধর্ম।

একটু থেমে বললেন, ওর নাম ধর্ম নয়, অধর্ম। গোঁড়া হিন্দুরা বলুন যা খুশি, সমাচারদর্পণ এই প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে। তা ছাড়া আমাদের পত্রিকা আছে, সম্বাদকৌমুদীতেও আমরা আমাদের অভিমত জানাব। আর, বঙ্গদূতটাও প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে সময়মতই— ওতেও লিখব আমাদের বক্তব্য।

চারদিকে তাকিয়ে তিনি বুঝি খুঁজলেন নীলরত্নকে, বললেন, কই, আজ আসেন নি বুঝি আমাদের বঙ্গদূত-সম্পাদকমশায়।

না। নীলরত্ন আসেন নি আজ।

অ্যাডাম হেয়ার দ্বারকানাথ অন্নদাপ্রসাদ সকলে বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে রামমোহন আলোচনায় বসলেন। কি লিখেছেন তিনি তার খসড়াটি মেলে ধরলেন। সকলে মিলে পাঠ করলেন ওই বিবরণ।

এদিকে রাত্রি হয়ে এল ক্রমশ। শ্রাবণের আকাশে মেঘ জমে এসেছে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল ওই মেঘ, বুঝতে পারা যায় নি। মেঘ ডেকে উঠল গুরুগুরু শব্দে। অবিলম্বে নেমে এল মুষলধারায় বৃষ্টি।

বাইরে শুরু হয়েছে প্রবল বারিপাত, ভিতরেও চলেছে আলোচনার প্রবল ধারাপাত। রক্ষণশীলেরা যত চক্রান্তই করুন, এবার যখন পাওয়া গিয়েছে একজন স্ট্রং গবর্নর-জেনারেল, তখন এই সুযোগ অবহেলায় হারানো হবে না।

সমাচারচন্দ্রিকাটি টেনে নিয়ে পূর্ণ বিবরণটি পাঠ করলেন রামমোহন। ২৭ জুলাই তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত সংবাদটিকে সূত্র ধরে এঁরা লিখেছেন এই মন্তব্য। এই সংখ্যাটির তারিখ দেখলেন তিনি— ৮ আগস্ট ১৮২৯, ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬।

দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি গবর্নর-জেনারেলের কাছে দাখিল করে দিলেন তাঁর বক্তব্য। কিন্তু এই বিবরণ-দাখিল করাই তিনি তাঁর শেষ কর্তব্য বলে বিবেচনা করলেন না। তাঁর মনে পড়তে লাগল, তাঁর মাতার কাছে তাঁর শপথের কথা; তাঁর চোখে জেগে উঠতে লাগল তাঁর ভ্রাতৃবধূ অলকমণির মুখ।

নিয়মিত তিনি যাচ্ছেন জোড়াসাঁকোয় সমাজমন্দিরের প্রার্থনা সভায়। কমল বসুর বাড়ি থেকে মাস-কয়েক হল স্বগৃহে উঠে এসেছে তাঁদের ব্রহ্মসমাজ।

সেখানে গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দেন। মনে-মনে চলে তাঁর আর-একটি প্রার্থনা, তিনি যেন অনুভব করেন এবার পূরণ হবে তাঁর সেই প্রার্থনাটি।

নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূতে এ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে জোর ভাষায় লিখছেন। সমাচারদর্পণও সমর্থনে আছেন, সম্বাদকৌমুদী তো লিখছেনই। কিন্তু সমাচারচন্দ্রিকায় বর্ষিত হচ্ছে উষ্মা।

রামমোহনের লেখা মূল ইংরেজি বিবরণটি ইণ্ডিয়া গেজেটে ছাপা হয়েছে।

হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা দল বেঁধে বিবরণটি পাঠ করছিল। তাদের মধ্যে জন-কয়েকের উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক। রামগোপাল ঘোষ ও রামতনু লাহিড়ি বলছে— এ ইংরেজি রামমোহনের হতে পারে না; রাধানাথ শিকদার প্যারিচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবও সন্দেহ প্রকাশ করছে; কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করছে না কিছু।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করছে তারা। কিন্তু কোনো মীমাংসায় আসতে পারছে না। অবশেষে মীমাংসায় পৌঁছে গেল তারা। একমত হয়ে তারা বলতে লাগল, এ নিশ্চয় অ্যাডামের ইংরেজি।

তারা আলোচনা করে চলেছে, এমন সময়ে সে-ঘরে ঢুকল ডিরোজিও। বছর-কুড়ি বয়সের একটি ফিরিঙ্গি ছেলে। ধর্মতলার পথে বহুদিন আগে একে আমরা দেখেছি, ডেভিড ড্রামণ্ডের স্কুলেও দেখেছি। সেই ছেলেটি এই কচি বয়সে অধ্যাপক হয়ে এসেছে হিন্দুকলেজে।

কচি হলে কি হবে, এরই মধ্যে ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে সে। ডিবেটিং ক্লাবও খুলেছে। ঘরে ঢুকেই ডিরোজিও জানতে চাইল কি নিয়ে আলোচনা।

বিস্তারিত বিবরণ শুনে রুষ্ট হয়ে ডিরোজিও বলল, আর্ ইউ অল ওয়াল্‌স্। কার ইংরেজি তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, কিন্তু আসল বক্তব্যটি কি সেদিকে মন নেই তোমাদের? আর্ ইউ অল ওয়াল্‌স্?

একটু থেমে ডিরোজিও বলল, ওর লাংগোয়েজের কথা পরে, আগে ওর সাব্‌স্ট্যান্সটা দেখ। অ্যাডামের ইংরেজি হোক আর যারই হোক, এ কথা জেনে রেখো, রামমোহন ক্যান রাইট ভেরি গুড ইংলিশ। অ্যায়াম সেণ্ট পারসেণ্ট শিয়োর ইট ইজ হিজ।

ছাত্রেরা এ কথা শুনে আর কোনো উত্তর দিল না।

সারা কলকাতা মুখর হয়ে উঠেছে আলোচনায়। চন্দ্রিকা-সম্পাদকের কলমের বুঝি বিরাম নাই। বেন্টিঙ্ক যদি কিছু করে বসেন তাহলে কি কি অঘটন ঘটতে পারে তার সমাচার প্রকাশ করে চলেছেন তিনি।

কলকাতার বাজারে-বাজারে আর গলিতে-গলিতে চলেছে তুমুল আন্দোলন। আহেরিটোলা বেনেটোলা দরজিটোলা কলুটোলা, বটতলা বাঁশতলা আমড়াতলা চাঁপাতলা তালতলা নেবুতলা বাদামতলা মানিকতলা, চড়কডাঙ্গা নারকেলডাঙ্গা পটলডাঙ্গা মলঙ্গা, বড়বাজার শোভাবাজার মেছোবাজার বাগবাজার জানবাজার, ভবানীপুর খিদিরপুর চিৎপুর, চুনাগলি পাঁচিধোপানি-গলি হাড়কাটা-গলি বাঁশতলা-গলি হাঁসপুকুর-গলি, জোড়াবাগান চোরবাগান হালসীবাগান হাতীবাগান মেহেদিবাগান রামবাগান— সর্বত্র ঐ এক কথা।

বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এল আকাশে। শরৎ কেটে গিয়ে এল হেমন্ত।

ঋতুবদল হয়ে চলেছে। কিন্তু রীতিবদলে কারো কোনো ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে তো নেইই, উপরন্তু এতে আছে আপত্তি।

গরানহাটায় কিছুদিন হল রূপনারায়ণের আবির্ভাব ঘটছে না। এতে রানী-বাইয়ের মনে বুঝি কোনো উদ্বেগও নেই, অশান্তিও নেই। তিনি না আসুন, তার কাছে আসছে তো অন্য কত বাবু। যথারীতি পরিতুষ্ট করাতে তার কোনো প্রতিবাদ নেই। কিন্তু জীবনে কেমন বিস্বাদ এসে গেছে যেন তার, কেমন পরিতাপে মন যেন তার পোড়ে। তার জীবনের শেষপরিণাম কি, এই কথাই বুঝি চিন্তা তার। ঐ মাসিটাই তাকে আরো ভয় দেখায়, বলে, করে নে, বয়স থাকতে যা পারিস করে নে।

কিন্তু বয়সই বা আর কতদিন তার। আসলে বয়স তো এর মধ্যে তার কম হয় নি।

চুঁচুড়ার বাবুটি আসেন না ব'লে কোনো অশান্তি বা উদ্বেগ তার নেই বটে, কিন্তু মনে হয় যেন, সে একবার এলে হত। আর, বেশি দিন এভাবে না-আসা তো ভালো না, এতে যে না-আসার অভ্যাস হয়ে যাবে।

তিনি আসেন না, এ দিকে তাঁর না-আসা নিয়ে ব্যঙ্গ করে এলোকেশী আর এলাচ।

এলাচ হেসে বলে, পুরুষমানুষরাই অমনি। তারা-সব দারচিনির মত, যেমন মিষ্টি তেমনি ঝাল। এলে মিষ্টি লাগে, না এলেই—

এলোকেশী বলে, দূর, ওরা লবঙ্গ, আগাগোড়াই ঝাল। এলেও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে, না এলেও জ্বালাযন্ত্রণার শেষ নাই।

কোনো উত্তর দেয় না রানী-বাই। কিন্তু এতদিন কোনো খবর না পেলে খবর তো নিতে হয় একটা!

ভাবতে-ভাবতেও কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। শীত নেমে এল শহরে। আজ মাস তিনেক আসে নি লোকটা। হল কি তার? এবার একটু উদ্বিগ্নই হয়ে উঠেছে রানী-বাই।

ডাকল, মোহন।

পিকদানবরদার এসে দাঁড়াতেই বলল, বকশিস পাবি। তোকে যেতে হবে চুঁচুড়ায়। খবর নিয়ে আসবি ওই বাবুর, বুঝলি? আমি তোকে বাৎলে দেব সব।

মোহনকে সব বাৎলে দিয়েছিল রানী। সব বুঝি বলে দিয়েছিল। তার পর রওনাও করে দিল।

দিন দুই বাদে ফিরে এল মোহন। সংবাদ নিয়ে এসেছে সে।

সে-সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রানী-বাই। তার সমস্ত অতীতটা বুঝি ভেবে নিল সে এক নিমেষে। সেই ফরাসগঞ্জের বাড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে শান্তিপুর চুঁচুড়া রামবাগান গরানহাটা। অতীতটা দেখে নিল। কিন্তু দেখতে পেল না বুঝি ভবিষ্যৎ।

অতি ত্বরায় তৈরি হয়ে নিয়েছে রানী-বাই। এ বাড়ির কারো কোনো জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছে না, কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, কখন ফিরবে—কোনো উত্তর নেই তার।

মাসি এসে বাধা দিল, বলল, যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না। যেতে নেই।

হীরামতি বলল, চলো, সঙ্গে চলি।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রানী বলল, না। একা যাব

—ফিরবে কবে?

উত্তর দিল না রানী-বাই।

টাকশালের ঘাট থেকে ভাড়া নিয়েছে পাল্সি। মাঝিকে বলল, মিঞাসায়েব, যত টাকা চাও দেব। খুব জলদি চল, খুব জলদি।

এমন খুবসুরৎ যাত্রী পেয়ে মাঝিদের বিক্রম যেন বেড়ে গেছে, তারা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে নৌকো।

জীবনের সহস্র স্মৃতির কিনার ঘেঁসে চলেছে এই নৌকা। রিসড়া মাহেশ শ্রীরামপুর শ্যাওড়াফুলি গৌরহাটি, তরতর করে পার হয়ে চলেছে পান্সি।

গৌরহাটির ধারে ঐ সেই চালতে-গাছটি। শীতের হাওয়ায় পাতাগুলো কেমন-যেন কুঁকড়ে গিয়েছে। তবু, চিনতে অসুবিধে হয় না এতটুকু। এগিয়ে চলেছে তার নৌকো, তবু সে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছে ঐ গাছটি। ওর সঙ্গে তার জীবনের কত স্মৃতি বুঝি বাঁধা। মাটি আঁকড়ে ধরে আছে যেমন গাছটির শিকড়, রানীর মনও যেন অবিকল অমনি আঁকড়ে ধরে আছে ওই গাছটির ডাল-পালা।—বিদায়, বিদায়—মনে-মনে সে যেন ঐ গাছকে শেষসম্ভাষণ জানাতে লাগল।

ঐ কিনার থেকে তাদের বাড়ি আর কতই-বা দূর। মা কি বেঁচে আছেন? আর বাবা? মুরলী নবীন কত বড় হয়েছে? কি করে এখন তারা?

কিন্তু সেসব খবর নেবার অবসর এখন আর নেই তার।

তার দৃষ্টির সীমার বাইরে চলে গেল ঐ কিনার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ঘুরে বসে তাকাল সম্মুখ দিকে।

আর রানী-বাই নয়। এবার রাধারানী। অভিসারে চলেছে এখন সে। এ তার নতুন নৌযাত্রা—মনে পড়ছে শাস্তিপুরে যাত্রার কথা, মনে পড়ছে মাহেশের স্নানযাত্রার কথা।

পরিপাটি সাজে সাজিয়ে নিয়েছে নিজেকে। কোনো সঙ্গী নেয় নি, কোনো সহায় নেয় নি। কেবল নিজের উপর ভরসা রেখে সে যাত্রা করেছে। আজকের এ-নৌযাত্রা তার জীবনের স্মরণীয় যাত্রা।

মাঝে-মাঝেই সে তাড়া দিচ্ছে মাঝিকে, বলছে, কতদূর মাঝি, আর কতদূর?

—এসে গেলাম বিবি-সায়েব। এই তো উড়িয়ে নিয়ে এলাম ময়ূরপঙ্খীর মত।

—আর-একটু জোরে দাঁড় টানো মিঞাসায়েব, আমার বড় তাড়া।

ঝপাঝপ দাঁড় ফেলতে-ফেলতে জিজ্ঞাসা করল টিল্লু মিঞা, কি হয়েছে মা-ঠাকরুন, এত তাড়া কিসের ?

—তাড়া ? রাধারানীর গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখ ছলছল করে উঠল, ঢোক গিলে বলল, আমার স্বামী মারা গিয়েছেন, মিঞা-সায়েব।

চমকে উঠল টিল্লু মাঝি, আপশোস করে উঠল হাঁসফাঁস করতে-করতে, দাঁড় টানার জোর যেন কমেই গেল এতে।

চুঁচুড়ার ঘাটে এসে নৌকা যখন ভিড়ল, বেলা তখন দুপুর। রুমালে-বাঁধা একগুচ্ছ মোহর মাঝির হাতের মধ্যে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে, কাদায় গেঁথে গেল একটা পা, সে পা টেনে তুলে সে উঁচু পাড়ের দিকে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করল।

একঘরো মানুষের যা দশা হয় তাই হয়েছে, একটা দিন ঘরে পড়ে ছিল মড়া। এখন এনে চিতা সাজিয়ে তাতে শোয়ানো হয়েছে শব।

দেরি হয়ে ভালোই হয়েছে, তবু দেখতে পেল রাধারানী।

মাত্র চার-পাঁচ জন লোক এসেছে, তারাই ব্যবস্থা করেছে সব। মোতিলালও নেই, নরহরিও নেই।

চিতার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাধারানী। এ যেন সামান্য রানী নয়, মহারানীর মত এই রমণীকে দেখে অবাক হয়ে গেছে শ্মশানযাত্রী। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছে না তারা।

রাধারানী একদৃষ্টে চেয়ে আছে রূপনারায়ণের মুখের দিকে। কালো প্রজাপতির মত গোঁফজোড়া চড়াই-পাখির ডানার মত বেরঙ হয়ে গিয়েছে একেবারে। ওই মুখ ওই চোখ সবই কেমন রঙ-চটা দেখাচ্ছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখছে। শুকনো খটখট করছে তার চোখ। এক ফোঁটা জলও নামে নি তার চোখে।

এখানে হঠাৎ এই রমণীর আবির্ভাবের খবর সাড়া চুঁচুড়ায় ছড়িয়ে গেছে অচিরে, দলে-দলে লোকজন ছুটে আসছে তামাশা দেখতে। অবিলম্বে এক বিরাট জনতায় পূর্ণ হয়ে গেল নদীকিনার।

—কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, কে তুমি, কেন এসেছ ?

রাধারানী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সতী হব। তাই ছুটে এসেছি এখানে।

তার এ-ঘোষণায় ভয় পেয়ে গেল জনতা। দু পা সরে দাঁড়াল তারা।

বলে কি এ? কে এ? বারো-চোদ্দ বছর আগে যার বউ করেছে গৃহত্যাগ, তার চিতায় উঠে সতী হবার বায়না ধ'রে কে এল এই মেয়ে?—স্বামীর জলচ্চিতায় আরোহণ করার জন্যে?

এই ভয়ংকর সংকল্পের কথা মুখে-মুখে ছড়িয়ে গেল আরো।

শ্মশান-পুরোহিত মহেশ্বর ভট্টাচার্য ছুটে এলেন বুঝি মন্ত্রপাঠ করার জন্যে। ভিড় ভেদ করে তিনি এগিয়ে আসছেন।

এমন-সময়ে উঁচু পাড়ের উপর আবির্ভূত হল দুই ঘোড়সওয়ার। খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হ্যালিডে, সঙ্গে ডাক্তার ওয়াইজ।

সহিসের হাতে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁরা বালুর উপর ভারি বুটের দাগ আঁকতে-আঁকতে এসে দাঁড়ালেন রাধারানীর কাছে।

—কেয়া মাংতা?

মাথা নাড়তে লাগল রাধারানী— কিছু না, কিছু না।

—কে তুমি?

রাধারানী পরিচয় দিল নিজের, জানাল সে ওর স্ত্রী। বহুদিন সে আত্মগোপন করে ছিল মনের দুঃখে, কিন্তু এই চরম দিনে আর লুকিয়ে রাখতে পারল না নিজেকে, তাই, তাই—

আশ্চর্য, ও বুঝি শোনে নি এখনো গবর্নর-জেনারেলের প্রোক্লামেশন— এসব বেআইনি হয়ে গিয়েছে। সতী হওয়াই শুধু না, সতী হওয়ার কাজে যে সাহায্য করবে সাজা পেতে হবে তাকেও?

—কেউ সাহায্য করবেন না তবে, আমি একাই উঠব চিতায়।

ডিসেম্বরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে কনকন ক'রে। সেই হিম হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে হ্যালিডে সায়েব আলোচনা করতে লাগলেন ডাক্তার ওয়াইজের সঙ্গে। টু ডে ইজ সেকেণ্ড ডিসেম্বর, আইন চালু হচ্ছে পরশু থেকে; সুতরাং এখন ওকে বাধা দেওয়াই বুঝি বেআইনি হবে। তাঁরা ওকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেও যখন দেখলেন, কিছু হবার নয়, তখন ঠিক করলেন ওর পরীক্ষা নেওয়া যাক।

সে পরীক্ষা দিতে সম্মত হল রাধারানী।

ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হল, তরতর করে কেঁপে উঠল তার শিখা।

অনড় হয়ে বসে সায়েবদের নির্দেশ মত রাধারানী ঐ শিখার মধ্যে ডান হাতের একটা আঙুল দিয়ে চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে বসল। ধীরে-ধীরে পুড়তে লাগল আঙুল। একটা সাড়া নয়, একটা শব্দ নয়, একটা বাড়তি নিশ্বাস নয়, চুপ করে বসে আছে সে। ক্রমে বেঁকে গেল আঙুলটা। তবু নড়ল না রাধারানী।

এ যে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে চলেছে, এবং আগুনের জ্বালা কি রকম তা জেনেশুনেই এই সংকল্প করছে তা বুঝতে পেরে হ্যালিডে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন. অলরাইট।

ডাক্তার ওয়াইজ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, স্ট্রেঞ্জ।

হ্যালিডের হুকুমে নদীর কিনার থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর চেয়ার। চিন্তিত মনে পাইপ টানতে লাগলেন তিনি, দাঁতের চাপে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠেছে পাইপের মুখ।

শঙ্খ ও সিঁদুর নিয়ে জমায়েত হয়েছিল এয়োর দল। বাধা দূর হওয়ায় তারা দলবেঁধে এগিয়ে গেল, রাধারানীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে-দিয়ে তার সমস্ত চুল রক্তরাঙা করে তুলল।

জোয়ার আসছে নাকি? ছলছল করে উঠেছে হুগলীর জল। এখান থেকে অনেক দূরে ইতিমধ্যে প্রবলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে বুঝি বঙ্গোপসাগর। সাগরসঙ্গমতীর্থ ডুবিয়ে দিয়ে, শতমুখী আর চৌমুখীতে প্লাবন সঞ্চার ক'রে, রূপনারায়ণ ও দামোদরের মোহনা ডিঙিয়ে ঘাটে-ঘাটে ত্রাস সঞ্চার করতে-করতে অচিরেই এখানে পৌঁছবে বুঝি সেই জোয়ার।

লেলিহান হয়ে উঠেছে চিতার আগুন ইতিমধ্যে, এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনতা।

সমস্ত স্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে অকস্মাৎ একসঙ্গে হুলুধ্বনি করে উঠল সমবেত পুরস্ত্রীরা।

—